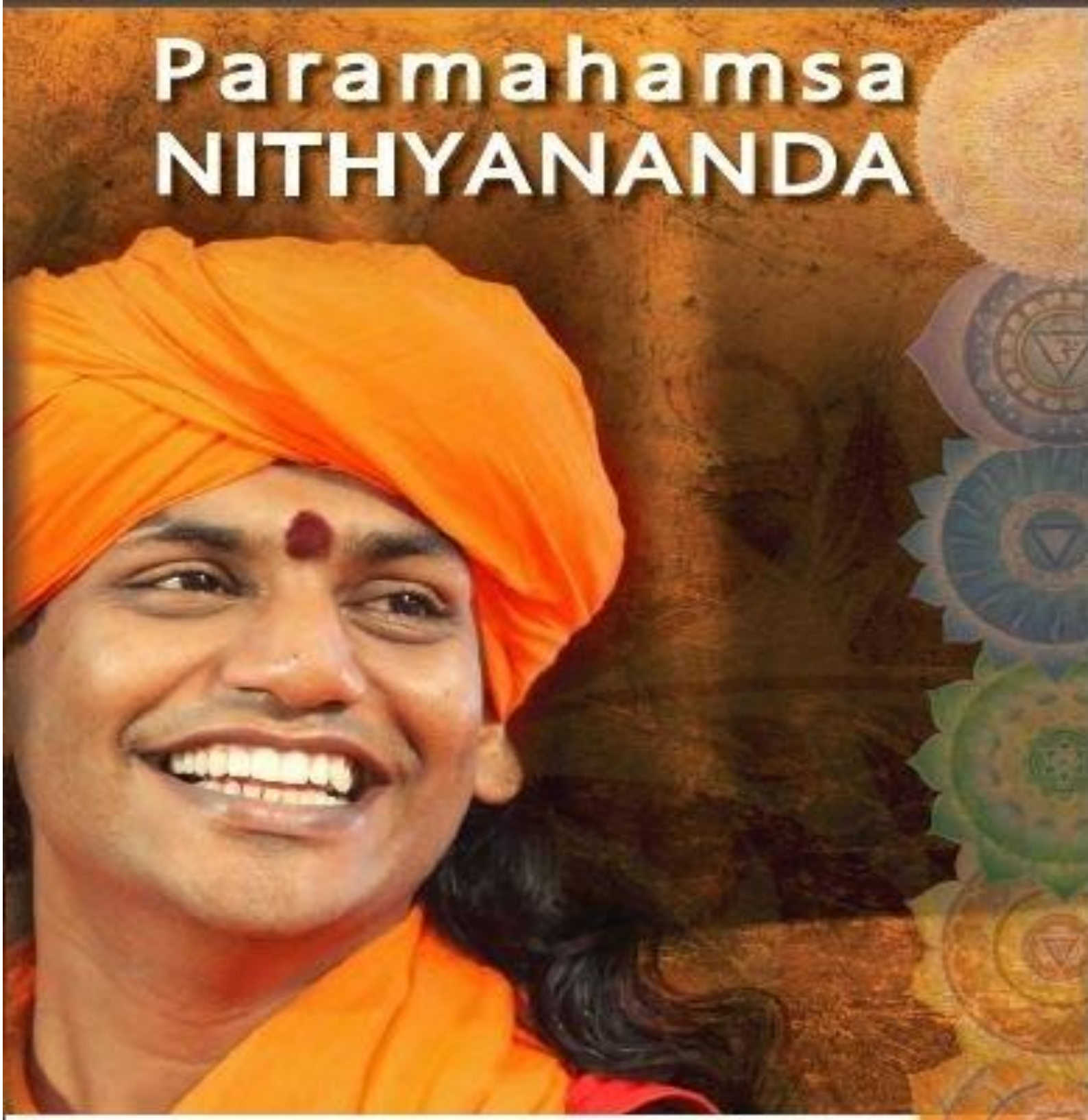
Paramahamsa
NITHYANANDA



নিশ্চিত সমাধান

আধ্যাত্মিক, ধ্যান ও আত্ম-উন্নয়ন

পরমহংস নিত্যানন্দ

এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ধ্যান শুধুমাত্র পরমহংস নিত্যানন্দ দ্বারা প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অভ্যাস করা উচিত। উপরন্তু এই ধ্যান প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস করার আগে আপনাকে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আপনার স্বাস্থের জন্য এগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে তার মতামত নাওয়া উচিত।

ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া এবং পরমহংস নিত্যানন্দ দ্বারা প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছাড়া কেউ এই ধ্যান প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস করলে সে নিজে সেগুলির সম্পূর্ণ ঝুঁকি নেবে ও কোন প্রকার ফলাফলের জন্য দায়ী হবে। সেক্ষেত্রে লেখক অথবা তাঁর সঙ্ঘ বা সংগঠন কোন রকম পরিণতির জন্য দায়িত্ব বহন করবে না।

Nithyananda University Press [নিত্যানন্দ ইউনিভার্সিটি প্রেস]
ebook ©2015 [ইবুক ©২০১৫]

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি বিনা এই প্রকাশনের তথ্য প্রচার করা বা কোন ভাবে কপি করা ও কোথাও সংরক্ষণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আপনি এই বইয়ের কোন তথ্য নিজে কোথাও ব্যবহার করলে, তার ফলাফলের জন্য লেখক ও প্রকাশক কোন দায়িত্ব নেবে না।

এই বই বিক্রি থেকে আয়ের একটা অংশ দাতব্য কার্যক্রমে সাহায্য করবে।

নিশ্চিত সমাধান

আধ্যাত্মিক, ধ্যান ও আত্ম-উন্নয়ন

নিত্যানন্দ

[চক্র ধ্যান প্রোগ্রাম যথা
আনন্দ স্ফুরণ প্রোগ্রাম (ASP) ও লাইফ ব্লিস প্রোগ্রামে (LBP)
বক্তৃতা থেকে সংকলিত]

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় **মিথস্ক্রিস্ক্রিয়া** 3

দ্বিতীয় অধ্যায় **অবতরণিকা** 15

তৃতীয় অধ্যায় **প্রেম শক্তির উৎস হও** 27

চতুর্থ অধ্যায় **দুশ্চিন্তা ছাড়া থাক** 49

পঞ্চম অধ্যায় **যৌন-কামনাকে ঐশ্বরিক প্রেমে রূপান্তরিত কর** 81

ষষ্ঠ অধ্যায় **ভয়ের সম্মুখীন হও** 107

সপ্তম অধ্যায় **তুমি অনন্য, অদ্বিতীয়** 129

অষ্টম অধ্যায় **আমিত্বকে মুছে ফেল** 155

নবম অধ্যায় **কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রস্ফুটিত হও** 187

পরিশিষ্ট 221



প্রথম অধ্যায়

মিথস্ক্রিয়া

তো

মাদের সবাইকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সুস্বাগতম্।

তোমরা সবাই এখানে কিছু আশা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছো , জ্ঞান বাড়াবার জন্য, জীবনে নতুন দিশা পাবার জন্য, জীবনটা আরও ভালভাবে কিভাবে বাঁচা যায় তা দেখার জন্য।

বিষয়ে প্রবেশ করার আগে তোমাদের কিছু বলতে চাই, যাতে তোমরা এখানে আসার ফলস্বরূপ সবচেয়ে বেশী করে লাভ অর্জন করতে পার।

প্রথমে মনকে খালি করো!

এখানে আসার আগে তুমি হয়তঃ বহু জায়গায় গিয়েছ, অনেক লেক্চার শুনেছ, নানা কলাকৌশল (technique) অভ্যাস করেছ। তা সব ঠিক আছে। খালি একটা জিনিস, যখন এখানে ব'সে আছ, একদম পুরোপুরি 'এখানে'-ই অবস্থান কর, ব্যাস।

অন্য জায়গায় যত জ্ঞান আগে সঞ্চয় করেছ তা রেখে দিয়ে এসো এবং তারপর এখানে এসো। বাইরে একটা বোর্ড দেখেছ, 'জুতা ও মন বাইরে রাখ।' হয়তো অবাক হয়েছ এর মানে কি। এর মানে - যেভাবে বাইরে জুতা রাখলে, সেভাবে নির্ণয় নিয়ে মনটাকেও বাইরে রেখে এসো! সঞ্চিত সমস্ত জ্ঞান তোমার জুতার পাশে রেখে তারপর ভিতরে এসো। ফেরার সময় তা নিয়ে যেতে পার । চিন্তা কোরো না, কেউ তা নিয়ে নেবে না। তা একদম সুরক্ষিত থাকবে। তোমার জুতা হয়তো কেউ নিয়ে যেতে পারে , কিন্তু তোমার মন? কেউ তা ছোঁবেই না, আমি তা গ্যারান্টি দিচ্ছি! মানুষ তার নিজের মনকেই সামলাতে পারে না, তারা কোনভাবেই তোমারটা ছোঁবে না।

খালি মন নিয়ে এলে তোমার কোন পূর্বসংস্কার (prejudice) থাকবে না আর আমি যা বলছি তা পূর্ণরূপে আত্মভূত করতে পারবে। যদি নিজের জ্ঞান নিয়ে আসো, তাহলে সারাক্ষণ আমার প্রত্যেকটা কথা তুমি যা জানো তার সাথে অথবা আগে কারো কাছে যা শুনেছো তার সাথে তুলনা করতে থাকবে। এতে আমি কি বলতে চাইছি তা ধরতে পারবে না। তুমি আমার কথা তখনই আত্মভূত করতে পারবে যখন তুমি তোমার ভিতরের জায়গা খালি রাখবে। তুমি যদি পুরো ভরা থাকো তো আমাকে রাখবে কোথায়?

ছোট্ট গল্প :

> পাশ্চাত্যের এক পণ্ডিত প্রফেসর জাপানে এক জেন-মাস্টারের (Zen-master) সাথে দেখা করতে যায়। প্রফেসর বহু বিষয়ে নানা রিসার্চ (অনুসন্ধান) করেছিলেন। আধ্যাত্মিকতা ভালভাবে বুঝতে ও তার সম্বন্ধে আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য সে মাস্টারের কাছে আসে।
> মাস্টারের বাড়ীতে পৌঁছে সে দ্যাখে যে মাস্টার চা বানাচ্ছেন। মাস্টার তাকে দেখে বসবার ইঙ্গিত দিলেন ও চা বানাতে থাকলেন। প্রফেসর বসল ও কিছুক্ষণ পরে বকবক করতে লাগল - তার নিজের ব্যাক্গ্রাউণ্ড সম্বন্ধে, তার অধ্যয়ন, আবিষ্কার ও বিশ্বভ্রমণ সম্বন্ধে, বিভিন্ন মানুষের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, নানা বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে, ইত্যাদি ইত্যাদি।
> মাস্টার চা বানানো শেষ করে দুজনের মধ্যে দুটি কাপ রাখলেন। এবার তিনি প্রফেসরের কাপে চা ঢালতে থাকলেন। তিনি ঢালতেই থাকলেন, চা উপচিয়ে যেতে থাকল। প্লেট চায়ে ভরে গেল ও চা টেবিলে বইতে লাগলো।
> প্রফেসর কি হচ্ছে তা দেখছিল এবং নিজেকে আর সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে বলল, 'মাস্টার, আপনি কি করছেন? চা ঢালা বন্ধ করুন। কাপ তো উপচিয়ে পড়ছে!'
> মাস্টার থামলেন ও শান্তভাবে বললেন, 'তোমারও তো একই অবস্থা।'
> প্রফেসর ধাক্কা খেল, কিন্তু বুঝল যে মাস্টার তাকে কি বলতে চাইছেন।
> প্রফেসর চায়ের কাপের মত পুরো ভর্তি! মাস্টার তাকে যাই বলতে চাইবেন তা খালি বাইরে উপচিয়ে পড়বে, তার ভিতরে যাবে না। প্রফেসর মাস্টারের একটা কথাতেই বুঝে গেল যে মাস্টার তাকে কি বলতে চাইছেন।

তাই বোঝ : যদি সত্যিই কিছু লাভ করতে চাও তো খালি কাপের মত হয়ে যাও। পুরোপুরি উন্মুক্ত ও গ্রহণোন্মুখ হও। শিশুর মত সরল ও উৎসুক হও, স্পঞ্জের মত হও, শুষে নাওয়ার জন্য তৈরী; তা হলেই অনেক হবে।

তিন প্রকার জ্ঞান

তুমি দ্যাখো, তিন রকম জ্ঞান আছে। প্রথম হল, বৌদ্ধিক (intellectual) জ্ঞান - মন সম্বন্ধীয় জ্ঞান। এর জন্য তোমার শুধুমাত্র মনের দরকার, আর কিছুই না। তুমি যদি মনোযোগী হও ও যদি তোমার ভাল স্মরণশক্তি থাকে , তাহলে যথেষ্ট। যদি যুক্তি ভাল প্রয়োগ করতে পার, যদি একটু সাধারণ বিচারবুদ্ধি (common sense) দিয়ে তুমি জিনিষগুলিকে সংযুক্ত করতে পার এবং বোঝ,

তা হলেই হবে। এই প্রকার জ্ঞান তোমরা স্কুলে লাভ কর, বই মারফৎ। গণিত ও বিজ্ঞান শেখার জন্য তোমার মন যথেষ্ট। তুমি মহান গণিতজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিক হতে পার।

দ্বিতীয়টি হৃদয়ের জ্ঞান। এখানে তোমায় হৃদয়কে ব্যবহার করতে হবে, খালি মন নয়। শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্য - এসবের মধ্যে পড়ে। খালি মন ব্যবহার করলে কিছুই হবে না। হৃদয়কেও ব্যবহার করতে হবে। ছবি আঁকতে , কবিতা লিখতে, গান গাইতে, তোমাকে অনুভূতিশীল হতে হবে। এগুলো সবই সৃষ্টি, তোমার হৃদয়ের অভিব্যক্তি। কোন অনুভূতি ছাড়া একটা কবিতা লিখতে পার কি? একমাত্র মন দ্বারা কোন শিল্পী চিত্রাঙ্কন করতে পারে কি? না! তাকে নিজেকে হৃদয়ের সাথে জুড়তে হবে, তাহলেই সে সাবলীলভাবে বয়ে চলবে।

মন দ্বারা তুমি কতগুলি পয়েন্ট নিতে পার, কিছু কৌশল যার দ্বারা কবিতা লেখা বা ছবি আঁকা যায়। কিন্তু শেষে জিনিষটাকে হৃদয় থেকেই আসতে হবে।

তৃতীয়টি আধ্যাত্মিক জ্ঞান - মন বা হৃদয়ের জ্ঞান নয়, এটা তোমার সত্তার (being) জ্ঞান! আসলে এটাকে জ্ঞান বলা যায় না; এটা তোমার যুক্তির ঊর্ধ্বে এক গভীর উপলব্ধি। এটি শেখানো যায় না, কোথাও কুড়িয়ে নাওয়াও যায় না। এটা হতে পারে এক গভীর ভাবের আদান-প্রদান (communion) থেকে - সত্তাস্তরে (being level)।

আমি সর্বদা বলি : আমি তোমাদের আধ্যাত্মিকতা শেখাতে পারি না, কিন্তু তুমি শিখতে পার! সত্তাস্তরে আমার এই কথাগুলি আত্মভূত করে তুমি শিখতে পার - শক্তি বা এনার্জী যেভাবে শোষিত হয়। মাস্টারের শব্দগুলিতে এত প্রচণ্ড শক্তি যে তুমি চাইলে তা তোমাকে ভেদ করে তোমার সত্তাস্তরকে স্পর্শ করবে। এতে এমন এক রূপান্তর হতে পারে যা কেবল মনের কথা এবং হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে হয় না।

আমি যখন বলি, আমি বলি আমার পরমসত্যের অভিজ্ঞতা থেকে, আমার সত্তা (being) থেকে। তাই তুমি যখন শুনবে, তুমি সর্বতোভাবে শোন, তোমার সত্তা থেকে শোন। তা হলে তুমি এই কথার পিছনে থাকা অভিজ্ঞতার ঝলক পেতে পার। আমি এখানে তোমাদের কথা শোনাতে আসি নি। তোমাদের কথার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমরা যদি এখানে সূক্ষ্ম সচেতনতা (acute awareness) ও নীরবতা নিয়ে থাকো, তাহলে কথার ঊর্ধ্বে যেতে পারবে এবং নিজের সত্তার ঝলক পাবে।

বিশ্বাস রাখো ও উন্মুক্ত হও

ঠিক আছে, আমরা আমাদের বসার ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন করি। নিজের আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিতদের পাশে বোসো না। চেনো না, জানো না, এমন মানুষের পাশে বসো। চেনা মানুষের সাথে বসলে আমি যখন বলছি , তখন তোমরা দৃষ্টি বিনিময় করতে পার বা কথা বলতে পার। অপরিচিতের সাথে বসলে, নিজের উদ্যমে আমাকে আরও ভালভাবে আত্মীভূত করতে পারবে।

আরেকটা ব্যাপার : যখন সেশন্ চলবে, একটা সুন্দর প্রবাহ হতে থাকবে, তখন এক শক্তি বা এনার্জী সৃষ্টি হবে ও ঘরটিকে স্পন্দিত করবে, তোমার ও আমার মধ্যে এক গভীর যোগাযোগ ঘটবে। দেরী করে এসে তাতে ব্যাঘাত সৃ ষ্টি কোরো না। সেই প্রবাহ বিঘ্নিত হবে। যেন সুন্দর হাই-ওয়েতে স্পীড-ব্রেকারে গিয়ে পড়লে। স্পীড-ব্রেকার (গতিবন্ধ) একটা ছোট বাধা। কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে গেলে তোমার গতি ধীরে করতে হবে, তারপর তার ওপর দিয়ে চল, অতিক্রম করে আবার গতি বাড়াও। সাবলীল প্রবাহ তো বিঘ্নিত হয়ে গেল।

আর দয়া করে সব মোবাইল ফোন সুইচ্ অফ্ (বন্ধ) কর। সেগুলো আজকাল আরেকরকম স্পীড-ব্রেকার! আসলে সেগুলো যাত্রাটা ঝাঁকুনিতে ভরিয়ে দেবে, যেন একটার পর আরেকটা স্পীড-ব্রেকার! আমি নিশ্চিত যে এখানে তোমাদের সবার কাছে সেল্ফোন আছে!

তারপর, তোমরা যখন এখানে আছ, একদম গম্ভীর ও জড়বৎ হয়ে থেকো না। আন্তরিকভাবে শোন, উন্মুক্ত মন নিয়ে শোন। এটা আশা কোরো না যে প্রথম সেশনেই ভগবান উপলব্ধি করবে! সহজ ও হাল্কা মেজাজে থাকো, কোন প্রত্যাশা কোরো না, তুমি অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারবে।

পরের জিনিষ : নির্ণয় নিয়ে তোমার সামাজিক পরিচয়টিকে বাইরে রেখে এসো। এখানে থাকার সময় এক সাধারণ মানুষ হবার চেষ্টা করো। আশ্রম এবং মাস্টারের উপস্থিতি এক অতি উত্তম গবেষণাগার বা ল্যাবোরেটারী, যেখানে নিজেকে নিয়ে গবেষণা করা যায়, আমিত্ব (ego) বিসর্জন দেওয়া যায়, নানা ভ্রান্তি দূর করা যায়, বোঝা যায় যে তুমি অস্তিত্বেরই (existence) এক সুন্দর অংশ। তাই তুমি যদি সমাজে বড় কেউ হও, এখানে সাধারণ হবার চেষ্টা করো ও সবার সাথে হৃদয় দিয়ে মেশো। কেবল আমার কথাই নয়, মেলামেশার প্রতিটি মুহূর্ত, এখানে অবস্থান করার প্রতিক্ষণ, তোমার মধ্যে রূপান্তর ঘটাতে পারে। তোমাকে শুধুমাত্র

সচেতন থাকতে হবে, ব্যাস।

একটা ছোট গল্প :

> এক বৌদ্ধ সাধু ছিলেন, তিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ। একদিন জাপানের এক রাজ্যপাল তাঁকে দেখতে এলো। রাজ্যপাল তার ভিসিটিং কার্ড মাস্টারকে পাঠালো। তাতে লেখা ছিলো, 'জাক-সান - জাপানের রাজ্যপাল।'
> মাস্টার কার্ডটার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'এই বুদ্ধুর সাথে আমার কোন কাজ নেই! তাকে এখুনি চলে যেতে বলো!'
> জেন মাস্টার কারো মন বা আমিত্ব ভেঙ্গে দেবার জন্য খুবই রূঢ় হতে পারেন। তাঁরা কর্কশ শব্দ ব্যবহার করতে কখনও ইতস্তত করেন না। তাঁদের শব্দের শক্তি আমিত্বকে সাবলীলভাবে ভেদ করে ও মানুষকে রূপান্তরিত করে।
> শিষ্য রাজ্যপালকে তার কার্ড ফিরিয়ে দিল ও মাস্টারের কথা হুবহু শোনালো। রাজ্যপাল কার্ড দেখে বুঝতে পারলো। সে বুদ্ধিমান ছিল, শুধু বুদ্ধিজীবী নয়! সে শান্তভাবে কার্ডে লেখা 'জাপানের রাজ্যপাল' কেটে ফেললো এবং কার্ডটি শিষ্যকে ফিরিয়ে দিলো।
> শিষ্য এবার কার্ডটি মাস্টারকে দিলে তিনি বললেন, 'তাকে ভিতরে নিয়ে এসো!'

উপাধি, পদবী এসব লেবেল সমাজই আমাদের ওপর সেঁটে দেয়। আমরা ভাবতে থাকি আমরা হচ্ছি সেই লেবেলগুলো। ভুলে যাই যে আমরা এই লেবেল নই, আমরা আরও গভীর কিছু। লেবেলগুলো আমাদের খুব ভাল লাগে। কিন্তু মাস্টারের সান্নিধ্যে এই লেবেল নিয়ে কখনও যাওয়া যায় না। এই লেবেল নিয়ে তুমি কদাপি অস্তিত্বকে জানতে পার না। মাস্টার হলেন অস্তিত্বের এক মানবরূপ।

রাজ্যপাল যা করেছিল তাকে ভুল বলা যায় না। সামজিক সৌজন্যবিধি অনুযায়ী রাজ্যপাল ঠিকই করেছিলো। কিন্তু মাস্টারের কাছে আমিত্ব পিছনে ফেলে যেতে হয়, আর সচেতনতাকে অবলম্বন করতে হয়।

মাস্টার ও অন্বেষণকারীর (seeker) মধ্যে কিছু একটা হয়। তাঁরা অন্তর্জগতের কিছু জিনিষ একসাথে শেয়ার করেন। এটা যখন ঘটে, বহির্জগতের লেবেল তাতে ব্যাঘাত ঘটায়। নিজব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হওয়াই আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিত্ব তো সামাজিক ব্যাপার। আমরা এখানে এসেছি আমাদের স্বতন্ত্র-অস্তিত্বকে পাবার জন্য, আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে ফিরে পাবার জন্য, মাতৃগর্ভে উপভোগ করা একাকীত্বকে পাবার জন্য। অস্তিত্বের সাথে আমাদের সংযোগকেই তো পেতে হবে ও একমাত্র তাকেই উদ্‌যাপন করা প্রয়োজন।

পরীক্ষা করতে সিদ্ধান্ত নাও!

যখন আমার কথা শুনবে, দুভাবে তোমাদের মন কাজ করবে। এক সন্দেহ নিয়ে, দুই বিশ্বাস নিয়ে।

সন্দেহ বুদ্ধিজীবী মনের পথ। সন্দেহ থাকলে, গ্রহণ করার পথে অনেক যুক্তি ও তর্ক আসবে। এটা হলে পুরো ব্যাপারটাই তুমি ধরতে পারবে না।

আর বিশ্বাস? সোজাসুজি বিশ্বাস করলেও তুমি ধরতে পারবে না। শোন, তোমাকে কাউকেও বিশ্বাস করতে হবে না, আমাকেও না। তথাকথিত বিশ্বাসীরা সবচেয়ে দুর্বল মানুষ, কারণ বিশ্বাস ছাড়া বাঁচতে গেলে অনেক সাহস চাই। বিশ্বাস না থাকলে তোমার কাজকে সমর্থন করার জন্য কোন আশ্রয় থাকে না। বিশ্বাস নেই অর্থ যেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারোপযোগী কোন পরিকল্পনা নেই, যা থেকে কি ভাবতে হবে ও কিভাবে করতে হবে, এসব উপদেশ পাওয়া যায়। বিশ্বাস বিনা থাকার জন্য অনেক সাহস চাই, কারণ তোমাদের তখন সবকিছুর জন্য নিজের বুদ্ধির ওপরে ভরসা করতে হবে আর এতে তোমরা নিজেদের অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন মনে করতে পার।

সন্দেহ ও বিশ্বাস - একই মুদ্রার দুই পিঠ - মুদ্রাটি যেন মন। অনেক গভীরে, তোমার বড় সন্দেহ কিছু বিশ্বাস নিয়ে থাকে এবং তোমার অগাধ বিশ্বাসেও কিছু সন্দেহ থাকে - আমি এটা তোমাদের জোড় দিয়েই বলছি।

তাহলে আমরা কি করব? কি করে শুনব?

একদম খোলা মন নিয়ে শোন, পরীক্ষা করার জন্য তৈরী থেকে, ব্যাস। যখন তোমরা পরীক্ষা করার জন্য তৈরী হয়েছ, তার মানে শিক্ষাগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে যাচ্ছ। আমি যদি বলি, 'সূর্য পূবদিকে ওঠে', তোমার সন্দেহ বা বিশ্বাস করার দরকার নেই। পরদিন সকালে উঠে নিজে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

সেটাই ঠিক পথ। খোলা মনে জিনিষগুলিকে গ্রহণ কর আর আমি যা বলছি তা প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি কর। বিশ্বাসের দরকার

নেই। পরখ করার ইচ্ছাই যথেষ্ট। আমি যা বলছি তা হাইপোথেসিস্ হিসাবে গ্রহণ কর, জীবনে তা কাজে লাগাও আর নিজে দ্যাখো তা কাজ করে কিনা। আপেলটি সুস্বাদু কিনা জানতে গেলে বিশ্বাস বা সন্দেহের প্রয়োজন নেই। একটি কামড় দাও, জানতে পারবে!

খোঁজ থামাও, তুমিই তো আনন্দ!

প্রাচীন ঋষি ও মাস্টারেরা বলেছেন যে মানুষের আসল প্রকৃতি হল আনন্দ। পৃথ্বীগ্রহে সময়কালে অনেক মাস্টার ঘটেছেন । বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ বা মহাবীর - তাঁদের সকল বাণীর সারমর্ম কিন্তু একই। তাঁরা সবাই বলেছেন যে মানুষের আসল প্রকৃতি আনন্দ এবং সেই আনন্দের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া তাঁরা দিয়ে গেছেন।

তাঁদের প্রকাশ হয়ত আলাদা আলাদা, কিন্তু তাঁদের বাণী বা শিক্ষা ছিল অভিন্ন। অবশ্যই বারংবার মানুষেরা এই বাণী হারিয়ে ফেলে, কারণ তারা মাস্টারের বাণী না নিয়ে কেবল মাস্টারের সাথে এঁটে থাকে। এই কারণেই পৃথ্বীগ্রহে এত অন্ধ -গোঁড়ামি, ধর্মীয় যুদ্ধ ও আরো নানা কিছু হয়ে চলেছে।

যাই হোক সব মাস্টারের একই বাণী যে আনন্দ মানুষের অন্তরেই আছে এবং মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা হল ভিতরের এই আনন্দকে খুঁজে বার করা। কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বিভ্রান্তিতে মানুষ তার উদ্দেশ্য ভুলে যায় আর এই আনন্দ বহির্জগতে খুঁজতে থাকে - বস্তুগত জিনিষে, নামে, আকারে, সমাজের দেওয়া লেবেলে, সম্বন্ধে, সম্পর্কে, পেশাগত উন্নতিতে, কিসে নয়।

একটা ছোট গল্প :

> এক বৃদ্ধ তার পরিবারের সাথে সিনেমা দেখতে গি য়েছিল। সিনেমা সবে শুরু হয়েছে আর লোকটি অন্ধকারে মেঝেতে কিছু খুঁজতে লাগলো। তার পাশে বসা নাতনী বিরক্ত হল ও দাদুকে জিজ্ঞাসা করলো সে মেঝেতে কি করছে।
> সে বলল, 'সোনা, আমার চুইংগামটা পড়ে গেছে।'
> বাচ্চা মেয়েটা আরও বিরক্ত হয়ে বলল, 'দাদু, ছেড়ে দাও। আমরা পরে আরও চুইংগাম কিনে নেবো। এখন সিনেমা দেখো।'
> বুড়ো বলে, 'আমার সেই চুইংগামটাই চাই।'
> মেয়েটা বলল, 'দাদু, ছেলেমানুষি কোরো না। আমরা আরও চুইংগাম কিনে নেবো।'
> বৃদ্ধ বলে, 'কিন্তু সোনা, আমার দাঁত তো ওতে আছে।'

দ্যাখো, আমরা আসলে একটা জিনিষ খুঁজছি, কিন্তু অন্য কোন নামে খুঁজছি! আমরা কত রকম নামে খুঁজছি। কিন্তু সেগুলো সব পাবার পরেও মনে হয় কিছু একটা পাই নি। ভিতরে একটা বিশেষ শূন্যতা। বোঝার চেষ্টা কর , এই শূন্যতা আছে কারণ আমরা আসলে আনন্দ অন্বেষণ করছি, কিন্তু আমরা তাকে অন্য নামে নানা জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই আমরা কখনই পরিতৃপ্তি পাই না। আমাদের সত্তা ডাক দিচ্ছে, আমরা শুনি না। আমরা আমাদের সত্তাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করি কারণ আমরা বহির্জগতে ভীষণভাবে ডুবে আছি।

সত্তাকেন্দ্রিক না হয়ে আমরা পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারি না , পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারি না। আমরা হয়ত বহির্জগতের কাজকর্মে ভরে আছি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই নি। আর পরিতৃপ্ত না হবার জন্য, ভিতরে একটা শূন্যতা থেকে যায় এবং বহির্জগতে আমরা আবার খোঁজ করতে থাকি। সত্তাকেন্দ্রিক হলে, বহির্জগতে আমরা যাই করি না কেন, প্রতিটি মিনিট আমরা পরিতৃপ্ত থাকব। কারণ পরিতৃপ্তি আমরা কি করছি তা থেকে আসে না , আসে ভিতর থেকে, সত্তা থেকে।

তাই মাস্টারেরা বারবার কি বলছেন তা গভীরে ঢুকে দেখা দরকার। অবিশ্রাম খোঁজার চেয়ে মাঝে মাঝে থেমে মাস্টারের কথার সত্যতার এক আবছা আভাস পাওয়া বেশী ভাল। কেবল খুঁজতে থাকলে তুমি তো এক পথিক হয়েই থেকে যাবে।

পথিকের এই ধারণা যেন 'বইটা ওঠানোর চেষ্টা, কিন্তু ওঠানো হচ্ছে না!' 'বইটা ওঠানোর চেষ্টা বলে কিছু হতে পারে কি? ওঠাও বা উঠিও না। ওঠানোর চেষ্টা কিভাবে করতে পার? যখন তুমি বলছ যে তুমি বইটা ওঠানোর চেষ্টা করছো , তুমি নিজেকে ঠকাচ্ছ! তুমি অন্যদের ঠকাতে পার না কারণ তারা জানে যে এটা সম্ভব নয়।

এইভাবে যাদের টাকাকড়ি করার ক্ষমতা নেই, তারা বলে যে যেহেতু তারা সৎ তাই তারা টাকাকড়ি করতে পারে না। সত্য হ'ল - তাদের ক্ষমতা নেই; কিন্তু তারা অন্য নানা কারণ দেখিয়ে তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে থাকে।

একইভাবে আমরা যখন আসল আধ্যাত্মিকতায় ডুব দিতে পারছি না , আর যদি সেইসময় আমরা আমাদের অজ্ঞানতা স্বীকার না করতে পারি, আমরা আমাদের নিজেদের দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করি আর সবাইকে বলি , 'আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সবই জেনেছি, জীবনমুক্তি

এই পেলাম বলে।' আমরা আমাদের আমিত্বকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখি। সত্য ও নিজের মাঝে আমরা এই অন্বেষী-আমিত্বকে বসিয়ে রাখি।

মোটরকারে যেভাবে শক্-অ্যাব্সর্বার (ঝাঁকুনি-রোধক) আমাদের রাস্তার ঝাঁকুনি থেকে বাঁচায়, অন্বেষী-আমিত্ব ঠিক তেমনি আমাদের বাস্তবতা থেকে দূরে রাখে। সত্য ও আমাদের মাঝে তা বাফারের (সংঘাত-রদকারী) কাজ করে। এই বাফারের আরামে আমরা খুশী হয়ে সিদ্ধান্তে আসি যে সারা জীবন আমরা অন্বেষী হয়ে ছিলাম !

এই ক'দিন যা বলছি, পুরো সচেতনতার সাথে তা শোন আর তার সারমর্ম বোঝ। তাহলে তুমি তোমার ভিতরের রূপান্তরের জন্য এক আকাশ সৃষ্টি করতে পারবে। নয়ত: তুমি খালি কথাই সঞ্চয় করতে থাকবে আর সবসময় খোঁজেই থাকবে। তোমার মধ্যে রূপান্তর না ঘটলে সব কথাই বৃথা। গভীর সচেতনার সাথে দ্যাখো , একমাত্র তবেই রূপান্তর সম্ভব হবে।

আরেকটা জিনিষ পরিষ্কার করে বোঝ : এই হলঘরে হাজার লোক থাকলেও, আমি কিন্তু তোমাকেই বলছি। যখন 'তোমাকে' বলছি, তার মানে 'তো' 'মা' 'কে।' তোমাদের প্রত্যেকের সাথে একটা সুতা দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে ; তাই অন্যদের কি বলছি তা প্রয়োগ করতে যেও না; তুমি তাহলে পুরো জিনিষটা নাগালে পাবে না।

সাধারণত: আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে শুনলে, আমরা সাথে সাথে তা নিজের ওপরে প্রয়োগ করি আর দেখি আমরা কি অবস্থায় আছি, আমরা দেখি আমাদের কোন রোগের লক্ষণ আছে নাকি, যা কিনা এক্ষুণি শুনলাম। আমি স্কিন্ বা ত্বক সম্বন্ধে বললে, নিজেদের ত্বক অনুভব করবে; হার্ট বা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে বললে নিজের হার্টের ধুকধুকানি শুনতে থাকবে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে শুনলে , আমরা তা অপরের ওপরে প্রয়োগ করি! আমাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী সবার ওপরে - কিন্তু নিজের ওপর কখনই নয়! সমস্যা হল আমি যাই বলি না কেন, তুমি ভাবো, 'ও! এসব আমি নিজে ভাল জানি। এই কথাটা আমার পতির জন্য। মাস্টার এটা বলছেন যাতে আমার পতি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে। আশা করি সে ঠিক করে কথাটা শুনেছে।'

যখন আমি দুশ্চিন্তার কথা বলি, তুমি ভাব তোমার মা কত দুশ্চিন্তা করে। তুমি ভুলে যাও যে তুমি নিজে কত দুশ্চিন্তা কর ! তোমাকে বলছি - কারণ তুমি দুশ্চিন্তা কর। হয়ত: তোমার মা তোমার চেয়েও বেশী দুশ্চিন্তা করে, কিন্তু সেটা এখানে পয়েন্ট নয়।

বোঝ যে প্রতিটি শব্দ তোমার জন্য। রূপান্তর ঘটানোর শক্তি নিয়ে শব্দগুলো তীরের মত আসবে। ওগুলি এড়িয়ে যেও না। অন্যরা বুঝতে পারছে কিনা সেদিকে নজর দিয়ো না।

যদি তুমি সবই বুঝে থাকো, তাহলে তো তোমার কোন দুশ্চিন্তা, অতৃপ্তি, ব্যথা, ভয়, কামনাবাসনা, ঈর্ষা বা আমিত্ব এসব নেই, ঠিক কিনা? কিন্তু তুমি এগুলোতে ভরে আছো। তা প্রমাণ করে তোমার আত্মশুদ্ধি হয় নি। প্রথমে জানো যে তুমি জানো না। তাহলে কমপক্ষে তুমি জানো যে তুমি জানো না! তুমি যদি নাই জানো যে তুমি জানো না, তাহলে তো তুমি জানই না যে তুমি জানো না!

প্রশ্ন : কিন্তু আমরা তো নিজেদের জানার পথে এগিয়ে চলেছি, তাহলে এই সময় হয়ত: আমরা কিছুটা জানি .....

উত্তর : তোমাদের একটা কথা বলি : গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে, কোন পথচলা নেই। সেটা একটা ক্ষণের অভিজ্ঞতা, ব্যাস। আমাদের সমস্ত তথাকথিত 'জানা' ব্যাপারটা খালি আমাদের ভিতরে স্থান তৈরী করছে যাতে পুরোপুরি জানা যায়। কিন্তু অ বশেষে গভীর ভাবে দেখতে গেলে, হয় 'আমরা জানি' অথবা 'আমরা জানি না।' আমরা আরও বেশী করে জানতে থাকলে আমরা আরও পরিষ্কার করে জানতে পারি যে আমরা জানি না! সেটাই যথেষ্ট। এটাই আমাদের আসল জানার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে।

ভগবত গীতার প্রথম পরিচ্ছেদ হল অর্জুন-বিষাদ-যোগ। এখানে অর্জুন তার বিষাদ বা দু:খ কৃষ্ণকে বলে যাচ্ছে আর কৃষ্ণ নীরবতা পালন করে আছেন। সবশেষে যখন অর্জুন সমর্পণ করে বলে , 'আমি কিছু জানি না!' তখন সে কৃষ্ণের কথা ধ্যান দিয়ে শোনার জন্য প্রস্তুত হল।

কৃষ্ণ ও অর্জুন বন্ধু ছিল এবং তারা কয়েক শতবার একসাথে অনেক স্বচ্ছন্দের অবস্থায় ছিলো, কিন্তু ভগবৎ গীতা আগে বলা হয় নি।

কেন?

কারণ, আগে অর্জুন গীতা শোনার জন্য পরিণত হয়নি ! যখন সে উচ্চারণ করল, 'আমি জানি না', তখন সে জানার যোগ্য হল। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হবার পথে মৌলিক শর্ত হ'ল পরিষ্কার করে জানা যে তুমি জানো না। এটাই সঠিক জানার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

তাই প্রশ্ন কর এবং উত্তর শুনে নিজের সন্দেহ দূর কর। তা শুনে অন্যেরও লাভ হবে। একমাত্র তুমি প্রশ্ন করলেই জিনিষগুলো বাস্তবিকভাবে কাজে লাগানো যায় এবং তা তোমার জীবনোপযোগী হবে।

তোমাদের মধ্যে কেউ ভাবতে পার যে প্রশ্ন করলে নিজেকে বোকা দেখাবে। তাহলে শোন, যদি প্রশ্ন কর তাহলে তোমাকে খালি বোকা দেখাবে; কিন্তু প্রশ্ন না করলে যে তুমি বোকা হয়েই থাকবে ! তাই কোন কিছু যদি মানতে বা বুঝতে না পার , হাত তোল আর সন্দেহ দূর করে নাও।

প্রশ্ন : এই ক'দিনে আমরা আমাদের সমস্ত নকারাত্মকতাকে ধ্বংস করে নতুন জন্ম নিতে চাই ...

উত্তর : ভাল করে বোঝ : পৃথ্বীগ্রহে কোন ধ্বংসই হবে না। খালি রূপান্তর হবে। তোমার সমস্ত নকারাত্মক ভাব যেমন রাগ , দ্বেষ, কামনাবাসনাকে রূপান্তরিত করা যায় পবিত্রপ্রেম, কৃতজ্ঞতা ও করুণার মত সকারাত্মক ভাবনাতে।

সমাজ সর্বদা তোমাকে শেখায় নিজেকে বিভাজন ও ধ্বংস করতে। সমাজ কখনও তোমাকে সুসংহত (integrated) হতে শেখায় না। তুমি ও তোমার মাঝে এক কীল বা গোঁজ লাগিয়ে সমাজ তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উচ্চ -নীচ - সমাজ সর্বদা তোমার সাথে এই ভাষায় কথা বলে। সে তোমাকে ভাবায় যে তুমি নিকৃষ্ট ও তোমাকে নিজের সাথে লড়ায়।

সমাজ তোমার ওপরে তখনই কর্তৃত্ব করতে পারে কেবল যখন তোমার ভিতরটা বিভ্রান্তিতে ভরা থাকে। তাই সমাজ তোমাকে প্রথমে মনে করায় যে তুমি ভাল নও আর পরে তার প্রতিকার নিয়ে আসে। সেইজন্য তুমি এইরকম হীন ভাষায় কথা বলতে শুরু কর।

একটা ছোট গল্প :

> একটা লোক সর্দিতে ভুগছিল। সে ডাক্তারের কাছে ওষুধ নিতে গেল। একদম সাধারণ সর্দি। ডাক্তার তাকে কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'এক কাজ কর। রাত্রে কিছুক্ষণ বাইরে বেরিয়ে গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাও। তারপর ফিরে এসো।'
> রোগী গেল ঘাবড়িয়ে। সে বললো, 'কিন্তু ডাক্তার! তাতে তো আমার নিমোনিয়া হয়ে যাবে।'
> ডাক্তার বলে, 'হ্যাঁ। আমি নিমোনিয়াকে তাড়াতাড়ি নিরাময় করতে জানি।'

সমাজ তোমাকে কিছু একটা বানিয়ে তারপর তা থেকে কি করে বেরিয়ে আসা যায় , তা শেখায়। বোঝ যে উচ্চ-নীচ বলে কিছু নেই। খালি রূপান্তর আছে। যখন চেতনার সাথে দেখতে শেখো, তুমি আপনা থেকেই রূপান্তরিত হয়ে যাবে। মাষ্টারের কাজ সবসময় এটাই। তিনি তোমাকে নিজের ভিতরে দেখতে ও সুসংহত (integrate) হতে শেখান।

মাষ্টার কখনও বলেন না যে তুমি নকারাত্মক। নকারাত্মক বলে কিছু নেই। যাকে তুমি নকারাত্মক বা সকারাত্মক বলো তা একটা বিস্তৃত-পরিসর বা স্পেক্ট্রামের (spectrum) দুটো চরম সীমা। নকারত্মকের কোন বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, যাকে তুমি ধ্বংস করবে। তুমি যদি রূপান্তরিত হও, তুমি স্পেক্ট্রামের উপরের সকারাত্মক শক্তির দিকে ধাবমান হবে, ব্যাস।

আগেই বলেছি, এই রূপান্তর সম্ভব যদি তুমি এখানে যা হচ্ছে সে সম্বন্ধে উন্মুক্ত ও গ্রহণোন্মুখ থাকো।

প্রশ্ন : আমরা অনেক বইতে পড়েছি যে আমাদের মন হল মায়া বা ভ্রান্তি আর আমাদের সব প্রশ্নগুলি ভ্রমমাত্র। দয়া করে এইসম্বন্ধে কিছু বলবেন?

উত্তর : আবার সেই মায়া সম্পর্কিত বিখ্যাত প্রশ্ন! প্রথম জিনিষ : জটিল পড়াশুনা করে নিজেকে গুলিয়ে ফেলো না। দ্বিতীয় : পরিষ্কার করে বোঝ যে মন দ্বারা কিছুই বোঝার নেই। জীবনের রহস্য মন দ্বারা সমাধান করা যায় না। জীবনের উদ্দেশ্য মন দ্বারা জানা যায় না। তাই তারা বলেন যে মন একটি ভ্রম।

জীবনের রহস্যের সমাধানের প্রথম সোপান হল 'মনকে ফেলে দাও।' যদি মনকে খেলতে দাও, তুমি খেলতেই থাকবে। জন্মের পর জন্ম খেলতে থাকবে। তোমার অন্তরের গভীর তৃষ্ণা অতৃপ্ত থেকে যাবে। হয়তো তোমার অন্বেষী-আমিত্ব তৃপ্ত হবে, কিন্তু তাতে কি হবে? তুমি তো অন্তরে আরও বেশী বিভ্রান্তিতে থাকবে।

তোমার ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্র মন থেকে হৃদয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর। যদি মনকেন্দ্রিক হও, প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে থাকবে। প্রশ্ন দ্বারা জানতে পারবে না। একমাত্র চেতনা দিয়েই জানতে পারবে।

যদি হৃদয়কেন্দ্রিক হয়ে ক্রিয়াকর্ম কর, তোমার মধ্যে সচেতনতা ও উপলব্ধি হবে আর নিজে থেকে তোমার প্রশ্নগুলি দ্রবীভূত হবে বা গলে যাবে; যেমন সূর্যোদয় হলে অন্ধকার মিলিয়ে যায়। তোমার চেতনা হলে , উপলব্ধি হবে এবং প্রশ্ন গলে যাবে।

প্রশ্ন জাগার আগেই তোমার উপলব্ধি হতে থাকবে! এইভাবে প্রশ্ন গলে যাবে। এটা বোঝা শক্ত, কিন্তু একবার একটা অভিজ্ঞতা হলে চেতনা সম্বন্ধে আমি কি বলতে চাইছি তা ঠিক বুঝে যাবে। প্রশ্নগুলি অদৃশ্য হবে এবং উপলব্ধি তোমাকে ক্রমাগত গ্রাস করতে থাকবে।

যদি এইটুকু বোঝ, তাহলে মায়া বা ভ্রান্তির ব্যাপারে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমার কথা থেকে বৌদ্ধিক উপলব্ধি ছাড়া ধ্যান তোমাকে চেতনার পদ্ধতিতে যেতে সাহায্য করতে পারে। ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা মায়া আর ভ্রান্তি সম্বন্ধে কথা বলতে পারি, কিন্তু তুমি তাতে আরও গুলিয়ে ফেলবে।

বরঞ্চ, আমাদের বুদ্ধিমানের মত বেঁচে থাকার জন্য সাহায্যকারী সমাধানগুলি শিখে নাওয়াই শ্রেয়। একটা জিনিষ তোমাদের বলি : যা কিছু মন প্রক্ষেপণ করে, তাই মায়া বা ভ্রান্তি। তাই আমি বলি, মায়া সম্পর্কে জানতে উদ্বিগ্ন হয়ো না। বরং আরও জাগরূক হয়ে, আরও সচেতন হয়ে বাস করার চেষ্টা কর। তাহলে মায়া সম্পর্কে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

আগেও বলেছি, আনন্দ আমাদের মধ্যে অবিশ্রাম ঘটছে। এটাই ধ্রুব সত্য। কিন্তু আমরা আনন্দ-প্রবাহকে লাগাতার গতিরোধ করে রাখি। ফলে, ভুগি। আনন্দ এই নয় যে এটা বাইরে পাওয়া যায় ও পেয়ে নিজের ভিতরে রাখবে। না। আনন্দ তোমার সহজাত প্রকৃতি। যখন পৃথিবীতে এসেছিলে, তুমি তখন আনন্দ-অবস্থায় ছিলে। সমাজ যখন তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল, তুমি তা (আনন্দ) থেকে অনেক দূরে সরে হেলে। তারপর তুমি তাকে ফিরে পাবার জন্য বহির্জগতে খুঁজতে থাকো।

আমরা দেখব এই 'আনন্দ বন্ধ করা'-কে কিভাবে বন্ধ করা যায়। আনন্দ মানে কিন্তু আমি সাধারণ সুখের কথা বলছি না , যে সুখ আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করি। সাধারণ সুখ বহির্জগতে কিছু ঘটার ফল : কোন খুশীর অনুষ্ঠান, কিছু বস্তুগত লাভ, কোন খুশখবর, কোন কার্যকরী সম্বন্ধ - বহির্জগতে কোন বস্তু বা মানুষের সাথে সম্পর্কিত। এইপ্রকার সুখ বাইরের মানুষ বা পরিস্থিতির ওপরে নির্ভর করে। আবার এই প্রকার সুখই দুঃখের দিকে ঠেলে দেয় , কারণ মানুষ ও পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। তারা এক থাকে না। ভিন্ন সময়ে তাদের ব্যবহার বিভিন্ন। আর যখন তাদের ব্যবহার বদলায়, আমাদের সুখও বদলায়!

আমরা যে আনন্দের কথা বলছি তা ভিন্ন। এটা তোমার ভিতরের এক অবস্থা, যা বাইরের জগতের সাথে কোনভাবেই সংযুক্ত নয়। এটা তোমার অন্তঃসার বা মর্মবস্তু, তোমার চিরস্থায়ী অবস্থা। যখন এটা পাবে, তুমি বহির্জগতকে আনন্দপূর্ণ হয়ে লক্ষ্য করতে থাকবে। বহির্জগতে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করবে, কিন্তু নিজের আনন্দকে না হারিয়ে।

একটা ছোট গল্প :

> এক পরিবারে এক বৃদ্ধ ছিল যে কোনভাবেই সন্তুষ্ট হতো না। তার পরিবারের লোকজন তাকে যতই খুশী রাখার চেষ্টা করুক, সে সর্বদাই জেদি ও বদমেজাজী হয়ে থাকতো। তার ছেলেমেয়ে নাতীনাতনীরা দেখতে আসতো ও তাকে খুশী করার চেষ্টা করত। সব বৃথা। বুড়ো সবসময়েই মেজাজী।
> হঠাৎ একদিন সে খুব ভদ্র ও প্রফুল্ল হয়ে গেল। এই আকস্মিক পরিবর্তনে তার পরিবার অবাক। তার নাতনী জিজ্ঞাসা করে, 'দাদু, কি করে তুমি হঠাৎ পরিবর্তিত হলে?'
> বৃদ্ধ জবাব দিলো, 'সারাজীবন আমি একটা পরিতৃপ্ত মন পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সার্থক হলাম না। তাই আমি এখন যেরকম মন, তাতেই সন্তুষ্ট হবার জন্য প্রযত্নশীল হ'লাম।'

সবই তোমার মনের প্রক্ষেপণ (projection)! আমরা ঠিক করতে পারি আমরা কি হতে চাই। সবই তোমার মনেতেই আছে। মনের সাহায্যেই আমরা আমাদের ভিতর থেকে আসা আনন্দ-প্রবাহ বন্ধ করেছি। এটাই সত্য।

শোন : এক সার্বলৌকিক-চেতনা (universal consciousness) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছে, আর আছে এক ব্যক্তিগত-চেতনা (individual consciousness) যা আমাদের ভরে রেখেছে। এই দুটির মধ্যে সংযোগসাধন করাই মানুষের আসল উদ্দেশ্য। যখন এই সংযোগ ঘটে মানুষকে মুক্ত বলা হয় - সে তখন নিত্যানন্দে (eternal bliss) থাকে। নিত্য মানে চিরন্তন বা অন্তহীন, তাই নিত্যানন্দ মানে অন্তহীন আনন্দ।

সুবিদিত মাষ্টারদের বাণী শ্রবণ করে ও তাঁদের দেওয়া ধ্যানপ্রক্রিয়া অভ্যাস করে আম রা এই সংযোগ সম্পর্কে উত্তরোত্তর অবহিত হতে থাকি এবং তা অভিজ্ঞতা করার প্রচেষ্টা করি। কারণ একবার এই সংযোগ হয়ে গেলে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে সবই সহজ হয়ে যায়!

দুই প্রকার মনুষ্য আছে : যারা অপরের সাথে লড়াই করে ও জেতে এবং যারা নিজের সাথে লড়াই করে জেতে। অন্যের সাথে লড়াই করা বড় সোজা। কোন ব্যাপার নয়। নিজের সাথে লড়া খুবই কঠিন। সাহসী হলে তুমি নিজের সাথে লড়াই করবে ও

জিতবে। তুমি যা নও তাকে তুমি বিধ্বস্ত করবে, আর আনন্দময় হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

নিজের সম্ভাবনা বা সুপ্তশক্তি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেটা হয় অন্তর্মুখী হলে এবং নিজেকে শোধন করতে করতে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়ে আরও সংগ্রহ করা ও আরও অধিকার করা বন্ধ করলে ।

আসলে স্বামী শব্দটির মানে যিনি তাঁর পুরো সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছেন। আমাদের পৃথ্বীগ্রহের সমস্ত অসুবিধাগুলির কারণ হল আমরা আমাদের সম্ভাবনা বুঝে উঠতে পারি নি। চলতি কথায় আছে : সিংহকে সিংহ না হতে দিলে তা শিয়াল হয়ে যাবে। আমাদের আসল সম্ভাবনা বা সুপ্তশক্তিকে চিনতে না দিলে, আমরা তা ভুলপথে প্রকাশ করব - নিজেকে ধ্বংস করবার জন্য বা অন্যদের বিনাশ করার জন্য।

তাই সৃজনশীল শক্তিকে, সুপ্তশক্তিকে, স্বচ্ছন্দ প্রবাহে প্রকাশ করতে দেওয়া উচিত। একদিকে সমাজের সেটা করতে দেওয়া উচিত; অন্যদিকে আমাদেরও তা প্রকাশ করার প্রক্রিয়া জানা উচিত। স্বামী হল সেই ব্যক্তি যিনি নিজের সম্ভাবনা ও সুপ্তশক্তিকে জেনেছেন, যিনি নিজে যা, সেভাবেই নিজেকে প্রকাশ করছেন, যিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তার সাথে সুরে বাঁধা; যিনি আনন্দময়।

তোমার মধ্যে অসীম সম্ভাবনা আছে। বারংবার মনোবিদ ও অতীন্দ্রিয়বাদীরা বলেন যে মানুষ তার পুরো সম্ভাবনা বোঝে নি। আমরা কোথায় জিনিষটা ধরতে পারছি না? কোথায় আটকে যাচ্ছি? কেন আমরা আমাদের পুরো সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারছি না?

আমাদের হালকা হবার ও অনুসন্ধান করার সাহস চাই, ব্যাস। তাহলে সবকিছুর উত্তর পেয়ে যাবো। আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করলে চেতনার উন্মোচন শুরু হওয়ার অভিজ্ঞতা হবে এবং এই উন্মোচন তোমার ভিতরে এক জগৎ উন্মুক্ত করবে ও তুমি প্রস্ফুটিত হবে।

প্রস্ফুটিত হলে তুমি রাজা হও। রাজার মত এই গ্রহে বাস কর। মানুষের হয়ত সবরকম সম্ভাব্য আরাম, ধন, জ্ঞান ইত্যাদি আছে। কিন্তু তারা ভিখারী হয়ে থাকবে যদি তারা অন্তর্জগতের সন্ধান না পেয়ে থাকে। নিজের সত্তাকে খুঁজে পাওয়াই ধনী হওয়া। অন্তর্জগতের সম্পদই আসল সম্পদ।

আমরা বহির্জগতের ঘটনায় এত বেশী জড়িয়ে পড়েছি যে অন্তর্জগৎ সম্পর্কে আমরা একেবারে অজ্ঞ হয়ে থাকি। বহির্জগতের অভিযানে আমরা এত বেশী ব্যস্ত যে আমরা অন্তর্জগতের সুন্দর অভিযানের সুযোগ হারাই। মহান ঋষিগণ ও মাস্টারেরা তাঁদের জীবনে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছেন তার নাগাল পাই না। এই অভিজ্ঞতাই আমি তোমাদের সবাইকে দিতে চাই।

প্রশ্ন : আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা আপনি সংক্ষেপে কিভাবে দেবেন?

তোমার ভিতরে চারটি জিনিষ প্রস্ফুটিত হওয়াই আধ্যাত্মিকতা : শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, সুষম পারস্পরিক সম্পর্ক (smooth inter-personal relationship) এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেবার সক্ষমতা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেবার সক্ষমতাকে আমি দায়িত্বশীলতা (responsibility) বলি।

শারীরিক স্বাস্থ্য মানে রোগমুক্ত থাকা। ডাক্তারের কাছে গেলে সে যেন তোমায় ক্লিনিকালি ভাল আছো বলে ঘোষণা করে ।

দ্বিতীয় - মানসিক স্বাস্থ্য : সর্ব প্রকার অবচেতন ও গভীরভাবে খোদিত নকারাত্মক চিন্তার ছক (thought pattern) থেকে মুক্ত হওয়া এবং দুশ্চিন্তা, বেদনা, ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা, অসন্তোষ, আমিত্ব, কামনা ইত্যাদিকে জয় করা।

তৃতীয়, তোমার চারিদিকের সমস্ত মানুষের সাথে সুষম পারস্পরিক সম্পর্ক রাখা। কেবল সবার সাথে সহৃদয় হলেই হবে না। কোন চাপ বা বেদনা অনুভব না করে সবার সাথে যে কোন পরিমাণে মিথস্ক্রিয়া করার সামর্থ্য চাই! যে মুহূর্তে চাপ বা বেদনা অনুভব কর, তার মানে তোমার ভিতরে কিছু প্রতিবন্ধক আছে এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে তা বাধা দিচ্ছে।

চতুর্থ - স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেবার সক্ষমতা, যাকে আমি দায়িত্ব বলি। যখন তুমি দায়িত্ব নিতে সক্ষম হও, যখন তুমি কোনকিছুতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'হ্যাঁ' বলতে সক্ষম হও, তুমি সেই মুহূর্তে প্রসারিত হবে এবং শক্তি তোমার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে সে কার্যে তোমাকে সফল করবে! নিশ্চিতভাবে সেই কার্য নির্বাহের জন্য শক্তি প্রয়োগ করাটা তোমার ওপর নির্ভর করে। সেটা করতে থাকলে তুমি প্রসারিত হতে থাকবে।

যদি এই চারটি জিনিষ তোমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, তবেই তুমি আধ্যাত্মিক। আর এই প্রস্ফুটন তোমার পেশা, বিবাহিত না অবিবাহিত, কম না বেশী বয়স, তাদের ওপর নির্ভর করে না।

প্রশ্ন : আপনি নিরামিষ বা আমিষ ভোজন সম্বন্ধে কি বলেন?

উত্তর : প্রথমে বলি, চারদিকে আমিষ ভোজন করতে মানা কোরো না। না জেনে মতামত দেওয়া মানে ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়া! কিছু ব্যাপার যুক্তি দিয়ে সমাধান করা যায় না। যদি তাদের আমিষ খেতে বারণ করো তাহলে তারা বলবে যে গাছ ও শাকসব্জীরও তো প্রাণ আছে। তাহলে আমরা তা কেন খাই? তাদের কি বলবে? এই তর্কের কোন শেষ নেই।

আমি তোমাদের বলতে পারি : দাঁত সহ মানুষের শরীর পুরোটাই তৈরী হয়েছে নিরামিষ খাবার চিবানো ও হজম করার জন্য। আমি শুদ্ধ শাকাহারী। আমি শাকাহার করি কারণ তা আমার শরীরের জন্য উপযোগী। অনেক মাস্টারেরা আমিষ খেতেন। অবশ্য জীবনমুক্ত মাস্টারেরা যখন বিশেষ কিছু করেন, আমরা তার বিচার করতে পারি না, কারণ তাঁদের কাজ সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। আমরা তাতে ভুল বুঝতে থাকবো ও পুরো জিনিষটাই হারিয়ে ফেলবো।

একটা অনুরোধ, খাবার অভ্যাস দেখে মানুষকে ভেদ কোরো না এবং মানুষকে আমিষ খাওয়া ছেড়ে দিতে জোর করো না।

একটা ছোট গল্প :

> ভারতে টেলিভিশন চালু হবার সময় ভিক্ষুকদের বাড়ীতে একটা নতুন টেলিভিশন কেনা হল। একজন ছাড়া সবাই টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দেখতো।
> যে টেলিভিশন দেখতো না, সে বাড়ীর প্রধানের কাছে গিয়ে নালিশ করতো যে কিভাবে অন্যেরা ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিভিশন দেখছে। অনেকবার নালিশ শোনার পরে প্রধান তাকে বলল, 'তোমারও কাল থেকে টেলিভিশন দেখা উচিত।'
> লোকটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কেন?'
> প্রধান বলল, 'তুমি না দেখার জন্য খুশী নও আর তাই ক্ষুব্ধ হচ্ছো। তোমার দেখার ইচ্ছা আছে কিন্তু দেখো না ; কারণ তুমি অন্তরে ভাল বোধ করতে চাও। সেটা দমিয়ে রাখার জন্য তোমাকে নালিশ করতে হচ্ছে।'

দেখো, তুমি যদি আমিষ না খাওয়ার জন্য খুশী না হও, তুমি অন্যদের নিরামিশাষী হতে জোর করবে। যখন তুমি কিছুতে পুরোপুরি ঢুকে আছো, তুমি কখনই অপরকে সেটা করতে জোর করবে না। যখন তুমি সেটা সন্দেহ নিয়ে করছ বা পুরো উদ্যমে করছ না , তখনই তুমি অন্যদেরও সেখানে টানবে। পুরোপুরি কিছুতে ঢুকেছ নাকি তা বোঝার জন্য এটা একটা মাপদণ্ড। যখন তুমি পূর্ণ , তুমি তোমাতে পুরোপুরি আছো, তোমার কোন অনুতাপ নেই। তাই তুমি কাউকে বিরক্ত করবে না। তুমি তাদের স্বাধীনভাবে থাকতে দেবে।

আমি বরং বলব যে যারা দিনে এক ঘন্টা আমিষ খায়, এমন মানুষেরা তাদের চেয়ে ভাল, যারা নিরামিশাষী কিন্তু সর্বদা আমিষ ভোজনের কথা চিন্তা করে!

একটা ছোট গল্প :

> এক জেন্-মাস্টার তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটা নদী পড়লো। সেখানে এক সুন্দরী মহিলা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে।
> মাস্টারকে দেখে মহিলাটি তাকে নদী পার হবার জন্য সাহায্য চাইল। মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহন করে নদী পার করে দিলেন এবং মহিলাটিকে ওপারে ছেড়ে এপারে ফিরে এলেন। শিষ্যদের মন তা দেখে চঞ্চল হল ও ভিতর ভিতর জ্বলতে থাকল। শহরের প্রায় কাছে এসে গেলে তারা আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসা করল, 'মাস্টার,আপনি কিভাবে মাস্টার হয়ে একজন মহিলাকে স্পর্শ করলেন, এমনকি বহনও করলেন?'
> মাস্টার উত্তর দিলেন, 'আমি তাকে সেখানে বহু আগেই ছেড়ে এসেছি। তোমরা তাকে এখনও বহন করছ কেন?'

মাস্টারেরা সব সময়ে প্রশ্নকর্তাকে উত্তর দেন, প্রশ্নকে কখনও নয়। এই গল্পে মাস্টার শিষ্যদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারতেন যে জীবনমুক্ত মানুষের কোন লিঙ্গভেদ নেই। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি শিষ্যদের বুঝিয়ে দিলেন যে বাধা বা প্রতিবন্ধক শিষ্যদের মনেই আছে, মাস্টারের কাজে নয়!

যদি দ্যাখো যে তোমার আমিষ খাদ্য গ্রহণের খুব ইচ্ছা ও তা ছাড়তে পারছো না , তাহলে তা খেতে থাকো যতক্ষণ না তা নিজে থেকে ছাড়ছ। আমি কিন্তু আমিষ খাদ্য খাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি না। আমার নিজের শরীর, মন ও জীবনের জন্য নিরামিষ খাবার সহায়ক, তাই আমি নিরামিষ খাই। যদি তুমি আমার জীবনশৈলী অবলম্বন করতে চাও , তবে নিরামিশাষী হয়ে যাও, ব্যাস!

কিন্তু ছেড়ে দিয়ে সেটা আর কামনা কোরো না এবং অন্যদেরও আমিষ ছাড়তে বলে অত্যাচার কোরো না। আমরা শাকাহারী অভ্যাসের মত ছোট ছোট ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট করি, এটাই সমস্যা।

এই তিন শ্রেণীর মধ্যে তুমি এক শ্রেণীতে পড়বে :

প্রথমে, আমিষ না খাওয়া ও তার সম্বন্ধে চিন্তা না করা। দ্বিতীয়টি, আমিষ খাওয়া ও খেয়ে ভুলে যাওয়া। তৃতীয়টি আমিষ না খাওয়া ও নিজেকে বঞ্চিত মনে করা, তাই আশেপাশের মানুষকে আমিষ না খাওয়ার জন্য পীড়িত করা। দয়া করে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হয়ো না।

প্রশ্ন : বাসে এক বৃদ্ধকে দেখে, ভাল কাজ করব ভেবে, তাকে আমার সীটটা দিতে চাইলাম; কিন্তু বাকী সফর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বুঝে আমি সেটা করলাম না। অথচ যখন সিগারেট খেতে চাই, নিজের ভিতর থেকে পূর্ণ সহমতি পাই। অন্তর বলে যে একটা সিগারেটে আমার জীবন নষ্ট হবে না। আমি কেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না আর যা সঠিক তা করতে পারি না?

উত্তর : দ্যাখো, তুমি যখন কিছু জিনিষ মন দ্বারা ভিতরে গ্রহণ কর, যা কিছু বাইরে থেকে বলা হয়েছে, তুমি তার উপকার পরিষ্কার ও গভীরভাবে দেখতে পাও না। তুমি হয়তো তা বৌদ্ধিক স্তরে বুঝেছো। কিন্তু যখন তুমি তোমার গভীর থেকে কিছু উপলব্ধি করো , তা তোমার নিজের অভিজ্ঞতা হয় এবং তুমি তাকে কোন সমস্যা ছাড়াই পুরোদমে সমর্থন কর।

সিগারেট তোমার সত্তার সাথে মিশে গেছে। তুমি নিজে তা উপলব্ধি করেছো। অন্যে প্রচার করে নি , এটা তোমার নিজের অভিজ্ঞতা। তাই তোমার হৃদয় তা মেনে নেয়।

কিন্তু বাসে সীট অন্যকে দিলে যে আনন্দ হয় তা তুমি নিজের গভীরে উপলব্ধি করো নি। তুমি লোকের মুখে শুনেছ যে বয়স্ক মানুষকে সীট দেওয়া ভাল কাজ, ব্যাস। খুব বেশী হলে, সামাজিক আচরণ অনুসরণ করবার জন্য এক ধরণের সন্তোষ তোমার হতে পারে। এদিকে সিগারেটের ব্যাপারে তুমি নিজেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছো !

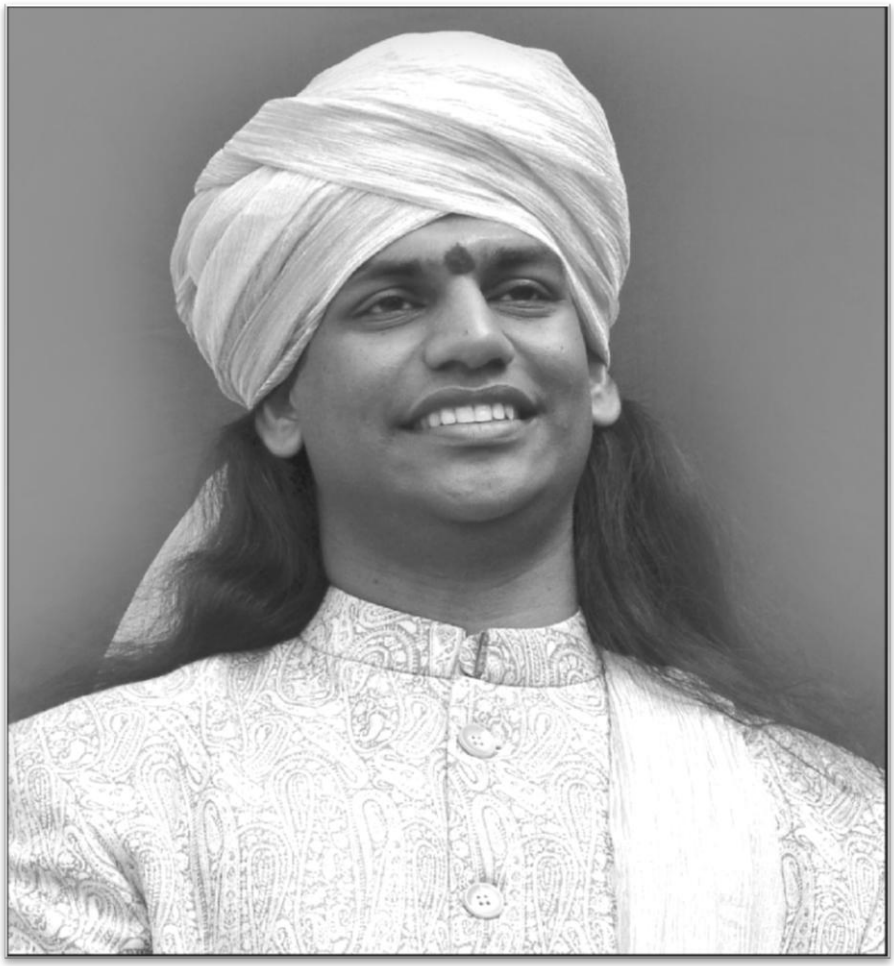
তুমি নিজে যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কর নি তার দিকে তুমি আকৃষ্ট হবে না। যদি তুমি অপরকে সাহায্য করার আনন্দ উপলব্ধি করে থাকতে, তুমি বৃদ্ধকে সীট দিয়ে দিতে।

প্রকৃত উপলব্ধি ঘটার জন্য ধ্যানই পথ। ধ্যানে আমাদের হৃদয়, যা পাথরের মত শক্ত, প্রস্ফুটিত হবে, তুলার মত নরম ও সংবেদনশীল হবে এবং আমাদের অপরের প্রতি করুণা হবে।

আমরা ম্যাগাজিনে পড়েছি বা বড়দের মুখে শুনাছি যে বাসে বয়স্কদের নিজের সীট দিয়ে দেওয়া ভা ল কাজ, ব্যাস। বরঞ্চ, সেবার ভাবনা নিজের ভিতরে প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত এবং তারপর আমাদের সেবা নিবেদন করা উচিত।

আমাদের মধ্যে ধ্যান হলে, সংবেদনশীলতা আপনা আপনি আসবে, নয়তো তা ভাসা-ভাসাই থেকে যাবে। ধ্যান যেন এক ছিদ্র করার কাজ এবং ধ্যান সেই শিক্ষাকে মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে ঠেলে দেয়। তাহলেই ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও অনুরূপ গুণাবলী জীবনে সর্বদা প্রকাশ পায়। নতুবা, এই সব গুণাবলী অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান না হয়ে খালি বৌদ্ধিক জ্ঞান হয়েই থাকে।

তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।



দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতরণিকা



ক আছে, চলো, এবার বিষয়ে ঢোকা যাক।

প্রথমে দ্যাখা যাক, মানুষের মন কিভাবে কাজ করে। তুমি আর তোমার মধ্যে আছে একমাত্র মন। যদি মনকে ফেলে দাও, তুমি জীবনমুক্ত হবে!

তোমার হার্ডওয়ার ও সফ্‌ট্‌ওয়ার রি-প্রোগ্রাম কর

মন কিভাবে কাজ করে তা বোঝার আগে, মনের সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করি যে মাস্টারের উপস্থিতি কিভাবে একজনের সম্পূর্ণ মানসিক গঠন বদলে দেয় :

তোমার মধ্যে দুটি জিনিষ আছে : হার্ডওয়ার ও সফ্‌ট্‌ওয়ার। মন হল সফ্‌ট্‌ওয়ার, ব্রেন হার্ডওয়ার। সফ্‌ট্‌ওয়ার বা মনে আবার দুটো ভাগ - চেতন (conscious) অঞ্চল ও অচেতন (unconscious) অঞ্চল। চেতন অঞ্চল হল সফ্‌ট্‌ওয়ার, অচেতন অঞ্চল ভাইরাস! চেতন অঞ্চলকে শিক্ষা দ্বারা শুদ্ধ করা যায়, অচেতন অঞ্চলকে পরিষ্কার করার জন্য চাই ধ্যান। নতুন পরিবর্তিত মন বা সফ্‌ট্‌ওয়ার নতুন উপলব্ধি দেবে। এখন নতুন পরিবর্তিত মন বা সফ্‌ট্‌ওয়ারকে ধরে রাখতে গেলে ব্রেন বা হার্ডওয়ারকে পোক্তভাবে তৈরী করতে হবে। এটা মাস্টারের আশীর্বাদে হয়, তার থেকে পাওয়া দীক্ষা(initiation) দ্বারা হয়।

তুমি চেতন ও অচেতন ক্ষেত্র পরিষ্কার করে এক প্রভাব সৃষ্টি করলে, কিন্তু হার্ডওয়ার সেই প্রভাবকে সয়ে নিতে ও ধরে রাখতে নাও পারে। যদি মাস্টারের থেকে দীক্ষা পাওয়া যায়, হার্ডওয়ার ব্রেন পরিবর্তিত হয়ে তা ধরে রাখতে পারে। মাস্টারের অনুপস্থিতিতে ক্রমাগত ধ্যান ও শিক্ষা হার্ডওয়ারকে বদলাতে পারে। আমাদের বর্তমান হার্ডওয়ার যেন সংস্কারসমূহ দ্বারা ব্রেনে অনেক খাঁজ (groove) সৃষ্টি করেছে। সংস্কার হলো সঞ্চিত অতীত স্মৃতি। নতুন সফ্‌ ট্‌ওয়ার হলে, হার্ডওয়ার ধীরে ধীরে বদলাবে। কিন্তু যদি তুমি হার্ডওয়ারকে এক্ষুনি পরিবর্তন করতে চাও, তাহলে মাস্টারের উপস্থিতি চাই। তাঁর উপস্থিতি সিধা হার্ডওয়ারকে বদলে দেবে।

মাঝে মাঝে সফ্‌টওয়ার না বদলিয়েই হার্ডওয়ার বদলানো যায় আর মানুষটি সিধাসিধি সঠিক সফ্‌ ট্‌ওয়ারের প্রভাব দ্যাখাতে থাকে। এটা হয় শিষ্য যখন মাস্টারের কাছে নিজেকে পুরোপুরি খুলে দেয়; যদি সে কোন কারণ ছাড়াই মাস্টারের প্রেমে পড়ে। কখন কখন শিষ্য কোন কারণ ছাড়াই মাস্টারের প্রেমে পড়ে। সে হয়তো তার শিক্ষা ও ধ্যান প্রক্রিয়া সমূহে আকৃষ্ট হয় নি ; সে খালি প্রেমে পড়েছে, ব্যাস। এই অবস্থায় সরাসরি তোমার হার্ডওয়ার বদলে যাবে। এই প্রকার শিষ্যেরা অভ্যাস না করেই মাস্টারের শিক্ষা ও ধ্যানপ্রক্রিয়ার সুফলগুলো সরাসরি বিকিরণ করতে থা কবে।

এখন অবধি তোমার হার্ডওয়ার ও সফ্‌ট্‌ওয়ার, দুটোই বহির্মুখি, বাইরের জগতের দিকে। যদি ঠিক উপলব্ধি হয়, তাহলে সফ্‌ট্‌ওয়ার অন্তর্মুখি হয়, আধ্যাত্মিকতার দিকে, পরিশুদ্ধিকরণের দিকে। চেতন অঞ্চল শিক্ষা দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর অচেতন অঞ্চল পরিষ্কার হয় ধ্যান দ্বারা। সফ্‌ট্‌ওয়ার অন্তর্মুখি হলেও, হার্ডওয়ার তা চালাতে পারে না। তাই স্বভাবতঃই হার্ডওয়ার তার অধুনা খাঁজগুলি বজায় রাখার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করবে। সফ্‌টওয়ার যদি খুব শক্তিশালী হয় আর একই রকম থাকে, তাহলে হার্ডওয়ার আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হবে। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে ধ্যান করার পর যদি দীক্ষাও নাওয়া হয়, তাহলে হার্ডওয়ার বদল হবে এবং নতুন সফ্‌টওয়ারকে ধরে রাখতে শুরু করবে। সে নতুন অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখতে তৈরী হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যাতে তুমি যথেষ্ট সচেতনতা নিয়ে এসে রূপান্তরিত হতে মেনে নাও ।

মন কিভাবে কাজ করে?

মন কিভাবে কাজ করে? এই রেখাচিত্রটি দেখো। রেখাচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে যে চোখে প্রবেশ করা তথ্যকে কিভাবে প্রসেস্ করা হয়। আসলে একমাত্র চোখই নয়, পাঁচ ইন্দ্রিয় মানে চোখ, কান, নাক, জিভ ও স্পর্শ সম্বন্ধীয় তথ্যকে একইভাবে প্রসেস্ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা চোখকে নিলাম। এখন আমায় ব্যাখ্যা করতে দাও।

যখন তুমি কিছু দ্যাখো, চোখ বা অক্ষি প্রথমে দেখে। সংস্কৃতে যাকে চক্ষু বলে, সেটা অক্ষি বা চোখ দ্বারা দেখা তথ্যকে ডিজিটাইস্‌ড (digitized) করে। এটা যেন এক ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসর (ডি এস্ পি)। সিগ্‌নাল বা ইন্‌পুটকে চক্ষু ডিজিটাল ফাইলে পরিবর্তিত করে। একমাত্র চোখ নয়, এই পরিবর্তন সমস্ত পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।



তারপর ফাইল যায় মেমরিতে। সংস্কৃতে তাকে বলা হয় চিত্ত। মেমরিতে ফাইলের ওপর আরও কিছু কাজ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ , ধর তুমি আমাকে এখন দেখছো, দেখার ফাইলকে চক্ষু প্রসেস্ করছে, তারপর ফাইল যায় চিত্ততে এবং চিত্ত বা মেমরি তাকে বিশ্লেষণ করতে থাকে। এখানে ফাইলটিতে এক বর্জন-প্রক্রিয়া করা হয়। বলা হতে থাকে, 'এটা জানোয়ার নয়, এটা উদ্ভিদ নয়, এটা পাথর নয় ইত্যাদি।' এই বর্জন-প্রক্রিয়া চিত্ত দ্বারা করা হয়।

তারপর ফাইল যায় মন বা মানসে। মন ফাইলকে শনাক্ত করার কাজ করে ও বলে, 'এইটি মানুষ। মানুষটি ক্লাস নিচ্ছে।' ফাইলটা কি, মন সেই সিদ্ধান্তে আসে।

এরপর ফাইল এক বড় লাফ দিয়ে ঢোকে আমিত্বতে (ego)। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তোমার আমিত্ব পরবর্তী কাজ বা সিদ্ধান্ত কি হবে তা ঠিক করে ফেলে। যদি অতীতে তোমার এইপ্রকার ক্লাসের অভিজ্ঞতা থাকে এবং তা যদি ভাল অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তুমি তাহলে এখানে বসে থাকা ঠিক করবে, নয়ত এখান থেকে চলে যাওয়াই সমীচীন বলে মনে করবে।

এই প্রসেস্টা ঠিক করে বোঝার চেষ্টা কর : তুমি আমাকে দেখছ। অক্ষি চক্ষুতে তথ্য পাঠাল। চক্ষু সেই সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে পরিবর্তন করল। মেমরি তারপর এই ফাইলের ওপর বর্জন-প্রক্রিয়া করে - 'এটা নয়...', 'এটা নয়...।' এরপর মন ফাইলটিকে শনাক্ত করে - 'এটা এই।' তারপর ফাইলটা এক বড় লাফ দিয়ে আমিত্বতে যায়। এখানে তোমার অতীতের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তুমি সিদ্ধান্ত নাও, এখানে বসে থাকবে নাকি হলঘর থেকে বেড়িয়ে যাবে।

এই উদাহরণে বর্জন-প্রক্রিয়া ও শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া আরও ভাল বোঝা যাবে। ধর, ডিক্শনারী বা অভিধানে 'পৃথিবী' শব্দটা খুঁজতে চাও। তুমি 'ক' থেকে শুরু করবে ও বর্জন করতে থাকবে। 'ক' নয়, 'খ' নয়, 'গ' নয়, যতক্ষণ না 'প'-তে আসছ, 'প'-তে আসার আগে পর্যন্ত সেটা ছিল বর্জন-প্রক্রিয়া। 'প'-তে এলে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া হল। এবার তুমি শনাক্তকরণ কর 'পৃ', তারপর 'পৃথ' এবং 'পৃথী' ইত্যাদি। শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াতেও বর্জন হয়, কিন্তু তা বর্জন-প্রক্রিয়ার মধ্যে পরে না, তোমার পুরো মনোভঙ্গি এই সময় পরিবর্তন হয়েছে। 'প'-তে আসা অবধি তুমি অন্য কোনদিকে দেখই না; কেবল বর্জন করতে থাক। 'প'-তে আসার পরে, 'প' একটা দৃষ্টিকোণ হয়। তারপর তুমি খুঁজতে থাক 'পৃ', 'পৃথ', 'পৃথী' ইত্যাদি।

তাই দ্যাখো হাজার হাজার ফাইল তোমার মনে মজুত করা আছে। এখন ধর তুমি আমাকে দেখছ। তুমি প্রথমে বর্জন-প্রক্রিয়া করতে থাকবে : এটা পাথর নয়, এটা গাছ নয়, এটা জন্তু নয়। তারপর তুমি সিদ্ধান্তে আসো, 'এটা এক মানুষ।' একবার মানুষে এলে তুমি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু কর : গেরুয়া কাপড়, আমার মাস্টার, নিত্যানন্দ ইত্যাদি। তাই বর্জন প্রক্রিয়ায় তুমি সঠিক শ্রেণীবিভাগ (classification) কর। বর্জন হল চওড়াই বা প্রশস্ততা, শনাক্তকরণ হল গভীরতা। অনেক ফাইল হ্যান্ডেল করা যেন বর্জন-প্রক্রিয়া। ফাইলের গভীরে যাওয়া যেন শনাক্তকরণ-প্রক্রিয়া।

এখন মন ও চোখের মধ্যে প্রক্রিয়া যুক্তিগত ও সচেতন। তুমি এই প্রক্রিয়া (প্রসেস্) সম্পর্কে পুরোদস্তর অবহিত। এটা তোমার সচেতনতা দ্বারা হয়।

মন থেকে আমিত্বতে লাফটা কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে অচেতন অবস্থায় হয়। সেই সময়তে আসল নির্ণয়গুলি নাওয়া হয় এবং প্রায় পুরোটাই তোমার একটা অচেতন প্রসেস্। তোমার চেতনা ছাড়াই এটা ঘটে। এই সময় তুমি অন্যায্যভাবে মীমাংসা কর। তুমি একটা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নাও।

এটা কেন হয়? কেন তুমি অচেতন অবস্থায় সিদ্ধান্ত নাও ও পরে আক্ষেপ কর?

কারণ হল, এই অচেতন ক্ষেত্র নকারাত্মক স্মৃতি ও চাঞ্চল্যে ভরে আছে; তোমার সমস্ত অতীতের স্মৃতি, যাকে সংস্কৃতে বলা হয় 'সংস্কার।' তোমার অতীতের সমস্ত চিন্তার নক্শাগুলি (thought pattern) এখানে বহু ফাইলে জমা করা আছে। মনোবিজ্ঞানীরা জমা এই স্মৃতিগুলিকে 'এন্গ্রাম্' (engram) বলে। এখানে অনেক ফাইল জমা আছে। নিজেদের মধ্যে কোনরকম যুক্তিগত সংযোগ ছাড়াই এই স্মৃতিগুলি বা ঘটনাগুলি এখানে জমা হয়ে রয়েছে।

বহু তথ্য জমা থাকা এই স্থানে যখন ফাইলটি লাফ দিয়ে আসে, তখন তোমার মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, ফাইলটি সিদ্ধান্তের জন্য তোমার আমিত্বতে পৌঁছুতেই পারে না। এই জমে থাকা তথ্য বা এন্ গ্রাম্গুলি, এই নতুন পাওয়া তথ্যের সাথে খেলতে থাকে। এন্গ্রাম্গুলি খুব জবরদস্তি করে ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়াকে বিধ্বস্ত করে।

ফলে আমিত্ব তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেয় - আর সহজপ্রবৃত্তি-স্তর বা উপজ্ঞা (instinct) থেকে ফাইলটা ফিরিয়ে দেয়। তখন সিদ্ধান্ত নাওয়া হ'ল এক অচেতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

উদাহরণস্বরূপ, সংগ্রহিত তথ্য অনুযায়ী তুমি জান যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর; এটা দেহ বা মনের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। এই সিদ্ধান্ত যতক্ষণ তোমার চেতন অঞ্চলে বিরাজমান, ততক্ষণ তুমি তাকে ধরে রাখো। কিন্তু মন যখন আমিত্বে ঝাঁপ দেয়, এন্গ্রাম্গুলি তোমাকে ধূমপান করার নির্দেশ দেয় ও তুমি ধূমপান করার সিদ্ধান্ত নাও! চেতন প্রক্রিয়া বলে, 'না, এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।' কিন্তু অচেতন প্রক্রিয়া বলে ... আসলে বলেও না, একদম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং তুমি তা পালন কর! এটা স্পষ্টভাবে উপজ্ঞা বা সহজপ্রবৃত্তি-স্তরের নির্ণয়।

অচেতন অঞ্চল খুবই পরাক্রান্ত বা শক্তিশালী। এটাকে তিন স্তরে ব্যবহার করা যায় - উপজ্ঞা বা সহজপ্রবৃত্তি-স্তরে (instinct-level), প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি-স্তরে (intellect-level) এবং স্বজ্ঞা বা অন্তর্জ্ঞান-স্তরে (intuition-level)। যতক্ষণ অচেতনতা নকারাত্মক স্মৃতি ও চাঞ্চল্যে বেশী করে ভরে থাকে, তা সহজপ্রবৃত্তি-স্তরে কাজ করে, আমরা এখন এটাই দেখলাম যে তুমি নির্ণয় নিলে সহজপ্রবৃত্তি সহকারে, অচেতনভাবে।

যখন সহজপ্রবৃত্তি-স্তরে থাক, সর্বদাই তোমার নাওয়া নির্ণয়ের জন্য পরিশেষে অনুতাপ কর। তুমি অবাক হও, 'কেন আমি সেই ভাবে ব্যবহার করলাম? এটা তো আমি নই! কি করে এটা ঘটতে সম্মতি দিলাম? কি করে ওই সিদ্ধান্তটা নিলাম?' অচেতনতা সহজপ্রবৃত্তি-স্তরে কাজ করে বলে এটা হয়। এই স্তরে তুমি কোন যুক্তিগত সংযোগ ছাড়াই জিনিষগুলির সাথে জড়িয়ে পড়ো এবং অচেতনভাবে তড়িঘড়ি করে নির্ণয় নাও।

উদাহরণস্বরূপ, সাদা কাপড় পরা কোন মানুষ যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, যেই মূহূর্তে তুমি সাদা কাপড় পরা কোন লোক দ্যাখো, তোমার অতীতের স্মৃতি অজ্ঞানেই তোমার সামনে এসে যায় ও তুমি রেগে যাও। এটাই সহজপ্রবৃত্তি-স্তর। তোমার চেতনা বিনা, তোমার বোধ বিনা, এটা অনায়াসে ঘটে।

মনের মানচিত্রে তোমাকে যখন অনেক ফাইল অতিক্রম করে আমিত্বতে পৌঁছাতে হয়, তখন তুমি সহজপ্রবৃত্তি-স্তরে আছো। ফাইল অচেতন জায়গায় গেলে, বিকৃত অবস্থায় সিদ্ধান্ত নাওয়া হয়। অনির্ধারিত সিদ্ধান্তের ওপর তুমি অনর্গল মতামত দিতে থাকবে। মেমরী ফাইলগুলির জন্য তোমার অচেতনতা অতিরিক্ত বোঝাই হয়ে থাকবে। এইভাবে কাজ করলে তুমি ক্লান্ত বোধ করবে।

এটা এইপ্রকার : তোমার হার্ড-ডিস্ক যখন হাই-রেসলিয়ুশন্ ফটোতে ভরা, তোমার হার্ড-ডিস্ক-এর আর কাজ করার সম্ভাবনা নেই। একইভাবে, অতীতের বহু স্মৃতিতে তোমার অচেতনতা ভরে থাকলে, তা অনুপযোগী হয়ে পরে এবং অগভীর ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়।

এরপর হল প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি-স্তর (intellect-level)। এখানে তুমি সচেতন; যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নাও। কিন্তু তোমার কোন অতিরিক্ত উৎসাহ ও শক্তি নেই। তুমি সৃজনশীলতা বা নব্যতার প্রবর্তক নও, তুমি বড়সড় পদক্ষেপ নাও না; তুমি বিকশিত হও না। তুমি এক প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত। আইনস্টাইন বলেন, 'বুদ্ধি এক প্রভুভক্ত ভৃত্য।' তুমি পুরো জীবন ভৃত্য হয়ে থাকতে পার - কেবল এক

ভৃত্য, তার চেয়ে বেশী বা বড় কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না।

এই স্তরে, তুমি কেবল তথ্য সংগ্রহ করবে, প্রসেস্ করবে আর ডেলিভার করবে; তুমি কম্পিউটার ছাড়া আর কিছু হবে না। এই সময় চাঞ্চল্য সহকারে ভুল নির্ণয় নাও না; যুক্তি ও সজাগতা দ্বারা নির্ণয় নাও। তুমি এক ব্রেক্-ইভেন্ (break-even, লাভক্ষতি উভয়ই নয়,এমন অবস্থা) অবস্থায় আছো। এই স্তরে তুমি এখনও তোমার পুরো সম্ভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছ না।

পরের স্তর হল স্বজ্ঞা বা অন্তর্জ্ঞান-স্তর (intuition-level), যেখানে তোমার পুরো সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপে পাওয়া যায়। যদি অচেতন অঞ্চলে গভীর নীরবতা ও চেতনার সঞ্চার করতে পার, আর খোদিত স্মৃতি বা ফাইলগুলিকে নীরবতা ও চেতনা দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পার, তবে তুমি অন্তর্জ্ঞান-স্তরে আছো।

যদি তুমি স্মৃতির ভার থেকে মুক্ত হও, অচেতন অঞ্চলে শূন্য ও আনন্দময় হও, অতীতের ভার ছাড়া যদি জীবন্ত ও সতেজ হও, এন্গ্রামের গুরুভার বিনা তোমার সত্তার শক্তি নিজে থেকেই সবচেয়ে বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হবে। এটা হলে, আমরা বলি যে তোমার বুদ্ধি সর্বোচ্চ শিখরে, কারণ শক্তিই বুদ্ধি। তখন তুমি এক শক্তি বা এনার্জী থেকে সিদ্ধান্ত নাও , এই শক্তিই অন্তর্জ্ঞান বা ইন্টিয়ুশন্; এখানে তুমি অসাধারণ স্পষ্টতা নিয়ে পুরোপুরি জানো। বোঝ যে , অতীতের মেমরীগুলি কোন সমস্যায় ফেলে না। সেগুলির সাথে বন্ধনই ছিল আসল সমস্যা।

অন্তর্জ্ঞান-স্তরে যখন আছো, তখন তুমি নির্ণয় নেবে অন্তর্জ্ঞানের শক্তি থেকে, গভীর চেতনা ও শান্তি থেকে, আনন্দ থেকে!

এই ধারণার জন্য এক গভীর উপলব্ধি চাই। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানে তোমাকে গভীরভাবে ঢুকতে হবে, তাহলেই বুঝতে পারবে যে অন্তর্জ্ঞান বলতে কি বুঝিয়েছি। বুদ্ধি ছাড়িয়ে তোমার মধ্যে কিছু একটা হয় , সেটাই অন্তর্জ্ঞান।

অন্তর্জ্ঞানের ক্ষমতা

অন্তর্জ্ঞান বা ইন্টিয়ুশন্ কি?

আমাকে বোঝাতে দাও। হঠাৎ তুমি নিঃসংশয় হয়ে কোন একটা নির্দিষ্ট জিনিষকে সঠিক জিনিষ জেনে সেটা করার জন্য নিজের ভিতরে যথেষ্ট শক্তি অনুভব কর, কিন্তু সেটা করার জন্য সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলি জানো না। তুমি জানো না যে কোন পদক্ষেপে এই সিদ্ধান্তে এলে, কিন্তু তুমি অতি নিশ্চয় হয়ে জান যে তোমার সিদ্ধান্ত একদম ঠিক। এটাই অন্তর্জ্ঞান বা স্বজ্ঞা।

পূর্ব নজির ছাড়া যখন কোন পরিস্থিতিতে এসে যাও, তখন অন্তর্জ্ঞানের শক্তি চাই। যখন তোমার কাছে খুব কম তথ্য আছে আর তোমাকে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হবে, অথবা তোমার কাছে অনেক বিকল্প আছে এবং কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছো না; এই রকম পরিস্থিতিতে অন্তর্জ্ঞান সাহায্য করে। কেবল এইপ্রকার পরিস্থিতিই নয়, তুমি যদি সত্তার এই অঞ্চলে সর্বদা বিরাজমান থাকো, তুমি তবে প্রতিটি মূহূর্তে পুরোপুরি বিদ্যমান থাকবে এবং ভবিষ্যতের মুহূর্তগুলিকেও একই প্রকারে জন্ম দিতে থাকবে।

আমি এখন তোমাদের কি বলছি, যদি তুমি তা আত্মস্থ করতে চাও, যদি কিছু মিনিট নিজের সাথে বসে কাটাতে পার এবং অনুভব করতে পার যে সঞ্চিত এন্গ্রাম্গুলি কিভাবে তোমার ওপরে চাপ সৃষ্টি করছে ও তোমার ক্ষতি করছে, যদি তুমি আমার কথার সত্যতা বুঝতে পার, তুমি ধীরে ধীরে এই আবর্ত থেকে বেড়িয়ে পরার দক্ষতা অর্জন করবে এবং সত্তার উচ্চতর তলে পৌঁছে যাবে।

অন্তর্জ্ঞান কেবল নির্ণয় নেবার শক্তি দেয় তা নয়; অন্তর্জ্ঞান তোমার নির্ণয় সম্পাদন করার শক্তিও দেয়। লোকেদের এটা বললে তারা জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, কি করে বুঝবো যে আমার কোন একটা বোধ অন্তর্জ্ঞান থেকে এলো নাকি বুদ্ধি-স্তর থেকে এলো?' তারা বলে, 'স্বামীজী, আমি গুলিয়ে ফেলছি, এটা বুদ্ধি না অন্তর্জ্ঞান।' আমি তাদের বলি, পরিষ্কার করে বুঝে নাও যে যদি গুলিয়ে ফেলছো তো সেটা বুদ্ধিগত ব্যাপার! যখন তোমার অন্তর্জ্ঞান আছে, তখন তুমি এতই নিশ্চিত হবে ও শক্তিতে ভরপুর থাকবে যে সেখানে গুলিয়ে ফেলার কোন প্রশ্নই থাকবে না।

অন্তর্জ্ঞান দ্বারা তোমার সত্তার ভিতরের সুপ্তশক্তি সাবলীলভাবে প্রকাশিত হয়। তুমি উন্মুক্ত হও ও তা প্রদর্শন করতে থাকো। যে সব বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিরা তাদের ক্ষেত্রে খুব বড় কিছু করেছে, তুমি যদি তাদের সম্পর্কে পড়, দেখবে বারবার তারা বলেছে যে বুদ্ধি পেরিয়ে অন্য কোন জিনিষ থেকে তাদের সফলতা এসেছে, সেই জিনিষই তাদের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি নিতে বল ও সাহস জুগিয়েছে।

তোমাদের সবার মধ্যে অন্তর্জ্ঞানের বল আছে। একটা প্রশ্ন করি : তোমাদের মধ্যে কয়জন কমসেকম একবার জীবনে অভিজ্ঞতা করেছ যে যখন কারো সম্বন্ধে ভাবছ, ফোন বাজলো এবং ঠিক সেই ব্যক্তি লাইনে আছে? অথবা কোন নতুন জায়গায় গেলে এবং মনে হল যে তুমি সেখানে আগে এসেছো? অথবা এই রকম অন্তর্জ্ঞানের ঘটনা?

(উপস্থিতের ৮০%-এর বেশী মানুষ হাত তুললো)

দ্যাখো, এগুলি হল অন্তর্জ্ঞানের মুহূর্ত যা তুমি জীবনে আকস্মিকভাবে উপলব্ধি করেছো। এই মুহূর্তগুলিতে তুমি আকস্মিকভাবে ধ্যানাবস্থায় চলে যাও। এই মুহূর্তগুলিতে তোমার সত্তা তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তুমি কি কর ? তুমি এইসব ঘটনাকে সমস্থানিক বা আকস্মিক যোগযোগ বলে মনে করে গ্রাহ্য কর না ও নিজের সত্তাকে উপেক্ষা কর। নিজের সত্তার উচ্চতর মাত্রাকে পুরদস্তর উপেক্ষা কর। ৮০% মানুষের যা হয়েছে তা সমস্থানিক (coincidence) কিভাবে হয়?

একদম পরিষ্কার করে বোঝ : অন্তর্জ্ঞানের এই মুহূর্তগুলি তোমার সুপ্তশক্তির স্পষ্ট প্রমাণ। তুমি যদি তাকে মেনে নাও ও উৎসাহ দাও, তাহলে তোমার সত্তার উচ্চতর মাত্রাকে প্রকাশ করতে পারবে।

লেসার ও মেসার (LASER and MASER) ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ চার্লস্ টাউন্সের সাথে একবার ভোজন করার সুযোগ হয়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে এটা হল? কিভাবে এটা আবিষ্কার করতে পারলেন?' তিনি সুন্দরভাবে উত্তর দিলেন, 'আমি ওয়াশিংটনের পার্কে বসেছিলাম আর হঠাৎ আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটল । হঠাৎ সিদ্ধান্তটি আমার কাছে প্রকাশিত হল। আমি সাথে সাথে তা লিখে রাখলাম। তারপর বুঝলাম আমার একটা সমস্যা আছে। আমার কাছে সিদ্ধান্তটি আছে কিন্তু পদক্ষেপগুলি নেই! আমি কারও কাছে তা উপস্থাপন করতে পারলাম না, কারণ আমি কেবল সিদ্ধান্তটি জানি; পদক্ষেপগুলি জানি না। তারপর আমি বসলাম ও যুক্তিগত পদক্ষেপগুলিকে পেলাম।'

খালি চার্লস্ টাউন্সই নয়, সুবিদিত বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনস্টাইন পর্যন্ত বলেছেন, 'আমার যা কিছু নতুন উপলব্ধি হয়েছে, তা অন্তর্জ্ঞান থেকেই এসেছে, বুদ্ধি থেকে আসে নি।' অতি সুন্দরভাবে তিনি বলেন, 'অন্তর্জ্ঞানী মন এক পবিত্র উপহার, আর যৌক্তিক মন এক প্রভুভক্ত ভৃত্য।' আমরা এমন এক সমাজ সৃষ্টি করেছি যা ভৃত্যকে সম্মান করে এবং উপহারকে ভুলে গেছে।

আমরা বিশ্বাস করি কি না করি, গ্রহণ করি কি না করি, অন্তর্জ্ঞান বলে একটা জিনিষ আমাদের ভিতরে আছে। আইনস্টাইন তাকে উপহার বলেছেন কারণ তিনি জানতেন না যে এটাকে নিয়মিতভাবে ধরে রাখা যায় কিনা। তিনি নিশ্চিত ছিলেন না কখন এটা হতে পারে। কিন্তু প্রাচ্যের মহান যোগীবৃন্দ বারংবার বলে গেছেন যে তোমরা এটা সর্বদাই পেতে পার । অন্তর্জ্ঞানকে উপহার বলে ভাবতে হবে না। তুমি তাকে পাবার জন্য কাজ করতে পার। এটা তোমার জীবনের এক অংশ হতে পারে।

বুদ্ধি ছাড়িয়ে যখন তোমার অন্তর্জ্ঞান হয়, তোমার সমস্ত সত্তা সুসংহত হয়। তখন তুমি তোমার সর্বোচ্চ শিখরে। সর্বোচ্চ শিখরে এলে কিছু একটা খুলে যায়। একে তুমি বলতে পার বিস্ময়কর প্রকাশ বা অন্তর্জ্ঞান বা অন্য কিছু। যোগীবৃন্দ বারংবার বলেছেন যে এটা একটা বিজ্ঞান। তুমি যদি তোমার সত্তাতে অবিশ্রাম উপলব্ধ অন্তর্জ্ঞানের এই শক্তির সুরের সাথে সুর মিলিয়ে থাকতে পার , তুমি তবে তা নিজের জীবনে নিয়মিতভাবে উপযোগ করতে পার।

অন্তর্জ্ঞান তোমার সত্তার শক্তি। এই বিশুদ্ধ শক্তি যখন অচেতন স্তর থেকে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন তোমার শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত নিরাময় হয়। নিরাময় করা ছাড়াও তা চাপ (স্ট্রেস্) কমায় এবং তোমাকে অবিলম্বে নির্ণয় নিতে সাহায্য করে।

স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তোমার সংগৃহীত তথ্যের কোন সম্পর্ক নেই ; তার সাথে কিভাবে তথ্য প্রসেসিং (data processing) করছ তার সম্পর্ক আছে।

একই তথ্য বা ডাটা, একই জ্ঞাপন বা ইনফর্মেশন, নানাভাবে প্রসেস্ করা যায়। বুদ্ধিতে সীমাবদ্ধ না হয়ে, এই ডাটা তুমি কিভাবে প্রসেস্ কর এবং কিভাবে সিদ্ধান্তে আস, তা অন্তর্জ্ঞান সম্বন্ধীয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা আমরা নিজেদের তৈরী করতে পারি এবং অন্তর্জ্ঞানের শক্তির সাথে সুর বাঁধতে পারি।

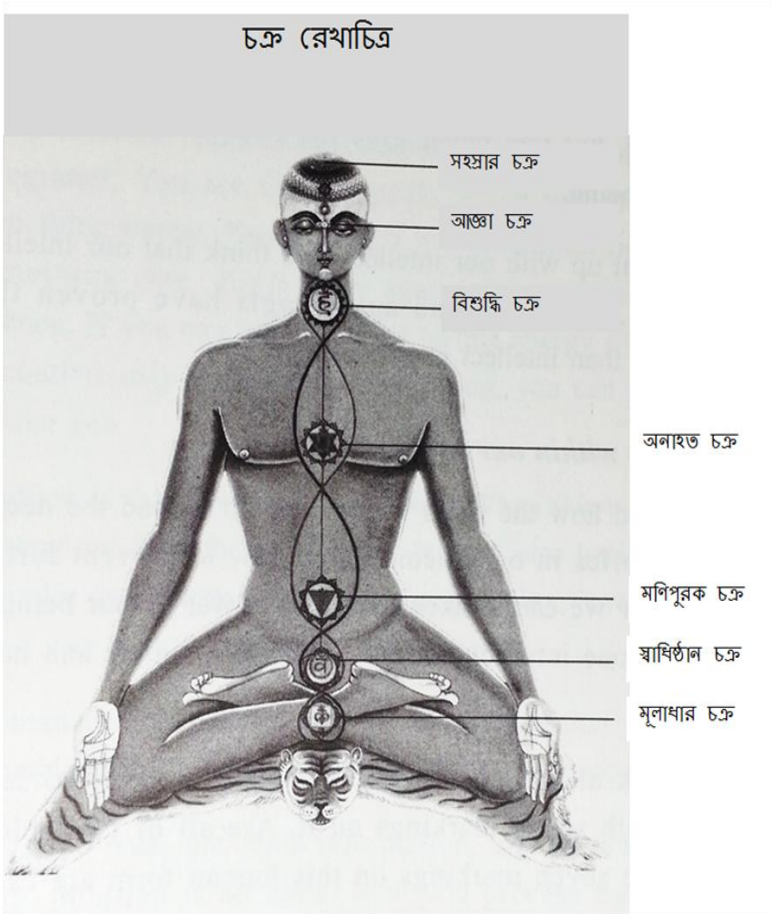
এই প্রক্রিয়াগুলিকে আমরা ধ্যান বলি। নিজের সত্তার উচ্চতর শক্তির সাথে সুর বাঁধার জন্য প্রাচ্যে আমরা ধ্যান শব্দটি ব্যবহার করি। সত্তার এই শক্তি সবসময় আমাদের তার অভিজ্ঞতা পাবার জন্য আমন্ত্রণ করে।

যখনই সময় পাবে, নিজেকে নিয়ে বসো এবং নিজেকে লক্ষ্য কর। আমরা সর্বদা অপরকে সাক্ষাৎ করার জন্য সময় দিই, কিন্তু কখনই নিজেকে তা দিই না! যদি ঠিক নিজেকে নিয়ে বসো, দেখবে যে তোমার সত্তার কিছু অংশ প্রকাশিত হতে চাইছে , আরও বেশী কিছু করতে চাইছে, কিন্তু তুমি কখনই তোমার সত্তার সেই অংশকে সুযোগ বা সময় দাও না।

আমরা আমাদের বুদ্ধিতে জড়িয়ে যাই। আমরা ভাবি আমাদের বুদ্ধিই চূড়ান্ত বা চরম, কিন্তু যোগীরা বারবার প্রমাণ করেছেন যে বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব।

আমাদের শরীরের অভ্যন্তরের শক্তি-কেন্দ্রগুলি

যদি আমরা বুঝি যে মন কিভাবে কাজ করে, অচেতনে মজুত গভীরভাবে খোদিত স্মৃতিগুলির ভার কিভাবে খালি করা যায়, নতুন ভার কিভাবে আর না ওঠানো যায় এবং কিভাবে আমাদের সত্তার সুপ্তশক্তিকে জাগরিত করে অন্তর্জ্ঞান -অঞ্চলে প্রবেশ করা যায়, তবেই আমরা এক মাস্টারের মত বাঁচব, ভৃত্যের মত নয়।



এখানে এই চার্টটি দেখো। একটি মানুষের ছবিতে সাতটি চিহ্ন দেখছো। সবাই দেখতে পাচ্ছো কি? ঠিক আছে। মানুষের আকারে এই সাতটি চিহ্নকে 'চক্র' বলা হয়।

আমাদের শরীরে চক্রগুলি অতিসূক্ষ্ম শক্তিকেন্দ্র। তারা আমাদের শরীরে শক্তির সাতটি চাকা।

আমাদের ভাবনা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের কেবল একটা শরীর নেই। আমাদের আছে সাতটি শরীর - শক্তি-শরীর। আমি প্রথম তিনটি এখন ব্যাখ্যা করব।

প্রথম শরীর - যেটা দ্বারা এখানে এসেছো, যেটাতে চলাফেরা করছো, কথা বলছো, লিখছো - এটাকে বলে 'জাগ্রত শরীর।'

পরেরটা হল 'সূক্ষ্ম শরীর' - যেটাকে তুমি স্বপ্নাবস্থায় ব্যবহার কর। এই শরীরকে তুমি স্বপ্নে নানা স্থানে ভ্রমণ করার জন্য ব্যবহার কর। স্বপ্নে তুমি নিজেকে বিভিন্ন জায়গায় দেখ। স্বপ্নে কখনও নিজেকে এমন জায়গায় দেখ যেখানে জাগ্রত অবস্থায় কদাপি যাও নি।

তৃতীয় শরীর হল 'কারণ শরীর।' এটাকে গভীর নিদ্রার সময় তুমি ব্যবহার কর। এই শরীর চলাফেরা করে না।

এই পরের দুটো শরীর জাগ্রত শরীরের দৈর্ঘ্য বরাবর সাতটি বিন্দুতে মিলিত হয়। এই সাতটি বিন্দুকে চক্র বলা হয়। এই সাতটি হল প্রধান চক্র। এছাড়াও অন্য বহু গৌণ-চক্র আছে, কিন্তু এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ চক্র আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য দায়ী।

বহুদিন আগে বৈদিকযুগে এই চক্রগুলির আবিষ্কার হয়। অনেক আধ্যাত্মিক স্তবে এই চক্রগুলির নামের উল্লেখ আছে। আজ বিজ্ঞান

প্রমাণ করেছে যে প্রতিটি চক্রের পাশে একটি করে গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড আছে যা সেই চক্রের সাথে সম্বন্ধিত। এই সাতটি চক্র গ্ল্যাণ্ডগুলিকে শক্তিপ্রদান করে।

এই সাতটি চক্র আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত কাজকর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাদের অনেক শক্তি। তারা শক্তিকেন্দ্র এবং যদি তাদের শুদ্ধ ও জাগ্রত অবস্থায় রাখা যায়, তারা আমাদের এক সুস্থ ও পরমানন্দ জীবনযাপনে সাহায্য করে।

এই চক্রগুলির মধ্যে কোন একটির অসন্তুলিত (imbalance) অবস্থাই অসুস্থতা, কারণ আমাদের শরীর ও মনের শিকড় আছে আমাদের অন্তরে, আমাদের চেতনাতে। চক্রগুলিকে সুস্থ অবস্থায় রাখলে আমরা আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্তরে এক রূপান্তর ঘটতে দেখি।

তোমাদের একটা ছোট গল্প বলি :

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একটা বাই-প্লেন বা ছোট প্লেন এশিয়ার কোন এক সুদূর আদিবাসী অঞ্চলে পরিত্যক্ত হয়। আদিবাসীরা জীবনে কখনও প্লেন দেখে নি। সবাই খুব বিস্ময়ে উত্তেজিত হল ও বহু লোক তার পাশে জড় হল। তারা অবাক হল যে জিনিষটা কি? সবাই নিজের মতামত দিতে থাকলো। সবশেষে তারা সবাই একমত হল, যেহেতু জিনিষটার চাকা আছে, সেটা একটা গরুর গাড়ীই হবে! নতুন গরুর গাড়ী সম্বন্ধে খবরটা গ্রামের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামে অনেক উৎসব চলতে থাকল এবং জোয়াল দিয়ে বাই-প্লেনটার সাথে দুটো বলদ জুড়ে দিয়ে নতুন গরুর গাড়ীকে সারা গ্রামে প্রদর্শন করানো হল।
>
> কিছুদিন পর এক তরুণ আদিবাসী শহর থেকে পড়াশুনা শেষ করে সেই গ্রামে ফিরল। সে বাই-প্লেনটা দেখল। সে তাকে ভালভাবে দেখলো ও ভিতরে ঢুকে পরীক্ষা করল, সুইচ ও গিয়ার নিয়ে নাড়াচাড়া করল। হঠাৎ ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল! কোনরকমে সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে মাটিতে কিছুদূর চালাতে পারল আর গ্রামবাসীরা তা দেখে হতবাক। ছেলেটি ট্রাক্টর ব্যবহার হতে দেখেছিল আর সবাইকে বলল যে নতুন জিনিষটি গরুর গাড়ী নয়, সেটা এক প্রকার ট্রাক্টর।
>
> গ্রামে আবার উৎসব হল আর বাই-প্লেনটি ট্রাক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকল!
>
> কয়েক দিন পরে এক অবসরপ্রাপ্ত সামরিকবাহিনীর পদকর্তা বা আর্মি-অফিসার গ্রামে এলো। সে দেখল একটি বাই-প্লেন ট্রাক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর তাই দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। সে গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করল যে এটা ট্রাক্টর নয়, এটা উড়তে পারে, নাম প্লেন।
>
> তারা তাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল, কারণ তারা তো কেবল পাখীদের উড়তে দেখেছে! আর্মি-অফিসার প্লেনের ভিতরে ঢুকল এবং প্লেনটা একটু উড়িয়ে মাটিতে নেবে এল।
>
> গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক। তখন তারা জিনিষটার আসল সম্ভাবনা ও সুপ্তশক্তি বুঝল।

বোঝ : মানুষ এমন খুব সুন্দর এক নির্মাণকৌশল যে উড়তে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের পুরো সম্ভাবনা জানি না । নিজের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সীমিত। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষই গরুর গাড়ী হয়ে থাকি, সহজপ্রবৃত্তি-স্তরে, আবেগের কাছে সমর্পিত হয়ে।

যখন আমরা বেশীরভাগ সময়ে বহির্জগতের বাড়ী, গাড়ী, পেশা ও অন্য প্রাথমিক জিনিষের সাথে নিজেদের জুড়ে রাখি , আমরা আমাদের শরীরকে গরুর গাড়ীর মত ব্যবহার করি। আমরা কেবল সহজপ্রবৃত্তি -স্তরে কাজ করি এবং খুবই ভারী অচেতন মন নিয়ে থাকি।

তদুপরি আমরা শিল্পকলা, সৃজনশীলতা, দর্শন এবং অন্যান্য বিষয় যাতে কেবল মন নয়, হৃদয়েরও প্রয়োজন, তা নিয়ে থাকলে আমরা নিজেদের শরীরকে ট্রাক্টর হিসাবে প্রয়োগ করি। আমরা আমাদের ভিতরে কিছুটা পরিতৃপ্তি পাই। যে মানুষ একটা কাব্যের জন্ম দিয়েছে সে এক সাধারণ মহিলার বাচ্চা জন্ম দেওয়ার চেয়ে বেশী খুশী হবে। মহিলাটির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় পাকস্থলীর নীচে জরায়ু থেকে, কবি সৃষ্টি করে হৃদয় থেকে এবং তাই কবির পরিতৃপ্তি বেশী। এই প্রকার মানুষেরা বুদ্ধি -স্তর থেকে কাজ করে।

অবশেষে মানুষ আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ করলে সত্য জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণার্ত হয় এবং বোঝে যে সে নিজেই চূড়ান্ত অস্তিত্ব -শক্তির (existential energy) শারীরিক প্রকাশ। সে তখন শরীরকে প্লেন হিসাবে ব্যবহার করে। জীবনমুক্ত মাস্টারেরা তাঁদের শরীরকে প্লেন হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁরা সর্বদাই পরমানন্দে থাকেন। তাঁরা গরুর গাড়ী ও ট্রাক্টরের সমস্ত দুর্দশা থেকে উত্থান করেন এবং

স্বচ্ছন্দে ওড়েন। তাঁরা অন্তর্জ্ঞান-স্তরে কাজ করেন।

একটা প্লেন বা উড়োজাহাজ হতে গেলে কি করতে হবে? গ্রামবাসী ও আর্মি-অফিসারের মধ্যে কি প্রভেদ? প্লেনটি তা মনে করিয়ে দেয়। প্লেনে কিছুই যোগ বা বিয়োগ করা হয় নি। তার কোন বস্তুগত পরিবর্তন করা হয় নি। তাহলে পার্থক্য কি ছিল?

জ্ঞান। প্লেন সম্বন্ধীয় জ্ঞান। গ্রামবাসীরা জানতো না যে যন্ত্রটিতে এমন নির্মাণকৌশল আছে যে তাকে ঠিক করে চালাতে পারলে সে উড়তে পারে। কিন্তু আর্মি-অফিসার তা জানত, ব্যাস, এটাই পার্থক্য। যে কৌশলে তারা যন্ত্রটিকে ব্যবহার করে, তাতে প্রথমে সেটা হয় গরুর গাড়ী, পরে ট্রাক্টর এবং সবশেষে একটা উড়োজাহাজ।

একইভাবে আমাদের ভিতরেও 'চক্র' বলে কিছু নির্মাণকৌশল বা গিয়ার আছে যা অসীম শক্তির কেন্দ্র। তাদের প্রতিটি আমাদের ভিতরের একেকটি আবেগের সাথে যুক্ত আছে। যদি আমরা ঠিক করে আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি, আমরা উড়োজাহাজ হয়ে কাজ করতে পারব।

মৌলিক আবেগগুলির মধ্যে কয়েকটার বিজ্ঞান যদি আমরা বুঝি , আমরা আমাদের বর্তমান গভীর অচেতন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। তারপর নিজেদের অচেতনতার ভার থেকে মুক্ত করতে পারি এবং আমাদের সত্তার উচ্চতর মা ত্রাগুলিতে যেতে পারি।

চক্রগুলির কোন শারীরিক অস্তিত্ব নেই। সেগুলি এক অধিবিদ্যামূলক (metaphysical) রূপায়ণ, কারণ এগুলি সূক্ষ্মদেহে আছে, স্থূল শরীরে নয়। কিরলান ফটোগ্রাফিতে চক্রগুলির ছবি নিয়ে তাদের সূক্ষ্মদেহে অস্তিত্বের প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষ নকারাত্মক আবেগে ভুগলে, সেই আবেগের সাথে সংশ্লিষ্ট চক্র কোটের বোতামের মত ছোট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যক্তিটি যখন একই আবেগের সকারাত্মক ভাব পায়, তার চক্রটি গাড়ির চাকার সাইজে প্রসারিত হয়। চক্র অর্থাৎ শক্তিকেন্দ্রগুলিকে আমাদের আবেগসমূগ এইভাবে প্রভাবিত করে।

নকারাত্মক ভাবনা দ্বারা চক্রগুলিতে আমাদের শক্তিপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়ে আছে এবং আমাদের তা জানা নেই।

বোঝ : কীটের মত মাটিতে চলার জন্য মানুষের সংকল্পনা করা হয় নি; তাকে আকাশে ওড়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা ঠিক যেভাবে জানত না যে যন্ত্রটি উড়তে পারে, মানুষও জানে না যে সে উড়তে পারে। মানুষ সর্বদা ভাবে যে জীবনমুক্ত মানুষেরা বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং দূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করাই মানুষের কর্তব্য। সে কখনই তাঁদের মত হতে চায় না। আমি এখন তোমাদের বলি : বাস্তবিক তুমি যদি অন্তর্জগতে সফল হতে চাও, তুমি তা পারবে, সে যা কিছু হোক না কেন। সমস্যা হল তুমি বিশ্বাস কর না যে তুমি তা পেতে পার। ঠিক যেভাবে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে নি যে যন্ত্রটি উড়তে পারে, তুমিও বিশ্বাস করতে চাও না যে তুমি আসলে আরও উচ্চতর জিনিষ পাবার জন্যই নির্মিত।

অভিজ্ঞতা থেকে শিখো না, বুদ্ধি থেকে শেখো!

একটা ছোট্ট গল্প :

> একটি ছোট মেয়ে পিয়ানো শেখে। সে শিক্ষকের দেওয়া পিয়ানোর পাঠ নিয়ে খুব বিব্রত ছিল। একবার মেয়েটি এক দক্ষ পিয়ানো-বাদককে পিয়ানোতে এক সুন্দর সুর বাজাতে দেখে। মেয়েটি তাকে কিছুক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করে , 'স্যার, বাই-চান্স আপনার হাতে কি আমার চেয়ে বেশী আঙ্গুল আছে?'

আমরা সবসময়ে ভাবি যে আমরা সঠিক গুণসম্পন্ন নই। সত্য হল, আমাদের যা দরকার তা সবই আমাদের কাছে ইতিপূর্বেই আছে। আমরা খালি সেগুলিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে জানি না। আমরা বেশীরভাগই গরুর গাড়ী বা ট্রাক্টরের মত নিজেদের সম্ভাবনাকে প্রদর্শন করি। আমরা জানি না যে এটা একটা উড়োজাহাজ। উড়বার শক্তি তোমার মধ্যে আছে, কিন্তু তা সবসময় সুপ্ত থাকবে যদি না তুমি আবেগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শেখ।

এই কয়েক দিনে তোমার মৌলিক আবেগসমূহ সম্বন্ধে এক স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি হবে।

এক মাস্টার তাঁর চরম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কথা বলেন। তিনি চরম কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলেন কারণ তাঁর চরম অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাধারণত আমরা এই ধারণার বশবর্তী যে কেবল বয়স ও অভিজ্ঞতা সহকারে পরিপক্বতা হয় ও মানুষ প্রস্ফুটিত হয়।

মাস্টারেরা জ্বলন্ত উদাহরণ যে পরিপক্ব ও বিকশিত হবার জন্য সময়ের প্রয়োজন নেই। তোমাদের আরেকটু বোঝাতে দাও ।

ছেলেবেলায় খেলনাতে খুব আসক্ত ছিলে, ঠিক কিনা? যদি তোমার কাছ থেকে কেউ খেলনা নিয়ে নিলে তুমি কিভাবে সাড়া দিতে?

তুমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবে যেন তোমার সমস্ত জীবন ওই খেলনার উপরে নির্ভর করে , ঠিক? কিন্তু এখন যেহেতু বড় হয়েছ, কেউ খেলনা নিয়ে নিলে কি একই ভাবে সাড়া দেবে? তুমি কি অস্থির হবে? না! তুমি খেলনার সাথে আর জুড়ে নেই। যখন তুমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হও, স্বাভাবিকভাবে পরিপক্বতা ঘটে।

এই প্রকার জ্ঞান ও পরিপক্বতা, যদিও আমরা ভাবি বয়সের সাথে আসে, আসলে শারীরিক বয়সের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই; তাদের সম্পর্ক মানসিক বয়সের সাথে। মানুষের মানসিক বয়স হিসাব করা র জন্য গবেষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে গড়পড়তা মানুষের মানসিক বয়স চৌদ্দর বেশী নয়!

শারীরিক বয়সের ওপরে নির্ভর করলে মানুষকে সমস্ত সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে , সমস্ত সম্ভাব্য ভুল করতে হবে এবং অভিজ্ঞ ও পরিপক্ব হয়ে উঠতে হবে।

এটা এরকম :

আমরা দীপশিখা ছুঁলে শিখি যে এতে আঙ্গুল পুড়ে যায়। তারপর আমরা স্টোভের আগুনে হাত দিই ও শিখি যে স্টোভের আগুনাও হাত পোড়ে। সিগারেটের আগুনে হাত দিয়ে শিখি যে তাতেও আঙ্গুল পোড়ে। তারপর কয়লার আগুন ছুঁয়ে দেখি যে তাও পোড়ায়।

বিভিন্ন প্রকার আগুন ছুঁয়ে আমরা শিখি যে সব প্রকার আগুনই হাত পোড়াতে পারে। যে সময়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি আমাদের শ্মশানঘাটে গিয়ে পোড়ার সময় হয়ে গেছে! এটাকে বলে অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখা, বয়সের সাথে জ্ঞান অর্জন করা। এইসব শিখতে জীবনকাল চলে যায়। বয়স বাড়তে বাড়তে তুমি শেখো - তোমার নিজের মন্থর গতিতে।

অন্যদিকে, প্রথমবার আগুন ছুঁয়ে যদি তুমি বোঝ যে সব রকম আগুনই পোড়াতে পারে, তুমি তখন বুদ্ধিমান! এটা শেখার জন্য বয়সের দরকার নেই। খালি বুদ্ধির প্রয়োজন। এটা তোমার মানসিক বয়স নিদর্শন করে। তাই আমরা বলি যে প্রাজ্ঞতার (wisdom) সাথে শারীরিক বয়সের কোন সম্পর্ক নেই। এটা নির্ভর করে যে তুমি কতটা বুদ্ধিমান ও বিভিন্ন জিনিষ বোঝার জন্য অন্তরের বুদ্ধিকে কতটা প্রতিপালন করেছ।

তোমাদের জীবনের ঘটনা দিয়ে এবার বোঝাই :

ছাত্রাবস্থায় কলেজে ভাব যে চাকরী পেলে সুখী হবে। চাকরী পাবার পর কিন্তু নিজেকে অতটা সুখী মনে কর না। তখন নিজেকে সান্ত্বনা দাও যে বিয়ে করলে সুখী হবে।

বিয়ে করার পর ভাব যে বাচ্চা হলে সুখী হবে।

প্রতিটি বাসনার পিছনে তুমি দৌড়াও এই ভেবে যে বাসনাটি তৃপ্ত হলে সুখী হবে। এইভাবে তুমি জীবনের শেষে চলে যাও এবং বোঝ যে তোমার কোন বাসনাই তোমাকে প্রকৃত পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। তখন তুমি আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যানের দিকে দৌড়াও ! এটা সেই মানুষের জীবন যে শারীরিক বয়স ও অভিজ্ঞতা দ্বারা শেখে।

যে মানুষ মানসিক বয়সে বয়স্ক, সে বুদ্ধি দিয়ে শেখে; সে তার প্রথম বাসনা থেকেই স্বচ্ছভাবে বুঝে যায় যে কোন বাসনা তৃপ্ত হলেও প্রকৃত সুখ দেয় না। সেখানেই পার্থক্য। সে সম্পূর্ণরূপে দেখে ও সামগ্রিকভাবে বিচার করে। সে জানতে পারবে যে আসল পরিতৃপ্তি অন্তর থেকে আসে, বহির্জগতের বস্তু থেকে নয়।

এই প্রাজ্ঞতা লাভ করার জন্য তোমার শারীরিক দিক দিয়ে বয়স্ক হবার দরকার নেই, তোমার কেবল বর্তমানে থাকা দরকার, ব্যাস। বর্তমানে থাকলে অস্তিত্বই তোমাকে শেখাবে। অস্তিত্ব সবচেয়ে মহান শিক্ষক। আমরা যখন বর্তমানে থাকি না, যখন আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সবসময়ে ছুটে বেড়াই , আমরা শেখার জন্য আমাদের মিষ্টি-সময় নিতে থাকি, এটাই ব্যাপার।

বুদ্ধ, আদি শংকরাচার্য, ভগবান শ্রী রামানা মহর্ষি এবং স্বামী বিবেকানন্দ, ইতিহাস রচনাকারী এই জীবনমুক্ত মানুষেরা সবাই অল্প বয়সেই জীবনমুক্ত হয়েছিলেন। তাই বোঝ যে বয়সের সাথে আধ্যাত্মিকতা বা শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।

তাই বলা হয় যে, 'তুমি যেমনটি, তোমার বয়সও তেমনটি।' তার মানে তোমার বয়স হল তোমার মানসিক-বয়স। তোমার বয়স তোমার পরিপক্বতার সাথে যুক্ত, শারীরিক বয়সের সাথে নয়। তোমার ৭০ বৎসর বয়স হতে পারে, কিন্তু তোমার বোধ হয়ত কেবল এক ২০ বছরের মানুষের মত। অথবা তুমি ১৮ বছরের হতে পার, কিন্তু পরিপক্বতা ও বোধশক্তি দেখাচ্ছ ৮০ বছরের মানুষের মত। তাই কেবল বয়সে বড় বলে শ্রেষ্ঠতা দেখাতে পার না।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের সরাসরি শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি সুন্দর গল্প আছে :

> একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে ধ্যান করছিলেন। এক ভক্ত এসে তাঁকে একটি মূল্যবান কম্বল অর্পণ করে গেল । স্বামী ব্রহ্মানন্দ কিছুই বললেন না। তিনি নীরবে সব প্রত্যক্ষ করছিলেন।
> কয়েক ঘন্টা পরে, একটা চোর এলো, কম্বলটা দেখল এবং সেটাকে নিয়ে গেল।
> তাতেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ একইভাবে নীরবে প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন, কোন প্রতিক্রিয়া ছাড়াই!
> পাওয়াতে বা হারানোতে তিনি কোন পার্থক্যই দেখলেন না।

ভগবান রামানা মহর্ষির জীবনাও একটি অনুরূপ গল্প আছে :

> আশ্রমে একদিন কিছু চোর এল। তারা যৎসামান্য যা পেল তা নিল, এমনকি যাবার সময় তারা মহর্ষিকে একটি ধাক্কাও দিয়ে গেল।
> শোনা যায় যে ভগবান কোন প্রতিক্রিয়া দেখান নি, এমনকি এই ঘটনায় তাঁর শ্বাসের গতিও পরিবর্তন হয় নি! তিনি ঘটনায় একেবারেই অনুত্তেজিত ছিলেন।

আমরা যখন নিছক দ্রষ্টা হয়ে যাই, আমাদের মন স্রেফ এক হাতিয়ার হয়ে যায়। আমরা তখন তাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারি; নতুবা, মন সহজেই আমাদের তার গোলাম বানিয়ে দিতে পারে। যখন দরকার তুমি যদি তোমার মনকে প্রয়োগ করতে পার , তুমি মনকে ফেলে দিতে শিখেছ! আর তুমি এক মাস্টার হয়ে গেছ!

তাই এই কয়েক দিন আমরা শিখব আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা ও জীবনের দ্রষ্টা হয়ে থাকা; আমাদের অন্তর্দেশে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করা এবং তার পরিধিতে শৃংখলতার সাথে কাজ করা।আমরা দেখব কিভাবে এক মানসিক গঠন সৃষ্টি করা যায় যা খোদিত স্মৃতিসমূহ থেকে মুক্ত। এই খোদিত স্মৃতিসমূহ অচেতন অবস্থায় ভুল সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দায়ী। আমরা দেখব কি করে আমাদের অন্তর্জ্ঞানের শক্তিকে আহরণ করা যায়; কি ভাবে অচেতন থেকে চেতনে ও তারপর অতি-চেতনে (super-conscious) যাওয়া যায়; কিভাবে সহজপ্রবৃত্তি থেকে বুদ্ধি ও তারপর অন্তর্জ্ঞানে যাওয়া যায়; কিভাবে আমাদের ভিতরের আনন্দ-ফোয়ারাকে জাগানো যায়!

পরের সেশনে দেখা হবে।

ধন্যবাদ।



তৃতীয় অধ্যায়

প্রেম শক্তির উৎস হও



নোযোগ পাবার চাহিদা - ব্যাপারটা কি?

প্রেম প্রসঙ্গে যাবার আগে, 'মনোযোগ পাবার চাহিদা' শব্দসমষ্টির মানে বোঝা যাক।

আমরা যাই করি, যাই ভাবি, আমরা অবচেতন (subconscious) মনে আমাদের চারপাশে লোকেদের কাছ থেকে সূক্ষ্মরূপে ঐক্যমত ও সমর্থন চাই। আমরা অতি উৎসুক যে সবাই আমাদের ভাল বলুক। আমরা এটা হয়ত একদম সোজাসুজি কায়দায় করি না। কিন্তু যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর, দেখবে যে তোমার চারপাশে লোকেরা তোমায় তারিফ ও সমর্থন না করলে তুমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর না। এই অনুমোদন, এই সমর্থন পাবার ইচ্ছাই হ'ল 'মনোযোগ-পাবার-চাহিদা।'

আমাদের ৮০% সমস্যা আসে অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার বাসনা বা অন্যদের আকৃষ্ট করার চাহিদা থেকে। যদি বসে লেখো তাহলে স্পষ্টভাবে দেখবে যে দিনে কতগুলি জিনিষ তুমি করে যাচ্ছ যাতে তোমার ভাল নাম হয়, পরিবার ও সমাজে যশ বজায় থাকে।

দেখবে যে পুরো ২৪ ঘণ্টা, পুরো জীবনকাল, তুমি অপরের অনুমোদন পাবার জন্য কাটিয়ে দিলে। পুরো জীবন তুমি যেন এক স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযানে আছ, সমাজের ও পরিবারের অনুমোদনের স্বাক্ষর।

যেন তুমি একটা বড় রেজিস্টারে লাইন টেনে কলম বানিয়ে লেখ : ভাল পিতা, এবং বাচ্চাদের জন্য যা যা করেছ, সেই কলমের নীচে বাচ্চাদের অনুমোদনের স্বাক্ষর আশা কর! তারপর তুমি তোমার পত্নীর কাছে যাও, বস্-এর কাছে যাও, বন্ধুদের কাছে যাও। কলমগুলির শিরোনামা বা হেডিং তৈরি করেছ - ভাল পতি, ভাল কর্মচারী, ভাল বন্ধু ইত্যাদি আর নীচে তাদের স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষা কর।

আবার এই সব মানুষেরাও তোমার কাছে তোমার স্বাক্ষর নিতে আসে! তোমাকেও তাদের রেজিস্টারে যে কলমটি তোমার জন্য প্রযোজ্য তার নীচে স্বাক্ষর করতে হয়।

নিজের সম্পর্কে অন্যের মতামতের জন্য আমরা এত বিব্রত কেন হই? কেন আমরা নিজের শক্তি দ্বারা নিজেকে বিচার করতে পারি না এবং নিজের কাজ করতে থাকি না? কেন আমরা অপরের কাছ থেকে শক্তি আহরণ করি? এগুলি দুটো জিনিষের জন্য হয়। এক : আমরা নিজেদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমরা নিজেদের জানি আমাদের সম্পর্কে অপরের মতামত মারফৎ; অপরের সার্টিফিকেট মারফৎ। দুই : অন্যেরা যখন আমাদের অনুমোদন দেয় ও আমাদের দিকে মনোযোগ দেয়, তারা যেন আমাদের জীবনযাত্রার জন্য শক্তি দেয়। মনোযোগ এক শক্তি। তাই আমরা অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করে এত খুশী হই।

অপরের যে কোন প্রকার মনোযোগ পেলেই আমাদের চলবে। বেশীরভাগ বাড়ীতে শ্বাশুড়ি ও বউ ঝগড়া করতে থাকে। সর্বদাই তারা অন্যজনের ওপরে ঘরের বেচারা পুরুষের কাছে নালিশ করতে থাকে। কিন্তু দুজনের মধ্যে একজন কিছুদিনের জন্য শহরের বাইরে গেলে কি হয়? তারা অপরকে মিস্ করতে থাকে! যদিও তারা ঘরে ঝগড়া করছিল, একসাথে না থাকলে তারা একে অপরকে মিস্ করে। এটা কেন হয়? তারা যখন ঝগড়া করে, তখন আসলে তারা অন্যজনের মনোযোগ পায়!

ভেবো না যে কেবল সকারাত্মক মনোযোগেই শক্তি আছে। যে কোন প্রকার মনোযোগেই শক্তি আছে। শ্বাশুড়ি ও বউ, দুজনেই ঝগড়ার সময় একে অপরকে যে মনোযোগ দেয়, তা তারা অবচেতন মনে উপভোগ করে। তাই একজন দূরে গেলে মনোযোগ না পাওয়ার কারণে একে অপরকে মিস্ করে এবং সেটাকে প্রেম মনে করে। তারা বলে যে তারা একে অপরকে মিস্ করে কারণ তাদের মধ্যে ভালবাসা আছে।

মনোযোগ হল এক ধরনের শক্তি যা আমাদের উচ্ছ্বসিত রাখে। এতে সূক্ষ্মরূপে আমাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চা লন হয় এবং আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন নই। আমাদের কিছু একটা চাই, সেই 'কিছু একটা' প্রেম নয়, তা 'মনোযোগ।' তোমার প্রেমের প্রয়োজন নেই, তুমি নিজেই তো প্রেম। তাই তুমি যখন বল যে তোমার প্রেমের প্রয়োজন আছে, যখন বল যে কেউ তোমাকে ভালবাসুক, আসলে তুমি অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছ, প্রেম নয়।

অনেকে আমাকে বলে যে তাদের ছেলেরা ও মেয়েরা বুড়ো বয়সে তাদের ভালবাসে না। তারা আসলে বলতে চায় যে তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, যে শক্তিটা তাদের বৃদ্ধাবস্থায় দরকার।

প্রকৃতপক্ষে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের নিজেদের ভিতরে আরও বে শী কেন্দ্রীভূত হওয়া দরকার, অন্তরের অস্তিত্বের শক্তির সাথে সংবেদনশীল হওয়া দরকার। কিন্তু কি হয়, যেহেতু আমরা সারাজীবন অপরের মনোযোগ ও শক্তির ওপরে নির্ভরশীল ছিলাম, যেহেতু আমাদের জানা প্রেম খালি আত্মীয়তায় ও বন্ধুত্বে থাকে, যেহেতু আমরা অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে অচেতন ও সংবেদনহীন

হয়ে থেকেছি, বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমরা বাইরে থেকে আসা ভালবাসা বা মনোযোগ হারাতে থাকি। পরিবার অন্যান্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং আমাদের অত সময় দিতে পারে না যতটা আগে দিত। তাই আমরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিযোগ করতে থাকি।

'আমাদের শক্তির উৎস আমাদের ভিতরেই আছে' ঠিক এই কথাটা না বোঝার জন্য দ্যাখো, আমরা চরম জীবনীশক্তিতে ও আনন্দে জীবন না কাটিয়ে কম জীবনীশক্তি ও আনন্দে জীবন কাটাই।

শক্তির সার্টিফিকেট?

শক্তির জন্য বাইরের উৎসের ওপর নির্ভর করে তো তুমি মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে গেলে। যখন শারীরিক সাহায্য চাই , তুমি শারীরিকভাবে পঙ্গু। যখন মানসিক সাহায্য চাই, তুমি মানসিক দিক থেকে পঙ্গু বা প্রতিবন্ধী।

শারীরিকভাবে কেউ পঙ্গু হলে পরিষ্কার করে দেখতে পার, তাই তা অনায়াসে বুঝতে পার; কিন্তু মানসিকভাবে পঙ্গু মানুষকে চেনা শক্ত। এটা সম্বন্ধে তুমি সচেতন নও, সেজন্য এর পরিণতি সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই থাকে না। যখন সত্যিকারের অ-সুখ (dis-ease) হয়, তার কারণ জানতে পেরে অবাক হয়ে যাও।

বাচ্চাদের খেলতে দেখেছ, দেখেছ তারা কিভাবে তাস দিয়ে দুর্গ বা ক্যাসেল্ বানায়। কোনাকুনি ভাবে, অনেকগুলি তলে, পিরামিডের আকারে তারা তাসগুলি রাখে। দেখতে সুন্দর লাগে। কিন্তু যে কোন একটা তাস সরিয়ে নিলে পুরো ক্যাসেল্ টাই ভেঙ্গে পড়ে! যত উঁচু ক্যাসেল্, তার ভেঙ্গে পড়ার ঝুঁকি তত বেশী।

ঠিক এইভাবে, আমরা তাসের দুর্গের মত মানুষের মতামত দিয়ে আমাদের আত্মাভিমান তৈরি করি। বাবা , মা, সঙ্গি, সঙ্গিনী, শিক্ষক, বন্ধু ও আরো অনেকের কাছ থেকে স্বাক্ষর বা সার্টিফিকেট নিই এবং এই সব সার্টিফিকেট সাজিয়ে তাসের দুর্গের মত নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করি। মূর্তিটা দেখতে ভাল লাগে এবং আমরা খুশী হই।

কিন্তু যদি কোন একজন তার সার্টিফিকেট সরিয়ে নেয় তো কি হয়? ক্যাসেল ভেঙ্গে পড়ে! তুমি নিজেকে দুর্বিষহ অবস্থায় দেখো, বিষাদগ্রস্ত হও। ভাবো যে পুরো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে।

কমপক্ষে বাচ্চারা ক্যাসেল নিজের তাস দিয়ে বানায়। কিন্তু আমরা তা বানাই অন্যের তাসে, অন্যের সার্টিফিকেট দিয়ে। আমাদের এই ক্যাসেলের ওপরে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই কারণ তা অন্য মানুষের সার্টিফিকেট দিয়ে তৈরি।

তাই আমরা কি করি? আমরা এই তাসের দুর্গকে রক্ষা করার জন্য প্রবল চেষ্টা করতে থাকি। আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে থাকি যাতে অন্যেরা সার্টিফিকেট সরিয়ে না নেয়। তাদের লাগাতার সমর্থন পাবার জন্য কাজ করতে থাকি, কারণ তাদের সমর্থন দ্বারাই আমরা বেঁচে থাকি।

ছোট গল্প :

> এক মহিলা তার পতির সাথে বাজারে একটি কোট কিনতে গেছে। অনেক দোকানে ঘুরেও কোন কোট মহিলাটির পছন্দ হ'ল না।
> পতি পরিশ্রান্ত। সে জিজ্ঞাসা করে, 'প্রিয়ে, তুমি কি জান যে কি রকম কোট তুমি কিনতে চাইছ?'
> পত্নী বলে, 'অবশ্যই! আমি একটা পড়ে-মর কোট খুঁজছি।'
> পতি জিজ্ঞেস করে, 'প্রিয়ে, পড়ে-মর কোট কি?'
> পত্নী উত্তর দিল, 'যখন লোকেরা দেখবে, তারা মরে পড়ে যাবে!'

মানুষের কাছ থেকে কিভাবে সার্টিফিকেট আদায় করা যায়, আমরা সর্বদাই সে চেষ্টা করে যাচ্ছি! লোকে কি বলবে বা লোকে কিভাবে সাড়া দেবে, এই ভেবেই আমরা আমাদের সব কাজ করে থাকি।

ধর একটা ব্যাগ তোমার বাজেট বা তোমার যেমন দরকার সেই অনুযায়ী ঠিক আছে, কিন্তু অচেতনভাবে মন বলবে যে লোকে এই ব্যাগটাকে তেমন প্রশংসা নাও করতে পারে। তুমি আবার অন্য ব্যাগ পছন্দ করতে থাক। তুমি মানতে রাজী হবে না যে তুমি অন্যের সার্টিফিকেটের জন্য আরও ভাল ব্যাগ খুঁজছ, কারণ এটা তোমার ভিতরে একটা অচেতন প্রক্রিয়া।

আমরা প্রায় কেন্নোর মত হয়ে যাই। হাঁটতে গেলে কেন্নোর একশটা পা লাগে। ঠিক সেইভাবে জীবনের পথ চলার জন্য আমাদের দরকার সকলের কাছ থেকে তালে তাল মেলানো সম্মতি। কেন্নোর একটা পা অকেজো হলে কি হয়? সে আর চলতে পারে না।

একটা সম্মতি না পেলে আমাদের কি অবস্থা হয়? আমরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

আমরা যদি অপরের ওপরে এত নির্ভরশীল হয়ে পড়ি, তাহলে তো আমাদের বিষাদগ্রস্ত হবারই সম্ভাবনা। যারা বিষাদে ভোগে, তারা আসলে ভুগছে 'মনোযোগ পাবার চাহিদা' থেকে। সময়কালে আমরা পর্যাপ্ত মনোযোগ পাই না এবং আমরা সামাল দিয়ে উঠতে পারি না। একটা কথাই যথেষ্ট, তা আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে দেবে। কিন্তু আমরা আমাদের বিষাদের আসল কারণ জানি না।

তাই আমরা কি করি? তা ঠিক করতে আমরা ওষুধ নিতে থাকি।

কি করে তা নিরাময় হবে? বিষাদের কারণ তোমার ভিতরে এবং তুমি সাহায্যের জন্য ওষুধ চাইছো। লোকেরা বিষাদ নিয়ে আমার কাছে এলে, শুরুতে তাদের সহজ মহামন্ত্র ধ্যান করতে বলি, আর বলি যে আমরা আস্তে আস্তে ওষুধ বন্ধ করব।

দ্যাখো, এই মানুষদের প্রদর্শন করাতে হবে যে তাদের শক্তির উৎস তাদের ভিতরে আছে। ধ্যান তাদের সেটা দেখাতে পারে।

তাদের ধ্যান করার আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে যে তারা নিজের ভিতরের শক্তি ব্যবহার করবে এবং বিষাদমুক্ত হবে। ওষুধ কিন্তু তাদের আরও ভোঁতা করে দেবে। এটা বুঝতে হবে।

বলছি শোন, যখন তুমি বাইরে থেকে শক্তি আহরণ কর, তা সহজেই তোমার সাথে ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতে উঠতে পারে। তুমি তার হাতের পুতুল হয়ে যাও।

তোমাদের একটা গল্প বলি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরীক্ষাটা করা হয়।

> একটি কমবয়সী, সুস্থ ও বুদ্ধিমান লোক সকালে তার কাজে বেরুবে। তার পত্নী তার দিকে তাকিয়ে বলে , 'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তুমি ভাল আছো তো?'
>
> সে পত্নীর কথায় বিরক্ত হয়ে তাকে উল্টোপাল্টা কল্পনা করতে বারণ করল ও ঘর থেকে বেরুল।
>
> গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করার সময় তার প্রতিবেশী তাকে দেখে ও জোরে জোরে বলে। 'তুমি ঠিক আছো তো? তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে!' লোকটি বিস্মিত হয় ও সে ঠিক আছে বলে উত্তর দিয়ে গাড়ী বার করে বেড়িয়ে পড়ে।
>
> সে অফিস পৌঁছাল। ভিতরে ঢোকার সময় রিসেপ্সনিস্ট্ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'স্যার, আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে! আজকে কাজে কেন এলেন?'
>
> লোকটি উত্তর দিল, 'ভাল, আমার তো মনে হচ্ছে আমি ভালই আছি। দ্যাখা যাক...' বলে অফিসে ঢুকল।
>
> সে কাজ শুরু করে ও একজন সহকর্মী এসে বলে, 'ওহে! তোমাকে খারাপ দেখাচ্ছে! কি ব্যাপার? তোমার জ্বরটর হয়েছে নাকি?'
>
> এতক্ষণে লোকটির অবস্থা খারাপ। সে অস্বস্তিকর ও অসুস্থ বোধ করতে থাকল। ঠিক সেই সময় তার বস্ তাকে ডেকে পাঠাল। বস্ তাকে দেখে বলল, 'তোমাকে আজ একদম অসুস্থ দেখাচ্ছে। তুমি কি নিশ্চিত যে আজকে কাজ করতে পারবে? তুমি যাও আর ডাক্তার দেখাও না কেন?'
>
> কমবয়সী লোকটির পক্ষে খুব বেশী হয়ে গেলো। সে এবার সত্যি সত্যি অসুস্থবোধ করতে লাগল; ছুটি নিয়ে সে ঘরে চলল। ঘরে যাবার সময় সে দেখল যে তার শরীরের তাপমান বেড়ে যাচ্ছে। তার পত্নী তাকে বাড়ীতে ফিরতে দেখে অবাক। সে তার কপালে হাত দিয়ে দেখে যে তার তাপমান বেশ বেশী।
>
> যে মানুষটি সকালে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, সে বিকালে অসুস্থ হয়ে পড়ল! আর সে কিভাবে অসুস্থ হল? কেবল কতগুলি মানুষের কথায়। সংশ্লিষ্ট লোকদের আগে থেকে বলা ছিল তাকে একই কথা বলতে যে তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। এই পরীক্ষা অনেক লোকের ওপর করা হয়েছিল এবং শেষে সবাই অসুস্থবোধ করেছিল।

তুমি তোমার ভিতরের শক্তিতে কেন্দ্রীভূত না হলে এটাই হয়। কেবল বাইরে থেকে আসা প্রভাবে তুমি উপর থেকে নীচে চলে যেতে পার। তুমি নিজেতে কেন্দ্রীভূত হলে, বাইরের কিছুই তোমাকে নাড়াতে পারবে না।

লোকেরা আমাকে বলে, 'স্বামীজী, আমরা প্রশংসা বা অনুমোদনের জন্য কাজ করি না; আমরা আমাদের কর্তব্যের খাতিরে কাজ করি।'

সাফ সাফ বোঝ : যেই মুহূর্তে তুমি দাবী করছ যে তুমি তোমার কর্তব্য করছ, তুমি সেটা করছ কারণ তুমি তা না করলে, তোমার লোকেরা তোমাকে অনুমোদন করা বন্ধ করে দেবে। যতক্ষণ তুমি তোমার থেকে প্রত্যাশিত প্রতিটি কর্তব্য করে যাচ্ছ , তোমার

লোকেরা তোমাকে সমর্থন করতে থাকবে। তোমার কাজে একটা ছোট্ট ত্রুটি হলেই দেখবে যে সম্পর্কতায় কেমন পরিবর্তন ঘটছে। তুমি এটা জান, তাই তুমি তোমার কর্তব্য কর।

তুমি বলবে, 'স্বামীজী, আমি এক পিতা। আমি ছেলেপুলেকে না দেখলে, কে দেখবে?' আমি বলছি না যে তুমি তাদের দেখবে না। তুমি তাদের জন্ম দিয়েছ; তোমাকে তো তাদের দেখতেই হবে; কিন্তু তাদের দেখতে হবে সেই সময় পর্যন্ত যখন তারা স্বতন্ত্র হয় ও নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারে। কিন্তু যা করছ, কোনরূপ আশাপ্রত্যাশা ছাড়া কর। এটাকে এমন একটা কাজ হতে দাও, যেন সেটা তোমার ভিতরে প্রেমশক্তির প্রকাশ, যাতে কোন প্রকার প্রত্যাশা নেই।

আজকে তুমি দাবী করতে পার যে তুমি কোন আশা ছাড়াই কাজগুলি করছ, কিন্তু অন্যপক্ষের প্রতিদান একটু কমে গেলেই তুমি জান, তোমার কি রকম মানসিক চাপ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। এই চাপ ও হতাশার কারণ কর্তব্য করার সময় ভিতরে ভিতরে তোমার প্রত্যাশা ছিল। বিভিন্ন মানুষে তার মাত্রা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কোথাও না কোথাও তা থাকবে।

আর এই প্রত্যাশা যতক্ষণ আছে, তুমি তোমার প্রেমশক্তির প্রকাশস্বরূপ কাজ করছ না; তুমি এটা করছো এক লঘুতর সীমিত গুণ থেকে যাকে কর্তব্য বা তথাকথিত প্রেম বলছ।

ভগবৎগীতায় সুন্দরভাবে আছে :

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ : তার মানে, তোমার কাজ হল কেবল কর্ম করে যাওয়া, তার ফল সম্পর্কে একদম উদ্বিগ্ন না হয়ে।

যাই কর না কেন তা যেন তোমার ভিতরের প্রেমশক্তির উচ্ছ্বাস হয়। তাহলে তুমি ফল সম্বন্ধে বিব্রত হবে না।

যখন আমি বলছি যে তুমি ফল সম্বন্ধে বিব্রত হবে না, তার মানে এই নয় যে হতাশা ও নৈরাশ্যের জন্য তুমি ফল আশা করছ না; তুমি ফল সম্পর্কে একেবারেই মাথাই ঘামাবে না। আমি বলতে চাইছি যে তুমি ফল আশা করতেই জান না, কারণ তুমি সর্বদা তোমার আনন্দময় অন্তরশক্তিকে প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চলেছ। তাই আমরা বলতেও পারি না যে তুমি ফল আশা করছ না। তুমি তো পরম আনন্দে প্রবহমান, ব্যাস! এই প্রবহমান শক্তিই প্রকৃত প্রেম।

অন্যের কাছে আশা করার কোন শেষ নেই। তোমাকে বলি : সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হল, তোমার চারপাশে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখা। তুমি কি মনে কর যে তুমি সব মানুষকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখতে পার? কখনই না। পৃথ্বীগ্রহে সেটা সবচেয়ে অসম্ভব ব্যাপার।

একটা ছোট্ট গল্প :

> পতিপত্নী তাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর উদ্‌যাপন করছে। পত্নী পতিকে দুটো শার্ট উপহার দিল। পতি খুব আবেগের সাথে ঘোষণা করল যে তারা বাড়ীতে রান্না না করে বাইরে কোথাও খেতে যাবে। এটা ছিল তাদের এক কোমল মুহূর্ত।
> সে হাতমুখ ধুয়ে তরতাজা হয়ে বউকে খুশী করার জন্য উপহারে পাওয়া একটা শার্ট পরল আর তার সামনে গেল।
> পত্নী তাকে দেখে প্রথমে হাসল কিন্তু শীঘ্রই তার মুখভঙ্গী পরিবর্তন হয়ে গেল ও বলল, 'ও! তার মানে অন্য শার্টটি অত ভাল নয়?'

অপরকে সম্পূর্ণরূপে খুশী করা কখনই সম্ভব নয়!

প্রথমে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা কর; নিজের মধ্যে পরিতৃপ্তির সন্ধান কর। সেটাই পর্যাপ্ত। আর এই পরিতৃপ্তির সাথে যেন বাইরের মানুষদের কোন সম্পর্ক না থাকে। বাইরের অবস্থা ও মানুষদের ছাড়াই এটা যেন তোমার ভিতরে এক টগবগে শক্তি হয়। তবেই যথেষ্ট।

অপরের জন্য কিছু করা ভাল; তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া ভাল, সম্মান করা ভাল - কিন্তু এসব যেন হয় গভীর প্রেমশক্তি থেকে, ভয় থেকে নয়, আমাদের সার্টিফিকেট তারা সরিয়ে নিতে পারে এই ভয়ে নয়। অন্যের মতামত পাবার জন্য পরিশ্রমের কোন মানেই হয় না, তাহলে তো অন্যেরা তোমার জীবনের কেন্দ্র হয়ে যাবে। অন্যরা যেন তোমার শক্তির উৎস না হয়।

তোমাদের আগেও বলেছি : যেহেতু নিজের সম্বন্ধে কিছু জান না, তুমি উত্তরের জন্য সমাজের দিকে তাকাও। আর সমাজ খুশী হয়ে তোমার ওপরে লেবেল লাগিয়ে দেয় : তুমি ভাল পিতা, তুমি ভাল দেখতে, তুমি জীবনে অসফল এবং আরো কত কি।

সঠিক ঠিকানা ছাড়া পার্সেল যেমন এদিক থেকে ওদিক যায়, আমরাও তেমনি এই লেবেলগুলি সঞ্চয় করতে করতে চলেফিরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আমরা জানি যে আমরা ওই লেবেলগুলি নই, আমরা তো পার্সেলের ভিতরের জিনিষ।

সুখের জন্য অপরের ওপরে নির্ভর করলে তুমি তাদেরকে তোমার জীবনের ওপরে কর্তৃত্ব প্রদান করছ। তোমার শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস নিজের ভিতরে পাও না কেন? একটা পরিষ্কার বোঝাপড়ায় আস যে যখন তুমি তোমার কেন্দ্র অন্যের কাছে রাখ, আসল সুখ সম্ভব নয়। এটা বুঝলে অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

একটা ছোট গল্প :

> মানব ইতিহাসে ব্রহ্মসূত্র একটি মহান গ্রন্থ। বিশ্বের দর্শনের এটা একটা অসংক্ষেপিত সংস্করণ, যার থেকে অন্যান্য সকল দর্শন উদ্ভব হয়েছে, এটি সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থ। ভারতবর্ষের সবচেয়ে মহান পণ্ডিত মহর্ষি বেদব্যাস এর রচয়িতা।
>
> একজন জীবনমুক্ত মাস্টার এই বইটি তাঁর শিষ্য বাচস্পতি মিশ্রকে দিলেন ও শিষ্যকে বইটির ওপরে ভাষ্য লিখতে বললেন। এদিকে মাস্টার তাঁর কন্যা বামাতিকে বিবাহে বাচস্পতি মিশ্রকে দিলেন ও কিছুদিন পর দেহ রাখলেন।
>
> বাচস্পতি মিশ্র স্থিরসংকল্প হয়ে ভাষ্যকারের কাজ শুরু করলেন ও একটানা লিখেই যেতে থাকলেন। এটা ছিল তাঁর এক প্রগাঢ় ধ্যান যাতে তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লিখে চললেন, শেষে কয়েক দশক হয়ে গেল। তখন তিনি আর কিছুই দেখতেন না, আর কিছুই ভাবতেন না, আর কিছুই শুনতেন না।
>
> সবশেষে তাঁর মহান কার্য সমাপন হল। কেবল বইটির নাম দেওয়া বাকী। তিনি বইটি থেকে মুখ তুললেন। দেখলেন এক বৃদ্ধা তার জন্য প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'
>
> মহিলা উত্তর দিলেন, 'আমার জন্য ভেবো না। তোমার কাজ করে যাও।'
>
> বাচস্পতি বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে। বল তুমি কে?'
>
> মহিলাটি বলেন, 'আমি আপনার পত্নী।'
>
> বাচস্পতি মিশ্র প্রচণ্ড বিস্মিত হলেন ও কি হয়েছে তা বুঝে কষ্ট পেলেন। কয়েক দশক ধরে তিনি বইটি লিখে যাচ্ছিলেন , কিন্তু নিজের পত্নীকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন! তিনি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।
>
> 'আমাকে এই কয়েক বৎসরে মনে করিয়ে দাও নি কেন?', তিনি আকুল হয়ে বলেন।
>
> 'কি জন্য?' পত্নী বলেন। 'আপনি তো বইতে ডুবে ছিলে। আপনার মনোযোগ নষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করি নি ,' শান্তভাবে বলেন।
>
> বাচস্পতি মিশ্র বলতে থাকলেন, 'মনুষ্যজাতির জন্য তুমি তোমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করলে! এখন তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?'
>
> বামাতি বলেন, 'আপনার সেবা করায় এক আনন্দ আছে। আমি মনে করি আপনার এই মহান পুস্তকটি লেখার সময় আপনাকে সেবা করতে পেরে আমি ধন্য। আর কিছু আমার চাই না।'
>
> বাচস্পতি মিশ্রের চোখে আনন্দের অশ্রু। তাঁর পত্নীকে তিনি পরম শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁর সমস্ত জীবনের কাজকে পত্নীর নাম দিলেন : বামাতি।

এমনকি আজও, মানবজাতির সর্বাধিক মূল্যবান পুস্তকের সবচেয়ে বিশিষ্ট ভাষ্য তাঁর নাম বহন করে : 'বামাতি।'

বামাতি অমর হয়ে গেলেন, তাঁর নিঃস্বার্থ ভক্তি ও প্রেমের জন্য। তিনি নিজেই নিজের কাছে যথেষ্ট ছিলেন। এটা নয় যে তিনি তাঁর পতিকে বিরক্ত করতে চান নি, তাঁর প্রয়োজনই হয় নি। দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য। বেশীরভাগ সময়ে আমরা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, কিন্তু এই ভেবে শান্ত থাকি যে আমাদের অন্যকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

কিন্তু এখানে এমন একজনের কথা হচ্ছে যাঁর অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজনই নেই - এই পার্থক্য। তিনি ভাবেন নি যে তাঁর যৌবন নিষ্ফল গেল; তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই ভাবছিলেন না। তিনি তাঁর স্বাভাবিক সত্তার সাথে জুড়ে ছিলেন , ব্যাস। তাঁর পক্ষে পতিকে ডিস্টার্ব না করাটা কোন কঠিন কাজ ছিল না। তিনি তাঁর নিজের শক্তিতে এতই কেন্দ্রীভূত ছিলেন যে তাঁর কাছে এটা কোন ব্যাপারই ছিল না।

মৃত্যুর পরেও বামাতি বেঁচে আছেন। আর আমরা বেঁচে থাকা অবস্থায় প্রতিটি মিনিটে মরছি। এই পার্থক্য।

আজকাল তুমি বাড়ীতে আধা ঘণ্টার জন্য শান্তিতে সংবাদপত্র পড়তে পার কি? তোমার স্ত্রী আধা ঘণ্টার জন্য কি টিভি-তে তার পছন্দের ধারাবাহিক দেখতে পারে? ঠিক যখন পেপার পড়ছো, তোমার স্ত্রী আগের দিন ঘরে যা ঘটেছে তা বলতে চাইবে। সে নালিশ করবে যে তুমি তাকে পর্যাপ্ত মনোযোগ দিচ্ছ না। সে বলবে যে তুমি সবসময় পেপার নিয়েই থাক ।

আর যখন তোমার স্ত্রী তার পছন্দের ধারাবাহিক দেখছে, তোমার তখন ক্ষিধে পাবে এবং তাকে খাবার দিতে বলবে। ভুল সময়ে ধারাবাহিক দেখানোর জন্য টিভিকে গালি দেবে।

একটা ছোট গল্প :

> রেস্টুরেন্টে স্ত্রীর সাথে পতি বসে আছে। তারা খাবারের আদেশ করে অপেক্ষা করছে। স্ত্রী অভিযোগ করে, 'যখন থেকে রেস্টুরেন্টে এসেছো, তুমি ঐ পেপারটা পড়ে যাচ্ছ।'
> পতি ক্ষমা চাইল, 'আমি দুঃখিত প্রিয়ে' এবং ওয়েটারের দিকে ইঙ্গিত করল। 'দয়া করে আমরা কি আরেকটা খবরের কাগজ পেতে পারি?'

দ্যাখো। আমরা সবাই সবসময় অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর যখন সেটা পাই না, আমরা অস্থির হয়ে যাই। আমাদের জীবনে সমস্ত ক্রোধ, হতাশা ও নৈরাশ্যের মূল কারণ এটাই।

আমাদের চাওয়া বন্ধ করতে হবে এবং দিতে শুরু করতে হবে। অপরের কাছে শক্তি না চেয়ে আমাদের নিজের শক্তি বিকিরণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের তো জানাই নেই যে কিভাবে অপরের থেকে সরে নিজের দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়া যায়। আমরা নিজেকে মনোযোগের কেন্দ্র বলে দেখতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমাদের তো বহির্জগতকে মনোযোগের কেন্দ্র বলে দেখতে শুরু করা প্রয়োজন। কি করে সেটা করা যায়?

কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত কর

পরবর্তী কয়েকদিন আমি চাই তোমরা এই ছোট অভ্যাসটি কর : তোমাদের মধ্য থেকে একজন সাথী পছন্দ কর, ছেলেরা ছেলে সাথী ও মেয়েরা মেয়ে সাথী পছন্দ কর। সেই সাথীকে সম্পূর্ণরূপে সেবা কর। তোমার সাথীর তৃপ্তিই যেন তোমার প্রথম উদ্বেগ হয়। তুমি সর্বদাই দেখবে যে তোমার সাথী খুশী ও স্বস্তিপূর্ণ আছে কিনা। দ্যাখো তারা কিছু চায় কিনা। খাবার সময় নিজের জন্য প্রথমে প্লেট হাতিয়ে নেবার আগে, তাকে আগে প্লেট দাও ও তারপরে নিজের জন্য নাও। নিজের ঘরে গরম জল আসছে নাকি দেখার আগে তাদের ঘরে গিয়ে দেখো তারা গরম জল পাচ্ছে নাকি।

আমি চাই না তোমরা তোমাদের আত্মীয় বা বন্ধুদের মধ্যে কাউকে বেছে নিয়ে জোড়া জোড়া হও! আমি চাই না যে তুমি এমন কাউকে বেছে নাও যার সাথে ঠিকানা বিনিময় করতে পার, আর পরে তার বন্ধু হতে পার! শুধুমাত্র একজন অপরিচিত ব্যক্তি পছন্দ কর - যে এখন তোমার কাছে দাঁড়িয়ে। এলোপাতাড়িভাবে বেছে নাও।

আমাদের সমস্ত জীবন ধরে আমরা কেবল নিজেদের সম্পর্কে চিন্তায় ভুগি। খুব বেশী হয়ত আমাদের পরিবারে র ঘনিষ্ঠ জনের জন্য চিন্তা করি এবং তাও করি এই ভেবে যে এটা আমাদের কর্তব্যবদ্ধ প্রেম। যখন এই অনুশীলন শুরু করবে, নিঃস্বার্থ প্রেম কি তা বোঝার সুযোগ পাবে! এটা নিঃস্বার্থ কারণ তুমি অন্য মানুষটির কাছ থেকে কিছুই আশা কর না।

প্রকৃত প্রেম

প্রকৃত প্রেম এত গভীর, এত শক্তিপ্রদানকারী, যে উপলব্ধি না করলে তা জানতে পারবে না। প্রেম শক্তির এক প্রকাশ বা অভিব্যক্তি, প্রেম কোন লেনদেন করার জিনিষ নয়। আমাকে বল : প্রথমবার কারো সাথে দেখা হলে তাকে ভালবাসতে পার?

(শোতৃমণ্ডলী থেকে : না স্বামীজী! আমরা তাদের চিনি না, কি করে তাদের ভালবাসবো?)

একদম তাই! তুমি তাই ভাব। তোমাদের বলি, একটু বুদ্ধিগত উপলব্ধি ও ধ্যান দ্বারা দেখবে যে তুমি কারণ ছাড়া, কারণবিহীন হয়ে যে কোন মানুষকেই ভালবাসতে পারছ! তুমি রাস্তার গাছগুলিকে ভালবাসছ, তুমি তাদের সস্নেহে স্পর্শ করছ ও তোমার থেকে শক্তিপ্রবাহ অনুভব করছ। রাস্তায় যে অচেনা লোক পাশ দিয়ে চলে গেল, তাকেও ভালবাসা যায়। আসলে তোমার সত্তাই তো প্রেম, প্রেম তোমার দ্বারা প্রসেস্ করা কোন শোধিত গুণ নয়।

আজকের দিনে প্রেমকে সবচেয়ে বেশী ভুল বোঝা হয়। আজ প্রেম লেনদেনের পর্যায়ে চলে গেছে। কেউ তোমাকে ভাল কথা বললে তুমি তাকে ভালবাস; আগামীকাল সে তার থেকে কম কিছু করলে তুমি তাকে আর ততটা ভালবাসবে না, হয়ত তাকে ঘৃণাই করবে।

এমনকি তোমার সারা জীবনের বন্ধু, যার সাথে তুমি প্রায় রোজই কম্পিয়ুটারে চ্যাট কর, সে যদি তোমার অনুমোদনের বিপক্ষে কিছু বলে, তাকে আর তত কাছের মানুষ মনে কর না। এই সময় তোমার প্রেম কোথায় গেল? তোমার প্রেম আঘাত পেয়েছে!

এই খেলাই তোমরা খেল, যেখানে ভালবাসা ও ঘৃণা পালা ক'রে ও পরস্পর অদলবদল ক'রে ভেসে উঠতে থাকে। এই ভালবাসা-ঘৃণা সম্বন্ধ মোটেই প্রেম নয়। একদম ঠিক করে বোঝ। এটা কেবল কোন মানুষ ও পরিস্থিতির ওপর তোমার প্রতিক্রিয়া , ব্যাস। এটাকেই তোমরা প্রেম বল। এটা প্রকৃত প্রেম নয়। এটা তো বিষয়ীকেন্দ্রিক প্রেম (subjective love)।

প্রকৃত প্রেম কোন উদ্দেশ্য রাখে না। কোন বস্তু বা মানুষ থাকুক কি না থাকুক , প্রকৃত প্রেম কিন্তু থাকবে। প্রকৃত প্রেম নিজেই একটা বিষয়। তার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তুমিই বিষয় এবং তুমি প্রেম হয়ে গেছো, ব্যাস। কোন বস্তু তার সংস্পর্শে এলে তা অনুভব করে। নদী যেভাবে স্বাভাবিকভাবে বয়ে চলে আর মানুষেরা তাকে নানা স্থানে উপভোগ করে , তেমনি প্রকৃত প্রেম একটি মানুষ থেকে নির্গত হয় ও তার আশেপাশের মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে ।

প্রকৃত প্রেমকে নিরূপণ বা নিয়ন্ত্রণ করার কোন সুযোগই নেই। তোমার ভিতরের শক্তি ছাপিয়ে ওঠা উচিত এবং তা প্রেম হয়ে বিকশিত হবে। তখনই তুমি সম্বন্ধতার ভীষণ গাঁটগুলি খুলে ফেলে নিজেকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবে , একজন প্রেমী সত্তা রূপে!

তোমার সত্তার গুণ বা প্রেম আবিষ্কার করার জন্য দুটি জিনিষ করা যায়। প্রথম : বারবার এই রকম কথা শোন যাতে করে সেই কথা তোমার মধ্যে প্রকৃত প্রেমের এক দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করে , যাতে করে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার জন্য তোমার ভিতরে একটি স্থান সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়টি : ধ্যান কর যাতে রূপান্তর প্রকৃতপক্ষে ঘটে।

বাস্তবিক জীবনে তুমি যখন সম্বন্ধতার গভীরে যেতে থাক, তুমি বুঝতে পার যে তুমি যা অনুভব করেছিলে তা প্রকৃত প্রেম নয় , তা ছিল এক দেওয়া-নাওয়ার ব্যাপার। তোমার তথাকথিত প্রেম হল কিছু মানিয়ে নাওয়া বা আপোস মীমাংসা , কিছু কর্তব্যে সীমিত ভাবনা, কিছু ভয়, কিছু অপরাধবোধ।

ধ্যান তোমাকে প্রেম সম্বন্ধে এই ভ্রম থেকে বার করে আনবে। ধ্যান সত্তাস্তরে কাজ করবে। তাই এটা সংক্ষিপ্ত বা সোজাপথ! যখন তোমাকে জীবনের পথ নিজে চলে নিজে সবকিছু জানতে হয় , তখন পুরো জীবনকাল লেগে যায়। কিন্তু ধ্যান দ্বারা তোমার ভিতরে এক জায়গার সৃষ্টি হয় যেখানে তুমি নিজেই এ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পার।

কেবল একটা জিনিষ বোঝ : যখন তুমি কারণ ছাড়াই ভালবাসতে পারবে, তখন তুমি বিশালভাবে প্রসারিত হবে। তোমার দুনিয়াকে হঠাৎ নানা রঙে রঙ্গিন মনে হবে। এটা হবে পরমানন্দদায়ক। তুমি তোমার নিজের ও অপরের শক্তির উৎস হবে। তুমি এত উপচে পড়বে বা ছাপিয়ে উঠবে যে তোমার শক্তি অন্যদের ছোঁবেই। আর কোন রাস্তাই নেই। অন্যরা তোমার দিকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষিত হবে।

প্রশ্ন : মা ও তার শিশুর সম্বন্ধে কি হয়? সেটা কি মায়ের নিঃস্বার্থ প্রেম নয়?

এমনকি মায়ের ভালবাসাতেও প্রত্যাশা থাকে। এই কথা বললে অনেক সময় মানুষেরা আমার সাথে লড়াই করে , তর্ক করে। শোন, মা তার ছেলেকে ভালবাসে, ঠিক কথা। কিন্তু সেই প্রেমে কোথাও না কোথাও একটা অলিখিত প্রত্যাশা আছে। যদি ছেলে একটু বিরোধ করে, মা ছেলের জন্য ছোটবেলা থেকে কত কিছু করেছে তার লিস্ট সামনে নিয়ে এসে পড়তে থাকে। সম্বন্ধতা একটু চোট পেলেই পুরো জিনিষটা খুলে যায়।

প্রকৃত প্রেম হল তোমার ভিতরের অস্তিত্বের শক্তির প্রকাশ এবং এই প্রেম এই ধরণের যুক্তিতর্ক কখনই চিন্তা করতে পারে না। কোন উদ্দেশ্য বিনা সে কেবল প্রবাহিত হতে জানে। কি করে সমস্ত তথ্য বা ট্র্যাক-রেকর্ড বিবরণ সহকারে লিখে রাখতে হয়, তা সে জানে না।

যেই মুহূর্তে তুমি অতীতের ঘটনা টেনে আন, তার মানে প্রত্যাশা সর্বদাই ছিল এবং তা ছিল তোমার ভালবাসার পিছনে লুকিয়ে। এরকম হলে তা কখনই প্রকৃত প্রেম হতে পারে না।

একই কথা ছেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ছেলে মাকে ভালবাসে, আশা করে মা তাকে দেখাশুনা করবে, আশা করে মা সকাল পাঁচটায় উঠে তার জন্য টিফিন গুছিয়ে দেবে, তার কাপড়চোপড় ঠিকঠাক রাখবে, একদিনও যেন এর থেকে বিচ্যুতি না হয়। সে মাকে পছন্দ করে কারণ সে সেবা ও বিলাস উপভোগ করে।

একটা ছোট গল্প :

> একটা ছেলে স্কুলে গণিতের ক্লাসে ভগ্নাংশ শিখছিল।
> একদিন শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'যদি একটা কেক পাঁচ ভাগে ভাগ কর এবং তোমার পরিবারের পাঁচজন একটি

করে ভাগ পায়, তাহলে কেকের কত ভগ্নাংশ তুমি পাচ্ছ?'
ছেলেটি বলে, '২/৫ ম্যাডাম।'
টীচার বলে, 'কিভাবে? তুমি ভগ্নাংশ ঠিক করে পড় নি?'
ছেলেটি বলে, 'ম্যাডাম, কেকটি ভাল লাগলে মা আমাকে তার টুকরোটাও দিয়ে দেবে।'

মা তার সন্তানের জন্য উৎসর্গ করতে চায়, ঠিক আছে, কিন্তু যে মনোভাব নিয়ে তারা উৎসর্গ করে আমরা এখানে তার সম্বন্ধে বলছি। তাদের এই উৎসর্গ করা উচিত ভিতর থেকে এক উপচে পড়া ভাব থেকে, কোন লুকানো প্রত্যাশা থেকে নয়। ঘটনাগুলি কখনই তাদের মধ্যে রেকর্ড হবে না যদি তারা এটা উপচে পড়া ভাব থেকে করে। আর রেকর্ড হলেও, তেমন কিছু ঘটনা ঘটলে, প্রতিহিংসা সহকারে সেগুলি বেড়িয়ে পরবে না।

সাধারণ প্রেম আশা প্রত্যাশার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না, যদিও অনেকে সেটা অস্বীকার করার চেষ্টা করতে পারে। প্রেমে প্রত্যাশা জিনিষটা এমনভাবে গেঁথে গেছে যে তাকে আলাদা করে দেখা খুবই কঠিন। সেটাই সমস্যা।

আসলে যতক্ষণ সব ঠিকঠাক আছে, আমি কি বলছি তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু অনেক ঘটনা শুনি যে অতি সাধারণ কারণে পুত্র বা কন্যাকে পরিবার থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে! কারণ তারা অন্য জাতিতে বিবাহ করেছে বা দুটি পরিবারের মধ্যে কোন কলহ ছিল। তখন সমস্ত ভালবাসা হঠাৎ করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়?

এই প্রকার ঘটনা ঘটার আগে অবধি পুত্র বা কন্যাকে অনেক ভালবাসা হত। আকস্মিক কি হয়ে গেল ? প্রকৃত ভালবাসা হঠাৎ মিলিয়ে যায় কি করে? প্রকৃত প্রেম কখনও বন্ধ করা যায় না, কারণ তা কার্য্য-কারণ চক্রে বাঁধা নয়।

পরিবারের কোন সূক্ষ্ম ঘটনা যদি ভাল করে দেখ, বুঝতে পারবে তোমার প্রেম বন্ধনে সীমিত। তোমার জীবনের কয়েকটা জিনিষ পুনর্বিন্যস্ত কর এবং লক্ষ্য কর তোমার পরিবার কিভাবে তাতে সাড়া দেয়।

সন্তানদের যতক্ষণ ভালবাসার নাম করে দিতে থাক, তারাও ভালবাসার নামে উপভোগ করতে থাকে। যতক্ষণ তোমরা একে অন্যের মন রেখে চলছ, ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজন অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যবহার করলে, প্রেমের মেজাজ পরিবর্তন হয়, রঙ বদলায়।

যে প্রেম সর্বদা আশঙ্কাতে আছে তা প্রকৃত প্রেম নয়। সেটা কেবলমাত্র সমঝোতার প্রেম। আর সমঝোতার জিনিষ পূর্ণ হতে পারে না। আর যা পূর্ণ নয় তা সর্বদাই আশঙ্কায় থাকবে। প্রেম তো এক পূর্ণ আনন্দ উদ্‌যাপন, কর্তব্য নয়।

সম্মান করা প্রেম নয়

আরেকটা ব্যাপার : আমরা সবাই সম্মান করা ও প্রেম গুলিয়ে ফেলি। যখন সম্পূর্ণরূপে প্রেম কর, তোমার কোন কাজেই অসম্মান করার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। যখন সম্মান করাকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ কর, দেখবে যে কিছু মানুষের যে কাজগুলি একেবারে স্বাভাবিক মনে হয়, সেই একই কাজ অন্যেরা করলে খারাপ লাগে। যে শক্তি দিয়ে মানুষটি কাজ করছে, সেই শক্তিই ঠিক করায় যে কাজটি সম্মানসূচক না অসম্মানসূচক।

তোমার শক্তি যখন পূর্ণ, যখন তুমি কেবল প্রেমশক্তি, তখন তুমি যা কিছু করতে পার। তুমি যখন নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত নও, তুমি সম্মান করার সমস্যার সাথে ধরা পড়ে যাবে। আমি তোমাকে অসম্মান করতে বলছি না। আমি খালি এটা বলছি যে যখন তোমার সত্তা প্রেমে ভরে যায়, তোমার দেহভঙ্গী, চলাফেরা ও কথাবার্তায় কখনই অসম্মান করার লেশমাত্র থাকবে না।

কিন্তু তুমি যদি প্রেমের জায়গায় সম্মান করাতে আটকে যাও, তুমি পুরো জিনিষটাই হারিয়ে ফেলছ। তাহলে প্রেমময় না হয়ে, তুমি ভান বা ছল করতে থাকবে। ভান করে কি পূর্ণ হওয়া যায়?

তুমি সম্মান করাতে কেন্দ্রিত থাকলে, তুমি ভান করবে, কারণ সম্মান করা সামাজিক ব্যাপার এবং তা সংজ্ঞার্থ পরিবর্তন করতে থাকে। কিন্তু যদি তুমি প্রেমে কেন্দ্রীভূত থাক, তাহলে সম্মান করা একটি মনোরম বাই-প্রোডাক্ট। তাই প্রেমে কেন্দ্রীভূত থাকো, সম্মান করা স্বতশ্চলভাবে হবে।

মনে রেখো : সম্মান করা মৃত। প্রেম জীবন্ত। সম্মান দূরত্ব সৃষ্টি করে, প্রেম কোন দূরত্ব জানে না।

লোকেরা ভগবানকে ভয় ও সম্মান করতে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তাদের কখনই ভগবানকে প্রেম করতে শেখানো হয় নি। তাদের মন্দিরের মূর্তিগুলিকে ছোঁবার অনুমতি নেই। আশা করা হয় যে তারা দূরে দাঁড়িয়ে প্রণাম করবে। তাদের ভগবানের থেকে সতর্ক

থাকতে বলা হয়। বোঝ যে ছোটদের প্রথমেই ভগবানকে ভালবাসতে শেখানো উচিত।

ভগবানকে আলিঙ্গন করতে না পারলে, আর কাকে আলিঙ্গন করবে? কারণ ভগবানই তো সব! তুমি যখন তোমার সন্তানকে শেখাচ্ছ যে ভগবানকে আলিঙ্গন করা যায় না, তুমি আসলে তাকে শেখাচ্ছ যে ঈশ্বর সবকিছু থেকে আলাদা। ভগবানকে বেদীতে রেখে তুমি আসলে ছোটদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ করে রাখছ।

কিছু সামাজিক বুদ্ধি রাখ এবং দরকার মত সম্মান করার খেলা বুদ্ধি সহকারে খেল, ব্যাস। মনে করিয়ে দিই, এই প্রকার সম্মান করা গভীর সজাগতা ও বুদ্ধির সাথে হবে। এতে তুমি লেশমাত্র কম প্রেমময় হবে না।

একটা ছোট গল্প :

> মা তার মেয়েকে নিয়ে এক পাব্লিক ফাংশানে গেছে। তারা সেখানে ভীড়ে আলাদা হয়ে গেল। মা ঘাবড়ে গিয়ে চারিদিকে মেয়েকে খুঁজতে লাগল।
> হঠাৎ সে পিছন থেকে এক আওয়াজ শোনে, 'মারিয়া! মারিয়া!'
> মা ফিরে দেখে যে সেটা ছিল তারই মেয়ে। সে তার দিকে দৌড়ে গেল ও তাকে কোলে নিয়ে নিল। মা জিজ্ঞেসা করে, 'আচ্ছা, আমাকে মা বলে না ডেকে মারিয়া বলে কেন ডাকছিলে?'
> মেয়েটি বলল, 'তাহলে কাজ হত না। এখানে তো অনেক মা আছে!'

বাচ্চারা তাদের নিজের মধ্যে কেন্দ্রিত থাকে এবং তারা আমাদের চেয়ে বেশী জীবন্ত ও সজাগ। তাদের নিষ্পাপতা, তাদের প্রেম, তাদের দেহভঙ্গী তাদের হয়ে কথা বলে। এইজন্য তারা যা বলে বা করে, তা নিষ্পাপ মনে হয়, কখনই তা অশ্রদ্ধার মনে হয় না। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একবার মনে ঢুকে গেলে, এই নিষ্পাপতা মিলিয়ে যায়। তখন আমাদের শব্দ প্রয়োগ করে ও ভান করে তা মানিয়ে নিতে হয়।

প্রেম যখন কর্তব্য হয়ে যায়, তা এক বোঝা হয়। আর বোঝা বা ভার হয়ে গেলে তা আর কোন উদ্যাপন নয়; তুমি সবসময়ে সেই বোঝাকে ধরে রাখার চাপে থাকবে।

মুক্তিদায়ী প্রেম

বাবা মায়েরা সন্তানদের ভালবাসার কারণ শেখায়। ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসা শেখানো হয়েছে কারণ দিয়ে। আমরা কি তাদের পৃথ্বীকে ভালবাসতে শেখাই? তাদের প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিক্ষা দিই? না। কিন্তু তাদের শেখাই যে আত্মীয় পরিজনদের ভালবাস, আমাদের ভালবাস। যাদের থেকে কিছু পাবার আছে, আমরা সন্তানদের কেবল তাদের ভালবাসতে শেখাই।

যদি তুমি তাদের প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে শিক্ষা দাও, তুমি তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের বীজ বপন করছ। অনেক মা-বাবাকে দেখেছি যারা বাচ্চাদের পাব্লিক প্লেসে নোংরা ফেলতে শেখায়। একই মা-বাবা যারা পরিবারকে ভালবাসতে শেখায় তারাই প্রকৃতিকে অমর্যাদা করতে শেখায়। তোমার ভিতরে প্রকৃত প্রেম থাকলে তুমি কখনই প্রকৃতিকে অমর্যাদা করবে না। তুমি মানুষ ও প্রকৃতিকে একইভাবে আলিঙ্গন করবে।

সঠিক বীজ বপন কর। তাহলেই অভিষ্ট গাছ হবে। সন্তানের ভিতরে প্রেম প্রস্ফুটিত হবার জন্য সঠিক অবস্থা সৃষ্টি করলে, সন্তানটি বিকশিত হবে। ধ্যান বীজ বপনে সাহায্য করে, অন্তর্দেশে সঠিক জায়গা সৃষ্টি করে। বাইরে থেকে কিছুই জোর করা যায় না। জোর করলেই তাতে বাধা আসবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সেটা করতে হবে, যাকে তুমি কর্তব্য বল।

যে প্রেম সম্বন্ধে আমরা কথা বলি তা হল মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব। তুমি প্রেমের নামে মানুষটিকে ভৃত্য বানিয়ে ফেলেছ এবং তাকেও সেই অনুসারে ব্যবহার করতে হয়। শারীরিক দাসত্বে আর যাই হোক তুমি জান যে তোমাকে ক্রীতদাস বানানো হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব ব্যাপারটা এত বড় ধূর্তামি, তুমি বুঝতেই পারবে না যে তুমি ক্রীতদাস হয়ে গেছ।

তোমরা কি বলতে পার আমাদের সবার মধ্যে এত অপরাধবোধ কেন? কারণ যাকে আমরা প্রেম বলে জানি, তা আমাদের সর্বদাই অপরাধবোধের দিকে ঠেলে দেয়। যখন প্রেম পূর্ণ, যখন তা তোমার সত্তার পবিত্র শক্তি, তা কখনই অপরাধবোধ দিতে পারে না। তুমি সর্বদাই অপরাধবোধে থাকো যে তুমি যথেষ্ট ভালবাসো নি, যে তুমি কোথাও একটা ব্যর্থ হয়েছ। আর তুমি যথেষ্ট ভালবাসো নি কেন? কারণ তোমাকে শেখানো হয়েছে সেই প্রেম যার কোন কারণ আছে, পূর্ণ প্রেম শেখো নি।

তুমি দেখবে তুমি যদি পূর্ণরূপে প্রেম করে থাকো, কেউ মারা গেলে কখনই অপরাধবোধ বা বিষাদে ভুগবে না। শারীরিক বিচ্ছেদে হয়ত দুঃখ পাবে, কিন্তু তুমি কখনই ভাববে না যে তাদের জীবদ্দশায় তুমি কিছু হারিয়েছ। যখন আমি পূর্ণ প্রেমের কথা বলছি,

তখন আমি এই বলতে চাইছি না যে অপরের মনোযোগ পাবার ইচ্ছা ও তাদের প্রয়োজন মিটানোর সমস্ত আশা তোমাকে পূর্ণ করতে হবে। আমি বলতে চাইছি যে তোমাকে তোমার ভিতরে সুন্দরভাবে কেন্দ্রীভূত থেকে অপরের দিকে শক্তিময় প্রেম বিচ্ছুরণ করা উচিত, তাদের অস্তিত্বের অংশ বলে দেখে ও শ্রদ্ধা করে।

এইভাবে প্রেম করলে তুমি তাদের পূর্ণরূপে অনুভব করে থাকবে এবং তারা চলে গেলে তোমার কোন অপরাধবোধ থাকবে না। পরিবার সর্বদাই তোমার মধ্যে অপরাধবোধ জাগিয়ে রাখে, যাতে তারা তোমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

নানারকম ভাবের একসাথে মদ্যপের মত প্রতিক্রিয়াই অপরাধবোধ, কারণ তুমি ঐ ভাবগুলির মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে যাও নি। অপরাধবোধ যেন কখনও তোমাকে বশে না আনে।

আমি কিন্তু এটা বলছি না যে, যা ইচ্ছা হয় তাই করবে এবং তাতে নিজেকে দোষী ভাববে না। আমি বলছি যে তোমার অন্তরের কেন্দ্রে বিদ্যমান থেকে এবং গভীর সচেতনতা ও উপলব্ধি নিয়ে পূর্ণরূপে সজীব থাক। তাহলে অপরাধবোধের কোন জায়গাই থাকবে না।

প্রকৃত প্রেম সর্বদাই প্রদান করে, জিজ্ঞাসা না ক'রে। তা নিতে জানে না। একমাত্র দিতে জানে। একে সৃষ্টিও করতে পার না। এটা এরকম : তুমি প্লাস্টিকের গোলাপ তৈরি করতে পার, কিন্তু তাতে কি গোলাপের সুগন্ধ থাকবে? না! সেরকম প্রকৃত প্রেম কখনই সৃষ্টি করা যায় না।

আসল গোলাপ হতে গেলে তোমাকে সঠিক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, সঠিক মাটি, ঠিকমত জল এবং তবেই সে নিজে থেকে হবে। সেইপ্রকার প্রকৃত প্রেম ঘটতে গেলে, তোমাকে তোমার ভিতরে সচেতনতা ও গভীর উপলব্ধির ক্ষমতা সৃষ্টি করা চাই - দেখবে প্রেম তোমার ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত হবে।

কলেজের সমাবেশে একটি মেয়ে একবার আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কি আপনি সন্ন্যাসী হয়েছেন?'

আমি তাকে বললাম যে প্রেমে সফল হওয়ার কারণেই আমি সন্ন্যাসী হয়েছি। প্রেমে অসফল হলে তো দেবদাস সৃষ্টি হয় , সন্ন্যাসী নয়! একমাত্র যখন তুমি পুরো বিশ্বকে প্রেম করতে পার, তুমি সন্ন্যাসী হতে পার। যখন সমগ্র বিশ্বকে প্রেম করতে পার, সেটাই তখন প্রকৃত প্রেম।

প্রকৃত প্রেম কোন সম্বন্ধ সহকারে হয় না। কেবল সাধারণ প্রেম সম্বন্ধ সহকারে হয়। সাধারণ প্রেমে তুমি পিতাকে ভালবাস কারণ সে তোমাকে দেয়। মাকে ভালবাস কারণ সে তোমায় যত্ন করে। তোমার প্রেমিকাকে ভালবাস কারণ সে তোমাকে যৌনসুখ দেয়।

প্রকৃত প্রেম সেরকম নয়। সে বলে না 'ও! এটা আমার বাবা। আমার তাকে ভালবাসা চাই'... না! সে সবাইকে ও সবকিছুকে সবসময় ভালবাসতে জানে, ব্যাস। সাধারণ প্রেম বাঁধন সৃষ্টি করে, প্রকৃত প্রেম মুক্তি দেয়। সাধারণ প্রেমে, সফলতা ও অসফলতা দুটিই আছে। প্রকৃত প্রেমে কোন সফলতা বা অসফলতা নেই, প্রেম কেবলমাত্র 'আছে', ব্যাস। সেটাকে খুঁজে পাওয়াই সফলতা!

লোকেরা ভাবে যখন তোমার পক্ষে কিছুই সুবিধার হচ্ছে না , যখন সব ভালবাসা হারিয়ে গেছে, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও। লোকেরা ভাবে হতাশায় সব ছেড়েছুড়ে মানুষ সন্ন্যাসী হয়। না। শোন, যারা এসব বলে আমি তাদের জন্য দুঃখিত হই। তারা এত অজ্ঞান। অজ্ঞ অবস্থায় তারা অবিশ্রাম বিচার করে। ভাল করে বোঝ : সন্ন্যাস এক চূড়ান্ত বিবাহ, ঈশ্বরের সাথে!

একজন যথার্থ সন্ন্যাসী এত প্রেমময় ও করুণাময় যে উনি হেঁটে গেলে ঘাস মরে না। এটা গল্প নয়। এটা সত্যি কথা। যথার্থ সন্ন্যাসী অস্তিত্বের দিকে প্রেম ও করুণা ঝরিয়ে দেন। তিনিই হলেন একজন যথার্থ সন্ন্যাসী, যিনি জানেন যে প্রার্থনা প্রেম এবং প্রেমই প্রার্থনা।

যখন প্রকৃত প্রেম খুঁজে পাবে, তোমার প্রার্থনা কেবল তার এক প্রকাশ হবে। মীরার ভজনগুলি কি? সেগুলি হল মীরার প্রেমের ঝর্ণা। মীরা হলেন ভারতের এক জীবনমুক্ত সত্তা। তিনি কেবল অনুরণিত হয়েছেন কৃষ্ণের সাথে , কৃষ্ণই তো অস্তিত্ব। মীরা তাঁর সত্তা থেকে ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর ভজনগুলি আজও বিখ্যাত। সেই ভজনগুলির শক্তি কখনই ম্রিয়মান হতে পারে না, কারণ সেগুলিতে অস্তিত্বের শক্তি আছে। সাধারণ প্রেমকে এত বছর ধরে এত লোক অনুভব করতে পারে না। কেবল প্রকৃত প্রেমই এইপ্রকার স্থায়ীরূপে শক্তি বিকিরণ করতে পারে।

আর মীরার ভজনগুলি তো তাঁর উপাসনা ছিল। যখন তুমি প্রকৃত প্রেম পেয়ে গেছ , আর কোন রাস্তা নেই - উপাসনা বা প্রার্থনা প্রেম হয়ে যায়।

সাধারণ প্রেমে আমরা কেবল চাই যে কেউ আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিমূর্তিকে পরিতুষ্ট করুক , কেউ আমাদের মানসিকভাবে সমর্থন করুক।

তোমার প্রয়োজন কেউ মিটিয়ে দেবে, সেটাই তুমি চাও। যখন তুমি হতোদ্যম, চাও যে কেউ তোমায় উদ্দীপ্ত করুক। তুমি চাও সে তোমাকে সহানুভূতি দেখাক আর তোমার দুশ্চিন্তাগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করুক। এটাকে তুমি প্রেম বল। কিন্তু প্রকৃত প্রেম তো নাম ও আকার, শরীর ও মনের সীমা পেরিয়ে। একমাত্র যে মানুষ এগুলিকে পেরিয়ে সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসতে পারে সে সন্ন্যাসী হয়। সে বিবেকানন্দ হতে পারে!

আমরা প্রেম কিভাবে জটিল করি

বিবেকানন্দ যখন বলছেন, 'ওঠো! জাগো!' তার মানে কি আমরা ঘুমিয়ে আছি? একদম তাই! আমরা ঘুমাচ্ছি, না জেনে ঘুমাচ্ছি। আর ঘুমন্ত অবস্থায় বিচার করছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সমালোচনা করছি। ঘুমিয়ে দোষ দিচ্ছি। আমরা ভাবছি আমরা জেগে আছি ও ত্রুটিনির্দেশ করছি। আমরা ভাবি যে আমরা সব বিষয়ে সবকিছু জানি , এমনকি প্রেম বিষয়েও।

একটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষের এক ধনী মাসী ছিল ও তাকে প্রায়ই দেখতে যেত। তার মন ছিল মাসীর ধন -সম্পত্তির ওপরে এবং মাসীকে খুশী রাখার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করত। মাসীর দুটো বেড়াল ছিল এবং মাসী তাদের খুব ভালবাসত। লোকটি সেটা জানত ও মাসীকে খুশী করার জন্য বেড়াল দুটিকে খুব সেবা করত। তার গুপ্ত বাসনা ছিল, মাসী যেন উইলে তার নামে কিছু সম্পত্তি লিখে যায়। সে রোজ আসে , বেড়ালগুলিকে দুধ খাওয়ায়, তাদের সাথে খেলে, অনেক সময় কাটিয়ে তবে ফিরে যায়। লোকটির বেড়াল-সেবা দেখে মহিলাটি খুব খুশী।
> মাসী একদিন মারা গেল। তার উইলে সে লোকটির জন্য বেড়াল দুটি লিখে গিয়েছিলেন। লোকটির হতাশা বুঝতে পারছ! সে নিশ্চয় নিজেকে প্রতারিত মনে করছিল।

সাধারণ প্রেমে প্রতারিত মনে হবার সুযোগ খুব বেশী। লোকেরা ধন -সম্পদের জন্য ভালবাসে, অনুগ্রহ পাবার জন্য ভালবাসে, পরামর্শ পাবার জন্য ভালবাসে, অন্যের ভোলামনের সুযোগ নেবার জন্য ভালবাসে ... আরও কত কি। ভালবাসা সবসময়েই কারণের সাথে আসে।

কিন্তু মানুষেরা এটাকে কখনই মানবে না। তারা এটা গ্রহণ করে না কারণ তারা নিজেদের সাধারণ প্রেমে একেবারেই বিভ্রান্ত। তারা ভাবে প্রেম এভাবেই হয়। ভাবে যে তারা কত প্রেমময়, আর আমিই যেন তাদের প্রেমকে নীচে নামিয়ে আনছি।

সততার সাথে বসে যদি ভাবো, তুমি আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবে। অকপট হয়ে নিজেকে অনুসন্ধান কর ও লক্ষ্য কর । কেবল বসে পড় ও ছবির মত মনে মনে দ্যাখ তোমার মা, বাবা, ভাই বা বোন তোমার সাথে একটু অন্যরকম ব্যবহার করলে তুমি কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। তাহলে তুমি বুঝবে আমি কি বলতে চাইছি।

আমরা সর্বদাই কারো না কারো কাছ থেকে কিছু না কিছু চেয়ে যাচ্ছি এবং তাই সবসময়ে আমরা তাদের কাছ থেকে এসব পাবার জন্য মসৃণভাবে পথ তৈরি করে দিই। এই মসৃণপথটিকে আমরা বলি প্রেম। ভেবো না যে এটা কেবল বস্তুগত সম্পদ পাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি কোন মানুষের থেকে বিশেষ ব্যবহার পাবার জন্যও তুমি তার সাথে বিশেষরূপে ব্যবহার কর। যতক্ষণ তোমরা দুজনেই একই ভাবে ব্যবহার করতে থাক, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। কেউ একটা ভুল করলেই, ভালবাসা তখনকার মত মিলিয়ে যায়!

আমাকেই উদাহরণস্বরূপ নাও। তোমরা সবাই দাবী কর যে আমাকে খুব ভলোবাস। তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ধারণা আছে যে তোমাদের সাথে আমার কিভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমি তোমাদের প্রত্যেকের সাথে সেইভাবে আচরণ করি। আসলে আমি এখন তাই তো করছি। কি হয়? যদি একবার তোমার দিকে তাকিয়ে না হাসি বা তোমাকে কিছু বলি যা আমার সম্বন্ধে তোমার কাঠামোতে মানানসই হয় না, তুমি ভাবতে থাক আমি আর তোমায় ভালবাসি না।

তুমি ভাবতে থাক হয়ত আমি অত ভালবাসার যোগ্য নই। তুমি কল্পনা করতে থাক কেন আমি তোমায় বিশেষ কিছু একটা বলেছি অথবা কেন তোমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি নি।

আমি হয়ত কারো সাথে কথা বলছিলাম বা আমি এমনিই তোমার দিকে তাকিয়ে হাসি নি - তোমার আমিত্বকে একটু শান্ত করার জন্য, ব্যাস। কিন্তু তুমি পুরো খেলাটাই হারিয়ে ফেল এবং তোমার প্রেমের অভিধানের সাহায্যে আমার কাজগুলিকে ব্যাখ্যা করতে থাক। এতে কি হবে? তুমি দুর্দশার গভীরে ডুবে যাবে।

প্রেমকে তোমরা এইভাবে জটিল করে ফেল। কমপক্ষে এটা যখন আমার কাছে আসে, আমি কিন্তু আমার দিক থেকে তাতে কোন জটিলতা যোগ করি না। কল্পনা কর, তোমরা দুজনে যদি এইভাবে নিজেদের সম্পর্কে জটিলতা যোগ করতে থাক, তো কি অবস্থা হবে? পুরো বিশৃংখলা হয়ে যাবে! তুমি প্রেমের উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে - এভাবে চলতে থাকবে, ব্যাস!

লোকেরা বলে, 'স্বামীজী, আমরা আমাদের সন্তানদের অনেক প্রেম করি ...'

তাদের দুষ্টামির সময় তুমি তাদের কতবার বাজে ভাবে বকেছ? একটি মেয়ে আমায় আশ্রমে বলছিল, 'স্বামীজী, আমার মা আমার সন্তানদের ভালবাসে যদি তারা ঠিকমত ব্যবহার করে। সে চায় যে আমি আমার সন্তানদের নিয়ে আসি আর মা নাতিদের নিয়ে গিয়ে তার বন্ধুদের দেখাবে, কিন্তু সেখানে তাদের দুষ্টামির জন্য এসে আমায় বকবে।'

বাচ্চাদের দেখলে তুমি তাদের সরলমতির দিকে আকৃষ্ট হও। সেটা এক ব্যপার। দ্বিতীয়ত , এটা তোমাকে একটা গর্বের ভাব দেয়, আমিত্বকে বর্দ্ধিত করে, যখন দ্যাখ যে তারা তোমারই সৃষ্টি। অবশ্যই তুমি তাদের যত্ন কর ও তাদের খুশী রাখ। কিন্তু আমি বলছি যে এরকম ভালবাসাও কিছু সীমাবদ্ধতা ও পছন্দের ভাব নিয়ে আসে। এটা বাচ্চাদের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক কংক্রিটের রাস্তা বানাচ্ছিল। রাস্তা বানানো ঠিক শেষ হবার আগে পাশের গ্রামের একদল বাচ্চা সেখানে দৌড়ে এল ও তাদের পায়ের ছাপ রেখে গেল। লোকটি খুব রেগে গেল এবং তাদের গালি দিল।
> তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, 'আরে, কি ব্যাপার? আমি ভাবেছিলাম তুমি বাচ্চাদের ভালবাস।'
> লোকটি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু কংক্রিটের ওপরে নয়।'

সাধারণ প্রেম সর্বদাই কিছু শর্ত নিয়ে আসে! কোথাও কোন ফাইন-প্রিণ্ট থাকবে। আমি সেটাই বলতে চাইছি। আমরা মানুষকে প্রেম করি, নাম, জায়গা, মেজাজ ও অবস্থা দেখে।

একজন জীবনমুক্ত সত্তার প্রেম

বিবেকানন্দের জীবনের একটি ছোট গল্প :

> একরাত্রে বিবেকানন্দ রাত দুটার সময় জেগে গেলেন ও শিষ্যদের জাগালেন। তাঁর শিষ্যেরা উদ্বিগ্ন হল ও জানতে চাইল কি হয়ছে। বিবেকানন্দ বললেন যে তিনি খুব বেদনা অনুভব করছেন আর মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য এই বেদনা হচ্ছে। পরের দিনে পেপারে দেখা গেল যে ফিজি-তে ভয়ংকর ভূমিকম্পে অনেকে মারা গেছে।

হাজার মাইল দূরে ঘটনার সাথে তিনি সংবেদী ছিলেন। তোমার কি মনে হয় যে স্বাভাবিক মানুষেরা এইপ্রকার সংবেদী হতে পারে ? নিজের প্রতিবেশীর অসুখও আমাদের প্রভাবিত করে না।

একটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষ তাদের পরিবারের ডাক্তারকে ফোন করে বলে, 'ডক্টর, মনে হচ্ছে আপনি একবার এসে আমার স্ত্রীকে দেখে গেলে ভাল হয়।'
> ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? তার কি শরীর খারাপ?'
> লোকটি বলে, 'তাই মনে হচ্ছে ডক্টর। গতকাল সে তার স্বাভাবিক সময়ে উঠল। চান করল, রান্না করল, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাল, কাজের লোক আসে নি বলে ঘর পরিষ্কার করল, কাপড় ধুল, বাচ্চাদের স্কুল থেকে নিয়ে এল, তাদের হোমওয়ার্ক করাল এবং শুতে গেল। মাঝরাতে সে বলে যে সে ক্লান্ত। মনে হচ্ছে তার চেক্আপ্ প্রয়োজন।'

আমরা আজকাল এত সংবেদনহীন হয়ে গেছি! আমরা সেই মানুষটার সাথে সংযোগ সাধন করতে পারছি না যার সাথে আমরা ২৪ ঘন্টা ও ৩৬৫ দিন আছি। আর অন্যদিকে জীবনমুক্তেরা সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে সংবেদী।

বিবেকানন্দের যেটা হয়েছিল তাকে একাত্মতা (empathy) বলে। মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা সমবেদনা বা অনুকম্পা (sympathy) নয়। অনুকম্পা শব্দটি বড় অগভীর। আমাদের অনুকম্পা করার সামর্থ্য আছে। যখন কেউ তার কষ্টের কথা বলে তুমি তাদের কষ্ট অনুমোদন কর, সেটা অনুকম্পা! যদি কেউ বলে যে তার পতি অসুস্থ, তুমি বল, 'ও তাই! খুব খারাপ লাগছে। তুমি নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত। দুশ্চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' অনুকম্পার নামে আমরা তাদের দুঃখকষ্ট পাবার ব্যাপারটাকে স্বীকার করি এবং পালাক্রমে তারা বলে যে আমরা তাদের প্রতি কত যত্নশীল ও তাদের কত ভালবাসি।

আসলে তারা আমাদের ভালবাসে কারণ আমরা একমত হয়েছি যে তারা কষ্টভোগ করছে; এতে তাদের আমিত্ব সূক্ষ্মভাবে বর্দ্ধিত হয়। তাদের ভাল লাগে যে আমরা স্বীকার করছি যে তারা বিরাট দুঃখকষ্টের সাথে মোকাবিলা করছে। সমাজ এটাকে অনুকম্পা বা সমবেদনা বলে।

মাস্টার যেটা অনুভব করেন তাকে সমবেদনা বলে না, তা হল একাত্মতা (empathy)। একাত্ম হলে অপরের বেদনাকে নিজের সত্তায় অনুভব করবে। তখন একজন মানুষকে তার নিজের কষ্ট সম্পর্কে বলতে হবে না, তুমি তা সহজেই জান কারণ তোমার ভিতর অস্তিত্বের শক্তি তা অনুভব করে।

একজন মাস্টার তোমার সাথে একাত্ম কারণ তিনি অস্তিত্বের সাথে একাত্ম, তুমি তো সেই অস্তিত্বেরই অংশ; কেবল তুমিই তাদের আলাদা করে দেখ। তোমার সাথে এক হয়ে থাকার জন্য মাস্টার নিজের হৃদয়ে তোমার দুঃখকষ্ট অনুভব করেন। তাঁরা আর কোন রাস্তা জানেন না এবং তাঁদের সেই বেদনা প্রত্যক্ষ করার সামর্থ্য আছে।

সাধারণ প্রেমে সন্তানের জন্ম হয়, প্রকৃত প্রেমে তোমার নিজের প্রকৃত সত্তার জন্ম হয়। তুমি নিজেকে নতুন জন্ম দাও, এক রূপান্তর ঘটে। যেভাবে শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হয়ে যায়, মানুষ আত্মজ্ঞানী হয়। তোমার ভিতরে সুপ্ত প্রেমশক্তির জাগরণ হয়।

মাস্টার তাঁর প্রেম দিয়ে তোমার রূপান্তর ঘটায়। আমি সর্বদাই আমার শিষ্যদের বলি, 'আমি যদি সহানুভূতি দেখাই, আমি তোমাদের ঠকাচ্ছি এবং যখন বকছি তখন শিক্ষা দিচ্ছি।' যেকোনভাবেই তুমি এগিয়ে চল। কখনও আমি আমার করুণা খুব প্রেম দিয়ে প্রকাশ করি যাতে তুমি আমার আঙ্গুলের ছোঁয়ায় রূপান্তরিত হবা র জন্য নমনীয় থাক। কখনও আমি আমার করুণা প্রকাশ করি তোমাকে বকুনি দিয়ে, যাতে তুমি আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে আরও গভীরভাবে সচেতন হয়ে যাও। দুটি ঘটনাই কিন্তু ঘটে তোমার ওপর আমার পবিত্র প্রেমের কারণে।

মাস্টার অসীম প্রেমের মহাসাগর এবং কেবল দিতে জানেন। যদি তুমি তাঁর কাছে একটি বাটি নিয়ে যাও, তুমি তাঁকে সেই বাটিতে ভরে নিয়ে ফিরে আসবে। তাঁর কাছে একটি কলস নিয়ে গেলে, তাঁকে সেই কলসটিতে ভরে নিয়ে ফিরবে। তুমি কতটা তৃষ্ণার্ত তার ওপরে এটা নির্ভর করে, ব্যাস। যত বেশী তৃষ্ণার্ত হবে তত বড় পাত্র নিয়ে তুমি তাঁর কাছে যাবে।

তিনি কিন্তু সর্বদাই আছেন, তোমাদের দেখছেন যে তোমরা তাঁর কাছে নানারকম আকারের পাত্র নিয়ে আসছ এবং তোমার অনিশ্চয়তা যা তোমার মনের খেলা, তা মাস্টারের ওপরে অভিক্ষিপ্ত করতে দেখে নিজে নিজে হাসছেন।

পরিষ্কার করে বোঝ যে আমি তোমাদের কোন ভগবান বা মাস্টারকে প্রেম করতে বলছি না। যা দেখনি তা ভালবাসা তোমার পক্ষে বড়ই কঠিন। কিন্তু যা কিছু দেখতে পাচ্ছ তা ভালবাসতে পার, তাই নয় কি? তুমি পশু, গাছ, মানুষ ইত্যাদি ভালবাসতে পার। সরাসরি তাদের কোন কারণ ছাড়াই প্রেম কর - কেবল প্রেম করার আনন্দে।

তাদের সাথে এক গভীর সংযোগ অনুভব কর। একবার এটা করা শুরু করলে অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার এক বিশ্বাস উৎপন্ন হবে কারণ অস্তিত্ব সমস্ত কিছুর মধ্যেই বিদ্যমান। বিশ্বাস তোমার ওপরে চাপানো যায় না। বিশ্বাস চাপানো হলে বিশ্বাসের বস্তুর ওপরে তুমি এক গভীর প্রতিহিংসাকে আশ্রয় দেবে।

যখন বিশ্বাস ঘটে, ধীরে ধীরে তোমার প্রেম হয়ে যাবে সম্পূর্ণ অস্তিত্বের জন্য প্রেম। তবেই তোমার ভিতর শিকড় গাড়বে পরম ধর্ম - কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের ধর্ম।

কৃতজ্ঞতা ও প্রেম নিকট সম্বন্ধীয়। যখন তোমার সত্তার কেন্দ্রে তুমি কৃতজ্ঞতা উপলব্ধি কর , তখন তোমার ভিতরে কেবল প্রেম থাকবে, আর কিছুই থাকবে না। প্রকৃত প্রেম উপলব্ধি করার প্রথম পদক্ষে প হল কৃতজ্ঞ বোধ করা। তোমার সিস্টেমে যতক্ষণ অসন্তোষ যাছে, প্রকৃত প্রেম হতে পারে না। কৃতজ্ঞতা ও প্রেম হাত ধরে চলে।

অন্তর্হিত হও! সেটাই প্রেম

কেউ কেউ আমায় বলে, 'স্বামীজী, আমি সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসি। আমি তো একটা ছোট্ট পিঁপড়েরও ক্ষতি করি না ...'

এসব বলে নিজেকে বিভ্রান্ত করছ কেন? তুমি তোমার প্রতিবেশীকে পুরো হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পার? একটা কথা শোন : এটা বলা খুব সোজা 'সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাস', কারণ এটা প্রমাণ করতে তাদের নির্দিষ্ট কিছু করতে হবে না। তারা অনবরত বলতে থাকবে যে তারা পুরো বিশ্বকে প্রেম করে, এদিকে কাজ কিছুই করছে না। তা দেখাবার জন্য তাদের বিশেষ কিছু করতে হবে না। আর যাই হোক বিশ্ব এক দুরধিগম্য (intangible) প্রকাশ, এক স্বচ্ছ প্রকাশ নয়।

কিন্তু তুমি যখন বল যে তুমি প্রতিবেশীকে ভালবাস, সমস্যা শুরু হয়ে যায়! তোমাকে তার মুখ রোজ দেখতে হবে। তোমাকে নির্দিষ্ট কিছু করে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি তাকে ভালবাস। এটা তো একটা সমস্যা!

একটা পিঁপড়ের ক্ষতি না করে নিজেকে এত বিরাট ভাব কি করে? পিঁপড়ে কি তোমার অথবা তোমার সম্পত্তির কোন অনিষ্ট করতে পারে? এটি কি তোমার প্রেম চাখতে সমর্থ? এটা চোখে প্রায় দেখাই যায় না আর তুমি তার সম্বন্ধে কথা বলে যাচ্ছ। এগুলি হল সত্য থেকে পলায়ন করার অভিসন্ধি।

কেবল একটা জিনিষ বোঝার চেষ্টা কর : তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতি হল প্রেম এবং প্রেম চিরস্থায়ী। অন্য সকল ভাব আসবে আর যাবে, ব্যাস। তুমি বুঝতে শিখেছ অন্য সকল ভাবগুলি আসল এবং তারা প্রেমকে সংহার করছে। প্রেমকে কখনই ধ্বংস করতে পারা যায় না। যদি তা পারা যেত, প্রেম বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়ে যেত।

যখন তোমার প্রেম আসল, তখন বিপরীত ভাবগুলি তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। তারা সহজেই বাদ পরবে। ঘরে উজ্জ্বল আলো থাকলে অন্ধকারকে কি নিয়ে আসা যায়? না! বাতিগুলিকে মৃদু করলে অন্ধকার আসতে পারে। একইভাবে যখন প্রকৃত প্রেম হয় নি, অন্যান্য আবেগগুলি প্রবেশ করতে পারে। যখন প্রেমে উদ্ভাসিত হচ্ছ, অন্য আবেগের ঢোকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

হয়ত উপলব্ধি করেছ যে যখন ঐকান্তিক হয়ে কিছু কর, তুমি নিজেকে ভুলে যাও। যে কোন কিছুই হতে পারে - রঙ করা, ছবি আঁকা বা বই পড়া বা অন্য কিছু। তাতে গভীরভাবে প্রবেশ করলে তুমি নিজেকে ভুলে যাও। খুব মাথাব্যাথা হলে, খুব উৎসাহী হয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা কর, দেখবে মাথাব্যাথা সেরে গেছে।

যেহেতু তুমি সর্বদাই মাথা সম্পর্কে সচেতন, তোমার মাথাব্যাথা বহাল থাকে। যেই মুহূর্তে অন্য কিছুর গভীরে ঢুকে পড়, মাথাব্যাথা অদৃশ্য হয়ে যায়। কেবল যখন মাথাকে মনে রাখছ, মাথাব্যাথা আছে। যখন তুমি কোন ভাবের গভীরে প্রবেশ কর, কেবল সেই ভাবই থাকে এবং তুমি থাক না। একেই আমরা বলি সমগ্রতা।

এই 'তুমি' মিলিয়ে যাবার মুহূর্ত হয়ত কয়েক সেকেণ্ড উপলব্ধি করেছ। কিন্তু প্রগাঢ় হয়ে কাজ করলে ও সমগ্রতা নিয়ে এলে, এই 'তুমি' মিলিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা বারবার হবে ও বেশী সময় ধরে হবে। শীঘ্রই তুমি ঐকান্তিক হয়ে কাজ করার কলা আয়ত্ত করবে এবং সেই কাজ 'তুমি' অনুপস্থিত থেকে সম্পাদিত হবে।

একইভাবে যখন প্রেমে উদ্ভাসিত হচ্ছ, তুমি নিজেকে খেয়াল কর না, কেবল প্রেম উপলব্ধি কর; তুমি প্রেম হয়ে যাও। একমাত্র যখন প্রেম হও, তুমি প্রকৃত প্রেম খুঁজে পেয়েছ। যখন প্রেম হও, স্বাভাবিকভাবে তুমি সকলের দিকে ও সব কিছুর দিকে করুণা ছড়িয়ে দেবে। তুমি তোমার চারিদিকের গুরুদায়িত্ব নাও। জনসেবা করার আমিত্ব থেকে এই দায়িত্ব নাওয়া হয় না, কিন্তু উপচে পড়া প্রেমশক্তি থেকে এই দায়িত্ব নাওয়া হয়।

প্রেম ও দায়িত্ব

প্রেম ও দায়িত্ব হাতে হাত দিয়ে চলে। যখন সত্যিকারের প্রেম হয়, তুমি পুরো দায়িত্ব নেবেই নেবে। লোকে ভাবে সন্ন্যাস তাদের জন্য যারা দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ায়। বুঝে নাও : নিজের পরিবারের দায়িত্ব পেরিয়ে একজন সন্ন্যাসী আরও অনেক বড় পরিবারের দায়িত্ব নেয়, মানবজাতি সেই বড় পরিবার যা তোমার পরিবারের চেয়ে কোটিগুণ বড়। লোকেরা এটা না বুঝে কেবল সমালোচনা করে।

দায়িত্ব খুব সহজেই ঝেড়ে ফেলা যায়। যত বেশী দায়িত্ব নেবে তত বেশী প্রসারিত হবে এবং ঐশ্বরিক শক্তি স্বাভাবিকভাবে তোমাতে প্রবাহিত হবে। আমি আমার হীলারদের (healer) যত পারে তত বেশী করে চারিদিকের দুঃখকষ্ট ও বেদনার জন্য দায়িত্ব নিতে বলি ও অবিশ্রাম লোকেদের নিরাময় করতে বলি।

যখন তুমি ভাব যে আশেপাশের দুঃখকষ্টের জন্য তোমার দায়িত্ব আছে তুমি স্বতশ্চলভাবে এই দুঃখকষ্ট যে করে হোক কমানোর জন্য উঠেপড়ে লাগবে। মানুষ প্রায়ই ভাবে যে নিজের পরিবারের জন্য কাজ করাই যথেষ্ট। এটা একপ্রকার সংকোচন, প্রসারণ নয়। বিকশিত হবার জন্য তোমাকে প্রসারিত হতে হবে। তুমি দায়িত্ব নিলে অস্তিত্ব নিজে থেকেই তোমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে।

লোকেরা আমায় বলে, 'স্বামীজী, ঠিক করে নিজের পরিবারের যত্ন করলেই তো যথেষ্ট।' পরিষ্কার করে বোঝ : নিজের চারপাশে একটা কড়া সীমারেখা টানার জন্য এটা খালি একটা অজুহাত, নিজেকে সংকুচিত করার উপায়।

তুমি হয়ত বোধিধর্মের বিখ্যাত পংক্তিগুলি শুনেছ :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

এর মানে :

আমি বুদ্ধের শরণাগত
আমি ধর্মের (বুদ্ধের শিক্ষার) শরণাগত
আমি সংঘের (বুদ্ধের মিশন বা প্রতিষ্ঠানের) শরণাগত

বুদ্ধ বা কোন মাস্টারের শরণাগত হওয়া খুবই সোজা। তোমাকে সেজন্য বেশী কিছু করতে হবে না। মাস্টারেরা নিজেদের ঈশ্বরত্বের জন্য সকলকে বিমুগ্ধ করেন। মাস্টারের প্রতি আকর্ষিত হতে তোমার বেশী সময় লাগে না। অনেকে বলে, যে মুহূর্তে তারা আমায় দেখে, তাদের মধ্যে আমার ওপরে একটা বিশ্বাস জাগে। আমি বলি, এটা বড় কিছু নয়। আমার এই আকারে যে অস্তিত্ব-শক্তি প্রবাহিত হয়, তাই তোমায় টেনে নেয়, ব্যাস!

পরের বর্ণনা : আমি বুদ্ধের শিক্ষার কাছে সমর্পিত বা শরণাগত। এটা প্রথমটার চেয়ে কঠিন, কারণ যেই মুহূর্তে এটা বল, তোমাকে দেখাতে হবে যে তুমি এটা অনুসরণ করছ। উদাহরণস্বরূপ, আমি তোমায় বলি, 'আনন্দময় হও!' এটা আমার শিক্ষা, তখন তুমি কি বল? 'না না স্বামীজী, এটা প্র্যাক্টিকাল, নয়...' সাফ সাফ বোঝ : আমই কেবল বাস্তব কথাই বলি। তুমি ভাবতে থাক যে আমি জীবনমুক্ত এবং আমি তোমার তথাকথিত বাস্তবিক জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

তুমি দৈনন্দিন জীবনে যা হতে পার আমি কেবল সেটাই বলি। যখন তোমায় বলি 'আনন্দময় হও', আমি তোমার সাথে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি, ধর্মোপদেশ দিচ্ছি না। যে পরমানন্দে আমি ডুবে আছি তা তোমায় উপলব্ধি করতে আকর্ষণ করছি। আর ব্যাপারটা একেবারেই প্র্যাক্টিকাল কারণ আমি এখানে তোমাদের সামনে পরমানন্দে জীবন্ত।

তৃতীয় লাইন বলে, আমি বুদ্ধের মিশন বা প্রতিষ্ঠানে সমর্পিত বা শরণাগত। প্রধান সমস্যা এখানে শুরু হয়। এটার জন্য তো নিজেকে অনেক দায়িত্ব নিতে হবে।

এটা বোঝ যে মাস্টার তাঁর শরীরের চেয়ে তার মিশনে বেশী জীবন্ত। তাঁদের মাত্র ৩৩% শক্তি তাঁদের দেহে। বাকী ৬৬% শক্তি থাকে তাঁদের মিশন ও শিক্ষায়। তাঁরা সেই প্রকার দায়িত্ব নেন। আমি সবসময়েই বলি যে আমি শক্তি পাই আমার 'নিত্যানন্দ মুভ্‌মেন্ট' থেকে, যা খাই তা থেকে নয়।

কোন কর্ম বা অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করার জন্য মাস্টারেরা জন্ম নেন না, কারণ তাঁদের পূরণ করার জন্য কোন কর্ম নেই। তাঁরা জন্ম নেন নিছক করুণা নিয়ে, নিছক প্রেম নিয়ে, মানুষের ঈশ্বরত্বকে জাগাবার জন্য।

মাস্টারেরা তাঁর শরীরের চেয়ে তাঁর কথা ও মিশনে বেশী জীবন্ত। তাই আমি সর্বদাই লোকেদের আমার আকার মন থেকে মুছে ফেলতে বলি এবং পরিবর্তে আমার মিশনের শক্তি সম্বন্ধে অনুভূতিশীল হতে বলি।

কিন্তু তুমি কি কর? তুমি সব সময়ে আমার কনুই ধরে থাকার চেষ্টা কর। দ্যাখ, আমার কাজ করলে তোমার নিজের প্রস্ফুটন হবে, কিন্তু তা করার বদলে, আমার পিছনে নিজেকে ট্যাগ লাগিয়ে সারাক্ষণ আমার সাথে থাকতে চাও। আর আমি তা বললে তুমি কখনই সেটা বোঝ না।

বোঝ যে তুমি যখন কোন ধর্মীয় মিশনের কাজ করছ, তুমি দুটি জিনিষ করছ। এক, তোমার নিজের আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাবার জন্য ধ্যান এবং দ্বিতীয়, সমাজসেবা, যেটা সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব। দ্বিতীয়টি কেবল এক বাই-প্রোডাক্ট। মিশনের কাজ করার সময় তোমার যে রূপান্তর হয়, সেটাই তো আমার আসল উদ্দেশ্য বা মিশন!

তাই খুশী হয়ে দায়িত্ব নাও! তাতে তুমি নিঃস্বার্থ প্রেমের দিকে যে এগিয়ে যাচ্ছ তা উপলব্ধি করবে। পুরো বিশ্ব তোমার পরিবার হবে। সামনে আপাতদৃষ্টিতে বড় কাজ এলে তুমি সহজেই সেই দায়িত্ব নেবে। নিজের ভিতরের কোন প্রতিরোধ ছাড়া ঐ দায়িত্ব নাওয়াই যথেষ্ট। অস্তিত্ব বাকী ব্যবস্থা করে দেবে।

মাইসোর পাক সম্বন্ধে শুনেছ? এটি প্রসিদ্ধ ভারতীয় মিষ্টি। এটা দেখতে ভারী, কিন্তু মুখে দিলে গলে যায় আর তোমায় নতুন শক্তি

দেয়। সেইরূপ তুমি যখনই এক ভারী দায়িত্ব নেবার জন্য হ্যাঁ বললে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করার জন্য শক্তি পাবে। দায়িত্ব নেবার নির্ণয়ই তোমাকে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাবে। তোমাকে অস্তিত্বের এই প্রেমশক্তিকে তোমার ভিতরে আবিষ্কার করতে হবে।

দায়িত্ব নেবার জন্য বাছবিচার ছাড়াই পূর্ণ অস্তিত্বকে প্রেম করা চাই। বৈষম্য ছাড়া প্রেম করলে, তুমি বৈষম্য ছাড়া দায়িত্ব নিতে পার। দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন একটা চিন্তা, একটা প্ল্যান বা পরিকল্পনা ছাড়া সাড়া দিতে পার, যখন যে কোন কিছুর মুখোমুখী হতে রাজী হয়েছ, তখন তুমি তৈরি হয়েছ!

প্রশ্ন : আমি ভালবাসতে চাই কিন্তু আমি ছাড়তে পারছি না .....

পূর্ণরূপে প্রেমময় হওয়া আমিত্বের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। পূর্ণরূপে প্রেমময় হওয়া মানে নিজেকে পূর্ণতে নিমজ্জিত করে ফেলা । আমিত্বের জন্য এটা এক বড় সমস্যা। তুমি এখন টুকরা টুকরা হয়ে আছ; তুমি সমগ্রতা বা সংহতি পাও নি। খণ্ড খণ্ড হয়ে থেকে তুমি বিভিন্ন খণ্ডের সাথে খেলা কর ও পালিয়ে বেড়াও, ব্যাস। প্রেমময় হওয়া মানে সংহত হওয়া। কিন্তু তুমি ভয় পাও, কারণ তুমি সংহত হলে তুমি সামগ্রিকভাবে বর্দ্ধিত হও। তোমার খণ্ডগুলিকে মরতে হবে এবং তোমাকে পূর্ণ হতে হ বে।

খণ্ডিত থাকার এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে তুমি সুসংহত হতে ভয় পাও। তাতে তোমার আমিত্ব বাধা দেয়। প্রেমময় হবার সময় তুমি তোমার আমিত্বকে গলিয়ে ফেল। আগে তোমার আমিত্ব শক্ত ছিল, কঠিন ছিল এবং তা তোমার ভাল লাগত। তোমার আমিত্ব গলে গেলে কি হবে? তোমার মনে হবে তুমি নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলছ, দৃঢ়মুষ্টি হারিয়ে ফেলছ।

মাত্র একবার যদি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নাও, তুমি এক অদ্ভুত স্বাধীনতা অনুভব করবে, তোমার ভিতরে এক মুক্তির উপলব্ধি পাবে। ছেড়ে দেবার জন্য ও প্রেমময় হবার জন্য সাহস চাই। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কমপক্ষে তোমার গভীরে এই সম্বন্ধে সচেতন হও, বাকীটা নিজে নিজেই হবে। বন্ধ তালা খোলার জন্য সচেতনতাই চাবি।

নাম যশ পেড়িয়ে যখন প্রেম করতে শুরু কর, তখন তুমি কিছুই হারাচ্ছ না, তুমি কেবল সেটাই হারাচ্ছ যা তুমি নও; যে ভ্রম তোমার হারানো উচিত। তুমি লাভ করেছ বাস্তব অস্তিত্ব। তাই কেবল বিশ্বাস রাখ ও পূর্ণের সাথে মিলে যাবার সময় ভয় পেয়ো না।

ছেড়ে দাও, স্বস্তিতে থাক ও অন্তরের রূপান্তর ঘটা প্রত্যক্ষ কর। তবেই তুমি হৃদয়ঙ্গম করবে যে, তুমি কেমন বোকার মত তোমার আমিত্বের কথামত চলতে আর আমিত্বের মুখোশের পিছনে লুকিয়ে কত কি হারিয়েছ।

প্রকৃত প্রেম কখনই হিসাব করে না। প্রকৃত প্রেম হৃদয় থেকে হয় এবং হৃদয় হিসাব জানে না। হিসাব জানে কেবল মন । মন থেকে হৃদয়ে যাবার সময় এসেছে। মনের কথা অনেক শুনেছ ও মেনেছ। এখন হৃদয়কে শোনার সিদ্ধান্ত নাও। যখন হৃদয়ের সাথে জীবন্ত থাকছ, জীবনে কিছুতেই আফশোস হবে না কারণ সব কিছুতেই এক পূর্ণতা থাকবে।

প্রকৃত প্রেম মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তা উপলব্ধি করা যায় কেবল হৃদয় দিয়ে। তোমার সত্তার কেন্দ্রে প্রেমের উপলব্ধি করতে হয়। তোমার সত্তার কেন্দ্র তো পূর্ণরূপে নীরব থাকে; সে কোন কথা বা চিন্তা জানে না। কোন চিন্তাই তাকে ভেদ করতে পারে না।

সেইজন্য বারংবার মাস্টারেরা তোমাদের নিজেদের গভীরে প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করতে বলছেন। তোমার কেন্দ্রই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। এটাই প্রকৃত 'তুমি।' কিন্তু তুমি নিজেকে অন্য জায়গাগুলিতে খুঁজতে থাক - সম্বন্ধতায়, বিভিন্ন বস্তুতে ও আরও কত কি। তুমি লাগাতার সত্য থেকে দূরে থাকছ। এখন তা কে নিজের অন্তরে দেখার সময়।

আমরা প্রেম সম্বন্ধে অনর্গল কথা বলি, সোজা কারণ হল আমরা এখনও এটার স্বাদ পাই নি। যখন একজন মানুষ তৃষ্ণার্ত, সে সর্বদাই জলের কথা বলে, তার স্বপ্ন দেখে। তৃষ্ণা মিটে গেলে সে আর জলের কথা বলে না। আমাদের 'ছেড়ে-দেওয়া' অবস্থায় এসে প্রকৃত প্রেমকে উপলব্ধি করা উচিত। এই প্রেম তোমাকে পূর্ণের সাথে মিলিয়ে দেয়। তবেই আমরা প্রেম সম্বন্ধে কথা বলা বন্ধ করব।

প্রেম আসলে সমর্পণ। কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে এটা হয়ে যায় এক লড়াই। যখন আমি সমর্পণের কথা বলছি, আমি স্বীকার করে সমর্পণের কথা বলছি না। গভীর উপলব্ধি থেকে সমর্পণের কথা বলছি। মেনে নিয়ে বা স্বীকার করে সমর্পণ করলে তো তুমি আপোস করছ। প্রেম কখনই একটা আপোস হতে পারে না। যেই মুহূর্তে আপোস করছ, সেটা আর প্রেম থাকল না। কেবল যখন তুমি উপলব্ধি কর ও দ্রবীভূত হও, সেটাই প্রেম।

একজন মাস্টারের সান্নিধ্যে যাওয়া মানে প্রেম আবিষ্কার করার জন্য এক চিরজীবনের সুযোগ পাওয়া; মরে গিয়ে নতুন জন্মের মহাসুযোগ। মাস্টারের উপস্থিতিতে যে অ্যালকেমি প্রক্রিয়া হয় তাতে তোমার মরণ হয়ে প্রকৃত প্রেম নিয়ে আবার জন্ম হওয়া ছাড়া

উপায় নেই। তার উপস্থিতিতে তুমি গলে যাবে বা দ্রবীভূত হবে, খালি এই ইচ্ছা চাই। তোমার এটা করার সাহস হওয়া মানে তুমি প্রেম নামক উচ্চতর চেতনাতে ডুব দেবার জন্য প্রস্তুত।

প্রেম কোন পদার্থ (object) নয়, প্রেমই উদ্দেশ্য (subject)। সেটাই তো তুমি। তুমিই প্রেম হয়ে যাও, ব্যাস। তখন তুমি কারণ বিনাই প্রেম করতে শুরু করবে। তুমি প্রেম করবে বৃক্ষকে, ফুলকে, পৃথ্বীকে... কাকে নয়। তুমি সহজেই প্রেম বিকিরণ করবে এবং অস্তিত্বে মিশে যাবে।

মূল হল প্রেম

দ্যাখো, যখন তুমি প্রেমে বর্দ্ধিত হও, তুমি সবকিছুকে ও সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে শেখ। যখন এক মাস্টারকে দেখবে , বুঝবে তিনি কেমন করে চতুর্দিকে আকর্ষণ করেন। তিনি কোন কিছুকে বা কাউকে বাদ দেন না। তিনি কারও মধ্যে অসম্পূর্ণতা দেখেন না। তিনি কেবল পবিত্র প্রেম, ব্যাস। আর পবিত্র প্রেম অসম্পূর্ণতা দেখে না।

অস্তিত্ব হল পবিত্র প্রেম। সমাজ সর্বদাই পবিত্র প্রেমের বিরুদ্ধে। খুব গভীরে , সমাজ আসলে অস্তিত্ব ও ভগবানের বিরুদ্ধে। সমাজের করা সমস্ত পূজাই নিছক ভণ্ডামি। উপাসনার নাম করে সমাজ লুকিয়ে থাকে। কোন কিছু গভীরভাবে অনুসরণ না করার জন্য সেটার পূজা শুরু কর। সমাজ পূজার নামে পলায়ন করে। যখন পূজা কর , তোমাকে আর কিছু করতে হবে না ! আর লোকেরা তোমাকে বিরক্ত করবে না কারণ তুমি তো পূজা করছ। কিন্তু তোমার অন্তর্দেশে কি হয়? সেটা যেখানে ছিল, সেখানেই থাকে।

সমাজ 'ছেড়ে-দেওয়া' ব্যাপারটা কখনই সমর্থন করে না এবং মেনে নিতে পারে না যে তুমি গাছপালা ও জীবজন্তুর সাথে প্রেম কর। তারা তোমাকে বলবে পাগল। তারা কেবল সেই প্রেম অনুমোদন করবে যা প্রকৃতপক্ষে নিছক দেওয়া-নাওয়া; যে প্রেম কেবল কারণ সহকারে আসে।

কিন্তু আমি তোমাদের বলি : আশা ছেড়ে দিয়ো না। সমগ্র হৃদয় দিয়ে প্রেম করতে থাক। সবকিছুতে অস্তিত্বকে দেখ। বৃক্ষগুলিকে কোমল হৃদয় দিয়ে অনুভব কর। জীবজন্তুকে দেখ, যেন তারা তোমার নিজের। প্রতিটি মানুষ, পাথর ও গাছকে ভগবানের অংশ হিসাবে দেখ। সেটাই প্রকৃত পূজা। মন্দিরে ভগবানকে পূজা করা সোজা। সবকিছুকে ভগবানের অংশ হিসাবে দেখাই হ 'ল প্রকৃত পূজা। তোমার প্রতিবেশীকে নিয়ে শুরু কর।

লোকেরা কখনই কোন কিছুর মূলে যায় না, সেটাই সমস্যা। ভগবানের মূল হল প্রেম। ভগবানের মূল আছে তাঁকে সবকিছুতে দেখাতে। লোকেরা মূলে যেতে ভয় পায় এবং তারা ওপর ওপর প্রলেপ দিয়ে নিজেদের ভ্রমে রেখে দেয়। জীবনে কোন কিছুতেই একটা বিশেষ দাগের বাইরে গিয়ে পরীক্ষা করার সাহস তার হয় না। তাই তারা তোমাকেও পরীক্ষা করতে দেয় না। তারা তোমায় বলে যে তারা যা পেয়েছে সেটাই সত্য। তারা তোমায় বলে যে তাদের কথা মানাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

গভীরে প্রবেশ করার সাহস রাখ ও প্রেম কর। তুমি অনুভব করতে থাকবে , যা দেখছ সবকিছুতেই একই অস্তিত্ব বিরাজমান। তুমি বুঝবে যা কিছু দেখছ তা সবই ভ্রমে ভরা ঘটনা যাতে অস্তিত্বই একমাত্র সত্য। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তুমি কো ন অসুবিধা ছাড়াই সবকিছুকে একইভাবে ভালবাসতে থাকবে কারণ তুমি সবকিছুতে কেবল অস্তিত্বকেই দেখবে । চেতনায় এটাই প্রকৃত পরিবর্তন।

বছরের পর বছর ধরে তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধে বলে যেতে পার , অথচ হয়ত ঈশ্বরোপলব্ধি হয় নি। অবশ্যই তোমার আমিত্ব হবে চমৎকার ও সুদৃঢ় কারণ তুমি মনে কর যে ভগবান সম্বন্ধে কত কিছু জান! কিন্তু যদি একটু ভিতরে ঝেঁকে দেখ, সেখানে কোন দৃঢ় উপলব্ধি নেই। আর যেহেতু তোমার দৃঢ় অভিজ্ঞতা নেই, তুমি কথার জালে জড়াতে থাকবে, কারণ কথা বলা বন্ধ করলে তো কিছুই আর থাকবে না; অভিজ্ঞতাই নেই যে।

তাই সবকিছু যে রকম আছে তাতেই প্রেমের ভাবনা নিয়ে এস। বোঝ যে : তোমরা এখানে সবাই আছ বলে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি। তোমরা এখানে না থাকলে আমি কথা বলতে থাকব এই বটবৃক্ষের সাথে , এই গাছগুলির সাথে, পশুপক্ষীর সাথে। এখানে প্রতিটি পাতা কথা বলে। এটাই প্রেমের ভাষা!

বছর ধরে লোকেরা তোমায় বলে আসছে যে তুমি একটি উন্নত প্রজাতির জীব। স্পষ্টভাবে বোঝ যে এমনকি জানোয়ারেরাও কেবল জানোয়ার নয়। বিশ্বের প্রতিটি পরমাণু দিব্য, অস্তিত্বেরই অংশ। যদি এটা পরিষ্কার করে বুঝতে পার , তবে তুমি তোমার চারিদিকের সবকিছু অনুভব করতে শুরু করতে পারবে।

তোমার মনের প্রেমের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমার সত্তার প্রেমের প্রয়োজন আছে। প্রেম এক অ্যাড্‌ভেঞ্চার বা অভিযান যেখানে তুমি দ্রবীভূত হও। যেখানে তুমি নেই, প্রেম আছে। আমাদের 'না থাকা'-র সাহস নেই এবং তাই আমরা আটকে থাকি; আমরা অপ্রতিবদ্ধ বা নিঃশর্ত প্রেম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিই।

যারা দ্রবীভূত হওয়ার অ্যাডভেঞ্চারের জন্য, পূর্ণকে উপলব্ধি করার জন্য প্রস্তুত, তারা নির্ভীক। সাধারণ প্রেম বলে যাকে জান তা চার দেওয়ালের মধ্যে বেষ্টিত থেকে সংগ্রাম করার মত। প্রকৃত প্রেম বাইরের ঠাণ্ডায় রাস্তায় লড়াই করার মত। নির্ভীক মানুষ রাস্তায় লড়ে ও জেতে। যখন চার দেওয়ালের মধ্যে লড়াই করছ, তুমি উত্তম বোধ কর, কিন্তু বাস্তবতা হারিয়ে ফেলেছ। যখন রাস্তায় নেমে লড়াই করছ, তখন বাস্তবে আছ ও জীবন্ত আছ!

বাইরে সংগ্রাম করার জন্য আতঙ্কিত হবার দরকার নেই। অস্তিত্বের করুণাময়ী দৃষ্টির সামনে লড়াই হচ্ছে জেনে লড়াই করলে , তোমার ভয়ের প্রয়োজন নেই, কারণ যদি পড়েও যাও, তুমি তো অস্তিত্বেরই কোলে পড়বে! কিন্তু তোমার দাঁড়িয়ে পড়ে লড়াই করার সাহস চাইই চাই। তোমার দিক থেকে এই পদক্ষপটি নিতে হবে। অস্তিত্ব বাকীটার ভার নেবে।

সত্য জানার জন্য আরও উৎসুক হলে এটা হবে। কেবল ঔৎসুক্য পর্যাপ্ত নয়। যদি তুমি খালি উৎসুক হও , তুমি আসবে, একটু মাখামাখি করবে ও কেটে পড়বে। উৎসুকের চেয়ে বেশী হলে , তোমার ভিতরে যদি মাঝে মাঝে এক তীব্র ইচ্ছা জাগে, তুমি জানা ও উপলব্ধি করা শুরু হবে। তুমি কেবল উৎসুক হলে , ভক্তি ও উৎসর্গ থাকবে না। ভিতরে আগুন থাকলে ভক্তি ও উৎসর্গ থাকবে। উৎসর্জন তোমাকে এখানে বারবার নিয়ে আসে।

এখান থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা কর, পারবে না! হয়ত কিছুদিন দূরে থাকলে, কিন্তু ভিতরের তীব্র ইচ্ছা আবার তোমায় এখানে নিয়ে আসবে। প্রকৃত প্রেম আবিষ্কার করার জন্য , তোমার এই ঐকান্তিকতা চাই।

প্রেম তোমায় সুন্দর ও সম্পদশালী করে

বিনিময়ে কিছু না চেয়ে যত পার প্রেম কর। কোন কারণে প্রেম , প্রেম নয়; তা এক ব্যবসায়ীর কারবার। তুমি যখন বিনা কারণে প্রেম করতে পার, যা কিছু ও যে কেউ তোমার সামনে আসে তাদের প্রেম করতে পার , তুমি অসাধারণ শক্তি ও সুন্দরতা বিমুক্ত করবে। তোমাকে অতি সুন্দর দেখাবে, শারীরিকভাবে সুন্দর হও কি না হও।

ভেবো না যে নিঃশর্ত প্রেম তোমায় কিছু ফিরিয়ে দেবে না। তোমাকে নানাভাবে তা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তোমার এমন এক স্তরে বিকশিত হওয়া উচিত যেখান থেকে তুমি এইসব জিনিষ তোমার দিকে আসছে দেখবে , কিন্তু প্রেম করতেই থাকবে কেবল প্রেম করার খাতিরে। বুদ্ধি তোমাকে দেখাবে যে তুমি কি বদলে কি পাচ্ছ এবং সেই বুদ্ধি তোমাকে সেই জিনিষগুলি থেকে পরমানন্দে মুক্ত করে রাখবে।

তোমার হৃদয়ে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে এবং তুমি এক নতুন মানুষ হবে। অন্যেরা তোমার মধ্যে এক সুন্দর রূপান্তর দেখবে। তারা তোমায় নতুনভাবে শ্রদ্ধা করবে। তারা তোমাকে প্রস্ফুটিত হতে দেখবে, যা তাদের কাছে অবোধগম্য।

নিঃশর্ত প্রেম করার জন্য, তোমাকে স্বাধীন অনুভব করতে হবে। স্বাধীন বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি? জাতি, উপজাতি, বর্ণ, ধর্ম, পরিবার, আত্মীয় প্রভৃতি দ্বারা বন্ধনে না আবদ্ধ হওয়া। কারণ এগুলি দ্বারা যখন বন্ধনে পড়, তোমার প্রেম বন্ধনে পড়বে এবং বাঁধা প্রেম প্রকৃত প্রেম নয়। সীমিত থেকে কিভাবে প্রেম করবে? তা তো প্রেমের সজ্ঞার বিপরীতে!

আমি তোমার পরিবার, ধর্ম ইত্যাদি ভোলা উচিৎ বলছি না। এদের প্রসঙ্গে প্রেমকে দেখো না, ব্যাস। তোমার অন্তর্দেশকে এই সকল বন্ধন থেকে মুক্ত কর। যখন তুমি অনুভব কর যে তুমি পূর্ণ অস্তিত্বের অংশ, তুমি কোন সীমা ছাড়াই প্রেম করতে পারবে।

আমি সর্বদাই লোকেদের বলি : আমার জন্য যে প্রেম অনুভব কর তা যদি সকলের জন্য অনুভব কর, তাহলে প্রকৃত প্রেম ক্ষণিকের জন্য হলেও অনুভব করেছ। আমায় প্রেম করা খুবই সোজা! কিন্তু সেই একই প্রেম তুমি যদি সকলকেই করতে পার তাহলে প্রকৃত প্রেম ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছ; তাহলে তুমি সবকিছুতে অস্তিত্বের উপস্থিতি অনুভব করতে শুরু করেছ। তারপর ধীরে ধীরে তুমি সবকিছু ও সবাইকে অস্তিত্বের অংশ বলে আলিঙ্গন করবে।

আমাদের ভিতরে শক্তির উৎসকে উপলব্ধি করার জন্য এখন একটা সোজা এবং খুব কার্যকর ধ্যান -প্রক্রিয়া করব - তার নাম ‘মহামন্ত্র ধ্যান।’ এই ধ্যান দ্বারা হার্ট অঞ্চলে অবস্থিত ‘অনাহত চক্র’-তে শক্তির সঞ্চার হয়।

আবেগ : প্রেম
চক্র : অনাহত চক্র
অবস্থান : হার্ট বা হৃদয় অঞ্চল

সংস্কৃতে অনাহত মানে 'যাকে সৃষ্টি করা যায় না।' পবিত্র প্রেম কখনই সৃষ্টি করা যায় না। তা নিজে থেকে প্রস্ফুটিত হয়।

অপরের মনোযোগ ও ভালবাসা আকাঙ্খা করতে থাকলে এই চক্রটি বন্ধ থাকে এবং কারো কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা না করে নিঃস্বার্থ প্রেম প্রকাশ করলে এই চক্রটি প্রফুটিত হয় !

প্রেমশক্তির উৎস হবার ধ্যান-প্রক্রিয়া :
মহামন্ত্র ধ্যান - তিব্বতের বৌদ্ধদের প্রক্রিয়া।

মহামন্ত্র ধ্যান

(সময় লাগবে ৩০ মিনিট। খালি পেটে করতে হয়)

মহামন্ত্র ধ্যান একটি পুরাতন তিব্বতীয় বৌদ্ধ পদ্ধতি যা তোমাকে তোমার ভিতরের শক্তির উৎস অনুভবে সাহায্য করে । এটা তোমার ভিতরে এক সুন্দর শক্তি প্রবাহ সঞ্চার করে। এটা তোমাকে কানায় কানায় শক্তিতে পূর্ণ করে দেয় যাতে করে তুমি অপরের মনোযোগ আকর্ষণের আকাঙ্খা করা বন্ধ কর এবং উপচে পড়া শক্তি ও প্রেম অপরকে দিতে থাক। এই প্রক্রিয়া হার্ট অঞ্চলে অবস্থিত অনাহত চক্রকে জাগ্রত করে।

এটা তোমার মনকে দৃঢ় ও স্থির করে। তোমার মন তো চিন্তায় আন্দোলিত হচ্ছে। এই ধ্যানে তোমার মন এক মন-বিহীন অঞ্চলে প্রবেশ করে ও স্থির হয়। এটা যেন অসীমে যাবার জন্য একটা জাম্পিং-বোর্ড (jumping board)।

এই ধ্যানের সময় তোমার গলায় মালা পরতে পার। ধ্যানকালে যে তুমি যে শক্তি উৎপন্ন করবে , তা এই মালাতে সঞ্চিত করতে পার। এই ধ্যান খালি পেটে করতে হয়, খুব সকালে করাই শ্রেয় অথবা যে কোন ভোজনের দু ঘন্টা পরে। এটা একা বা একত্র হয়ে করা যায়। একসাথে করলে, যেখানে এটা করা হল সেই জায়গায় সার্থকরূপে শক্তির সঞ্চার হয়।

তোমাদের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করি :

মেঝেতে পা মুড়ে আরামদায়ক ভঙ্গিতে বস। তোমার মাথা, ঘাড় ও শিরদাঁড়া এক সরলরেখায় রাখ। তোমাদের মধ্যে যারা মেঝেতে বসতে পার না তারা চেয়ারে বসতে পার। নিজেকে রিল্যাক্সড্ ভাব ও চোখ বন্ধ কর। এমন কি চোখ বন্ধ করার পরেও আমরা চোখের পর্দার পিছনে নানা আকার ও ছবি দেখি। এটাকে মোকাবিলা করার জন্য ভাব যে তোমার অক্ষিগোলক দুটি পাথর হয়ে গেছে। মানসিক বল দিয়ে তাদের কঠিন করে দাও; তাহলে ছবিগুলি চলে যাবে। চোখের নাড়াচাড়ার সাথে চিন্তার আসা যাওয়ার অনেক সম্বন্ধ আছে। তাই চোখের গোলকের গতিচাঞ্চল্য বন্ধ করতে বলা হয়। তাদের বন্ধ রাখার জন্য খুব পরিশ্রান্ত হয়ো না। ধ্যানে সহজভাবে প্রবৃত্ত হও।

ঠোঁট দুটি একসাথে রেখে ভিতর থেকে 'মমমমম...' আওয়াজ বার কর। একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে গুঞ্জন করলে যে আওয়াজ শোন, সেই প্রকার আওয়াজ হবে। লক্ষ্য কর এটা 'হাম...' বা 'ওম...' নয়, এতে তোমার ঠোঁট দুটি

সর্বদাই একসাথে লেগে থেকে ‘মমমম...’ ধ্বনি হবে। এই গুঞ্জন ধ্বনি পরের শ্বাস নেবার আগে পর্যন্ত যতটা পার লম্বা সময় ধরে কর। আওয়াজ যত গভীর থেকে সম্ভব আসবে, নাভি থেকে আসবে এবং যত জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে পার কর।

প্রতিটি ‘মমমম...’ ধ্বনির পরে গভীর শ্বাস নেবার প্রচেষ্টা কোরো না; শরীর নিজেই দরকার মত শ্বাস নেবে। স্নায়বিক কোন চাপে থেকো না। নিজের সমস্ত সত্তা ও শক্তিকে এই স্পন্দন সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দাও। একদম এই গুঞ্জন হয়ে যাও। তোমার সমস্ত শরীর যেন এই গুঞ্জনের স্পন্দনে ভরে যায়। কিছু সময় পরে, দেখবে যে এই গুঞ্জন তোমার প্রচেষ্টা ছাড়াই হয়ে চলেছে এবং তুমি তার শ্রোতা হয়ে গেছো।

কুড়ি মিনিট পর, গুঞ্জন বন্ধ কর। যদি সিডি শুনছ তাহলে ‘স্টপ্’ শুনতে পাবে এবং যে অবস্থায় আছ সঙ্গে সঙ্গে থাম। একটা গুঞ্জন শেষ করার চেষ্টা কোরো না, একদম আকস্মিকভাবে থাম।

গুঞ্জন থামানোর পর, চোখ বন্ধ রাখ এবং দশ মিনিট হাসিমুখে ও আনন্দময় মেজাজে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাক। কোন চিন্তা এলে আসতে দাও। সহজভাবে মনকে দেখো, যেন তুমি টেলিভিশন দেখছ। চিন্তাকে বাধা দিও না অথবা তাদের কোনরূপে বিচার কোরো না। নীরবে ও আনন্দে থাক। এই সময়ে ২০ মিনিট ধরে গুঞ্জন করার সময় যে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে তা তোমার সত্তার প্রতি টি কোণাতে পৌঁছাবে এবং তাদের গভীরভাবে বিশোধন করবে।

দশ মিনিট পর, ধীরে, খুব ধীরে ধীরে, তোমার চোখ খোল। কমপক্ষে পরের আধ ঘন্টা খুব কম কথা বলার চেষ্টা কর।

ধন্যবাদ।



চতুর্থ অধ্যায়

দুশ্চিন্তা ছাড়া থাক



শ্চিন্তা কি?

তোমরা কেউ বলতে পার দুশ্চিন্তা কি?

(এক মহিলা উত্তর দেয়...) স্বামীজী, আমাদের ব্যবসা সম্পর্কে যখন ভাবি দুশ্চিন্তা হয় অথবা যখন ভাবি আমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে বা আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে...

তুমি যা বলছ তা দুশ্চিন্তার কারণ। আমি তো দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করি নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছি 'দুশ্চিন্তা কি'? আমি যদি দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করি, এই সেশন কখনই শেষ হবে না! তোমাদের সকলেই এক লম্বা লিস্ট নিয়ে তৈরী হয়ে যাবে -

স্বামীজী, আমার ব্যাবসা নীচের দিকে যাচ্ছে ...
বাড়ীতে আমার কোন মনের শান্তি নেই!
আমার এত সমস্যা যে আপনি ভাবতেই পারবেন না ...!
আমার কোন সন্তান নেই, সেটা আমার দুশ্চিন্তা!
আমার সন্তানই আমার দুশ্চিন্তা!

সবসময়ে আমাদের এত দুশ্চিন্তা। আর যদি কোন দুশ্চিন্তা না থাকে, আমরা দুশ্চিন্তা না থাকার জন্য দুশ্চিন্তা করি! আমাদের দুশ্চিন্তা না থাকলে, আমরা নিরাপত্তাহীন বোধ করতে শুরু করি! কিছু রিটায়ার্ড মানুষ আমার কাছে এসে বলে, 'স্বামীজী, আমরা জানি না কি করতে হবে। আমাদের সন্তানদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং তারা তাদের নিজের নিজের বাড়ীতে সংসার করছে। তারা আমাদের কাছে কিছুই চায় না; ভাববার কিছুই নেই। বাঁচার আর কোন মানেই হয় না। আমরা শান্তিতে মরতে চাই।'

তারা জানে না কি করতে হবে কারণ তাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই! তারা খুব চেষ্টা করে যে কি করে কোন বিষয়ে মনকে ব্যস্ত রাখা যায়, কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না! আর তাদের পক্ষে এটা একটা নতুন ব্যাপার, কারণ আগে তারা জীবনে সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল।

দুশ্চিন্তার সংজ্ঞা দেবার আগে, আমি তোমাদের চিনিয়ে দিতে চাই যে আমাদের সংস্কৃতি, আর্থিক অবস্থা, বয়স ইত্যাদি যাই হোক না কেন, আমরা সবাই একটি ব্যাপারে এক : আমাদের সবারই দুশ্চিন্তা আছে।

কেন দুশ্চিন্তা কর প্রশ্ন করলে তোমরা বহু কারণ দেখাবে। তুমি সর্বদাই ভাব যে দুশ্চিন্তা বাইরে থেকে আসে এবং তুমি সব সময়ে তোমার আশেপাশের মানুষদের দোষ দিতে থাক।

দুশ্চিন্তার কারণ যদি বাইরে থাকে, তাহলে কমপক্ষে একজন মানুষ থাকবে যে এই সমস্ত কারণগুলিকে জয় করে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাই কি? যার সাথেই দেখা হয় সবারই দুশ্চিন্তা আছে, তাই নয় কি? সে ধনী কি গরীব, বিবাহিত কি অবিবাহিত, সন্তান আছে কি নেই, চাকরি করে কি ব্যাবসা করে - সবারই দুশ্চিন্তা আছে।

এর কারণ, যদিও আমরা ভাবি যে দুশ্চিন্তার কারণ বাইরে, আসলে দুশ্চিন্তার কারণ আমাদেরই ভিতরে, গভীরে। সেইজন্যই সবারই সব সময় কিছু না কিছুতে দুশ্চিন্তা।

তাই আমরা সেই প্রশ্নতেই ফিরে এলাম : দুশ্চিন্তা কি?

যদি গভীরে প্রবেশ করে দ্যাখ, বুঝবে যে দুশ্চিন্তা হল কোন ঘটনায় তোমার সাড়া দেওয়া। একটা ঘটনা তোমায় দুশ্চিন্তা দেয় কিনা তা নির্ভর করে তুমি কিভাবে সাড়া দিতে পছন্দ কর।

উদাহরণস্বরূপ, তোমার বন্ধু একটা নতুন চাকরী পেয়েছে এবং তোমার কাছে এসে সেই কাজের মাইনে ও অন্যান্য সুবিধাগুলি সম্পর্কে বলছে, তাহলে তুমি কিভাবে সাড়া দেবে? অচেতনভাবে তোমার ভিতরে কিচিরমিচির শুরু হয়ে যাবে : ও, সে একটা নতুন চাকরী পেয়েছে। সে এতগুলি সুবিধা পাচ্ছে। আমার কি হবে? ওর মাইনে আর সুবিধাগুলি শুনলে আমার স্ত্রী কি বলবে? ভাল হয় ও যদি আমার স্ত্রীর সাথে না দেখা করে, নয়ত আমার সমস্যা হবে। আমিও কি আরেকটা চাকরী খুঁজব? না পেলে কি হবে? আমার কিছুই ঠিকঠাক করে হয় না...

এটা হল দুশ্চিন্তা! অবাঞ্ছিত কিন্তু অনর্গল কথার ধারা যা আমাদের ভিতরে সর্বদাই বয়ে চলেছে।.

কেন ও কিভাবে আমরা দুশ্চিন্তা করি

যখন তুমি নিজেকে বাইরের রেফারেন্স ফ্রেমে বারবার তুলনা করতে থাক এবং তা নিয়ে নিজের সাথে অনর্গল বকবক করতে থাক, সেটাই দুশ্চিন্তা। সময়কালে এটা তোমার মানসিক গঠন হয়ে যায়। তোমার মানসিক গঠনই দুশ্চিন্তা হয়ে যায়।

তুমি ভাববে :

আমি কি আমার প্রতিবেশীর মত উন্নতি করছি?
আমার বস্‌কে কিভাবে খুশী করব?
আমার ছেলেমেয়েরা কি ভাববে?

সর্বদাই আমাদের অন্যের অনুমোদন পাওয়া চাই - পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজে। এটা আমাদের দুশ্চিন্তার প্রধান অংশ। আমাদের জীবন যেন কেবল অপরের কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার এক কার্যকলাপ। যদি অন্যরা আমাদের ভাল পতি, ভাল কর্মচারী, ভাল অফিসার, ভাল প্রতিবেশী - এসব সার্টিফিকেট না দিতে থাকে, আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই যে আমাদের জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব অপরের সার্টিফিকেটগুলি দিয়ে বানাই। আমরা সবাই নিজেকে বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিয়েছি, সেটাই সমস্যা।

শৈশবে আমরা সকলেই নিজের সত্তায় দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রিত থাকি। লোকে কি ভাববে তা নিয়ে কখনও কি একটি শিশুকে দুশ্চিন্তায় দেখেছ? না! একটি শিশু সুন্দর, কারণ তার কোন দুশ্চিন্তা নেই। অন্যেরা কি বলবে সে সম্বন্ধে সে দুশ্চিন্তায় নেই।

আমরা বড় হতে থাকলে, সমাজ আমাদের অপরের ভাবনা ও মতামত দ্বারা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে শেখায়। সমাজ আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম ও কথার জন্য বাহ্যিক সাহায্য ও অপরের সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভরশীল করিয়ে ফেলে। সেইজন্য অন্যেরা আমাদের সম্বন্ধে কি বলবে তাতে আমাদের সর্বদাই দুশ্চিন্তা।

আবার, তুমি যখন কিছু ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছ, তুমি তখন ভাব যে তোমার একটা নির্দিষ্ট সূত্র আছে যাকে মনে রেখে তোমায় জীবন চালাতে হবে। তাই দুশ্চিন্তা তোমার জীবনে এক গতিপথ দেখায়। দুশ্চিন্তা ছাড়া তোমার মনে হয় যে তোমার কোন অক্ষরেখা বা অ্যাক্সিস নেই যার চারিদিকে তুমি ঘুরতে পার। তাই তুমি আসলে দুশ্চিন্তাগুলিকে প্রতিপালন কর।

তোমাদেরকে একটা ছোট গল্প বলতে দাও :

> তিনজন লোক এক পরিত্যক্ত দ্বীপে বসে আছে। তারা ভুলে গেছে কত বছর ধরে তারা সেখানে আছে।
> তাদের মধ্যে একজন একদিন হঠাৎ একটা বোতল পেল ও সেটাকে উঠিয়ে নিল। সে বোতলে আঙ্গুল ঘষল ও তা থেকে তৎক্ষণাৎ এক জিন (দৈত্য) অবতীর্ণ হল।
> তারা ভীষণ অবাক হয়ে গেল।
> জিন তাদের বলে, 'আমাকে এই বোতল থেকে মুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। তোমরা প্রত্যেকে ইচ্ছামত একটা করে বর চাইতে পার এবং আমি তা পূরণ করব।'
> তারা খুব উল্লসিত হল ও কিছুক্ষণ চিন্তা করল।
> প্রথম মানুষটি বলে, 'আমি আমার প্রেমিকাকে বিয়ে করে সুখী জীবনযাপন করতে চাই।'
> জিনি বলে, 'ঠিক তাই হবে। তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।'
> প্রথম মানুষটি দ্বীপ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে জিন এবার দ্বিতীয় লোকটির দিকে তাকাল।
> দ্বিতীয় লোকটি বলল, 'আমি এক ধনী ব্যবসায়ী হতে চাই।'
> জিনি বলে, 'ঠিক তাই হবে। তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।'
> দ্বিতীয় মানুষটিও দ্বীপ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জিন এবার তৃতীয় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কি চায়।
> তৃতীয় লোকটি বলে, 'আমি আমার দুই বন্ধুর সাথে এত বছর একসঙ্গে ছিলাম, কিন্তু এখন তাদের হারিয়ে ফেললাম। আমি তাদের এখানে চাই।'
> জিনি 'ঠিক তাই হবে' বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবশেষে তিনটি মানুষ সেই পরিত্যক্ত দ্বীপেই থেকে গেল !

আসলে তৃতীয় মানুষটি নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হবার দুশ্চিন্তার সাথে ভীষণভাবে জুড়ে ছিল ! এইজন্য আমি বলি যে আমাদের দুশ্চিন্তাগুলি আমাদের কত প্রিয়! আমরা বলি যে সেগুলি আমাদের কষ্ট দেয়, কিন্তু তাও আমরা তাদের সাথে কিভাবে জুড়ে থাকি।

লোকেরা আমার কাছে এসে বলে, 'স্বামীজী, আমার ব্যবসা খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আগের মাসে অনেক

লোকসান হয়েছিল এবং আমি জানি যে পরের মাসে আরও বেশী লোকসান হবে।'

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি। 'যদি তুমি সেটা জেনেই গেছ, তবে ব্যবসাটা এক্ষুণি বন্ধ কর না কেন? কষ্ট পাওয়া বন্ধ কর?'

কিন্তু তারা আমার কথায় ধাক্কা খেয়ে যায়। অবিশ্বাস নিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'কি বলছেন স্বামীজী? তাহলে আমি করবটা কি?'

যে মুহূর্তে আমি তোমার দুশ্চিন্তার জন্য কোন সমাধান দেই, তুমি ধাক্কা খাও, কারণ দুশ্চিন্তা করার কারণ ছাড়া তোমার আমিত্ব বহাল থাকার কারণ হারিয়ে ফেলে! তাই তুমি দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকা পছন্দ কর। দুশ্চিন্তায় থাকলে তুমি ভাব যে তুমি একজন কেউ। তুমি নিজেকে বলিষ্ঠ ভাব।

অথচ দুশ্চিন্তামুক্ত হ'লে তুমি আনন্দময় হও, আর এই আনন্দময় অবস্থায় তুমি কিন্তু কেউ নও! কোন কিছুই তোমাকে ব্যস্ত রাখবে না। কিছুই সমাধান করার নেই। তুমি নিরাপত্তাহীন বোধ কর যেন তোমার কোন অস্তিত্বই নেই। তাই আমি তোমাদের বলি, দুশ্চিন্তামুক্ত অবস্থা উপভোগ করতে গেলে তোমাকে প্রথমে এক বলিষ্ঠ -অস্তিত্ব হবার আমিত্ব ছাড়তে হবে।

মনকে খোরাক দিতে ও তাকে ব্যস্ত রাখতে দুশ্চিন্তা করার জন্য তো তুমিই নিষ্পত্তি করেছ। তার ওপরে প্রত্যেক মানুষ ভাবে যে তার অনেক অনেক দুশ্চিন্তা, কেবল সে-ই অসুখী এবং অন্য সবাই সুখী! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল সবাই এইরূপে ভাবে! কি করে এটা সম্ভব?

একটা ছোট গল্প :

> এক রাজ্যে রাজার নজরে এল যে তার রাজ্যে সবাই খুব উদ্বেগিত , কারণ প্রত্যেকে ভাবছে যে তারই সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা এবং অন্যদের অত দুশ্চিন্তা নেই। তাই রাজা 'দুশ্চিন্তা বিনিময় প্রস্তাব' ঘোষণা করল, লোকেরা তাদের দুশ্চিন্তা নিয়ে এসে অন্যের কম দুশ্চিন্তার সাথে নিজের দুশ্চিন্তা বিনিময় করবে।
> একটা বিরাট জায়গা তৈরী করা হল এবং তার কেন্দ্রে একটি বড় 'দুশ্চিন্তা-পাত্র' রাখা হল। যে চায় এসে তার দুশ্চিন্তা তার ভিতরে রাখতে পারে এবং বিনিময়ে অন্য যে কোন দুশ্চিন্তা উঠিয়ে নিতে হবে।
> ব্যাপারটা হল তাদের সবাইকে অন্য কারো দুশ্চিন্তা উঠিয়ে নিতেই হবে।
> লোকেরা এল, একে অপরের সাথে মিলল এবং নিজেদের দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে কথা বলতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে দুশ্চিন্তা বিনিময়ের প্রোগ্রামের উদ্বোধন হল।
> অনেক সময় গড়িয়ে গেল এবং কোন মানুষই তাদের দুশ্চিন্তা বড় পাত্রটিতে রাখার জন্য এগিয়ে এলো না। রাজা তার মন্ত্রীদের কি হচ্ছে জিজ্ঞাসা করল।
> এক মন্ত্রী বলল, 'রাজামশাই, নিজেদের মধ্যে লম্বা আলোচনার পর সবাই ভাবছে যে তাদের নিজের পরিচিত ছোট ছোট দুশ্চিন্তাগুলি অন্যের দুশ্চিন্তার চেয়ে অনেক ভাল!'

আমাদের তথাকথিত দুশ্চিন্তাগুলির গভীরে ঢুকলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা জিনিষগুলিকে বাড়িয়ে দেখি এবং আসলে জিনিষগুলি অতটা খারাপ নয়। বাস্তবে না গিয়ে আমরা হাওয়ায় কথা বলি। কিন্তু তাদের সত্যতা দেখলে বা বুঝতে পারলে , তুমি আগের এক দশমাংশ (১/১০) দুশ্চিন্তাও করবে না।

ভিতরে ও বাইরে কথা বলা

ঠিক আছে, এবার বিশ্লেষণ করা যাক যে দুশ্চিন্তা হলে মনের ভিতরে কি হয়?

যখন কিছু ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছ, নিজের মনকে লক্ষ্য কর।

দেখবে যে মন থেকে অনেকগুলি চিন্তার স্রোত উৎপন্ন হচ্ছে - সংযোগহীন, অসংলগ্ন কতগুলি চিন্তা এবং বেশীর ভাগই নকারাত্মক চিন্তা। নকারাত্মক ও পুনরাবৃত্তিক কথার এই অবিরাম অন্তঃপ্রবাহ তোমার মনে তড়িৎ প্রবা হের মত লাগবে।

দ্যাখো, আমরা দুই প্রকার বাচনভঙ্গি ব্যবহার করি - বহির্বাচন ও অন্তর্বাচন। বহির্বাচন মানে অপরের সাথে কথা বলা, যাকে আমরা বার্তালাপ বলি। অন্তর্বাচন হল নিজের সাথে কথা বলা। আসলে এই অন্তর্বাচন অনর্গল আমাদের মধ্যে হয়ে চলেছে। এই অন্তর্বাচনকে 'ভিতরের কিচিরমিচির' বলা যায় এবং এটাকে আমরা দুশ্চিন্তাও বলি।

দুশ্চিন্তা হল মনের ভিতর হয়ে যাওয়া এই অনর্গল, অনিয়ন্ত্রিত 'ভিতরের কিচিরমিচির।' এই কিচিরমিচির তোমার প্রভু হয়ে বসে ও তোমাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বহির্বাচনে যা কথা বল, তুমি সতর্ক হয়ে বল, কারণ তা না করলে সমাজ তোমাকে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু তোমার অন্তর্বাচনের ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। তোমার বহির্বাচন যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পার, তবে অন্তর্বাচন কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পার না?

তুমি অন্তর্বাচন নিয়ন্ত্রণ কর না কারণ তোমার আত্মসম্ভ্রম বা নিজের ওপর শ্রদ্ধা নেই। যা ইচ্ছা তাই ভিতরে বলতে থাক। খাবারের থালায় কি নোংরা ফেলা হয়? না। আমরা তা কেবল ডাস্টবিনে ফেলি। তুমি অন্যকে খাবারের থালার মত দেখ এবং নিজেকে ডাস্টবিনের মত মনে কর। এইজন্য তুমি হজম করতে পার না।

ভয়ংকর ব্যাপার হল, বহির্বাচনে বিরাম বা ব্রেক পাওয়া যায়। যখন বার্তালাপ হচ্ছে না, তখন সেটা ব্রেক-এর সময়। কিন্তু অন্তর্বাচন অবিশ্রাম চলে, কোন বিরাম নেই। তা তোমাকে পাগল করে দেয়! অনেক সময় তুমি বাইরে কথা বল কারণ তুমি অন্তর্বাচন থেকে পালাতে চাও। তাই পৃথিবীতে এত কথাবার্তা চলতে থাকে ! লোকেরা নীরব থাকতে ভয় পায় কারণ তাদের ভিতরে তো এক পাগলাগারদ। তাই তারা অন্যের সাথে মেলে, সোসালাইজ করে, কথা বলে এবং নিজেদের ব্যস্ত রাখে।

'ভিতরের কিচিরমিচির' বলতে ঠিক কি বলছি?

এই ছোট অভ্যাসটি যখন নিজের মত আছ, করে দেখ। চোখ বুজে কিছু মিনিট বসে থাক। একটা পেন ও পেপার সাথে রেখো। মনকে কোন কিছুতে কেন্দ্রিত কোরো না। কেবল মনকে লক্ষ কর। কেবল দে খ তোমার মনে কি চলছে। যেই মুহূর্তে চোখ বন্ধ কর , তুমি দেখবে যে মনে অবিশ্রাম চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে। যে যে চিন্তা আসছে , সততার সাথে সেগুলি লিখে ফেল। যা হচ্ছে তাই লিখতে থাক, যতই অসংলগ্ন চিন্তা হোক না কেন। পাঁচ মিনিট ধরে এটা কর।

এখন বসে বসে পড় কি লিখেছ। তুমি অবাক হয়ে যাবে! যা তুমি পেপারে লিখেছ তা তোমার ভিতরের কিচিরমিচির। পড়লে তুমি বুঝবে তোমার চিন্তাগুলি কত অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক ! এই মুহূর্তে তুমি এখানে, পরের মুহূর্তে তুমি আমেরিকাতে , আবার চলে গেছ তোমার অফিসে, পরের মুহূর্তে তোমাদের বাচ্চাদের কথা চিন্তা করছ !

তুমি তোমার জীবনকে এই মনটির ওপরে বিশ্বাস করে সঁপেছ। এই মনই যত দুশ্চিন্তা উৎপাদন করে। এই মনই যেন তোমায় বাঁচিয়ে রাখছে। এই পদক্ষেপটি বুঝতে পারলে , বাকীটা সোজা।

একটা ছোট গল্প :

> একদিন রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা হয়। লোকেরা ভীড় করল এবং দেখল যে একটা নতুন গাড়ী দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। তারা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক করে গাড়ী চালাতে জান না তো গাড়ি চালাচ্ছ কেন?'
> 'অবশ্যই আমি গাড়ী চালাতে জানি', লোকটি উত্তর দিল, 'আমি কেবল থামাতে জানি না।'

লোকটি গাড়ী চালাতে জানে কিন্তু থামাতে জানে না! তুমিও এক গাড়ী চালাচ্ছ, যেটাকে তুমি থামাতে জান না। এটা খুবই বিপজ্জনক। তোমার মন একটি গাড়ীর মত যেটাকে তুমি থামাতে জান না। খালি তোমার ভিতরের কিচিরমিচির বন্ধ করার চেষ্টা কর, এমন কি এক সেকেন্ডের জন্য। পারবে কি? যখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কর, চিন্তার সংখ্যা বেড়ে যায়। মনকে থামানো এখন তোমার আরেকটি নতুন দুশ্চিন্তা হয়ে গেল।

তুমি তোমার মনকে চালাচ্ছ না, মন তোমায় চালাচ্ছে।

দুশ্চিন্তাকে বোঝার জন্য, মনের স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে আমাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি চাই।

দুশ্চিন্তার রাস্তা মন থেকে শুরু হয়, তাই দুশ্চিন্তামুক্ত হবার রাস্তাও মন থেকে হয়। কিন্তু আমরা ভুল জায়গায় উত্তর খুঁজতে থাকি। উত্তর আমরা সর্বদা বাইরে খুঁজি। আমরা ভাবি, যদি আমার বেশী টাকা থাকত, আমার সব দুশ্চিন্তা শেষ হয়ে যেত! যদি আমাকে আরও ভাল দেখতে হলে ... যদি আমার এর থেকে ভাল চাকরী হ'ত ... যদি... যদি... যদি...

সমাধান বাইরের জগতে পাওয়া যাবে না। তা পাওয়া যাবে কেবল আমাদের ভিতরে।

একটা ছোট গল্প :

> বুদ্ধের দশ হাজার শিষ্য ছিল এবং তিনি তাদের রোজ সকালে সম্ভাষণ করতেন।
> একদিন তিনি একটি শক্ত করে গিঁট বাধা দড়ি নিয়ে এসে সবার কাছে রাখলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ কি এই গিঁট খুলতে পারবে?'
> সব শিষ্যেরাই এল, গিঁট নিয়ে টানাটানি করল কিন্তু গিঁট খুলল না।

এক বুদ্ধিমান শিষ্য এল, কিছুক্ষণ ধরে গিঁটটাকে ভাল করে দেখল এবং তাকে সহজেই খুলে ফেলল।

তোমাকে গিঁট দেখতে হবে, দেখে বুঝতে হবে কিভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে , তাহলে তুমি তাকে খুলতে পারবে। টানাটানি করলে কিছুই হবে না, বরং গিঁট আরও শক্ত হয়ে যাবে।

একই ব্যাপার আমাদের সমস্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সমস্যাবলী, অসুখগুলি ও আবেগগুলির সাথে এখন লড়াই করছ, সেগুলি তোমার সিস্টেমে বা তন্ত্রে একেকটা গাঁট। একবার যদি বুঝে ফেল যে কিভাবে এই গাঁটগুলির সৃষ্টি হয়েছে , তুমি ঠিক পদক্ষেপ নিয়ে তাদের খুলে ফেলবে।

দুশ্চিন্তা মণিপুরক চক্রের সাথে সম্বন্ধিত। এই চক্রটি নাভি অঞ্চলে আছে। নকারাত্মক চিন্তা সরাসরিভাবে মণিপুরক চক্রকে আক্রমণ করে।

এই ছোট্ট পরীক্ষাটি কর : যখনই ভাবো যে নকারাত্মক চিন্তা আসছে, তাদের ভাল করে দেখ ও লক্ষ্য কর যে সেগুলি কোথা থেকে আসছে। দেখবে যে তারা সর্বদাই নাভি অঞ্চল থেকে উঠছে।

যখনই তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হও, যখনই এমন অবস্থা হয় যে তুমি তা একদমই সামলাতে পারছ না , তখন প্রথমেই তোমার নাভি অঞ্চল, তোমার পাকস্থলী, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিষাদগ্রস্ততাকে তুমি শারীরিকভাবে পেটে অতিরিক্ত ওজন হিসাবে অনুভব করবে। তাই আমরা বলি, 'আমি এটা পেটে সইতে পারছি না; এটা হজম করতে পারছি না।' এই কথাটি সমস্ত ভাষাতেই আছে। এটা বিশ্বজনীন। অবিশ্রাম দুশ্চিন্তা মণিপুরক চক্রকে তালাবদ্ধ করে দেয়।

তাই দুশ্চিন্তামুক্ত হবার রাস্তা কি?

কেবল সকারাত্মক শব্দ সৃষ্টি কর

আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি যে কিভাবে দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া যায় , তোমরা বলবে, 'কোন অবস্থাতেই আমাদের দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়, স্বামীজী।'

কেবল নিজেকে বলতে থাক যে দুশ্চিন্তা করা উচিৎ নয়। কি হবে? তুমি 'দুশ্চিন্তা না করা' বলে আরও একটা দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করবে। কখনই বলবে না, 'দুশ্চিন্তা বন্ধ কর'; এটা একদমই অসম্ভব। তুমি একটাই জিনিষ করতে পার, সেটা হল : 'দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ কর!'

দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা না করা বলতে কি বলছি? দুশ্চিন্তাগুলি কেবল দেখ, লক্ষ কর এবং সেগুলিতে উত্তেজিত হয়ো না, ব্যাস। খালি যখন তুমি তোমার দুশ্চিন্তাগুলিকে নিজের কাছে বারবার নিয়ে আস , আসল দুশ্চিন্তা শিকড় গেড়ে বসে। 'দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ কর' - বলতে আমি তাই বুঝাচ্ছি। তোমার দুশ্চিন্তাগুলিকে জীবন্ত কোরো না। তাদের রক্ত এবং মাংস দিও না।

যখন তুমি বলছ, 'মনকে নিয়ন্ত্রণ কর, নকারাত্মক চিন্তা আনবে না' - এটা যেন দড়ির গিঁটকে আরও শক্ত করে দেওয়া। তোমার মন আরও উত্তেজিত ও সংকুচিত হয়ে যায়। এতে গাঁট খোলায় সাহায্য হবে না।

যখন দমন কর বা চেপে রাখো, দমন করার স্মৃতি সরাসরি দুশ্চিন্তা-কেন্দ্রে চলে যায়। এই কেন্দ্র বিষময় হলে তোমার সমস্ত কার্যকলাপে এক অচেতন হিংস্রতা থাকবে। তুমি গাছের পাতা ছিঁড়বে , তুমি জিনিষপত্র ধ্বংস করবে, নিজের শরীরের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, নিজের ও অন্যের সাথে লড়াই করবে।

এগুলি সবই দমিয়ে রাখার সূক্ষ্ম প্রকাশ। তাই লোকেরা বলে যে তাদের পেট ক্রোধে জ্বলছে অথবা তারা পেটে খুব ভারীবোধ করছে। চেপে রাখা ক্রোধ আরও বেশী নকারাত্মকতার জন্ম দেয়।

নকারাত্মকতা কি?

ধর, ব্যবসায় কোন কারণে অসফল হলে। তাহলে কিভাবে সাড়া দেবে? তুমি অসফল হলে তোমার দুঃখ হবে; সেটা ঠিক আছে। কিন্তু তুমি তাতে থামবে না। আরও অনেক প্রকার জিনিষকে তুমি প্রশ্রয় দেবে।

ও, এটা আমার খারাপ সময়!
আমি যাই করি, অসফল হই!
আমি এক অপদার্থ!

সর্বদাই আমার ভাগ্য এত খারাপ কেন? ... এভাবে চলতেই থাকবে!

এটাই নকারাত্মকতা। দুশ্চিন্তার মূল। আমাদের ৯৯% দুশ্চিন্তা কখনও সত্য নয়। সেটা কেবল নকারাত্মকতা, ব্যাস।

ধীরে ধীরে, এই নকারাত্মক কিচিরমিচির তোমার সত্তায় জমে যায় এবং যা কিছু কর সব কিছুতেই এক নকারাত্মক প্রভাব বিস্তা র করে। আর তুমি এই জমে যাওয়া জিনিষটা সম্বন্ধে এতই অচেতন যে সেটাই বিপদ। তোমাকে তোমার ভিতরে সে সম্বন্ধে সচেতন করানো একটা বিরাট কাজ কারণ এটা তোমার স্বভাব হয়ে গেছে। এটাকে তুমি নিজের থেকে আলাদা করে দেখো না। তুমি ভাব এভাবেই তো হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে এই নকারাত্মক আচরণের ভঙ্গিকে বলা হয় বিষাদগ্রস্ততা বা ডিপ্রেশন্। বিষাদে কেউ কম ভোগে, কেউ বেশী। এই কিচিরমিচিরকে যত বেশী তোমাকে গ্রাস করার অনুমতি দেবে, তত বেশী তুমি বিষাদগ্রস্ত হবে। কম বিষাদগ্রস্ত হয়ত একটু কম ভোগে আর বেশী বিষাদগ্রস্ত সর্বদাই ভোগে, ভোগে তো সবাই।

তাই বিষাদ বা নকারাত্মকতা হল নকারাত্মক চিন্তার সমষ্টি - যেখানে তুমি নিজের সাথে কথা বল। একবার এই চিন্তাগুলিকে মনে প্রবেশ করতে দিলে যখনই কোন ছোট অসফলতা আসবে প্রতিবার ঐ চিন্তাগুলি ফিরে এসে খেলতে থাকবে। এতে এই মনোভাব আরও দৃঢ় হতে থাকবে। যাই হোক, দুশ্চিন্তা করা তো কেবল এক খুবই দৃঢ়ভাবে বানিয়ে ফেলা অভ্যাস।

কিন্তু এটা একটা অভ্যাস মাত্র, তাই যে কোন অন্য অভ্যাসের মত এটাকে ফেলে দিতে পার! কিন্তু তুমি এটাকে নিছক অভ্যাস বলে ভাব না; তুমি ভাব এটা এক সুদৃঢ় বাস্তবতা। সেটাই সমস্যা। সেজন্য তুমি এটাকে ফেলে দিতে পার না।

মনে রেখ : মন এক চমৎকার লিপিবদ্ধের পদ্ধতি (রেকর্ডিং সিস্টেম)। এটা তোমার নকারাত্মক চিন্তার নকশা, তোমার জটিলতা ও তোমার দুশ্চিন্তা সঞ্চিত করে। মনকে যা শেখাবে, মন বিশ্বাসী হয়ে তা শেখে ও পুনরাবৃত্তি করে। এইভাবে তুমি নকারাত্মকতার শক্ত মনোভাব সৃষ্টি কর। তাই মনকে কি বলছ তা সম্পর্কে সাবধা ন হও। অপরের সাথে কথা বলার সময় আমরা এত যত্ন নিই, কিন্তু নিজের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কোন যত্ন নিই না।

খাবার অভ্যাস খারাপ হলে যেমন তোমার ধমনীতে কোলেস্টেরল জমা হয়, অবিশ্রাম দুশ্চিন্তা করলে দুশ্চিন্তাগুলি তোমার সত্তাতে জমে যায়। কোলেস্টেরল যেভাবে ধমনীতে অবরুদ্ধ অবস্থা বা ব্লকেজ সৃষ্টি করে, দুশ্চিন্তা তোমার শক্তি প্রবাহে শক্তি-অবরোধ (energy blockage) সৃষ্টি করে।

সময়কালে দুশ্চিন্তা তোমার স্বভাবের এক অংশ হয়ে দাঁড়ায়; এটা একরকম অচেতনভাবেই কাজ করে। যদিও তুমি তোমার দুশ্চিন্তার কারণ বার কর, তবুও মেজাজ খারাপই থাকে। কেন? কারণ তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত ক্রোধ, যা বছরের পর বছর ধরে চেপে রেখেছ, তারা সবই তোমার সত্তায় একটা অদৃশ্য স্তর হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তা এক ঢেউ যা সময় সময় ওঠে , কিন্তু বিষাদ হ'ল জল।

আমরা বিষাদ বা নকারাত্মকতাকে ছাড়িয়ে যাই কিভাবে?

কেবল সচেতন ও সজাগ হও। যখন কোন নকারাত্মক চিন্তা আসছে দেখে সচেতন হবে, তখন তুমি দৃশ্যত নকারাত্মক শব্দগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে দাও ও দেখ যে সেগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। যদি এটা করতে থাক, তুমি নকারাত্মক নক্শা জমতে দেবে না এবং সময়ের সাথে তোমার মানসিক গঠন ও প্রোগ্রামিং পরিবর্তন হবে; সেটা আর নকারাত্মক হবে না।

ভিতরের কিচিরমিচিরের গভীরে কিছু মুহূর্তের জন্য গেলে তুমি আরও সচেতন হয়ে যাবে , আরও সজীব হয়ে উঠবে। তুমি বুঝবে দুশ্চিন্তা কাল্পনিক ও অনাবশ্যক।

প্রশ্ন : স্বামীজী, চিন্তা কি মনের অংশ, অথবা তারা মনের এক অভিব্যক্তি বা প্রকাশ?

তোমার মন ও চিন্তা একই জিনিষ। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মন চিন্তা এবং চিন্তাই মন। মন চিন্তাসমূহের সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়, অবিশ্রাম চিন্তার ধারা। আর চিন্তাগুলিও তোমার নিজেকে বলা অনর্গল শব্দাবলী ছাড়া কিছুই নয়।

যখন তুমি দুশ্চিন্তা কর, সেই দুশ্চিন্তার গভীরে নিজেকে নিয়ে যাও, সেগুলিকে স্পষ্টতার সাথে গ্রহণ কর। গভীরে যেতে ভয় পেয়ো না। মনে রেখ : গ্রহণ করা মানে অক্ষমতা নয়। গ্রহণ করা এক মহান ধ্যান প্রক্রিয়া। গ্রহণ করা থেকে থেকে মহান শক্তি নির্গত হয় যা তোমায় স্পষ্টতা ও মুক্তি দেয়।

যখন তুমি তোমার দুশ্চিন্তাগুলি গ্রহণ কর, যখন তাদের গভীরে প্রবেশ কর, তখন তোমার এক বিরাট বোধশক্তি হবে যে সব

দুশ্চিন্তাগুলি তোমারই সৃষ্টি। তুমি দেখতে সমর্থ হবে যে তোমার মন কিভাবে খেলা করে এবং কিভাবে তোমায় টেনশন দেয় ।

যখন আমি তোমাদের বলি দুশ্চিন্তা অহেতুক, তোমরা তা কেবল বুদ্ধি দিয়ে বোঝ। যখন এটা তোমাদের অভিজ্ঞতা হয়ে যায় , তুমি দুশ্চিন্তা ছাড়িয়ে চলে গেছ। বিষাদ তোমায় ছুঁতে পারে না। তুমি দুঃখদুর্দশার উপরে উঠে গেছ।

একটা ছোট গল্প :

> কোলকাতায় ঈশা ভাষ্য উপনিষদের ক্লাস নেবার সময় একজন আমাকে দেখতে আসে।
> সে বলল, 'স্বামীজী, আমার একটা সমস্যা আছে। আমি রাত্রে ভাল ঘুমাতে পারি না কারণ আমাদের পাড়ার কুকুরগুলি সারারাত খুব চিৎকার করে। রোজ তাদের চিৎকার ভোর হলেই থামে। আমার ঘুম এমনিতেই পাতলা আর এই আওয়াজের সমস্যায় আমার একদম বিশ্রাম হচ্ছে না।'
> আমি তাকে বলি, 'আজ রাতে ঘরে এটা চেষ্টা কর। ঘেউ ঘেউ শুনলে, তোমার ভিতরে জেগে ওঠা নকারাত্মক ভাব ক্রোধকে মুছে ফেল। তাদের চিৎকার কোনরকম বিরোধিতা না করেই শোন। নিজেকে বল যে কুকুরগুলি ঘেউঘেউ করছে, ব্যাস। নিজেকে এতে কোনপ্রকার সাড়া দিতে অনুমতি দিও না। সমস্যা ঘেউঘেউতে নয় , সমস্যা এর সঙ্গে তোমার বিরোধিতায়।'
> লোকটি চলে গেল এবং আমি যা বলেছিলাম তা চেষ্টা করল। কয়েকদিন পরে সে ফিরে এল এবং বিবরণ দিল, 'স্বামীজী, আপনি যেভাবে বলেছিলেন আমি সেভাবে বিরোধিতা বন্ধ করা চেষ্টা করেছি। এই কুকুরগুলির কি সাহস , আমার ঘুমের বারোটা বাজাচ্ছে - না ভেবে, আমি আরাম করে ভাবছিলাম
> কুকুরগুলি ঘেউঘেউ করছে। তারা আমার ঘুম নষ্ট করছে...
> কুকুরগুলি ঘেউঘেউ করছে...
> কিছু জানোয়ার কিছু আওয়াজ করছে...
> যে সময়ে আমি এই বাক্যে এলাম, আমার মনে হয় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।
> যাই হোক এই ক'দিন ধরে আমার খুব সুন্দর ঘুম হচ্ছে।
> ধন্যবাদ স্বামীজী!'

এটা তোমার সাথেও হতে পারে। যে কোন অবস্থার সাথে মোকাবিলা করা যায়, যদি তুমি নকারাত্মকতাকে কিভাবে মুছে ফেলতে হয় জান, যদি জেনে থাক কিভাবে তোমার নকারাত্মকভাবে সাড়া দেওয়ার অভ্যাসকে বদলানো যায়।

ভিতরের কিচিরমিচিরের চেনা পরিচিত নকশাগুলিকে পুনরাবৃত্ত করার জন্য মন কিন্তু অধীর। মন সর্বদাই জিনিষগুলিকে টাইপকাস্ট করতে চায়। তা সবসময় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তুলনা করে এবং দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়।

দুশ্চিন্তা মুছে ফেল, মুহূর্তে প্রবেশ কর

মনের পরিচিত বাসস্থানের নক্শা হল দুশ্চিন্তা। মনোবিজ্ঞানে এই পরিচিত নকশাগুলিকে এন্গ্রাম (engram) বলে। এন্গ্রাম হল অতীতের খোদিত স্মৃতি, যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যের জন্য এক অবাঞ্ছিত রসদ হিসাবে আমাদের ভিতরে কাজ করে। এই সকল সঞ্চিত এন্গ্রামের জন্য আমরা বর্তমানে অযৌক্তিকভাবে সাড়া দিই।

প্রতিটি মুহূর্ত যেমন আছে সেভাবে নিতে পারি না কেন? আমাদের বর্তমানের মুহূর্তকে অতীত ও ভবিষ্যতের মুহূর্তের সাথে সংযুক্ত করার প্রয়োজনবোধ কেন করি? কেন আমরা সবকিছুতে সঙ্গতি খুঁজি? আর যখন সঙ্গতি থাকে না, তা হজম করতে কেন এত কষ্ট হয়? এগুলি হয়, কারণ আমাদের মানসিক গঠনের সাহায্যে ও সঞ্চিত এন্গ্রামগুলির সাহায্যে আমরা সর্বদাই কাঠামো গড়তে চাই; আর যখন পারি না, আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই।

আমাকে কি কখনও দুশ্চিন্তায় দেখেছ? তোমরা অনেকেই আমায় জিজ্ঞাসা করেছ আমি কি করে সবসময়ে এত আনন্দে থাকি? তার কারণ, আমি প্রতিটি ক্ষণে বাস করি, ব্যাস। আমি অতীতকে রেফারেন্স হিসাবে মনে বহন করি না। আমি মনকে ভবিষ্যৎ দ্বারাও ভারাক্রান্ত করি না। সবই হয় স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে, নক্শা বা প্যাটার্ন থেকে নয়।

তোমাদের অনেকেই গঙ্গা নদীকে হিমালয়ে বইতে দেখেছ। কত সুন্দর। তাঁকে কোথাও শান্ত দেখায়, কোথাও উত্তাল দেখায়, কখন স্বচ্ছ, কখন ঘোলা। মানুষ গঙ্গাকে কোথায় দেখছে, সেই হিসাবে তার অভিজ্ঞতা হবে। এটাই স্বতঃস্ফূর্ততা।

গঙ্গা দেখে কি দুটি মানুষ তাদের পরস্পরের উপলব্ধি তুলনা করে অভিযোগ করতে পা রে? সেটা তো বোকামি হবে। নদী খালি বয়ে চলে, ব্যাস। এর কোন প্ল্যান নেই। জীবনমুক্ত মাস্টারেরা নদীর মত। তারা প্ল্যান ছাড়াই বয়ে চলেন , কেবল স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোন

দুশ্চিন্তা ছাড়াই।

কিন্তু লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনি যা বলেন ও করেন তা এত পরস্পরবিরোধী!' লোকেরা আমায় বিচার করে, বলে আমি সঙ্গতিহীন। তোমাদের মধ্যে কতজন আমার অসঙ্গত কথা ও আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করেছ? চল, হাত তোল।

(অনেকক্ষণ পর, কয়েকজন সাহস করে ...) আমি নিশ্চিত যে তোমাদের মধ্যে বেশীরভাগই কোন না কোন সময়ে এটা ভেবেছ, খালি এই কয়জন সাহস করে হাত তুললে।

গঙ্গাকে কি সামঞ্জস্যহীন বলতে পার? বলতে পার কি গঙ্গার আরও সুবিন্যস্তভাবে প্রবাহিত হওয়া উচিত ছিল? না! গঙ্গা সেই ভাবেই বয়ে চলে, ব্যাস; তুমি তাতে রায় দিতে পার না। একইভাবে এক মাস্টারও বয়ে চলেন। তোমরা আমাকে সামঞ্জস্যহীন বলতে পার না। আমি ক্ষণ থেকে ক্ষণে বাস করি। তোমরা বাস কর সংযুক্ত ও জটিল ক্ষণগুলিতে। তোমরা ভারাক্রান্ত বোধ কর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হও।

যখন এতগুলি ক্ষণ তোমার ওপরে চাপ দিচ্ছে, তুমি তো ভারী বোধ করবেই। একইভাবে যখন মাত্র একটি ক্ষণ তোমার ওপরে আছে, তুমি কত হালকা বোধ করবে। তুমি অতীতের নক্শা দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সংযুক্ত কর বলেই দুশ্চিন্তাগুলি হয়। এমন করতে করতে তুমি বর্তমানকে হারিয়ে ফেল, বর্তমান তো তোমার পাওয়া এক উপহার। অতীত ও ভবিষ্যতের জন্য তুমি অবিশ্রাম বর্তমানকে হারাতে থাক। সবশেষে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ পড়ে থাকে, বর্তমান কখনই নয়।

দুশ্চিন্তার প্রবাহ সৃষ্টি করার এই নক্শাগুলি তোমার জন্য জীবনধারণের উপকরণ হয়ে গেছে।

একটা ছোট গল্প :

> দুই বন্ধু এক নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি দেখতে গেল।
> সিনেমা দেখার সময় একজন লক্ষ্য করল যে অন্যজন বারবার ঘড়ি দেখছে। শেষে সে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কি সিনেমাটা ভাল লাগছে না?'
> বন্ধুটি উত্তর দিল, 'ভাল লাগছে। আমি কেবল দেখছি উপভোগ করার আর কত সময় বাকী আছে।'

আমরা প্রায় সবাই এই প্রকার! আমরা দুশ্চিন্তা করতে এত অভ্যস্ত যে দুশ্চিন্তা করার কিছু না থাকলে আমাদের দুশ্চিন্তা হয় যে কতক্ষণ এই দুশ্চিন্তা-না-হওয়া অবস্থা চলবে! যখন আমরা উপভোগ করছি, আমরা দুশ্চিন্তা করি যে উপভোগ করার আর কত সময় বাকী আছে। তাহলে কিভাবে কখন আমরা উপভোগ করব? অবিশ্রাম এইভাবে ভাবলে তো তুমি নিজেকে সর্বদাই ভবিষ্যতে রাখছ। যখন এরকম কর, তুমি তো বর্তমানের মজাই হারিয়ে ফেলছ!

দুশ্চিন্তাকে আশ্রয় দিয়ে সকলেই নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ মনে করে। আসলে একজন যত বেশী দুশ্চিন্তা করে, তার নিজেকে তত বেশী ভাল লাগে কারণ সে মনে করে যে এতগুলি দুশ্চিন্তা সে সামলাচ্ছে! তাই দেখবে প্রায়ই যখন কারো সঙ্গে তোমার দুশ্চিন্তা সম্পর্কে কথা বল, সে বলে উঠবে, 'আ! এটা তো কিছুই নয়; আমার সমস্যাগুলি শোন; তাহলে বুঝবে দুশ্চিন্তা কি জিনিষ।' লোকেরা বড় বড় দুশ্চিন্তা বহন করার জন্য নিজেকে শ্রেষ্ঠতর ভাবে!

সর্বদা দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে ভাবলে কি হতে পারে? কিছুই না। তোমার দশটা দুশ্চিন্তার সাথে, এগারতম দুশ্চিন্তা হবে, যাকে বলে বিষাদগ্রস্ত হওয়া, ব্যাস।

কাজ করার সময় আমরা দুশ্চিন্তা করি। দুশ্চিন্তা থাকলে কাজ করতে পার না এবং তুমি যখন ঠিকভাবে কাজ করছ, তুমি দুশ্চিন্তা করতে পার না। যেখানে দুশ্চিন্তা আছে, সেখানে সৃজনশীলতা নেই এবং যেখানে সৃজনশীলতা আছে, সেখানে কোন দুশ্চিন্তা থাকতে পারে না। সৃজনশীলতা ভগবানের কাজ। যখন সৃজন করছ, তুমি ভগবানের নিকটে আছ। সৃজনশীলতা হৃদয় থেকে আসে। দুশ্চিন্তা আসে মন থেকে।

অতীত একটি অবাঞ্ছিত বোঝা। তাকে ফেলে দাও

অতীতের পিছনে দৌড়ে বা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে চিন্তা করে, তুমি বর্তমানকে হারিয়ে ফেলছ। আধ্যাত্মিকতায় অতীতকে ফেলে দিয়ে বর্তমানে বাস করতে হয়। এই মুহূর্তে তুমি অতীত পুঞ্জীভূত করছ। তুমি এইজন্য পাঁকে নিমজ্জিত হচ্ছ।

তুমি তোমার অতীতের বোঝা নামাতে জান না। তুমি ভাব যে তোমাকে সেটা বহন করতে হবে। সমাজ তোমাকে তা বহন করতে

শিখিয়েছে। তুমি এই বোঝা নামাবার চেষ্টা করলে নিজেকে দোষী ভাবতে শেখানো হয়েছে।

সমাজ তোমাকে বলে যে অতীতকে ফেলে দিলে তুমি অকৃতজ্ঞ হবে। তোমার অতীতকে বহন করার কোনও প্রয়োজন নেই। যারা তোমাকে এসব বলে তারা জানে না যে অস্তিত্বের জন্য, সমষ্টিগতভাবে সকলের জন্য তোমার অবিশ্রাম কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত। জীবনে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর জন্য অনুভূতি কৃতজ্ঞতা নয়।

অতীতকে ফেলে দিলে বর্তমান তোমাকে বিস্মিত করবে। সমাজ তোমাকে সর্বদাই বর্তমানকে অতীত হিসাবে উপভোগ করার শিক্ষা দেয়, কখনই বর্তমান হিসাবে উপভোগ করা শেখায় না। এটা তোমায় সবকিছুকে অতীত বানিয়ে পরে উপভোগ করতে শেখায়।

আমি লোকেদের ছুটিতে যাওয়া দেখেছি - তারা সবসময়ে তাদের ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। নৈসর্গিক স্থানে গিয়ে চারপাশ উপভোগ না করে দৃশ্যাবলি ধরে রাখার জন্য তারা কেবল ক্যামেরাগুলি নিয়ে হুড়াহুড়ি করতে থাকে।

তারপর তারা ঘরে ফিরে যাবে, ফিল্ম রোল ওয়াশ করবে, চার দেওয়ালের ভিতরে সোফায় বসবে এবং ক্যামেরায় ধরা একই দৃশ্য উপভোগ করবে। আর পরিবার ও বন্ধুদের ফটোগুলি দেখাবে এই বলার জন্য যে তারা ঐ ছবির জায়গাগুলিতে গিয়েছিল। কিন্তু তারা কখনই সেখানে থাকাকালীন সেই জায়গা উপভোগ করে নি!

তুমি বর্তমানকে অতীত বানিয়ে উপভোগ কর। তাই লোকেরা বলে, 'সেই দিনগুলি স্বর্ণময় ছিল।' যখন দিনগুলি আসলে ছিল, নিশ্চিত তুমি সেই দিনগুলিকে সোনালি মনে কর নি। সেই সময়ও তুমি বলছিলে যে আগের দিনগুলি স্বর্ণময় ছিল!

তুমি যখন বর্তমানে আছ, প্রতিটি ক্ষণ হয়ে যাবে এক উৎসব উদ্‌যাপন এবং তুমি উদ্‌যাপনের জন্য অতীতের ঘটনা খুঁজবে না।

দুশ্চিন্তার জন্য অতীতকে ব্যবচ্ছেদ করা তো সময় বরবাদ করা, কারণ তুমি প্রতিটি মুহূর্তে এক নতুন মানুষ। প্রতি ক্ষণে তুমি বিকিশিত হচ্ছ; প্রতিটি মুহূর্তে তোমাকে আধুনিক বা আপ্‌ডেট করা হচ্ছে। তুমি অস্তিত্বের অংশ আর অস্তিত্ব প্রতিটি ক্ষণে পরিবর্তন হয়। তাহলে অতীতের ঘটনাকে তুমি কিভাবে আধুনিক বা নতুন বুদ্ধি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করবে ? এটা পুরাদস্তুর অবান্তর ও অর্থহীন।

কখনই আপ্‌ডেটেড (আধুনিকীকৃত) বুদ্ধি দিয়ে অতীতকে বিশ্লেষণ কোরো না। সেটা একেবারেই বোকামি। তাতে কেবল আরও বেশী দুশ্চিন্তা ও অপরাধবোধ আসবে। প্রতিটি ক্ষণে তুমি মরে গিয়ে পরের ক্ষণে নতুন মানুষ হচ্ছ। এটাই সত্য।

তুমি কি কখনও একটা গরু বা মোষকে দুশ্চিন্তায় দেখেছ? গাছ দুশ্চিন্তা করে বলে কখনও শুনেছ? তারা কি বিব্রত না হয়ে বেঁচে নেই? তুমি কেন তাহলে দুশ্চিন্তা কর? আমি তোমাদের বলি : দুশ্চিন্তা হল মানুষের সবচেয়ে নিষ্ফলা অভ্যাস।

শব্দ দুশ্চিন্তার একক বা ইউনিট্

আমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তাগুলি হল আমাদের পরিচিত ভাষায় শব্দের সমষ্টি। আর তারা অনেক বিভ্রান্ত করে ও ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে। কিন্তু কি করা যায়? মানুষ একমাত্র শব্দাবলী দ্বারা যোগাযোগ করতে অভ্যস্ত।

আমি সর্বদা লোকেদের বলি : যখন আমি কিছু বলি, তুমি সেটা অন্য কিছু বলে বোঝ। আর সেখানেই সমস্যার সূত্রপাত। প্রত্যেকে নিজের নিজের ডিক্‌শনারী সৃষ্টি কর এবং শব্দগুলির অর্থ নিজের মত করে গ্রহণ কর।

একটা ছোট গল্প :

> একজন তার পত্নীকে বলে, 'তুমি জান কি রঙের তুলি তৈরী করতে বছরে ৫০০০ উট ব্যবহার করা হয়?'
> পত্নী উত্তর করে, 'ও ভগবান! কি আবাক কাণ্ড। দ্যাখ দেখি, মানুষ জানোয়ারদের দিয়ে কি কি করিয়ে নেয়?'

পতি এক কথা বলে, পত্নী অন্যকিছু বোঝে। আমরা প্রায় সবাই এইভাবেই বুঝি। তাই আমি বলি যে, কথা বা শব্দ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দুঃখের কথা, মানুষ কেবল শব্দ দ্বারা যোগাযোগ করতে জানে। সে শব্দজালে জড়িয়ে পড়তে থাকে।

দ্যাখো, শব্দ থেকে আরও বেশী শব্দের উৎপত্তি হবে। কিন্তু দুটি শব্দের মাঝে এক নীরবতা আছে - এই ছোট্ট বিরতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না; এই বিরতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে। এই বিরতিই তো আমরা খুঁজছি।

এই বিরতি এত মাইক্রো-কস্মিক বা ক্ষুদ্র-মহাজগৎ, যদিও আমরা প্রতিদিন এর মধ্য দিয়ে যাই, আমরা এর সম্পর্কে অদ্ভুতভাবে

বিস্মৃত বা অচেতন থাকি। আমি যখন কথা বলি তোমরা আমার কথা শোনার জন্য পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হও। কখন কখন , শব্দাবলীর মাঝে আমি লম্বা বিরাম দিই। যাতে তোমরা নীরবতাকে প্রত্যক্ষ ও আত্মীভূত করাতে পার, সেইজন্য আমি এই বিরামগুলি দিই - নীরবতাই তো আসলে তুমি খুঁজছ। কিন্তু ব্যতিক্রমহীনভাবে কি হয়? যেই মুহূর্তে আমি বিরাম দিই, তুমি চঞ্চল হয়ে পড়। তুমি তোমার জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করতে থাক, এদিক ওদিক দেখতে থাকো, কথা বল, আবার শব্দাবলী সঞ্চয় কর!

প্রকৃত নীরবতা সেটাই যা তোমাকে ভরিয়ে দেয় সচেতনতায়, অন্য কিছু নয়। কেবল মুখ বন্ধ রাখলে তা হয় না।

এখন তোমার মন জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। 'কি করে এই ভিতরের কিচিরমিচির ও চিন্তা বন্ধ করতে পারি? কিভাবে প্রকৃত নীরবতা উপলব্ধি করতে পারি?' এই চিন্তা তোমাকে তাড়া করতে থাকবে এবং এটাও একটা দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়াবে।

বোঝার চেষ্টা কর : তুমি চিন্তা বন্ধ করতে পার না। 'চিন্তা করা বন্ধ করতে হবে' চিন্তাটাও তো একটা চিন্তা! জোর করে এক সেকেণ্ড নীরবতা চেষ্টা করার নীরবতা আমরা অর্জন করতে চাই না; এটা তো এক জবরদস্তি করা মৃত নীরবতা। যে নীরবতা আমরা লাভ করতে চাই তা তো অস্তিত্বের স্পন্দমান ও আনন্দময় নীরবতা।

তাহলে কি করতে হবে? সোজাসুজি মনকে প্রত্যক্ষ কর, ব্যাস। একজন পর্যবেক্ষক হও। বিচার কোরো না; কোন চিন্তাকে প্রতিরোধ কোরো না। তাকে তোমাকে দেওয়া ভগবানের উপহার বলে নাও এবং গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে সেই চিন্তাকে প্রত্যক্ষ কর। স্বতশ্চলভাবে নীরবতা হবে।

তোমার সচেতনতা ধীরে ধীরে বাড়বে, তোমাকে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করবে এবং তোমার নীরবতা বৃদ্ধি পাবে। আমি যখন বলছি ভিতরের নীরবতা বাড়বে, তার মানে ভিতরের কিচিরমিচির কমবে এবং তুমি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মত হবে। সেই বর্দ্ধিত নীরবতার সাথে তোমার ভিতরে আরও বেশী সচেতনতা আসবে এবং এটা এক চক্রাকার প্রক্রিয়া হয়ে যাবে।

বর্দ্ধিত সচেতনাতার সাথে তুমি তোমার চতুষ্পার্শ্বের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে। এমন নয় যে এই সৌন্দর্য হঠাৎ করে এল , তা তো সর্বদাই ছিল। কিন্তু তুমি তাতে সচেতন ছিলে না। তুমি নিজেকে নিয়েই খুব ব্যস্ত ছিলে। এখন তোমার সচেতনতার সাথে তুমি তাকে উদ্‌যাপন করতে পারবে! অকস্মাৎ, প্রকৃতি নিজেকে তোমার কাছে অতিসুন্দর হয়ে ধরা দিতে শুরু করবে। তোমার অন্তরাত্মা রূপান্তরিত হবে এবং তার সাথে সাথে বহির্জগতও রূপান্তরিত হবে!

যখন তুমি সচেতন হতে শেখ, তুমি তোমার মনকে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করতে পারবে। মন এক মুখ্য হাতিয়ার হয়ে যাবে । যখন চাও তখন এটাকে ব্যবহার করতে পারবে। ভয়ংকর শত্রু থেকে, তোমার মন হয়ে যায় এক বিশ্বাসযোগ্য মিত্র।

প্রতি সেকেণ্ডে চিন্তার সংখ্যা কমাও

তোমার অন্তর্বাচন বা ভিতরের কিচিরমিচির যখন কমে যায়, যখন তোমার প্রতি সেকেণ্ডে চিন্তা বা টিপিএস্ (TPS - Thoughts per second) এক সেকেণ্ডের কম সময়ের জন্যও কমে, সেই টুকরো সেকেণ্ডে তুমি পুরোপুরি বর্তমানে আছ এবং সেই টুকরো সেকেণ্ডে তুমি তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎকে একটা খোলা বইয়ের মত পড়তে পার ! ভিতরের কিচিরমিচির খুব বেশী হওয়া অর্থ তোমার টিপিএস্ বেশী এবং তুমি সর্বদা অতীতে অথবা ভবিষ্যতে আছ; বর্তমানে কখনই নয়।

তোমাকে এবার ব্যাখ্যা করে বলি অতীত ও ভবিষ্যতে প্রবেশ করা মানে কি বলতে চাইছি। তোমরা হয়ত কখনও অভিজ্ঞতা লাভ করেছ যখন তোমরা কোন পার্টি, লেক্‌চার বা অন্য কোথাও আছ, হঠাৎ কেমন মনে হয় যে পুরো ঘটনাস্থল ও দৃশ্য যেন আগে ঘটেছে। গলার আওয়াজ, কথাবার্তা, জায়গা, এমনকি সেখানকার কিছু শিল্পকর্মও তোমার আগে দেখা ঘটনা বলে প্রতিপন্ন হবে। তুমি হতবাক হও।

অথবা তুমি হঠাৎ একজনের কথা চিন্তা করছ, এক বন্ধু যার সাথে বহুদিন যোগাযোগ হয় নি এবং সেই মানুষটির ফোন এল। পরের কয়েকটা মুহূর্তে কি হবে তার ভবিষ্যৎবাণী তুমি করতে পারছ। তোমার সাথে এরকম ঘটলে তুমি অবাক হয়ে যাও। পরিষ্কার করে বোঝ : এই কয়েকটা মুহূর্তে তুমি দুর্ঘটনাক্রমে পুরোপুরি বর্তমানে ছিলে। দুর্ঘটনাক্রমে , যে করেই হোক তুমি বর্তমানে এসে গিয়েছিলে।

তুমি বর্তমানে কখনই সচেতন অবস্থায় থাক না। তুমি তো সর্বদাই অতীত বা ভবিষ্যতে থাক । তুমি অতীত থেকে ভবিষ্যতে যাও বর্তমানকে না ছুঁয়ে। এটাই সত্য। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে মুহূর্তের জন্য তোমার টিপিএস্ বা প্রতি সেকেণ্ডে চিন্তা কমে যায় এবং তুমি বর্তমানে ধপাস করে পর।

যখন তুমি বর্তমানে পূর্ণরূপে এক সেকেণ্ডের জন্যও আছ, তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ তোমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেইজন্য

এইপ্রকার অন্তর্জ্ঞান-মূলক ঘটনা তোমার ভিতরে ঘটতে থাকে।

আমাদের চিন্তাধারা কখনই পরিষ্কার নয়। এটা সর্বদাই কেবলমাত্র অনুষঙ্গ; এটা কখনই নির্ভেজাল চিন্তা নয়।

এবার বলি অনুষঙ্গ বলতে কি বোঝাচ্ছি। সকালে ঘুম থেকে উঠলে এবং বাগানে একটা গোলাপ ফুটেছে দেখলে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার মন চলে গেল যে কেউ তোমাকে একটা গোলাপ অনেকদিন আগে দিয়েছিল। তখন তোমার চিন্তা সেইসময় গোলাপ দেখে যা হয়েছিল সেদিকে অথবা যে মানুষটি গোলাপ দিয়েছিল তার দিকে চলে গেল। তারপর ভাবতে থাকেলে সেই মানুষটির সাথে কি কি হয়েছিল। শেষে কি হয়? যে গোলাপটা তোমার সামনে আছে তুমি তাকে হারিয়ে ফেললে!

এইভাবে তুমি অতীতের পিছনে ছোট ও বর্তমানকে হারাও। এটাকে আমি বলি 'অনুষঙ্গ' (association)। তোমার অধুনা মানসিক গঠনের স্বভাব এইরূপ। যতক্ষণ তোমার মানসিক গঠনের স্বভাব কেবল সংসর্গ, নিজের ভিতরে শব্দের পর শব্দ বা কথার পর কথা সৃষ্টি করে তুমি অতীত ও ভবিষ্যতের পিছনে দৌড়াতে থাকবে।

জীবনমুক্ত মাস্টারেরা সর্বদাই বর্তমানে বাস করেন। তাই তাঁরা অতীত ও ভবিষ্যতের অগাধ সমুদ্রে প্রবেশ করতে পারেন। তোমার ক্ষেত্রে এটা দুর্ঘটনা। টুকরো সেকেণ্ডে তোমার এরকম হয়। এমন কি যখন এরকম ঘটে তুমি ভয় পাও ! তুমি অচেতনভাবে বাস করতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছ যে তুমি যখন সচেতনতায় হঠাৎ করে এসে পড় , তোমার পক্ষে সেটা খুব বেশী হয়ে যায়। বাস্তবতা খুব বেশী হয়ে যায়।

বর্তমান থেকে তুমি কত দূরে আছ, তাতে তোমার টিপিএস্ প্রধান ভূমিকা নেয়। যখন টিপিএস বেশী, তুমি অচেতনভাবে বাস কর; তুমি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে সরে আছ। আর যখন টিপিএস নীচে, তুমি ধ্যানের অনেক কাছে হও। টিপিএস কমানোর পথ ধ্যান ও সচেতনতা।

লোকেরা আমায় বলে, 'স্বামীজী, আমরা যখন ছুটিতে বেড়াতে যাই, তখন সেটা যেন নরক হয়ে যায়।' আমি বলি, 'নরক তোমারই ভিতরে; তুমি তাকে তোমার সাথে সর্বত্র নিয়ে বেড়াও। তাকে নিশ্চিত তুমি যেখানেই যাও পাবে! যখন বেঁচে থাক, তুমি অপরকে নরক দেখাও। যখন মর, নরকে যাও! যেখানেই যাও, তুমি তোমার নরককে সাথে করে বয়ে নিয়ে যেতে চাও। তুমি নরকের সাথে এত পরিচিত যে তোমাকে স্বর্গ দেখালেও নিজেকে সেখানে মানাতে পারবে না!'

একটা ছোট গল্প :

> তিনজন মৎসজীবী মহিলা মাছ বিক্রি করে ঘরে ফিরছিল এবং সেদিন ঘরে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তারা ঠিক করল যে রাতটা রাস্তায় কোন বাড়িতে কাটাবে। তারা এক মহিলার ঘরে গেল, সেই মহিলাটি জুঁইফুল বিক্রি করত। মৎসজীবী মহিলারা জুঁইফুল বিক্রেতাকে রাতে থাকতে দিতে অনুরোধ করল ও সে রাজী হয়ে তাদের শোবার জন্য একটা ঘর দেখিয়ে দিল।
>
> মহিলাটির পুরো বাড়ী জুঁইফুলের সুন্দর গন্ধে ভরে ছিল। কিন্তু তিনজন যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা ফুলের গন্ধে একদম ঘুমাতে পারছিল না। তারা এপাশ ওপাশ করছিল এবং বুঝতে পারছিল না কি করা যায়।
>
> তখন হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন উঠল ও মাছের খালি ঝুড়িগুলি নিয়ে এসে সবার মাথা ঢেকে দিল। কোন সময় নষ্ট না করেই তিনজন ঘুমিয়ে পড়ল!

আমরা আমাদের দুশ্চিন্তাগুলি সর্বত্র বহন করে নিয়ে যেতে ও তাদের প্রতিপালন করতে ভালবাসি! আবার আমরা অভিযোগও করি যে আমাদের সদাই কত দুশ্চিন্তা! আমরা কিছু থেকে ছাড়া পেতে চাই কিন্তু আমরা ছাড়া পাওয়ার জন্য রূপান্তরিত হতে চাই না। সেটাকেই আমি স্ব-বিরোধী হওয়া বলি। যদি আমরা দুশ্চিন্তা না করতে চাই, তাহলে আমাদের দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। একদিকে আমরা দুশ্চিন্তা করতে চাই না, অপরদিকে আমরা সর্বদাই দুশ্চিন্তা করতে চাই।

প্রতিক্রিয়া করা বন্ধ কর

কিভাবে এর থেকে আমরা মুক্তি পাব? আমাদের কি প্রকার মনোভাব হওয়া উচিত?

দুটো প্রশ্নেরই একই উত্তর : যাই কর, একটা আনন্দ ভাবনার সাথে কর, ব্যাস। তোমার অন্তর্দেশ তোমার জীবনের বৈশিষ্ট্য বা কোয়ালিটি ঠিক করে। এই স্থানটি সর্বদাই পবিত্র ও আনন্দময় হওয়া চাই।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে একজন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষানিরীক্ষার ওপরে তার চেতনা অনেক প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে নিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একইভাবে কিছু পরীক্ষা করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন ভিন্ন ফল পেয়েছে। তারা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করেছে

যে মানুষের ভাবনা তার কাজ ও কাজের ফল নিয়ন্ত্রিত করে।

আনন্দ সমৃদ্ধি আকর্ষণ করে। এটা পরম সত্য। যখন তুমি আনন্দময় , স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্তিত্ব তোমার ওপরে বর্ষণ করে। ধন-সম্পদ তোমার দিকে আসে। তুমি সর্বদা কৃতজ্ঞতা সহকারে থাক। বাকী সব স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় ।

একদম ঠিক কর যে কোনকিছুতেই দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। যদি কোন দুশ্চিন্তা বা দোষ বা দুঃখের ঘটনা মনে আসে, তখন তার দিকে কেবল তাকাও, স্মিত হেসে বল, 'না, তোমার দ্বারা প্রভাবিত হব না। তুমি করবেটা কি?' দেখবে সেই ঘটনা বা দোষ তোমার ওপরে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। সেটাকে তোমার ওপরে আক্রমণ করতে দিয়ে তুমি কি কিছু লাভ করবে ? না। তার দিকে তাকিয়ে এবং তাকে আক্রমণ করতে দেবে না বলে ব্যক্ত করে, তুমি দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। আমি সমস্যা থেকে পালিয়ে যেতে বলছি না। আমি তোমাকে সমস্যার দিকে তাকাতে এবং চেতনা সহকারে প্রতিক্রিয়া না করার সিদ্ধান্ত নিতে বলছি।

তুমি যদি ভাবনাকে চাপতে যাও, সেটা তোমার মনের কোন কোণায় ওৎ পেতে থাকবে এবং যে কোন সময়ে ফিরে আসার ভয় দেখাবে। তাই ভাবনাগুলিকে ভেসে উঠতে দাও। কেবল তার দিকে দেখ এবং বল যে সেটা শক্তিহীন; তবে দেখবে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে।

জ্ঞান - অপরাধী

যা কিছু তোমায় শরীর, মন ও আত্মায় বলপ্রদান করে, তা আধ্যাত্মিকতা এবং তা তোমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের দিকে নিয়ে যাবে। যা তোমাকে দুর্বল করে দেয়, তা আধ্যাত্মিকতা নয় এবং তা কখনও অনুসরণ করবে না। এই সোজা নিয়মটি অনুসরণ করবে। কখনই ভুলবে না যে আনন্দ তোমার আসল প্রকৃতি।

আরেকটা জিনিষ : সুন্দর যা কিছু দেখ, তাকে তোমার জ্ঞান দ্বারা কেবল নাম না দিয়ে উপলব্ধি কর। তুমি কি আশ্রমে বা অন্য কোথাও সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখেছ? তুমি কি দাঁড়িয়ে দেখেছ কিভাবে আকাশের রঙ বদলাতে থেক? আমাদের বেশির ভাগই সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে হয় জানে না অথবা বলে, 'হ্যাঁ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে; তো কি হল? সে তো রোজই অস্ত যায়!'

জ্ঞান নির্মলতা নষ্ট করে দিতে পারে এবং জীবনকে নীরস করতে পারে। তুমি যখন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখ, তা এক সুন্দর ধ্যান হতে পারে। তুমি যদি তার এক অংশ হও, দেখবে যে তুমি এই বিরাট অস্তিত্ব, যে সর্বক্ষণ উদ্‌যাপন করছে, তার এক কণা। তুমি তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্‌যাপনে যোগদান করবে।

কিন্তু তথাকথিত জ্ঞান আমাদের ভোঁতা করেছে। এই জ্ঞান তো কেবল কতিপয় শব্দের সমষ্টি। আমরা অনেক শব্দ সংগ্রহ করেছি এবং আমরা ভাবি যে এই শব্দগুলিই চূড়ান্ত। আর তাই কিছুই আমাদের বিস্মিত করে না। এমন কি ভগবানও যদি আমাদের কাছে আসেন ও ভগবান বলে নিজের পরিচয় দেন, আমরা জিজ্ঞাসা করব, 'তাতে কি?' জ্ঞানের জন্য সবকিছুই অবধারিত বলে মেনে নাওয়া হয়।

জ্ঞানের জন্য সমগ্র অস্তিত্বকে অবধারিত বলে মনে করা হয়। আমরা পার্থিব বস্তুর পিছনে দৌড়াই যা খালি আমাদের বেশী ও আরও বেশী লোভ, দুশ্চিন্তা ও ভয় দেয়। এগুলি আমাদের অন্তর্দেশের কেন্দ্র থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়; তারা আমাদের ভিতরে না দেখতে দিয়ে বাইরে দেখাতে তৈরী করে দেয়। তারা আমাদের চিরস্থায়ী আনন্দে কেন্দ্রিত না হয়ে, বিষাদ ও খুশির মধ্যে পালা করে দোদুল্যমান রাখে।

আমরা ভাবি যে সব কিছুই বাইরে হচ্ছে এবং দেরী হবার আগে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরতে হবে। তাই সব সময়েই আমাদের তাড়া থাকে ও সর্বদাই ভিতরে কিচিরমিচির করে যাচ্ছি।

জ্ঞান হল সাধারণ তথ্য বা ডাটা, ঘটনা, পরিসংখ্যান বা স্টাটিস্টিক্স; এরা তো মৃত। জ্ঞান সংগ্রহ কর, কিন্তু তারা যেন কোনভাবে তোমার জীবন নিয়ন্ত্রণ না করে। তাদের পাশে রেখে দিতে শেখ এবং জীবনকে বিস্ময়তা সহকারে দেখ। মন যা দেখে তা থেকে সর্বদাই উপসংহারে আসতে চায়, সার সংগ্রহ করতে চায়, বিচার করতে ও তথ্য সংগ্রহ করতে চায়। মন শব্দ ও আরও বেশী শব্দ সংগ্রহ করে, ব্যাস। তা কি কোন কাজের হয়?

আমি কিছু শিষ্যদের নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায় গি য়েছিলাম। কি সুন্দর। যমুনা নদীতে নৌকায় চড়লাম, কৃষ্ণের দিনগুলিতে আবার বাস করলাম। আমি আমার আনন্দ শেয়ার করছি শিষ্যদের সাথে - সব ভীষণ বুদ্ধিজীবীর দল। এদিকে আমি কৃষ্ণের দিনগুলিকে মনে করছি, তাদের দেখাচ্ছি কোথায় রাসলীলা হয়েছে, আমি তো পরমানন্দে পূর্ণ; আর এই শিষ্যরা আমায় বলে যে এখানকার টালিগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে সেগুলো নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে ! আমি আশ্চর্য হলাম। আমি তাদের বললাম যে আমি হয়ত এমন কিছু মানুষদের সাথে নিয়ে এলে ভাল করতাম যাদের জ্ঞান কম কিন্তু বিস্ময় বেশী - তাদের সাথে

আমার আনন্দ শেয়ার করতে পারতাম!

দিনের শেষে জ্ঞান তো মৃত। যে করেই হোক মানুষ জ্ঞান দ্বারা অপরের মূল্যায়ন করে। যত বেশী জ্ঞান তোমার , তত বেশী তুমি সম্মান পাও।

জ্ঞানের সাথে তো তুমি সর্বদাই তোমার মনের সাথে বাস করছ। তোমার মন দিয়ে অস্তিত্বকে কখনই জানতে পার না।

অস্তিত্ব হল যুক্তি ছাড়িয়ে

মানুষ ও অস্তিত্বের মধ্যে ঐকতান ও গভীর সংযোগই আধ্যাত্মিকতা। যখন এটা বোঝ ও তোমার সংগ্রাম বন্ধ কর, তখন তুমি কেবল এক নদীর মত বয়ে চলবে। নদী নিজের গতিপথ দিয়ে যাবে ও সাগরে গিয়ে মিশবে। তোমাকে খালি ছেড়ে দিতে হবে, ব্যাস।

আমার কথার মানে এই নয় যে তুমি এক কোণায় বসে থাকবে এবং তোমাকে নদী ধুয়ে নিয়ে চলে যাবে। আমি বলছি যে, নিজের কাজ কর এই অকুতোভয় বিশ্বাস নিয়ে যে একটি জীবনীশক্তি আছে , যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছে, যা তোমারও যত্ন নিচ্ছে, যা তোমাকে ভিতরে ও বাইরে যাবার জন্য তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস তৈরী করছে। তা হ'লেই যথেষ্ট।

সহজভাবে এক উচ্চতর কর্তৃত্বকে দায়িত্ব দিয়ে দাও এবং আরাম কর। তাহলে তুমি রাজার মত বাস করতে পারবে ! তবেই তুমি প্রবহমান নদীর গান, অস্তিত্বের সুর এবং তোমার ও অস্তিত্বের মধ্যে ঐকতানের সঙ্গীত শোনা শুরু করবে । এই ঐকতানের সাথেই তোমাকে সুর মেলাতে হবে। আর তখন তোমার দুশ্চিন্তাগুলি মুছে যাবে !

অবশ্যই কোন প্রমাণ নেই যে অস্তিত্ব আমাদের যত্ন নিচ্ছে। কিছু ব্যাপার প্রমাণ করা যায় না । প্রমাণ করতে পার কি এই দিক হচ্ছে পূর্বদিক? না! তুমি কি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ঘটনা প্রমাণ করতে পার? না! তুমি কেবল এগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পার। তুমি যেহেতু এগুলি প্রমাণ করতে পার না, তার মানে কি তুমি এগুলিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পার? বিজ্ঞান দ্বারা কি তুমি সূর্যকে প্রতিদিন উদয় হতে ও অস্ত যেতে আটকাতে পার?

বোঝ যে একমাত্র অস্তিত্বই যুক্তির বাইরে। যদি অস্তিত্বকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করা যায় তার মানে যুক্তি অস্তিত্বের চেয়ে বড় এবং এটা কখনও হতে পারে না!

একটি লোক আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আধ্যাত্মিক হবার জন্য কি আমাকে হিন্দু হতে হবে?' আমি প্রশ্নটিতে বিস্মিত হয়েছিলাম! আমি তাকে বললাম যে তার হিন্দু হবার কোন দরকার নেই। পরিষ্কার করে বোঝ : যা কিছু তোমার উপলব্ধির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেড়া লাগায়, তা আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্বন্ধিত নয়। আধ্যাত্মিকতা সর্বদাই সবকিছুকে নিয়ে (all encompassing)।

'আমি এটা' এবং 'আমি ওটা' - এই ধারণা ত্যাগ কর। তোমার জীবন উন্মুক্ত রাখ। এটাই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। এটা এরকম : যে লাগাতার একটা তালাবদ্ধ ঘরে থেকে এসেছে সে মুক্ত হাওয়া বা বাতাস সম্পর্কে কি বুঝবে? তার কিছু অপরিণত ভাবনা থাকবে। যেই মুহূর্তে তুমি নিজেকে এভাবে সীমাবদ্ধ কর, তুমি তোমার অন্তরের অসীম প্রেম ও করুণা সম্বন্ধে জানবে না। কেবল দুশ্চিন্তা ও অভিযোগ করবে। তুমি প্রস্ফুটিত হবে না।

বুদ্ধকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে করুণা-বিহীন লোকেদের কি প্রকার নরক দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'তুমি তাদের নরকে রাখতে পার না, কারণ তারা তো এখনই নরকে আছে!' একমাত্র তুমি যখন নরকে আছ, তুমি অপরের জন্য নরক সৃষ্টি করবে, কারণ তুমি কেবল সেটা দিতে পার যেটা তোমার কাছে আছে।

একটা ছোট গল্প :

> মা ও ছেলেতে বিরাট ঝগড়া।
> মা জিজ্ঞাসা করে, 'তোর কি মস্তিষ্ক আছে?'
> ছেলে হাসল।
> মা ছেলের হাসার কারণ জানতে চাইল।
> ছেলেটি উত্তর দিল, 'কেবল যখন তোমার কাছে যা নেই, তুমি অন্যের কাছে তা চাও!'

প্রকৃত শান্তি

আমরা হর্ষ বা আনন্দ কিসে পাই জানার জন্য, মনের সঙ্গে আমাদের বারংবার কাজ করা উচিত। স্বচ্ছভাবে বোঝ, সুখ আনন্দের

থেকে আলাদা। আনন্দ তোমার ভিতরে এক সুন্দর ও সুগভীর ভাবনা , যেন তুমি অস্তিত্বের অন্য এক মাত্রায় আছ। সুখ বা আমোদ বাইরের জগতের বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এবং তা আমাদের জন্য অবিশ্রাম বেদনারও সৃষ্টি করে।

সুখ হ'ল আপেক্ষিক, কিন্তু আনন্দ হ'ল স্বয়ম্ভূ। আনন্দের কোন বিপরীত নেই। যখন তুমি সুখে আছ, দুঃখ কোন একটি কোণায় অপেক্ষা করছে। যখন তুমি খুব বেশী ভোগসুখে আছ, তুমি বেদনার দোরগোড়ায় আছ। কিন্তু যখন আনন্দে আছ, তুমি একমাত্র 'আছ' এবং তার কোন বিপরীত নেই। সুখ ও দুঃখ পেন্ডুলামের দোলার মত, ফিরে আসার আগে অন্য প্রান্তের শেষে যায়।

আনন্দ পেন্ডুলাম নয়; এটা দ্বৈততার উর্দ্ধে; কখনই দোদুল্যমান নয়। এটা কেবল 'আছে।'

বারবার মনকে বিশ্লেষণ করে দেখ যে তুমি আনন্দ কোথা থেকে পাও। তারপর তাকে অনুসরণ কর। একবার যদি তোমার ভিতর থেকে বলে যে তুমি চিরস্থায়ী আনন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছ, একবার সেই দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে গেলে, তোমার জীবনের ঘটনা ও বিষয়বস্তুগুলিকে পুনরায় সাজাও ও তাদের এই আনন্দের দিকে ঘুরিয়ে দাও। তোমার প্রতিটি কাজ ও ভাবনাকে এই আনন্দের দিকে মুখ করে রাখ। যতটা শক্তি খরচ করবে, ততটা শক্তি লাভ হবে। তুমি সর্বদাই শক্তিপূর্ণ থাকবে।

দুশ্চিন্তা ছাড়া কেউ কেউ শান্তিতে থাকতে চায়। যে শান্তির কথা তারা বলে সেটা জীবন্ত শান্তি নয়, তা তো মৃত শান্তি। জীবনের প্রাচুর্যকে সামলাতে না পারার ফল হিসাবে এটা তো এক জীবনহীন ও নিষ্ক্রিয় শান্তি। জীবনকে সামলানো বড় কঠিন দেখে তারা এইপ্রকার শান্তি কামনা করে। যেন 'আঙ্গুরফল টক' বলে চলে যাওয়া হচ্ছে।

আসল শান্তি তোমার ভিতরে সর্বদাই আছে, বাইরে যাই হোক না কেন; তুমি সহজে নিজের সাথে খুশী থাক; তুমি সবকিছুকে ও সবাইকে এমনভাবে দেখ যেন তারা বাতাসের মত তোমাকে ছুঁয়ে চলে যায়। তোমার সামনের মানুষটি বা বস্তুটি যাই হোক না কেন, তোমার শান্তি তোমার সঙ্গেই থাকে। লোকজন অথবা ঘটনা তাকে কোনভাবেই পরিবর্তন করে না।

তোমার ভিতরে অনুভব করা আনন্দই হল শান্তি। যখন শান্তি আনন্দ থেকে জন্ম নেয় , তা তোমাকে ও অপরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রাখবে। একবার তুমি যদি এই শান্তিকে অন্তরে পেয়ে থাক , তুমি কখনই বলবে না 'আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও', 'আমি শান্তি চাই' ইত্যাদি। যেই মুহূর্তে এসব বল, তুমি অন্যদের কৃপায় শান্তি পেতে চাও, তা শান্তি হতেই পারে না।

শান্তি এক অবিভক্ত কেন্দ্র যা তোমার ভিতরে বৃদ্ধি পায় ও তোমাকে তোমার সাথেই খুশী রাখে। বাইরে যা কিছু ঘটে তা কেবল বাইরের আরও একটি ঘটনা। তুমি তাকে তোমার শান্তির সাথে সম্পর্কিত করবে না। ভাল করে বুঝে নাও , যে মুহূর্তে তুমি কোন ঘটনাকে তোমার শান্তির সাথে সম্পর্কিত করছ, আসল শান্তি তোমার ভিতরে হয় নি।

অভিযোগ করা - দুশ্চিন্তার এক উপজাত (বাইপ্রোডাক্ট)

আমাদের বাৎসরিক হিমালয় যাত্রায়, কোন কোন অংশগ্রহণকারীরা কষ্টকর ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি সম্বন্ধে অভিযোগ করে। বারবার আমি লোকেদের বলেছি যে হিমালয়ের সাথে থাকাই একটা আশীর্বাদ যা অনেক মানুষ পায় না এবং তাদের কেবল হিমালয়ের সান্নিধ্য উপভোগ করতে হবে এবং অন্যান্য তুচ্ছ ব্যাপারগুলি ভুলে যেতে হবে। যেভাবেই হোক , কিছু লোক অস্থির ও চঞ্চল হয় এবং এসব ব্যাপারে কথাবার্তা বলে।

একবার এমন এক ঘটনার সময়, দুইজন কমবয়সী শিষ্য আমাকে বলছিল, 'স্বামীজী, এরা এখানকার কষ্ট সম্বন্ধে বলছে এবং সেগুলিতে বিরক্ত না হবার চেষ্টা করছে; কিন্তু আমরা তো কোন কষ্টই দেখছি না! সর্বক্ষণ আমরা নিজেরা খুশীতেই আছি!' নিজের খুশীতে থাকা বলতে আমি এটাই বলতে চাইছি। 'আমার শান্তি' বা 'তোমার শান্তি' বলে কিছুই নেই। যাই আছে, আছে, ব্যাস। তুমি আছ, অন্য ঘটনা আছে এবং কিছুই সম্পর্কিত নয়। তুমি কেবল এক শান্তিপূর্ণ ও আনন্দ অবস্থায় এগিয়ে চল।

অভিযোগ করা দুশ্চিন্তা সম্পর্কিত, কারণ তুমি অস্থির হয়েছ এবং শব্দজালে আটকে পড়েছ। তুমি যদি হিমালয়ে পথভোলা ভিক্ষুকদের একটি ছোট জলের পাত্র ও দুটি কাপড় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখ , তুমি বুঝবে যে তোমার যা আছে তার থেকে তোমার আর বেশী কিছু চাই না এবং তাহলে তো অভিযোগ করার কিছুই নেই।

অভিযোগ কর কেন? যারা নালিশ বা অভিযোগ করে তাদের অনেক বেশী বেশী জিনিষ আছে; অন্য কি ব্যাপারে কথা বলা যায় তারা জানে না এবং তাই তারা অভিযোগ করে! যখন তোমার কাছে অনেক আছে ও জীবনধারণের জন্য লড়াই করতে হয় না, তোমার অভিযোগ করার সময় আছে। যখন তোমায় বাঁচার জন্য লড়াই করতে হয়, তুমি তোমার কাজে কেন্দ্রীভূত হবে ও অভিযোগ করবে না, কারণ অভিযোগ করা শুরু করলে কাজ করবে কে?

হিমালয়ে, সবচেয়ে যোগ্যই বাঁচে। তোমাকে সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। তোমার ওপরে যে কোন সময়ে পাহাড় থেকে

ধস নামতে পারে। হঠাৎ বরফ পড়বে ও চেনা জায়গাগুলিকে ঢেকে দেবে। খাদ্য ও অন্যান্য রেশন কমে যাওয়ার জন্য হঠাৎ সীমিত করা হবে।

এরকম পরিস্থিতিতে, সেখানকার লোকেদের তোমার লক্ষ্য করা উচিৎ। তারা অভিযোগ ছাড়া কত সরল, প্রীতিকর ও উষ্ণ। তাদের থেকে অনেক শেখার আছে। তারা কোন কিছুতেই বেঠিক দেখে না, তারা কেবল খুশীতে থাকে, ব্যাস। চারদিকে কি হচ্ছে তা বুঝে তারা তাদের কার্যকলাপ বারবার সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়। তারা দুশ্চিন্তা করে না এবং অভিযোগও করে না।

কেন তুমিও যা আছে তা নিয়ে চলে বেড়াচ্ছ না? ভারতে জন্মে ও বড় হয়ে অনেকে আমেরিকা যায়, তারা ফিরে এসে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করতে থাকে। বাথরুম থেকে রাস্তাঘাট, সব কিছুতেই তাদের অভিযোগ। এটা কেবল দেখায় যে তোমার সমস্ত বিদেশ-শিক্ষা তোমায় বিশালতা ও প্রস্ফুটিত করার জায়গায় আরও খুঁতখুঁতে ও অভিযোগী করে ফেলেছে।

যখন তুমি বোঝ যে অস্তিত্ব তোমার ওপরে বর্ষণ করেছে এই কারণে নয় যে তুমি তার যোগ্য , সে তো সবার ওপরে ও সব কিছুর ওপরেই সমানভাবে বর্ষণ করে; তখন তুমি অভিযোগ করা ছেড়ে দেবে। তুমি নালিশ কর কারণ তুমি ভাব যে তুমি কিছু পাবার যোগ্য, কিন্তু পাও নি।

পরিষ্কার করে বোঝ : কেউ যোগ্য বা অযোগ্য নয়; কেউ সাধু বা অসাধু নয়। সবকিছুই আছে প্রকৃতিকে উপলব্ধি ও তার সাথে সুর মিলিয়ে চলাতে, যাতে তুমি অস্তিত্ব ও তার উপহারকে পেতে পার। এটা সর্বদাই একটা গভীর উপলব্ধি যা তোমার চেতনাকে আরও জাগ্রত করে।

যদি তুমি উন্মুক্ত হও, অস্তিত্ব বর্ষণ করে। অস্তিত্ব অবিশ্রাম বর্ষণ করছে, আমরা কেবল তা কি করে নিতে হয় জানি না। আমরা শব্দ সঞ্চয় করাতেই ব্যস্ত!

নিজের সাথে থাকা শেখ

নিজের সাথে থাকা শিখলে তুমি অস্তিত্বের সাথে একাত্ম হতে পারবে। কিন্তু আমরা নিজের সাথে কখনই থাকি না। আ মরা সবসময়ে আছি লোকেদের সাথে, শোরগোলের সাথে। আমরা নিজেদের অপরের সাথে চিহ্নিত করি, নিজের সাথে নয়। নিজের সাথে থাকতে আমরা একাকী বোধ করি ও ভয় পাই।

তুমি মায়ের গর্ভে একলা ছিলে এবং সেটাই তো তোমার আসল প্রকৃতি। কিন্তু তার পরে কি হল ? তুমি ভাবলে যে তোমায় খুশী করার জন্য তোমার চারপাশে লোকজন চাই। তুমি লোকেদের সাথে হাসলে , কাঁদলে, তাদের সাথে বার্তালাপ করলে, তাদের জন্য কষ্ট পেলে এবং আরও কত কি। তুমি কেবল নিজেকে নিয়ে উদ্‌যাপন করতে জান না।

যেই মুহূর্তে তুমি নিজেকে একলা দেখ, তুমি ভিতরে হুড়াহুড়ি করতে থাক। তোমার ভিতরের কিচিরমিচির বেড়ে যায়, তোমার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় এবং তুমি ভাব কিভাবে শোরগোল সৃষ্টি করা যায় অথবা কাকে ডেকে কথা বলবে বা কার সাথে কম্পিউটারে চ্যাট করবে।

তুমি ভিতরে দেখতে ভয় পাও এবং তাই বাইরে দেখ। যখন এক ধ্যানী হও, ধীরে ধীরে বুঝতে পার যে নিজেকে খুশী রাখার জন্য কোন সম্বন্ধতা চাই না। তুমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। যখন নিজের সাথে শান্তিতে থাকতে পার না , তথাকথিত সম্বন্ধতায় আটকে গিয়ে তুমি তোমার সত্তার বাহ্যসীমাতে থাকবে।

প্রথমে তোমাকে নিজের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে হবে। সেটা যখন দৃঢ় ও অটল হয় , অন্যের সাথে সম্বন্ধতা করা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখন যেটার পরিধিতে থাকার কথা তাকে কেন্দ্র বলে দেখা হচ্ছে এবং যেটার কেন্দ্র হওয়া উচিৎ তাকে পরিধি বলে গণ্য করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিটাকে উলটো করতে হবে, এর জন্য তোমাকে তোমার দৃষ্টি ভিতরে নিতে হবে।

মনের পিছু যাও... এবং তাকে পেরিয়ে যাও

নিজের সাথে সম্পর্কস্থাপন করার জন্য, তোমাকে মনের পিছু যাবার সাহস করতে হবে। তুমি সবাইকে সময় দিতে রাজী , কিন্তু নিজেকে নয়। তুমি অপরকে সময় দাও কারণ তা তোমার আমিত্বকে ভরে দেয়। তুমি নিজেকে সময় দিতে ভয় পাও কারণ তুমি ভাব যে সত্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে এবং তুমি তাকে গ্রহণ করতে অসমর্থ হতে পার। ভুল জায়গায় আনন্দ খুঁজতে তুমি স্বস্তি পাও এবং অভিযোগ কর যে আনন্দ তোমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। যদি তুমি সত্যি সত্যি আনন্দ পেতে চাও , তুমি তা পাবে। কিন্তু তোমার সাহস চাই।

আসলে আমরা সবাই একই জিনিষ খুঁজছি... তা হল আনন্দ। কিন্তু তা আমরা অবিশ্রাম ভুল জায়গাতে খুঁজছি। যদি এক অল্পবয়সীকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে কোন জিনিষে সুখ পায়, সে হয়ত বলবে 'ড্রাগ।' সেও আনন্দ খুঁজছে, চিরস্থায়ী শান্তির জন্য, কিন্তু ভুল রাস্তায়!

আমরা আমাদের রাস্তা থেকে এতটা সরে গেছি যে আমাদের আদি চিন্তা-পদ্ধতি নকারাত্মক ভাবনার নক্শা দিয়ে পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে। আমাদের জীবন যা হওয়া উচিৎ তা থেকে ভীষণভাবে অন্যরকম। ড্রাগ খেয়ে কি আনন্দ পেতে পার? ড্রাগ খেয়ে তুমি নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ এবং তোমার স্বাস্থ্যও বিপন্ন হচ্ছে।

ড্রাগ খাওয়া খুবই বোকামি বলে হয়ত তোমার মনে হবে কারণ এটা অত্যন্ত কঠোর ব্যাপার। এটা নৈতিকতার স্কেলে আঘাত করে, তাই তোমাকেও আঘাত করে। কিন্তু খুশী খুঁজবার তোমার অন্যান্য সূক্ষ্ম কার্যকলাপও তো একই প্রকার প্রচেষ্টা , কেবল অন্য স্কেলে, অতটা অনৈতিকতার স্কেলে নয়, তাই তুমি তাদের বোকামি ভাব না। যখন সময় পাও, মন পরিষ্কার কর, তাহলে তুমি বুঝবে আমি কি বলতে চাইছি।

দুশ্চিন্তা তোমাকে অনেক মিথ্যা অনুমান করাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তোমার ছেলে একদিন দেরীতে বাড়ী এলে, তুমি ধরে নাও সে হয়ত কোন কুসঙ্গে পড়েছে। এটা তোমার ভিতরে রেকর্ডিং হয়ে যায়। পরের বার যখন সে ক্লাস করে দেরীতে ঘরে ফেরে , এই রেকর্ডিং সামনে আসবে ও তোমার ছেলেকে দোষী ঠাওরাবে।

তোমার ছেলে বিরক্ত তো হবেই এবং সে তোমার বিরোধিতা করার জন্য অন্য খারাপ রাস্তাতেও চলে যেতে পারে। তোমার বোঝা উচিত, সবাই বিকশিত হচ্ছে এবং পরিবর্তনশীল। তুমি নিজের মত কল্পনা করতে থাকলে তাতে কোন সাহায্য হবে না।

কল্পনার সাথে বাস করা সোজা। কিন্তু তোমাদের বলি, তোমরা যা বিশ্বাস কর তার ৯৮% ভুল। তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি ও অন্য মানুষটির মধ্যে একটি বড় পর্দা আছে। যদি সবুজ চশমা পড়, তাহলে পুরো দুনিয়াই সবুজ দেখবে।

মহম্মদ নবি বলেন, 'যখন তুমি বিশ্বকে কিছু একটা ভাবে দেখছ, সেই কিছুই হল তুমি।' তুমি আমার কাছে কারো সম্পর্কে নালিশ কর আর দাবী কর যে তুমি উদ্বিগ্ন, তাই এই কথাগুলি বলছ। কিন্তু আসলে তুমি তোমার নিজের মনকে দেখাচ্ছ, কারণ তুমি জিনিষগুলিকে সেভাবে দেখ যেভাবে তুমি দেখতে চাও, কখনই সেগুলি যেভাবে আছে সেভাবে দেখ না। যখন তুমি যা দেখতে চাও তা দেখ, তুমি অনেক কিছু হারিয়ে ফেল।

তোমাদের একটা সত্যি ঘটনা বলি :

> কিছু বছর আগে প্রায়ই আমি একই ড্রাইভারের সাথে আশ্রম থেকে ব্যাঙ্গালোরে সিটি সেন্টারে যেতাম। একদিন আমি এক নির্দিষ্ট রাস্তায় যেতে চাইলাম এবং ড্রাইভারকে সেই রাস্তার কাছে একটা বড় মসজিদ আছে বলে মনে করিয়ে দিলাম।
> সে বলে যে সেখানে কোন মসজিদ নেই।
> আমি তাকে মনে করাবার চেষ্টা করলাম যে সেই মসজিদের পাশে একটা বিখ্যাত হোটেল আছে, কিন্তু তাও সে মানতে রাজী হল না।
> আমি শেষে তাকে বললাম যে সেখানে একটা হনুমান মন্দির আছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ উজ্জ্বল হল ও জায়গাটা চিনতে পারল।
> সে তারপর সেই রাস্তায় গেল ও আমি তাকে মসজিদ দেখালাম যেটা মন্দিরের পাশেই এবং মন্দিরের চেয়ে পাঁচগুণ বড়।
> সে অবাক হয়ে গেল।
> সে এত গোঁড়া হিন্দু ছিল যে মসজিদের দিকে আগে তার কখনও নজর যায় নি।

মনের একই কাঠামোতে থেকো না

একটি নদীর কথা ভাব : যখন নদীতে প্রথমবার পা দাও ও তাকে বার করে নাও এবং দ্বিতীয়বার পা দাও, সেটা কি একই নদী? না! নদী পরিবর্তিত হয়েছে, একই জল সেখানে আর নেই; নতুন জল বয়ে এসেছে, তাই নয় কি?

তাই নিজেকে কোনকিছুর সাথে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা কোরো না , জীবন সর্বদাই পরিবর্তনশীল। সংকীর্ণ বিশ্বাসের জন্য তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি বাধা পায়। তুমি ঘোড়াগাড়ীর ঘোড়ার মত হয়ে যাও যে সামনে রাস্তায় কেবল এক সীমিত জায়গা দেখতে পারে। জীবনে বিস্তৃত দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন।

আমাদের পূর্বপূরুষেরা আমাদের অনেক খাদ্য দিয়েছেন, কিন্তু স্বাদ নেবার জন্য জিহ্বা দেন নি। এই বিশ্বকে আনন্দের সাথে

উপলব্ধি করা আমাদেরই হাতে। কিভাবে উপলব্ধি করছ, তাতেই আনন্দ, বহির্জগতের বস্তুগুলিতে আনন্দ নেই। এটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। তোমার মানসিক গঠনই জীবনকে আনন্দময় বা দুঃখময় করে।

যখন তোমার এক পরিষ্কার মানসিক গঠন হয়েছে, তুমি কখনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। কেবল যখন তুমি জটিল চিন্তার নক্শা ও শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হও, তুমি দুশ্চিন্তা করবে। আমি সর্বদাই লোকেদের বলি : যখন তুমি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নও, তুমি দুশ্চিন্তা করবে যে গ্রহগুলি কোথায় আছে! তুমি বিশ্লেষণ করবে যে কোন গ্রহ কোন ঘরে আছে এবং তা তোমাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে। আসল সমস্যা হল তুমি তোমাতে কেন্দ্রিত নও।

সময় থাকলে নিজের মনের ওপরে কাজ কর। গভীরে দেখ ও মনকে পরিষ্কার করে রাখ। তুমি তো এই মনের সাথে ২৪ ঘণ্টা আছ, তাই নয় কি?

আমি লোকেদের সুন্দরভাবে ঘর সাজিয়ে রাখতে দেখেছি। তারা ভ্যাকুয়াম ক্লীনার দিয়ে কার্পেট সাফ করতেই থাকে , যতক্ষণ না কার্পেটে ফুটো হয়। আর যে ঘরে তুমি ২৪ ঘণ্টা আছ, তাকে সাফ করার ব্যাপারে কি হল? - মানে তোমার মন। তুমি তো তার সাথে ২৪ ঘণ্টা ধরে আছ; তোমার প্রতিটি ভাবনা ও কাজে সে জড়িয়ে আছে।

ঘরের ভিতরকে পবিত্র ও শক্তিপূর্ণ অবস্থায় রাখার জন্য তুমি বাস্তুশাস্ত্র , ফেংশুই ইত্যাদি ব্যবহার কর। কিন্তু তোমার একটা জিনিষ বোঝা উচিত : তোমাকে তোমার ঘরকে অবিশ্রাম শক্তিপূর্ণ করতে হয় কারণ তুমি তাকে তোমার নকারাত্মকতা দিয়ে তাকে দুষিত করতে থাক।

তুমি যখন বাড়ীর ভিতর নকারাত্মক ভাবনা ও তোমার দুশ্চিন্তা দ্বারা দুষিত কর , সেই স্থানে একই নকারাত্মকতা তোমার ওপরে প্রতিফলন করতে শুরু করে। বাড়ী ঢুকলেই তুমি নকারাত্মকতার এক দুষ্টচক্রে পড়ে যাও।

কতবার তুমি অনুভব করেছ যে বাড়ী ঢোকার আগে পর্যন্ত তুমি ভালই ছিলে? যেই ঢুকলে, তুমি এক পরিচিত নকারাত্মক চিন্তার নক্শায় যেন আটকে গেলে। এই প্রকার চিন্তাগুলি দিয়েই তো তুমি তোমার ঘর পূর্ণ করে রেখেছ। তাহলে তুমি কি করবে? তুমি বাস্তুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজনকে ডেকে নিয়ে এসে ঘরের নক্শা পরিবর্তন করবে বা এক পুরুত ডেকে যজ্ঞ করবে বা ফেংশুই প্রয়োগ করবে।

সন্দেহ নেই যে আন্তরিকভাবে করলে এগুলি কার্যকর হবে। কিন্তু তোমাকে একটা জিনিষ বুঝতে হবে : এগুলি সবই সম্পূরক প্রক্রিয়া। আসল ব্যাপারটা হ'ল তোমার নিজের ভিতরটা পরিষ্কার করা ও এক আনন্দময় মানসিক গঠন বিকিরণ করা, যাতে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমার বাসস্থান এই প্রকার শক্তি বিকিরণ করে।

একটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য কি ?

সে বলে, 'আগে আমি মেঝেতে মাদুর পেতে বসে খেতাম। এখন টেবিলে খাই।'

অতীত ও বর্তমানে তার মুখ একই আছে। যদি তোমার জীবনে কোন আমূল পরিবর্তন না আসে , তোমার এইটুকু পরিবর্তনই চোখে পড়বে। ঠিক যেমন সৌন্দর্য দ্রষ্টার চোখে থাকে, স্বাদ যে স্বাদ নিচ্ছে তার জিভে থাকে। তোমার মানসিক গঠন নির্ণয় করে তোমার জীবনরসের আস্বাদন কেমন হবে।

বেশীর ভাগ সময় আমরা জানি যে আমাদের পরিবর্তিত হতে হবে, কিন্তু যে করেই হোক আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতেই থেকে যাই। আমরা বারবার একই চক্রে ঘুরতে থাকি। আমাদের একদিক বলে পরিবর্তিত হতে , আর অন্যদিক অচেতনভাবে পরিচিত প্যাটার্নে ঠেলে দেয়। যদিও তোমাকে পরিবর্তন হবার সুযোগগুলি জানিয়ে রাখা হয় , তুমি বর্তমান অবস্থাতেই আরাম অনুভব কর ও সেখানেই থেকে যাওয়া পছন্দ কর।

তোমার সন্তানদেরও সাহায্য কর

যদি তুমি দৃঢ় মানসিক গঠন নিয়ে বাস কর, তাহলে খুব বিপদ : তোমার সন্তানদের তোমার থেকে সেটা আত্মস্থ করার সম্ভাবনা খুব বেশী।

একটা জোক মনে আসছে :

> পতি ও পত্নী পেশায় উভয়েই পকেটমার। তারা প্রায় আলোচনা করে যে তাদের বাচ্চা হলে খুব সমৃদ্ধি হবে এবং শীঘ্রই তাদের একটি শিশু হল।

নবজাতকের ডান হাত শক্ত করে বন্ধ করা ছিল এবং তারা সেটা খুলতে পারে নি। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করল , কিন্তু অসফল রইল। শেষে একটি সোনার হার বাচ্চাটির চোখের সামনে দোলাতে লাগল।
বাচ্চাটি আস্তে আস্তে হাত খুলল এবং তাতে ছিল ধাই-মার সোনার আংটি।

এটা কেবল একটা জোক, কিন্তু বোঝ যে মাতাপিতা হয়ে তোমাদের মানসিক গঠন বাচ্চাদের হস্তান্তরিত করে দেবার খুবই সম্ভাবনা আছে। তাই সর্বক্ষণ সচেতন থাক এবং তোমার চেতনার ওপরে কাজ কর; ভিতরের কিচিরমিচির ও কাঠামো সাফ করার জন্য কাজ কর।

আমরা সর্বদাই বাচ্চাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি ও তাদের পুতুল বানিয়ে ফেলি। বাচ্চারা প্রচণ্ড শক্তিতে পূর্ণ থাকে । আমরা সেই শক্তিকে বাক্সবন্ধ করতে চাই যাতে তাকে পরিচালনা করতে সুবিধা হয়।

একটা ছোট গল্প :

দুটো কুকুর রাস্তায় হাঁটছিল।
প্রথমটি বলে, 'আমার নাম স্যাণ্ডি। তোমার নাম কি?'
দ্বিতীয়টি একটু থেমে বলল, 'আমার মনে হয় আমার নাম - না না টমি।'

দ্বিতীয় কুকুরটি যাই করুক না কেন তার মালিক নিশ্চয় সবসময় বলতে থাকে , 'না না টমি'! কুকুরটি ভাবতে শুরু করেছে যে তার নাম 'না না টমি'! ঠিক এই কুকুরটির মত , বাচ্চারাও আমাদের কথা ও দেহভঙ্গিমার অর্থ আত্মীভূত করতে ও শিখতে থাকে। যখন শিশুরা খুব ছোট, তারা আমাদের শব্দ ও কাজকর্ম অবচেতন হয়ে লক্ষ্য করে ও তাদের সত্য বলে গ্রহণ করে। তাই তুমি যখন বাচ্চাদের সাথে আছ, আরও বেশী সচেতন থাক, অন্ধের মত বাচ্চাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে তাদের বুদ্ধিকে জীবন্ত রাখার চেষ্টা কর।

মায়েরা অবিশ্রাম এটা করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বৃষ্টি হয়, মা বাচ্চাদের ঘরের ভিতরে থাকতে বলবে কারণ তাদের সর্দি লাগতে পারে। মা যদি এই জিনিষটা কয়েকবার করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাচ্চা বৃষ্টি দেখলেই সর্দি লাগার কথা ভাববে। ছিটেফোঁটা হলেও তার নাক বইতে থাকবে।

আসলে মানুষের শরীর সবচাইতে বুদ্ধিমান; এতে আছে স্ব-সংশোধন ও নিজে থেকে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। কিন্তু যে করেই হোক, আমরা শরীরের সহজাত বুদ্ধিকে না মেনে আমাদের মনকে বিশ্বাস করি। সেখানেই সমস্যা ও সব দুশ্চিন্তার সূত্রপাত।

একটা ছোট গল্প :

বাবা-উট ছেলে-উটকে তাদের প্রজাতির শরীরের গঠন সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছিল।
সে বলে, 'তুমি জান, আমাদের শরীরে কুঁজ আছে যাতে আমরা মরুভুমিতে থাকার সময় কয়েক দিন পর্যন্ত জল সঞ্চয় করে রাখতে পারি।'
ছেলে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাদের চোখের পাতার লোম এত লম্বা কেন?'
বাবা বলে, 'বালু ঝড় থেকে আমাদের চোখ বাঁচাতে।'
ছেলে-উট জিজ্ঞাসা করে, 'আমাদের পায়ের পাতা এত নরম কেন?'
বাবা-উট উত্তর দেয়, 'যাতে আমরা মরুভুমিতে তাড়াতাড়ি যেতে পারি।'
'বাবা', ছেলে প্রশ্ন করে, 'আমরা তাহলে এই চিড়িয়াখানায় কি করছি?'

দ্যাখো, আমাদের শরীর কত সুন্দরভাবে সংকল্পনা করা হয়েছে! আমরা যদি তাকে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিতে চলতে দিই, তা খুব ভাল কাজ করবে। যেই মুহূর্তে শরীরকে জবরদস্তি নিয়ন্ত্রণ করতে চাও, তুমি নানা সমস্যার মুখামুখি হতে থাক।

হিমালয়ে সাধুরা, ঘুরে বেড়ানো ভিক্ষুকেরা গুহার ভিতরে বাস করেন। তাঁরা সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান মানুষ। রোদ বৃষ্টি বরফ যাই হোক না কেন তাঁরা বেঁচে থাকেন; তাঁদের শরীর নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়। প্রকৃতি ও নিজেদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতার ওপরে আমাদের বিশ্বাস চাই। কিন্তু যে করেই হোক আমরা আমাদের দুশ্চিন্তা ও মানসিক গঠন শরীরের ওপরে চাপিয়ে দিতে থাকি। এটা আমাদের সমস্ত রোগের মূল কারণ।

মাস্টারের উপস্থিতিতে আবার জন্মাও!

একজন মাস্টার তোমাকে এক নতুন মানসিক গঠন বা পুনর্জন্ম দিতে পারেন এবং তিনি সেটা কেবল তাঁর উপস্থিতি দ্বারাই দিতে

পারেন। তুমি মাস্টারের উপস্থিতিতে থাকলেই যথেষ্ট। এটা হয়ে যাবে। যখন মাস্টারের শক্তি তোমাকে বন্যায় ভাসিয়ে দেয়, তোমার মানসিক গঠন পরিবর্তন হয়, তুমি আবার জন্ম নাও। তুমি এমন এক জায়গায় প্রবেশ কর যা আছে বলে তুমি আগে জানতেই না।

এইভাবে আবার জন্ম নিলে তুমি সর্বপ্রকার আবেগ থেকে মুক্ত হবে। আগে জানতেই না যে তুমি এত সহজে এই আবেগগুলিকে পরিচালনা করতে পারবে। চারপাশে যা হচ্ছে তুমি কেবল তার এক পর্যবেক্ষক হবে।

একটা ধ্যানের ওয়ার্কশপ হবার সময় আমি একদিন হোটেলে টেলিভিশন দেখছিলাম। একটা ভারতীয় চ্যানেলে পুরানো সিনেমা থেকে একটি দ্বৈতসঙ্গীত চলছিল। আরেকটা ভারতীয় চ্যানেলে নতুন মুভি থেকে একটা দ্বৈতসঙ্গীত হচ্ছিল। আমি আমার সেক্রেটারীকে বললাম যে এই দুটি চ্যানেল দেখাচ্ছে যে এত বছর গড়িয়ে যাবার পরেও মানুষের চেতনার কোন বাস্তব উন্নতি হয় নি।

একই নক্শা বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে - যেন পাঁচজন লোক একটা বন্ধ ঘরে একটা বলে লাথি মেরে যাচ্ছে। পরিচিত প্যাটার্ন আমাদের বুদ্ধিকে মেরে ফেলে। এমনকি আমাদের দুশ্চিন্তাগুলি হ'ল মনে সঞ্চিত পরিচিত নক্শা-সমষ্টি, যা আমাদের ওপরে বারংবার চেপে বসে।

সচেতন হও, আনন্দময় হয়ে যাও!

আমি যখন লোকেদের এসব বলি, তারা বলে, 'স্বামীজী, যা বলছেন আমি বুঝছি; কিন্তু আমি তা পরাভূত করতে পারি না।' আমি তাদের বলি, 'কেবল আমার কথাগুলিকে তোমাকে ভেদ করতে দাও, আর তোমার ভিতরে একটি নতুন স্থান সৃষ্টি কর, তাহলেই যথেষ্ট।' এই ব্যাপারে ধ্যান সাহায্য করতে পারে। ধ্যান-শিবিরে আমি তোমাদের বুদ্ধিগত বোধ দিই এবং তারপর তাকে তোমার ভিতরে ভেদ করার জন্য ধ্যান করাই।

কিন্তু লোকেরা আমায় বলে, 'স্বামীজী, আমাদের নিজেদের কাজ থাকে, বিল পে করতে হয়, ডেডলাইন অনুযায়ী কাজ করতে হয়; আমরা তবে কি করে ধ্যান করব?' আমি তাদের একটা সোজা ধ্যান-প্রক্রিয়া দ্বারা উত্তর দিই : বিল পে করা বল, ডেডলাইন মীট্ করা বল, তোমার নিশ্চয় শ্বাস নেবার জন্য সময় আছে? নয়ত তুমি বেঁচে থাকতে না! এখন তুমি সোজাসুজি এই শ্বাসপ্রশ্বাসে সচেতনতা যোগ কর, ব্যাস। সেটাই ধ্যান। কেবল তোমার শ্বাস-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ কর। সেটা খুব সোজা অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্যান।

যখনই এই প্রক্রিয়া মনে পরে, অভ্যাস কর। শীঘ্রই এটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। যখন তুমি শ্বাসে সচেতনতা নিয়ে আস, তুমি বর্তমান ক্ষণে আছ। বর্তমানে বাস করা তোমায় আনন্দে নিয়ে যায়। 'এখন'-এর শক্তি হল আনন্দে যাবার সিধা রাস্তা। প্রতিটি শ্বাস ও প্রশ্বাসে সচেতনতা যোগ কর।

তাই আনন্দ প্রাপ্তির জন্য তোমার আলাদা করে সময় বার দরকার নেই, ছুটি নিয়ে কোন নির্জনবাস বা ধ্যান-শিবিরে যাবার প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করে যেতে পার। তোমার সৃষ্ট বর্দ্ধিত সচেতনতার সাহায্যে ডেড্ লাইন ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু আরও দক্ষতার সাথে তুমি লাভ করবে।

ধ্যান হল তোমার চেতনায় এক পরিবর্তন। এটা তোমার সত্তায় এক 'শক্তি-অপবর্তন' (energy shift)। এটা এক কোণায় পা ভাঁজ করে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে মন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা নয়। তুমি যদি তা করতে চেষ্টা কর তোমার ঘাড় অথবা পিঠে ব্যাথা হবে ! তোমার আরও একটা দুশ্চিন্তা হবে যে তুমি ঠিক করে বসে ধ্যান করতে পারছ না।

তোমাকে কেবল বর্তমানে বাস করতে হবে, এখন ও এখানে। বর্তমানে থাকলে তুমি অস্তিত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে চলবে। যখন তুমি বর্তমানে আছ, অস্তিত্ব নিজেই তোমাকে শেখাবে।

অস্তিত্ব মহান মাস্টার। 'জীবন এক বড় শিক্ষক' বলতে তাঁরা এটাই বোঝাতে চাইছেন। যখন তুমি এটা হারিয়ে ফেল, তুমি শেখার জন্য নিজের মত সময় নাও। তুমি জীবনভর শেখো। নিজের ইচ্ছামত আস্তে আস্তে শিখতে থাকলে জীবন কখন কখন ধাক্কা দেয় যাতে তুমি জেগে উঠে তাড়াতাড়ি শেখো!

এখন, তুমি হয় অতীতের পিছনে অনুতপ্ত হয়ে, নয়ত ভবিষ্যতের পিছনে উদ্বিগ্ন হয়ে দৌড়াচ্ছ। এই প্যাটার্নের জন্য তুমি বর্তমানকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দাও। তাতে হয় কি? তুমি কখনও ঠিক ভাবে ক্রিয়া কর না, তুমি কেবল প্রতিক্রিয়া কর অতীতের অনুতাপ বা ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার ওপর ভিত্তি করে। যখন প্রতিক্রিয়া করছ, তুমি তোমার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যবহার করছ না। তুমি কেবল এক প্রোগ্রাম করা রোবটের মত ব্যবহার করছ; অন্ধ যুক্তি থেকে কাজ করছ, সচেতনতা বা বুদ্ধি থেকে নয়।

তোমার ৮০% শক্তি অতীত ও ভবিষ্যতে আটকে আছে। খালি ২০% বর্তমানের জন্য পাওয়া যায়। তাই তোমার মনে হয় যে তুমি নিষ্প্রভ, যেন শক্তি নেই। সম্প্রসারিত চেতনার সাথে এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায় এবং তোমার জীবনকে এক উচ্চতর তলে উঠিয়ে আনন্দ, হর্ষ ও উৎফুল্লতার সাথে বাঁচা যায়!

প্রশ্ন : তাহলে আপনি বলছেন যে কেবল শ্বাস প্রত্যক্ষ করে আমরা আনন্দ লাভ করতে পারি?

উত্তর : হ্যাঁ। এটা খুব শক্তিশালী প্রক্রিয়া। তুমি যখন তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষ্য কর, তোমার চেতনা প্রগাঢ় হয় এবং কোন চিন্তাই তোমার কাছ থেকে অচেতন হয়ে পালাতে পারে না। যখন প্রতিটি ভাবনা তোমার চেতনার মধ্য দিয়ে যায়, তুমি তোমার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন নকারাত্মক ভাবনা সৃষ্টি করবে না।

তোমার ভাবনাগুলিকে সংশোধন করার জন্য সময় নষ্ট করতে হবে না; চেতনা তোমার জন্য সেই কাজ করে দেবে। তোমার চিন্তা প্রণালী আপনা আপনি নতুন কাঠামো পেয়ে যাবে। সচেতনতার শক্তি এত বেশী যে এটা তোমার চিন্তা প্রণালীকে সকারাত্মক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

তোমার চিন্তাসমূহ, শব্দাবলী ও কাজগুলিকে একীভূত কর

বস্তুত আমাদের ভাবতে শেখনো হয়েছে যে কেবল যদি আমরা কাজ করে কোনরূপে বেদনার অভিজ্ঞতা পাই, আমরা সুখের যোগ্য। তাই আমরা ব্যাথা না হওয়া পর্যন্ত দৌড়াই; বেড়ায় ধাক্কা না খাওয়া অবধি আমরা দৌড়াতে থাকি। আমরা বেড়ার ধারণাতে এতই অভ্যস্ত যে বেড়া নেই বললেও আমরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই। আমরা যে করেই হোক একটা বেড়াতে ধাক্কা খেয়ে বেদনা অনুভব করে থামি, বেদনা পেয়ে সন্তুষ্ট হই। আমরা সর্বদাই ভাবি যে অভীষ্ট পাবার যোগ্য হবার জন্য আমাদের ব্যাথা-বেদনা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে যেতেই হবে।

আরও কিছু লোক আছে যারা তাদের দুশ্চিন্তা নিজেরাই সৃষ্টি করে এবং তারপর দুশ্চিন্তা ভোলার জন্য মদ্যপান করে! আজকাল এটা খুব সাধারণ ঘটনা। এটা এইপ্রকার : একটা শূকর নিজের বাসস্থানের দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছে না, আর সেই দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য সে আবর্জনার মধ্যেই নাক ঢুকিয়ে দিল। তুমি ভাবছ তুমি মদ খেয়ে সব দুশ্চিন্তা জয় করেছ, আসলে তুমি তো তাতে আরও ডুবেছ।

আমরা একটা জিনিষ চাই, কিন্তু আমরা তার পরস্পরবিরোধী কিছু সৃষ্টি করার জন্য কাজ করি - তোমার চিন্তা, কথা ও কাজ একীভূত কর বলতে এটাই আমি বলতে চাইছি, নয়ত তোমার জীবনে পরস্পরবিরোধী ফল সৃষ্টি হবে।

একটা ছোট গল্প :

> একজন অযাচিত অতিথি একজন লোকের বাড়িতে এল। লোকটি তার পত্নীকে চেঁচিয়ে কফি আনতে বলল। তার পত্নী রান্নাঘরে ছিল।
> পত্নী রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল যে ঘরে কফি নেই, কফি কেনার পয়সাও নেই। পতি রেগে গেল ও পত্নীকে বকতে লাগল এবং শেষে পত্নীকে কফি না করার জন্য এক চড় মারল। পত্নী কাঁদতে থাকল।
> অতিথি এসব দেখে ধীরে উঠে চলে গেল।
> পত্নী তার চোখের জল মুছে বিজয়ীর মত পতিকে বলে, 'দেখলে? আমি কাঁদার ভান করে তাকে তাড়িয়ে দিলাম!'
> পতি উত্তর দিল, 'ভাল! আর আমি তোমার সাথে রাগ করার ভান করলাম ও তোমায় কাঁদালাম!'
> অতিথি ফিরে এল, 'আমি চলে যাবার ভান করেছিলাম। এখন আমি ফিরে এলাম!'

আমাদের চিন্তা আমাদের শব্দের থেকে আলাদা, আমাদের শব্দ আমাদের কাজের থেকে আলাদা, তাই আমরা জীবনে অবিশ্রাম পরস্পরবিরোধী জিনিষ আমন্ত্রণ করছি! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেন, 'আমাদের চিন্তা ও কাজকে ঐক্যবদ্ধ করা যেন প্রায়শ্চিত্ত করা।' কিন্তু আমরা কি করি? আমরা আমাদের চিন্তাকে কাটছাট করি, সম্পাদনা করি এবং তাদের থেকে শব্দ বা কথা তৈরী করি। কথা বার করার আগে কত হিসাব নিকেশ চলতে থাকে। আমরা কথা বলার আগে লাভ লোকসান দেখি এবং ভবিষ্যতে গিয়ে বিশ্লেষণ করি। আমাদের ব্যক্তিত্বে কখনই একাঙ্গীভবন হয় না, এই কারণে আমরা টুকরা টুকরা ভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকি।

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে আমি কিভাবে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণ দিয়ে যাই। দ্যাখো, আমি সত্য যেভাবে আছে সেভাবে বলি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ব্যাস। আমি সত্যকে অনাবৃত করতে উদ্বিগ্ন নই! আমি কখনই আমার কথা কাটছাট বা সম্পাদনা করি না। আমার কাছে চিন্তা করাই কথা বলা। এদিকে তুমি প্রথমে চিন্তা কর; তারপর তোমার চিন্তার কাটছাট হয় এবং শেষে কথা বার হয়। এই পদ্ধতিতে সরলতা হারিয়ে যায় আর তুমি শব্দাবলীতে জড়িয়ে পড়।

তুমি আমাকে অনেক ঘন্টা ধরে শুনতে পারছ তার কারণ আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে যাচ্ছি। নয়ত তুমি অস্থির হয়ে উঠতে । এখানে এসে যে তোমরা সময় সম্পর্কে বিব্রত হচ্ছ না, সেটা আমি যা বললাম তার যথেষ্ট প্রমাণ।

যখন স্বতঃস্ফূর্ততা ঘটে, প্রবাহ ঘটে এবং তাই তা এত হৃদয়গ্রাহী হয়। নতুবা তুমি একপেশে (ওয়ান-ট্র্যাক) মন নিয়ে নিশ্চল হও।

একটা ছোট গল্প :

> প্রতিবেশীর কুকুরগুলির একটানা চিৎকারে একটা লোকের ঘুমের বারোটা বাজছিল। কয়েক রাত ধরে এই অবস্থা চলছে।
> সে সবশেষে কুকুরগুলির মালিকের সাথে কথা বলবে বলে ঠিক করল।
> সে তার বাড়ীতে গিয়ে এই ব্যাপারে অভিযোগ করল।
> প্রতিবেশী নিশ্চল, তার ওপরে কোন প্রভাব হ'ল না। প্রতিবেশী বলে, 'আমি কিছুই করতে পারব না। আপনার কি করার প্ল্যান?'
> লোকটি উত্তর দিল, 'ঠিক আছে, আজ রাতে আমি সব কুকুরগুলিকে আমার পিছনের উঠানে বেঁধে রাখব এবং তাহলে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।'

দ্যাখো, লোকটি কেমন বোকার মত প্রস্তাব রাখল! সে বারবার বিষয়টিতে ওয়ান-ট্র্যাক মন নিয়ে ঢুকছে। সে কিভাবে সমাধান পাবে? তুমি স্বতঃস্ফূর্ত হলে কোন মুহূর্তেই তোমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করছে বলে লাগবে না। তুমি তৎক্ষণাৎ কোন সমধান পেয়ে যাবে। যখন তুমি স্বতঃস্ফূর্ত, তুমি যেকোন উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দেবে ও নীচে যাওয়ার সময় নিজের পাখা তৈরি করবে !

প্রশ্ন : আমাদের এত দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মূল কারণ আপনি কি বলেন?

উত্তর : এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ মানে তুমি সমাধানের জন্য প্রস্তুত।

দ্যাখো, সবকিছু সম্বন্ধেই আমাদের অবিশ্রাম কিছু কল্পনা থাকে - আমাদের চারদিকের লোকজন সম্পর্কে, যেখানে থাকি সেই স্থান সম্পর্কে, বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং আমাদের জীবনশৈলী সম্পর্কে। আমরা একটানা অলীক কল্পনা করে যাই অথবা আশা করে যাই যে ঘটনাগুলি নির্দিষ্ট ছকে ঘটবে। কিন্তু বাস্তবতা সবসময় এই অলীক কল্পনা থেকে আলাদা। বাস্তবতা ও আমাদের কল্পনার মধ্যে তফাত আমাদের জীবনে উদ্বেগ বা টেনশন সৃষ্টি করে।

আমরা আমাদের ভিতরে একটি কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করেছি এবং অবিশ্রাম তাকে বাস্তবে দেখতে চাইছি। বাস্তবতা এবং আমাদের অলীক কল্পনার মধ্যে তফাত আছে। যত বেশী কল্পনা করি, তত বেশী তফাত এবং টেনশন বাড়বে।

আমরা সর্বদাই ভাবি যে আমরা কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চলেছি, কিন্তু যখন তা হয়, আমরা দেখি আমাদের কল্পনা আরও বেড়ে গেছে এবং আমরা তাই তাকে কখনই পূরণ করতে পারি না। এতে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় হতাশা , টেনশন এবং দুশ্চিন্তা।

ঘটনা হল, আমরা জানিই না যে আমরা কল্পনা নিয়ে কাজ করছি। নিজের কল্পনা আমাদের ভিতরে এত ঘন ও দৃঢ় হয়ে গেছে যে আমরা তাকে কল্পনা বলে দেখতেই পারি না। আমরা তাতে পুরো আটকে গেছি। কিছু কাজ করার জন্য যদি তোমার মধ্যে টেনশন হয়, তাহলে তুমি বাস্তবতার সাথে কাজ করছ না; তুমি তোমার কল্পনার অঞ্চল থেকে কাজ করছ।

প্রতিটি মুহূর্তে বহির্জগতে আমাদের প্রত্যাশাগুলি পূরণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করি। প্রত্যাশা হতে পারে - মানুষসম্বন্ধীয়, বস্তুগত সুখ, নাম ও যশ ইত্যাদি। লোকেরা যদি আমাদের কল্পনামত সাড়া না দেয় আমাদের প্রত্যাশা কষ্ট পায়। ছোট থেকে বড় জিনিষ, সর্বদাই আমরা আমাদের কল্পনার অনুরূপ খুঁজে চলেছি। আমাদের ভিতরে এটা এক অচেতন প্রক্রিয়া। সেজন্য এটা করার ব্যাপারে আমরা সজাগ নই, আর তাই আমরা টেনশনের কারণ বুঝি না। কারণটা এত সূক্ষ্মভাবে পুরো জিনিষে বোনা হয়ে গেছে যে সেটা বোঝা যায় না।

তুমি তোমার চেতনাকে যদি এই পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে আস এবং নিজেকে কিছু ঘন্টা লক্ষ্য কর, তোমার পুরো মন কিভাবে কাজ করে তা বুঝবে। নিজের মনের ও আশেপাশে মানুষের কেবল দ্রষ্টা হও। তুমি দেখবে যে, তোমার দেখা ও করা প্রতিটি ছোট জিনিষ থেকে মন অবিশ্রাম কিভাবে কত সূক্ষ্মভাবে প্রত্যাশা সৃষ্টি করছে এবং প্রত্যাশার সাথে বাস্তব কি ভাবে কখন মিলছে ও কখন মিলছে না এবং এসব হবার সময় কিভাবে দুশ্চিন্তা ও টেনশনের ভাবনা আসছে।

চেতনা দিয়ে পুরো জিনিষটাকে ভরিয়ে দিয়ে তুমি দেখতে পারবে তোমার মন কিভবে খেলা করে ও টেনশন সৃষ্টি করে । একবার দ্রষ্টা হওয়া শিখে গেলে, তোমার দুশ্চিন্তা মুছে যাবে ও বহির্জগতের কো ন ঘটনাকে অন্তর্দেশে নেবে না। যখন বহির্জগতের

ঘটনাকগুলিকে অন্তর্দেশে নাও, তুমি শব্দের আরও বড় তথ্য-ভাণ্ডার বা ডাটাবেস্ সৃষ্টি কর, যা থেকে নতুন দুশ্চিন্তা আসবে।

যখন তুমি কালানুক্রমে পরিকল্পনা কর এবং কোন সময় নষ্ট না করে তোমার কালানুক্রমিক পরিকল্পনা সার্থক করা র জন্য কাজ কর, তুমি বাস্তবতার পথে আছ। যদি দেখ যে তোমার কাজের চেয়ে দুশ্চিন্তা বেশী হছে এবং কিছুই ঠিকমত হচ্ছে না , তুমি মনস্তাত্ত্বিক দুশ্চিন্তার পথে আছ। তাহলে বাস্তবতা ও তোমার মধ্যে একটি তফাত আছে। এখন সময় এসেছে ভিতরে দেখার ও চিন্তাগুলিকে সরল করার।

কালানুক্রমে পরিকল্পনা করার চিন্তা ঠিক আছে, কিন্তু সেই পরিকল্পনা তুমি কি ভাবে সম্পাদন করবে সে সম্বন্ধে চিন্তা ঠিক নয়। এটা মনস্তাত্ত্বিক দুশ্চিন্তা হয়ে যায় এবং তার থেকে টেনশন ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হয়।

যদি পরিকল্পনা করতে ২ ঘণ্টা লাগে, তাহলে বাকী ২২ ঘণ্টা সেই পরিকল্পনাকে সম্পাদন করার জন্য পরে থাকে। তাহলে সেই পরিকল্পনা সম্পাদিত হচ্ছে না কেন? কারণ তুমি ৮০%-এর বেশী সময় পরিকল্পনা কিভাবে সম্পাদন করবে তার দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে দাও।

যখন পরিকল্পনা নিজের কাছে পুনরাবৃত্ত করতে থাক, তখন তুমি আসলে তোমার শক্তি অপচয় করছ। পরিকল্পনা সম্পাদনে সেই শক্তি ব্যবহার না করে তুমি তো তার অপচয় করছ। তোমার কাজটা কি করে হবে?

আরেকটা জিনিষ : তুমি যদি সত্যি সত্যি কাজটা হোক চাও, তুমি সেটাকে কোন দুশ্চিন্তা না করেই করবে। প্রকৃতপক্ষে টেনশন এবং দুশ্চিন্তা কাজ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য নিছক অজুহাত। টেনশন এবং দুশ্চিন্তা র অজুহাত দেখিয়ে তুমি দায়িত্ব থেকে পালাও।

প্রতিটি সমস্যা সমাধানে গর্ভবতী থাকে। তুমি যদি সত্যি তার সমাধান চাও, তুমি তা পারবে। তোমাকে কেবল সমস্যার দিকে গভীর চেতনা দিয়ে দেখতে হবে, তবেই সমাধান বেড়িয়ে আসবে। একমাত্র যখন তুমি তার সমাধান চাও না , তুমি তার সম্পর্কে কথা বলে আরাম পাবে। আর তুমি নিজেকে মহান ভাববে যে তোমার কত কিছুতে দুশ্চিন্তা করার আছে।

দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হল দুশ্চিন্তা এবং টেনশনের অবস্থায় যাওয়া। প্রায়ই যারা বিষাদে ভোগে তারা সেই অবস্থায় আরাম পায় কারণ তাদের কোন দায়িত্ব নিতে হয় না।

একটা ছোট গল্প :

> একজন মহান হীলার (healer) এক গ্রামে এলেন। তাড়াতাড়ি অনেক ভীড় জমে গেল। একটি লোকের ঘাড়ে স্পর্শ করলেন ও তাকে সঙ্গে সঙ্গে স্পন্ডেলাইটিস থেকে মুক্ত করলেন।
> তার পর আরেকজনের মাথায় হাত দিলেন ও তার মাথাব্যথা সেই মুহূর্তেই ঠিক করে দিলেন।
> কিন্তু একজন যে ক্রাচ নিয়ে খুঁড়িয়ে আসছিল সে বলে উঠল, 'আমাকে স্পর্শ করবেন না!'
> হীলার অবাক হল ও কেন তা জিজ্ঞাসা করল।
> লোকটি বলল, 'আমি অসামর্থ্য-সুবিধা (ডিসেবিলিটি বেনেফিট) পাবার জন্য এই তো হ'ল আবেদন করেছি।'

আমরা অনর্গল আমাদের সমস্যার কথা বলে যাই, কিন্তু যখন আমাদের একটা সমাধান দেওয়া হয়, হঠাৎ আমরা প্রচণ্ড অব্যাহতিপ্রাপ্ত হই! আমরা কখনই আমাদের সমস্যার বাইরে ভাবি নি, তাই সমস্যা চলে গেলে আমরা এক শূন্যতা অনুভব করি।

তাই জীবনশৈলী, মানুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে তোমার সমস্ত কল্পনা ত্যাগ কর এবং বর্তমান ক্ষণে বাস করতে থাক , দেখবে জিনিষগুলি নিজে নিজেই হবে। মনে রেখ : তুমি এই আরামের অবস্থায় বেশী সময় থাকতে পারবে না। কোন একটা সময় বাস্তবতা তোমাকে ধরে ফেলবে। তাই সচেতনভেবে বাস করতে শুরু কর, সচেতন সিদ্ধান্ত নাও এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তের হন্য দায়িত্বশীল হও।

অপরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং শেষে তাদের দোষ দেওয়া সোজা। এটা সবচেয়ে বড় বোকা ও ভীতুর কাজ। কাউকে কিছুর জন্য নিন্দা করো না। মনে রেখ, কেবল যখন তুমি কিছু চালাতে অসমর্থ হচ্ছ, তুমি অপরকে দায়িত্ব নিতে দেবে এবং তাদের নিন্দাও করবে।

প্রশ্ন : স্বামীজী, কি করে আমরা সর্বদা স্বস্তিতে (রিল্যাক্সড্) থাকব?

তোমার চেতনা সর্বদা সজাগ থাকলে তুমি সব সময় রিল্যাক্সড্ থাকবে। ধ্যানই এই অবস্থায় আসার চাবিকাঠি। প্রথমে কমপক্ষে

বুদ্ধির স্তরে এটাকে বোঝ। ছোট ছোট সময়কাল ধরে তুমি এটার অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকবে। সেই সময়কাল বাড়বে এবং সেটা তোমার চিরস্থায়ী অবস্থা হয়ে যাবে।

আমি সব সময়ে লোকেদের বলি যে প্রকৃত মাস্টার খোঁজার জন্য তাঁকে ঘুমাতে দেখ। ঘুমন্ত প্রকৃত মাস্টারকে পুষ্প বলে মনে হবে ! তিনি পুর্ণরূপে স্বস্তিতে থাকবেন এবং তাঁকে খুব সুন্দর দেখতে লাগে। তখন তিনি এক শিশুসুলভ নিষ্পাপতা বিকিরণ করবেন। অন্যদিকে একজন সাধারণ মানুষকে ঘুমিয়ে থাকার সময় উত্তেজনাপূর্ণ ও আঁটসাঁট লাগবে।

একজন মাস্টার সর্বদাই অতিচেতন (super-consciousness) অবস্থায় থাকেন এবং তিমি ঘুমান কেবল শরীরকে বিশ্রাম দেবার জন্য। তুমি যখন সর্বদা এক উচ্চতর সচেতন অবস্থায় আছ , তুমি উত্তেজিত হতে পার না। কেবল যখন তুমি নিজেকে অচেতন অবস্থায় নিয়ে যাবে, এক বিভ্রান্ত অবস্থায় নিয়ে যাবে, তুমি নিজের জন্য টেনশন সৃষ্টি করবে। রিল্যাক্সড্ থাকার একমাত্র রাস্তা হল তোমার ভিতরে ও বাইরে যা কিছু হচ্ছে তার প্রত্যেকটিতে সর্বদা সচেতন থাকা।

চেতনা সহকারে রিল্যাক্স করতে শেখ। তুমি যখন কোন মাস্টারের সাথে আছ , যদি তুমি নিজেকে রিল্যাক্সড্ থাকার অনুমতি দাও, তিনি তোমার ভিতরে প্রবেশ করবেন; তাঁর অবস্থা তোমাকে ভেদ করবে। তুমি যদি বন্ধ থাক ও উত্তেজিত হয়ে থাক , তিনি তোমার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

'উপনিষদ' শব্দটির অর্থ, 'মাস্টারে পদযুগলের সামনে বসা।' যদি তুমি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ মন নিয়ে মাস্টারের পায়ের কাছে বসতে সমর্থ হও, তাঁর উপস্থিতি তোমার ভিতরে ঢুকবে এবং তোমার ওপরে অসীম করুণা নিয়ে কাজ করবে।

যখন এক মাস্টারের উপস্থিতিতে স্বস্তিতে আছ, তুমি প্রকৃতপক্ষে তোমার শরীরে শান্ত হচ্ছ; তুমি তোমার ব্যক্তিস্বভাবে শান্ত হচ্ছ এবং নিজের ব্যক্তিগত অবস্থায় স্বস্তি বোধ করছ। তখন তোমার ভিতরে কোন কীলক বা গোঁজ নেই এবং তোমার একাঙ্গীভবন হয়েছে। তাই মাস্টারের উপস্থিতিতে রিল্যাক্স করা অভ্যাস কর।

প্রশ্ন : স্বামীজী, আপনি কি সব সময়ে আনন্দ অনুভব করেন? আপনি কি কখনও ভাবনার দোলা অনুভব করেন না?

উত্তর : হ্যাঁ! আমি সর্বদাই আনন্দে, ২৪ x ৭ তোমাদের ভাষায়! কারণ আমার সত্তা থেকে বহুত্ব-ভাব চলে গেছে। যখন আনন্দ আছে, বহুত্ব থাকতে পারে না। বহুত্ব মুছে গেলেই আনন্দ ঘটে।

আমার সত্তায় কোন লালসা, ভয়, আসক্তি, ঘৃণা বা কোন নকারাত্মক ভাবনা নেই। একমাত্র ভাব হল আনন্দ ! এই অভিজ্ঞতা না হলে তোমার পক্ষে এটা বোঝা শক্ত। তুমি হয়ত এটাকে এক বুদ্ধির স্তরে বুঝবে। এখন কেবল বুঝে নাও যে আমি সদাই আনন্দপূর্ণ, সেটাই যথেষ্ট!

আনন্দে যাবার প্রথম পদক্ষেপ হল দ্রষ্টা হওয়া। সহজভাবে জীবনকে লক্ষ্য কর যে এটা একটা নাটক। যখন লক্ষ্য কর, তখন তোমার মন শান্ত হবে। যখন মন শান্ত হয়, তুমি হয়ত জিনিষটার সূত্র ধরতে পারবে। যদি সেই শান্তভাব একবারমাত্র উপলব্ধি করেছ, তুমি তো তার সূত্র ধরে ফেলেছ।

সেই সূত্র তোমাকে আরও বেশী সময়ের প্রশান্তিতে নিয়ে যাবার জন্য পরিচালিত হবে। প্রশান্ত -ভাব তোমার অন্তরের মাস্টার। বাইরের মাস্টার তোমায় ভিতরের মাস্টারকে পেতে সাহায্য করে। যখন তুমি প্রশান্ত -ভাবকে পেয়েছ, তুমি বুঝবে যে তোমার সমস্ত আবেগগুলি স্রেফ মনের খেলা।

এটা বোঝ যে তুমি কোন আবেগকে সচেতনতার সাথে মুছে ফেলার চেষ্টা করে মুছে ফেলতে পারবে না। যত বেশী মুছে ফেলতে চেষ্টা করবে তত বেশী তুমি তার সাথে লড়াই করবে, আর ভাবনাটি তোমাকে তাড়া করে বেড়াবে। একমাত্র উপায় হল তোমার ভাবনাগুলিকে লক্ষ্য করা। যখন ভাবনাগুলিকে লক্ষ্য কর, ভাবনাগুলি সহজেই মুছে যাবে।

ঠিক এখন তুমি তোমার ভাবনাগুলির সাথে এত বেশী জড়িয়ে পড়েছ যে নিজেকে তাদের থেকে আলাদা করে দেখতে পারছ না । যখন লক্ষ্য করা শুরু কর, তুমি ও তোমার ভাবনাগুলির মধ্যে এক দুরত্ব তৈরি হওয়া শুরু হবে। ধীরে ধীরে দুরত্ব বাড়বে এবং একদিন দ্রষ্টা দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

তখন তোমার ভাবনাকে মুছে ফেলার জন্য তোমাকে কোন প্রচেষ্টা করতে হবে না। তারা সহজেই নিজে নিজে মুছে যাবে। তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আর সমর্থ হবে না। তারা তোমার সত্তা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। চেতনার পরিবর্তন ঘটবে । তুমি এক নতুন মানুষ হবে।

যখন তুমি দ্রষ্টা হও, তখন দুশ্চিন্তা বা বেদনার কোন স্থান থাকবে না। তোমার মধ্যে কেবল এক সুন্দর শক্তি শোভা পাবে , যার নাম প্রেম। তুমি তখন অস্তিত্বের প্রেম প্রণিধান করতে পারবে, অসীম প্রেম যা তোমাকে প্রতি মুহূর্তে আবৃত করে।

একটা ছোট গল্প :

> একটি মানুষের খুব দুর্বল হৃৎপিণ্ড ছিল। তার পরিবার তাকে কোনরকম আকস্মিত খবর সর্বদাই অনেক যত্ন করে দিত। একদিন তারা জানতে পারল যে তার এক ধনী কাকা তার জন্য এক কোটি টাকা রেখে গত হয়েছে। তারা খুব উৎফুল্ল হ'ল এবং একই সময়ে তারা চিন্তা করতে লাগল কিভাবে এই খবরটা তাকে দেওয়া যায়। তারা ভয় পাচ্ছিল যে এই খবর শুনে তার হার্টফেল হতে পারে।
> একজন পরামর্শ দিল, 'আমার মনে হয় আমরা পরিবারের ডাক্তারকে ডাকি ও তাকে এটার সমাধান করতে বলি।'
> তারা সবাই রাজী হল এবং পরিবারের ডাক্তারকে ডেকে সব কথা বলল।
> ডাক্তার বলে, 'চিন্তা কোরো না, আমি ব্যাপারটা দেখে নেব। সেটা যত কঠিন ভাবছ ততটা নয়।'
> ডাক্তার বাড়ীতে এল ও তার সাথে কথা বলতে লাগল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে যদি হঠাৎ বলা হয় যে কেউ আপনাকে এক কোটি টাকা দেবে, তাহলে কি করবেন?'
> লোকটি উত্তর দেয়, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে তার অর্ধেক দিয়ে দেব।'
> ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ও মারা গেল।

ওপরের ক্ষেত্রে আমরা জীবনকে নাটক হিসাবে দেখতে তৈরি, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সেটাকে হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা সর্বদাই অপরকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত। একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে সবাই উপদেশ দিতে ভালবাসে কিন্তু কেউ তা নিতে চায় না!

তোমার নিজের জীবনকেও দ্রষ্টার মত দেখতে পার। তুমি একটি কমল ফুলের মত হতে পার - জলে থেকেও ভিজে যাবে না। তবেই তুমি এই জীবনের খেলা খেলতে শিখবে। একটা জিনিষ বোঝ : অস্তিত্ব নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এটা বোঝা ও গভীর সচেতনতার সাথে প্রবহমান হওয়াই আমাদের ভূমিকা।

এটা বোঝ যে সম্পূর্ণ সৃষ্টি অস্তিত্ব অনুসারে বয়ে চলেছে। তাহলে তুমি নিজেই তোমার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলবে। তোমাকে একটা স্থানে পৌঁছাতে হবে যেখানে তোমার অন্তরকে তোমার চারপাশের ঘটনা স্পর্শ করতে পারে না। এটা হবে যদি বোঝ যে অস্তিত্ব অবিশ্রাম পরিবর্তন হচ্ছে।

বাইরে তুমি হয়ত নানা ভাবনা প্রকাশ করবে, কিন্তু তোমার অন্তর্দেশের কেন্দ্রে, তোমাকে বহির্জগতের সমস্ত ঘটনাগুলিকে অবিশ্রাম একই অস্তিত্বের সুতায় গাঁথা পুঁতি বা গুটিকা হিসাবে দেখতে সমর্থ হতেই হবে। সুতাটি তাদের একসাথে ধরে রেখেছে।

প্রশ্ন : কিন্তু আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে দুশ্চিন্তা করি না। আপনি কি করে বলেন যে আমরাই আমাদের ওপরে দুশ্চি ন্তা নিয়ে আসি?

দুশ্চিন্তা তোমার মনের অচেতন অবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে এর ভিতর কোন ইচ্ছা ঢোকাতে হবে না। এটা সহজভাবে হয়, ব্যাস! তোমাকে সচেতনভাবে কোন প্রয়াস করতে হবে না; এটা তোমার ভিতরে সর্বদা আছে।

একটা ছোট গল্প :

> এক মহিলা হোটেলের রিসেপশন্ ডেস্কে কল করে সাহায্যের জন্য চীৎকার করল।
> রিসেপশনিস্ট তার রুমে এল।
> মহিলাটি চ্যাঁচাল, 'আমি আমার জানালা দিয়ে একটা উলঙ্গ লোককে রাস্তার ওপারের জানালাতে দেখতে পাচ্ছি।'
> রিসেপশনিস্ট জানালা দিয়ে দেখল ও বলল, 'ম্যাডাম, তার দেহের ওপরের অংশ খালি। আপনি কি করে বলেন যে সে উলঙ্গ?'
> মহিলাটি চেঁচিয়ে বলে, 'আলমারির ওপরে ওঠ, আর ঠিক করে দেখ!'

যদিও সব কিছু ঠিক থাকে, আমরা টর্চলাইট দিয়ে দুশ্চিন্তা খুঁজি। আমরা এটাকে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে করি না। আমরা এটা একদম স্বাভাবিকভাবে করি - সেটাই সমস্যা! আমাদের মানসিক অবস্থাকে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরতে হবে (পুরো উল্টাতে হবে)।

আরেকটা ছোট গল্প :

> এক জায়গায় পুলিশ রাতে পাহারা দিচ্ছিল ও গলিতে একটা মরা গরু দেখল। সে গরুটিকে পাশের রাস্তার দিকে টানতে লাগল। একজন পথচারী তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কেন গরুটিকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ উত্তর করে, 'কাল এই ব্যাপারে রিপোর্ট লিখতে সুবিধা হবে, কারণ আমি ঐ রাস্তাটির নাম জানি।'

যেহেতু আমরা স্বতঃস্ফূর্ত হতে জানি না, আমরা সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকি! আমরা জিনিষগুলিকে আমাদের নক্শায় মেলাতে গিয়ে জটিল করে ফেলি। আমরা নমনীয় হয়ে বাস করি না। নমনীয় হয়ে থাকলে তোমাকে অযথা কাজ করতে হবে না। তুমি সহজে উপভোগ করবে ও এগিয়ে চলবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি এখন তোমায় বলি যে তোমাকে সর্বদা আনন্দে থাকা উচিত, তুমি দুশ্চিন্তা করতে শুরু করবে কিভাবে আনন্দে থাকা যায়! যে কোন জিনিষ তুমি দুশ্চিন্তা দিয়ে শুরু করতে জান; সেটাই সমস্যা। সেজন্য বেশীরভাগ সময়ে তুমি যখন কিছু জিজ্ঞাসা কর, আমি কখনই তোমাকে সিধাসিধা বলি না বা বেশী বলি না। আমি সাদামাটাভাবে তোমায় কিছু ভাবমূলক (অ্যাবস্ট্রাক্ট) কথা বলি যাতে তোমার মন কোন দুশ্চিন্তার রাস্তায় না ঢুকে পড়ে কিন্তু একই সময়ে আমি তোমায় সেটাকে বুঝতে ও বাস্তবায়িত করতে শক্তি দিই।

প্রশ্ন : আমরা তাহলে যদি আপনার কথা অনুসরণ করার জন্য দুশ্চিন্তা না করি, তো কিভাবে শুরু করব?

কেবল আমার কথার পিছনে যে শক্তি ও অনুপ্রেরণা আছে তাকে আত্মভূত কর এবং বর্তমানে বাস করা শুরু কর , ব্যাস। যখন যুক্তিকে ভিতরে আসতে দাও, সমস্যা শুরু হয়।

কেবল আমার কথার শক্তি অনুভব কর, যাকে আমি নীরবতা বলি, যে নীরবতা নিয়ে আমি তোমার ভিতরে সর্বদা ঢোকার চেষ্টা করছি। এই নীরবতা অবশেষে তোমাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া দরকার নিয়ে যাবে। কখনও আমার কথার আক্ষরিক অর্থ খুঁজতে যেও না। আমার নিজের ডিক্সনারী আছে, যা তোমারটা থেকে একটু ভিন্ন! ঠিক ম্যাচ হবে না। কেবল শক্তি আত্মভূত কর। শক্তিই বুদ্ধি। সে তোমাকে গাইড করবে।

কখনও শব্দ সংগ্রহ কোরো না। কেবল বুদ্ধিজীবী পাগলেরা বেশী ক'রে ও আরও বেশী ক'রে শব্দ সঞ্চয় করে। তারা শব্দ সঞ্চয় করে ও আরও বেশী বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তার ভাবে যে একসময় তাদের স্পষ্টতা আসবে বা সবকিছু পরিষ্কার করে জানবে , কিন্তু তা কখনও হয় না।

আমি যাই বলি, তা যদি পরস্পরবিরোধীও মনে হয়, সেটা কথনের মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ সত্য। আমার বলার সময় সেটা পূর্ণ সত্য। কেবল আমার কথা দ্বারা তুমি সিদ্ধান্তে আসতে পার না। তাই সেই মুহূর্তে পরীক্ষা করার মেজাজ নিয়ে সেটাকে গ্রহণ কর। তা তোমাকে অনুসরণ করতে শক্তি ও বুদ্ধি দেবে।

তাই তোমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে শুন না। গভীর ধ্যান দ্বারা শোন। সেই সময় তোমার ভাবনা বা পথ যাই হোক না কেন , কেবল তার গভীরে যাও এবং আমাকে মন দিয়ে শোন। তাহলেই যথেষ্ট। তুমি শক্তি ও স্পষ্টতা দ্বারা ভরে যাবে। প্রাথমিক এইসব গোপন কথা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি।

যখন আমার কথাগুলির সাথে এঁটে থাক, তুমি দুশ্চিন্তায় থাকবে যে সেই কথাগুলি ভুলে যেতে পার। তুমি তাদের লিখতে শুরু করবে। আমি বলি, আমার কথা লিখতে থাকলে, তুমি পুরোটাই হারিয়ে ফেলবে। আমার কথার শক্তি আত্মভূত করতে পারবে না এবং আমার সব কথাও লিখে নিতে পারবে না। তুমি বাড়ী ফি রে যাবে কিছু হিজিবিজি নোট নিয়ে এবং সেগুলিও কয়েক বছর ধরে ঘরের এক কোণায় পরে থাকবে। পরে কখনও যদি সেগুলি পাও, তুমি তা পড়ে কিছুই বুঝতে পারবে না।

এটা এরকম : ধর একটা বই পড়ছ এবং বইয়ের শেষের দুটি পাতা রেখে দিলে। এই শেষের দুটি পাতা দিয়ে কি পুরো বইটিকে ধরে রাখতে পারবে? না! একইভাবে আমার কিছু কথা লিখে নিয়ে তা থেকে পুরো জিনিষটা মনে করার চেষ্টা কোরো না। যখন আমি বলছি, তখন কেবল সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত থাক। তাহলেই যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে তোমার সমস্ত আবেগগুলি হল তোমার সাথে অচেতনতার খেলা। পূর্ণ সচেতনতা নিয়ে বাস করলে ভাবনাগুলি তোমাকে কখনই দোলাতে পারে না। তাই আমি বারংবার তোমাদের বলি যে নিজেকে সচেতনতা দিয়ে ভরিয়ে দাও।

দ্যাখো, তোমার দুশ্চিন্তা, তোমার শব্দাবলী, তোমার জীবনকে গড়তে বা ভাঙ্গতে পারে। তাদের এতটা বল আছে - তোমাকে ও অন্যদের প্রভাবিত করার। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমি 'গরু' শব্দটা বলি, সাথে সাথে কি হয়? চার পা, দুই শিং ও একটা লেজ নিয়ে একটা আকার তোমার মনে দৃষ্টিগোচর হয়। একটা ছোট্ট শব্দ তোমার মনে পুরো ছবিটা নিয়ে এল ! শব্দ এতই বলবান। শব্দগুলিকে সম্মান না করে এবং তাদের ভুল ব্যবহার করে কিন্তু আমরা ঝঞ্ঝাট চাইছি।

একটা ছোট গল্প :

বীরবল ছিলেন এক জীবনমুক্ত মাস্টার। একদা বীরবল ও তাঁর রাজা আকবর একসাথে রাস্তায় হাঁটছিলেন। একজন চন্দনকাঠের ব্যবসায়ীকে রাস্তায় দেখে আকবর বলে উঠলেন। 'জানি না কেন আমার এই লোকটিকে ফাঁসিতে চড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে।'
এক মাস পরে সেই লোকটিকে আবার দেখা গেল এবং আকবর এবার বললেন, 'অদ্ভুত, কিন্তু আমি এবার এই লোকটিকে কিছু সম্পদ দিতে চাই!'
লম্বা বিরাম নিয়ে বীরবল বলেন, 'একমাস আগে লোকটির চন্দনকাঠের ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না এবং সে তখন আপনাকে দেখার পর মনে মনে ভেবেছিল যে আপনি মারা গেলে আপনার শেষকৃত্যের জন্য সভাসদেরা তার থেকে অনেক চন্দনকাঠ কিনবে। সে এই প্রকার নকারাত্মক স্পন্দন ছড়াচ্ছিল এবং তাতে আপনি তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তার থেকে প্রচুর চন্দনকাঠ কিনে আমাদের রাজ্যের জন্য অনেক চেয়ার টেবিল বানিয়েছিলাম। আজ সে আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ মনে করছে। আপনি তার সেই সকারাত্মক স্পন্দন অনুভব করতে পেরেছেন এবং তাকে ভাল কিছু দিতে চাইছেন!'

বোঝ যে তোমার চিন্তায় প্রচুর বল আছে। তাই তোমার সকারাত্মক চিন্তা ও দুশ্চিন্তামুক্ত মানসিক গঠন খুব দরকারী।

প্রশ্ন : অনেক বইতে আছে 'ছোট জিনিষে ঘাম ঝরিও না।' কিন্তু ছোট জিনিষও তো গুরুত্বপূর্ণ, তাই নয় কি?

যখন তুমি বুদ্ধি দ্বারা কাজ কর, তুমি ছোট জিনিষের জন্য ঘাম ঝরানোর শ্রেণীতে পড়বে না।

একটা ছোট গল্প :

এক অল্পবয়স্ক লোক তার বন্ধুকে দেখতে গেল। সে বন্ধুকে দেওয়াল থেকে ওয়ালপেপার চেঁছে তুলছে দেখল।
সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আবার ঘর রঙ করবে?'
বন্ধু উত্তর দিল, 'আমি বাড়ী পরিবর্তন করছি।'

দ্যাখো, আমরা ছোট জিনিষ উপেক্ষা করতে পারি না। কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়ে যতটা মনোযোগ চাই ততটাই দেওয়া উচিৎ , নতুবা তুমি ঘাম ঝরাতে থাকবে। যারা ছোট ছোট ব্যাপারে মনোযোগ না দিতে বলে , তাদের কথা কখনও শুনবে না। মনে রেখ, একটা ছোট ফুটো এক বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। খালি বুদ্ধি ও সচেতনতা দিয়ে কাজ করে যাও, তুমি ছোট জিনিষটাকে চিনতে পারবে।

স্ববিরোধীতা ছাড়া তোমার যদি দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে তোমাকে ঐ ছোট জিনিষগুলি করতে হবে , তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলিকে সম্পাদন করার শক্তি পাবে। পুরোপুরি দৃঢ় প্রত্যয় না হলে সেগুলি সম্পাদন করার জন্য তোমার যথেষ্ট বিশ্বাস ও শক্তি হবে না। তোমার বুদ্ধি তোমাকে পূর্ণরূপে সাহায্য করবে না , কারণ বুদ্ধি শক্তি এবং শক্তিই বুদ্ধি।

ছোট ব্যাপারে যদি তুমি ঘেমে যাও, কোথাও কিছু ভুল আছে। পরিষ্কার করে বোঝ যে সমস্ত কষ্ট আসে স্ববিরোধীতাগুলি থেকে। নিজেই পরিষ্কার নও যে তুমি কি করতে চাও, তাই তুমি সেটা করতে অসমর্থ। সেই স্পষ্টতা হবার জন্য , তোমাকে নিজের বুদ্ধিকে প্রতিপালন করতে হবে।

যখন বুদ্ধি হয়, স্ববিরোধীতা মুছে যায় এবং তোমার একাঙ্গীভবন হয়। তোমার একাঙ্গীভবন শুরু হলে , বুদ্ধি আরও বাড়তে থাকে। এই চক্রে তোমাকে প্রবেশ করতে হবে। এই চক্রই তোমার দুশ্চিন্তাগুলি মুছে দিতে পারে।

যদি সত্যি সত্যি তোমার ভিতরের কিচিরমিচির ও দুশ্চিন্তা মুছে ফেলতে আগ্রহী হও , তাহলে একটি ছোট অনুশীলন চেষ্টা করতে পার। যে সব জিনিষ তোমাকে প্রফুল্লতা প্রদান করে তাদের ভাব। মনস্থির কর যে তুমি তোমার মনকে কেবল এই সমস্ত জিনিষের মধ্যে রাখবে, আর কিছুতে নয়। অন্য কিছু মনে এলে তাদের করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি দেবে ও তারপর তাদের ভুলে যাবে। এই অভ্যাসটি কর, সেখবে তুমি অনেক শক্তি সংরক্ষণ করছ।

বোঝ যে তুমি তোমার দুশ্চিন্তাগুলি সম্পর্কে বারবার কথা বলে তাদের অনেক শক্তি দিয়েছ। উদাহরণস্বরূপ , ঘরের বউ যখন টেলিফোন ওঠায় ও তার বন্ধুকে পায়, সে তার বন্ধুকে বলে যে তার কাজের লোক সেদিন আসে নি। সেটা তার সেদিনের ডিপ্রেশন। তুমি যদি সত্যিই কাজের লোক না আসার বিষণ্ণতা থেকে বাঁচতে চাও , তাহলে তুমি নিজেই ঘরের কাজ শেষ করে ফেলবে! এটা কি বেশী যুক্তিপূর্ণ শোনাচ্ছে না?

কিন্তু তুমি কি কর? তুমি সে সম্বন্ধে কথা বলতে থাক এবং আশা কর যে তোমার বান্ধবীও তোমার বিষণ্ণতায় খোরাক দেবে। সে যদি তোমার কষ্টে সমবেদনা না জানায় অথবা সে যদি বলে যে জীবন তো এরকমই এবং তোমাকে এগিয়ে চলতে হবে, তুমি

আরেক বান্ধবীকে ফোন লাগাবে এবং তাকে বলবে যে আগের বান্ধবী কত সহানুভূতিহীন। কেবল ভাব, যদি তুমি সত্যি সত্যি জীবনে এগিয়ে যেতে চাইতে, তুমি তোমার প্রথম বন্ধুর কথাগুলির দাম দিতে, তাই নয় কি?

কিন্তু তুমি অন্যভাবে সাড়া দিচ্ছ কেন? কারণ, দুশ্চিন্তাগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে তুমি খুব আরাম পাও এবং সেগুলি থেকে বার হয়ে আসার পথ খুঁজছ না।

এই ছোট অভ্যাসটি শুরু করলে দেখবে যে তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা মুছে যায় এবং তুমি এক নতুন মানসিক গঠন লাভ কর। তোমার ভিতরে এক শক্তির উচ্ছ্বাস আবিষ্কার করবে কারণ যে শক্তি আগে দুশ্চিন্তায় অপচয় হচ্ছিল তা এখন তোমার কাছে হঠাৎ করে উপলব্ধ।

সততার সাথে নিজেকে পরীক্ষা কর এবং দ্যাখ যে তুমি গুপ্তভাবে তোমার দুশ্চিন্তাগুলিকে প্রতিপালন করছ কিনা অথবা তুমি রূপান্তরিত হতে প্রস্তুত কিনা।

যখন তোমার দুশ্চিন্তাগুলির পিছনে যাওয়া বন্ধ কর, তুমি দেখতে সমর্থ হবে যে কিভাবে অন্যরা এই চক্রে অসহায়ভাবে আটকে আছে। তুমি দেখতে পাবে কিভাবে লোকেরা তাদের দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে অবিশ্রাম কথা বলে বলে দুশ্চিন্তাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে ফেলে। দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে এইভাবে কথা বলাকে আমি বলি 'দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা'! কেবল এটাকে লক্ষ্য করতে পারলেই এটা বন্ধ হবে। দ্রষ্টা হওয়া অবধি আবেগগুলিকে তুমি অনেক বল ও নিয়ন্ত্রণ দিয়ে তাতে নিজেই আটকে গেছ।

আমি তোমাকে তোমার দুশ্চিন্তাগুলি থেকে দৌড়ে পালাতে বলছি না। আমি বলছি, তাদের সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে সেগুলিকে বড় করে ফেল না। তাদের ওপরে তোমার শক্তি খরচ কোরো না। বরঞ্চ তাদের জন্য যেটা করা উচিত সেটা কর যাতে সেগুলি তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলা বন্ধ করে। এই কাজ কোন সময় নষ্ট না করে কর, ব্যাস।

নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ যে তুমি তোমার দুশ্চিন্তাগুলিতে আরামলাভ করতে শুরু করেছ কিনা। সেই স্কেলে বুঝতে পারবে যে দুশ্চিন্তাগুলি তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, নাকি তুমি দুশ্চিন্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছ। তুমি যদি তাদের সম্বন্ধে বারবার কথা বলতে আরাম পাও, তার অর্থ দুশ্চিন্তা তোমায় নিয়ন্ত্রণ করছে। যদি তুমি তাদের সাথে জড়িয়ে না পড় এবং তাদের জন্য সঠিকভাবে কাজ কর, তবে তো তুমিই তাদের নিয়ন্ত্রণ করছ!

প্রশ্ন : স্বামীজী, আগে আপনি মদ্যপান সম্বন্ধে বলেছিলেন। আমার পতি প্রায়ই মদ্যপান করে ও বলে যে সে তার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য পান করে। আমি কি করি?

উত্তর : আমি বলেছি যে এটা একটা সাধারণ সমস্যা এবং তোমার পতি এখানে থাকলে সাহায্য হত। মদ্যপানের অভ্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখবে যে এই অভ্যাসে তোমরা কত পরস্পরবিরোধী। সেটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি :

তুমি খুশী হবার জন্য মদ্যপান কর, কিন্তু শেষে শোচনীয়ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হও। তুমি সামাজিক হবার জন্য পান কর, যাতে সমাজ তোমাকে গ্রহণ করে, কিন্তু শেষে তর্কপ্রিয় হয়ে পড়!

তুমি অভিজাত হবার জন্য পান কর, কিন্তু শেষে অসহনীয় হয়ে ওঠ।
সব দুশ্চিন্তা ভোলার জন্য তুমি পান কর কিন্তু পরের দিন সকালে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠ !
তুমি খুশী পাবার জন্য পান কর, কিন্তু শেষে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়।
তুমি আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য পান কর, কিন্তু শেষে নিজেকেই ভয় পাও।
তুমি বার্তালাপ চালু রাখার জন্য মদ্যপান কর, কিন্তু শেষে অসংলগ্ন বলতে থাক।
সমস্যা সমাধানের জন্য পান কর, কিন্তু শেষে দেখ সেগুলি অনেক বেড়ে গেছে।

এই সত্যটি আমার চেয়ে তোমরা ভাল করে জান! এখন সততার সাথে বলবে কি? মদ্যপান করার কি কোন অর্থ আছে? এইভাবে তুমি খালি এই বিষয়েই নয়, জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই তুমি পরস্পরবিরোধী। যদি তুমি পরিষ্কার করে জান যে তুমি কি করতে চাও এবং সমস্ত শক্তি সেইদিকে খরচা করতে, তবে তুমি নিয়মিতভাবে বর্দ্ধিত হতে পারতে এবং আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে। তুমি কখনই পরস্পরবিরোধী হতে না।

প্রত্যেকবার মদ্যপান করার সময় সম্পূর্ণ সজাগতা সহকারে পান কর। প্রত্যেকবার পান করার সময়, সচেতন হয়ে পান কর, ধীরে ধীরে, নিজের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য কর, প্রতিটি ফোঁটার স্বাদ নাও এবং দেহ কিভাবে সাড়া দিচ্ছে লক্ষ্য কর। সূক্ষ্ম চেতনা দ্বারা এটাকে একটা প্রক্রিয়া বানিয়ে ফেল। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, প্রতিবার মদ্যপান করার সময় এটা করলে, তোমাকে অভ্যাস ছাড়তে হবে না, অভ্যাস তোমায় চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেবে।

কোনকিছুতে নেশা এক অচেতন বা যন্ত্রবৎ প্রক্রিয়া। খালি মদ বা তামাকের নেশা নয়। ধর্মেরও নেশা হয়। যারা অচেতনভাবে ও যন্ত্রবৎ প্রার্থনা করে, রুটিন মাফিক, তারা মাত্র একদিন প্রার্থনা না করতে পারলে খুব দোষী বোধ করে। তাদের জন্য এটা এক নেশা এবং তাই একদিন প্রার্থনা না হলে উদ্বিগ্ন হয়। একইভাবে সুরাসক্ত ব্যক্তি পান না করতে পারলে অসহায় হয়ে কাঁপতে থাকে, যন্ত্রবৎ ধার্মিক মানুষ তার রুটিন প্রার্থনা না করতে পারলে বিরাট শূন্যতা অনুভব করে।

সচেতনতার সাথে কাজ করা ও ভয়ে যন্ত্রবৎ কাজ করা, দুটির মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। সচেতনতার কাজ করলে কিছুই তোমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। এটা তোমাকে স্থান ও কালে বাঁধতে পারবে না। তুমি মাস্টার হয়ে যাবে। অচেতন হয়ে কাজ করলে তুমি বন্ধনে থাকবে এবং দুঃখকষ্ট পাবে। তুমি কেনা গোলাম হয়ে যাবে।

নেশা ছাড়তে গেলে তাকে সচেতনতা দিয়ে ভরিয়ে দাও। সেটা ঠিকভাবে রূপান্তরিত হবে। কখনই ভেবো না যে তোমাকে নেশা ছাড়তে হবে। যা কিছুকে অবরোধ করবে তা নাছোড়বান্দার মত অটল থাকবে। তোমাকে সহজভাবে তাকে সচেতনতা দিয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। যখন তুমি রূপান্তরের ভাষা বোঝ, তুমি ঠিক পথে আছ; তুমি উন্মুক্ত হবার পথে আছ।

আমি যা বলছি তা খুবই ব্যবহারিক (প্র্যাক্টিকাল)!

লোকেরা আমায় বলে, 'স্বামীজী, আপনাকে শুনে খুব অনুপ্রাণিত লাগে। এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলি প্রয়োগ করতে হবে এবং দেখতে হবে তা কাজ করে নাকি।'

আমি কেবল প্র্যাক্টিকাল জিনিষই বলি। কখনই ভেবো না যে আমার কথাগুলি দৈনদিন জীবনে করা যায় না।

যদি আমি বনে থাকা এক মানুষ হতাম এবং এগুলি বলতাম , তাহলে ভাবতে পার যে আমার কথাগুলি প্র্যাক্টিকাল নয়। কিন্তু এখানে আমি সারা বিশ্বে এক রূপান্তরের আন্দোলনের কথা বলছি! প্রকৃতপক্ষে আমি পুরাতন গ্রন্থ বেদান্তের কথাই কেবল নতুন শব্দে, আধুনিক পরিস্থিতিতে পুনরায় বলছি; যাতে তোমাদের তা শুনতে ভাল লাগে; যাতে তুমি বোঝ যে এটা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং তাকে অনুসরণ কর। যদি তুমি বইয়ের এই ভাবনাগুলি পড়, তা লেখকের মস্তিষ্ক থেকে তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। তাতে অভিজ্ঞতার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যখন তুমি এই কথা একজন জীবনমুক্ত সত্তা, যে আত্মজ্ঞানী, তাঁর কাছ থেকে শোন, কথাগুলি তোমার গভীরে প্রবেশ করে এবং ঈপ্সিত ফল দেয়।

আমি তোমাদের সাথে আমার জ্ঞান শেয়ার করছি না। আমি শেয়ার করছি আমার অভিজ্ঞতা, আমার জীবন। যখন আমি আমার সত্তা থেকে কথা বলি, তাকে তো তোমার সত্তাকে ছুঁতে ই হবে। তা তোমার জীবনকে রূপান্তরিত করবেই করবে। আর কোন পথ নেই।

বিবেকানন্দ শিকাগোতে বিশ্বধর্মমহাসভায় প্রথমবার বলেছিলেন, 'আমার প্রিয় আমেরিকান ভ্রাতা ও ভগ্নীরা...' এটা রেকর্ডে আছে যে তার পর অডিটোরিয়াম হাততালিতে ফেটে পড়ে! এক মহিলা লিখেছিল, 'সেটা কেবল হাততালি ছিল না। তিনি পুরো দেশটিকে জিতে নিয়েছিলেন। আমরা অনুভব করলাম যেন এক প্রেমের তরঙ্গ বয়ে গেল আমাদের মধ্য দিয়ে , আমাদের সত্তার মধ্য দিয়ে...!' সে পরে বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সেটা কিভাবে হয়েছিল এবং তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'কারণ সেটা আমার সত্তা থেকে এসেছিল।

বিবেকানন্দ তাঁর সত্তা থেকে বলেছিলেন। যখন শব্দাবলী মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়, সেটা অপর মানুষের মস্তিষ্ক ছোঁবে এবং তাকে বলে বার্তালাপ বা 'কমিউনিকেশন' (communication)। যখন শব্দাবলী হৃদয় থেকে নির্গত হয়, তা অপরের হৃদয়কে ছোঁয় এবং তাকে বলে ভাবের আদান-প্রদান বা 'কমিউনিয়ন' (communion)। বার্তালাপ যথেষ্ট নয়। আমাদের ভাবের আদান-প্রদান করা জানতে হবে। আমি আমার হৃদয় থেকে বলছি, তাই তোমরা পুরো হৃদয় দিয়ে শুনবে।

যখন বক্তা পূর্ণতা নিয়ে বলে, শ্রোতা পূর্ণতা নিয়ে শুনবেই। তার জীবন রূপান্তরিত হতে বাধ্য। যদি তোমার জীবন আমার কথার ছোঁয়া না পায়, তাহলে তো আমার বলার কোন অধিকার নেই। তুমি আমার অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার জন্য স্বাধীন। যদি তুমি অনুভব যে আমার কথা তোমার জীবন রূপান্তর করতে সমর্থ হয় নি , তোমাকে তোমার ভাবনা লুকিয়ে রাখতে হবে না। সেটাকে খুলে বল। কিন্তু তোমাকে ছোঁবে না, তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

হৃদয় দিয়ে শ্রবণ করলে দেখবে সময়কালে এই কথাগুলি তোমার জীবনে স্বতশ্চলভাবে কাজ করছে। যে শিক্ষক নিজের সম্পর্কে সংশয়িত কেবল সে তার শিষ্যদের ফিরে গিয়ে তার কথাগুলিকে অভ্যাস করার জন্য জোর দেয়। যখন এক মাস্টার বলেন, কেবল শ্রবণ করলেই হবে। পূর্ণ শ্রবণ কর, রূপান্তর ঘটবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ এটাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে। মাস্টার শিষ্যকে বলে : তৎ ত্বম্ অসি - সে হচ্ছে তুমি। কেবল শুনেই শিষ্য

প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করে! যখন মাস্টার ও শিষ্য দুজনেই পূর্ণতা নিয়ে কাজ করে, এটা সম্ভব।

যখন তুমি মাস্টারের আশেপাশে আছ, শব্দ পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। কেবল মাস্টারের আশেপাশে নীরবে থাকা ও তাকে আত্মভূত করা - এতে তোমার মধ্যে আসল রূপান্তর ঘটে। কিন্তু কি করা যায়? তুমি তোমার ভিতরের কিচিরমিচিরে এত জড়িয়ে পড়েছ। তাই আমি তোমাকে নীরব করতে শব্দ ব্যবহার করি। কারণ আমি যদি কথা না বলি, তুমি অবিশ্রাম নিজের ভিতরে কথা বলতে থাকবে, অতীতকে বিশ্লেষণ করতে করতে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করতে করতে, সিদ্ধান্ত নিতে নিতে, বিচার করতে করতে এবং কি নয়। যদি আমি কথা বলি, তুমি আমাকে হারানোর ভয়ে তন্ময় হয়ে আত্মভূত করতে থাকবে এবং সেই সময়ে আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করতে পারি!

যখন মাস্টার বলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে নিজের ভিতরে নীরব থাকেন। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে, যদিও তারা নীরব, তারা ভিতরে নিজেদের সাথে কথা বলে চলেছে - ভিতরের কিচিরমিচির থাকবে। সেটাই পার্থক্য। কেবল প্রত্যক্ষ কর, তুমি নীরব থাকলে তোমার ভিতরে কি চলছে। তোমার নীরবতা ব্যতিক্রমহীনভাবে কেবল এক হুড়াহুড়ি যা কর্ণগোচর নয়। তোমার ভিতরে তুমি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক না রেখে বাঁদরের মত লাফিয়ে বেড়াও।

এখন আমরা এক ধ্যান-প্রক্রিয়া করি, যাকে বলে 'মণিপুরক শুদ্ধি ক্রিয়া।' এটা মণিপুরক চক্রকে বিশোধন করবে।

আবেগ : দুশ্চিন্তা
চক্র : মণিপুরক চক্র
অবস্থান : নাভি অঞ্চল

সংস্কৃতে মণিপুরক মানে 'রত্নের নগর'

যখন তুমি অবিশ্রাম দুশ্চিন্তা কর, এই চক্রটি তালা বদ্ধ থাকে এবং তোমার দুশ্চিন্তা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করলে এই চক্র প্রস্ফুটিত হয়।

দুশ্চিন্তা মুছে ফেলার ধ্যান-প্রক্রিয়া : মণিপুরক শুদ্ধি ক্রিয়া - খ্রিস্ট-ধর্ম থেকে নাওয়া

মণিপুরক শুদ্ধি ক্রিয়া

(সময় : ৩০ মিনিট। খালি পেটে করতে হয়)

মণিপুরক শুদ্ধি ক্রিয়া খ্রিস্ট-ধর্ম থেকে নাওয়া এক প্রাচীন ধ্যান প্রক্রিয়া। তারা এটাকে গ্লসোলালিয়া (glossolalia) বলে। সুফীরা এটাকে 'গিবারিশ' (gibberish) বলে উপযোগী করে নিয়েছে। এই প্রক্রিয়া তোমাকে তোমার গভীরে খোদিত থাকা নকারাত্মক মানসিক নক্শা বা প্যাটার্নগুলিকে ও দুশ্চিন্তাগুলিকে মুছে দেবে। এটা তোমার চেপে রাখা সমস্ত ক্রোধ ও দুশ্চিন্তাগুলিকে মুছে দেবে। একবার এই প্রক্রিয়া করলে তুমি নাভি অঞ্চলে অবস্থিত মণিপুরক চক্রে খুব হালকা অনুভব করবে। সেটা তোমার দুশ্চিন্তা ও জটিল মানসিক নক্শার স্থান।

এই প্রক্রিয়া খালি পেটে অথবা ভোজনের দুই ঘন্টা পরে করা উচিৎ।

চোখ বন্ধ করে দাঁড়াও। তোমার নাভি অঞ্চলে গভীরভাবে চলে যাও এবং অনুভব কর সেই অঞ্চল কত ভারী লাগছে। সেই জায়গাতেই তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তাগুলি জমে আছে। এক মিনিট এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হও। তোমার ভিতরে নানা কারণ থেকে হওয়া সমস্ত দমিত ক্রোধ ও দুশ্চিন্তাগুলিকে কেবল অনুভব করার চেষ্টা কর।

এবার নাভি অঞ্চল থেকে যত জোরে পার অর্থহীন আওয়াজ বার করতে থাক। চেঁচানোর জন্য শব্দাবলী ব্যবহার কোরো না। যদি শব্দাবলী ব্যবহার কর, তাহলে কেবল পরিচিত ও অধুনা আবেগ ও ভাবনাগুলি সামনে আসবে এবং শব্দগুলি তার পিছনে ভাবনাগুলির সাথে কাজ না করে কেবল আরও বেশী শব্দ টেনে আনবে। একদম অর্থহীন ধ্বনি সহকারে চেঁচাও; কেবল তবেই তোমার অচেতনতা খুলে যাবে; কেবল এতেই গভীরে লুকানো ভাবনাগুলি বেড়িয়ে আসবে। তোমার হাত নাড়াও , চেঁচাও, আর্তনাদ কর; যদি চোখে জল আসে, তাকে বইতে দাও।

তোমার সমস্ত নকারাত্মক ভাবনাগুলিকে বমি করে বার করে দেবার জন্য তোমার পুরো বল দিয়ে এই প্রক্রিয়া কর। বেদনাদায়ক ঘটনাগুলি স্মরণ কর। তাতে জড়িত মানুষদের ছবির মত দেখ এবং সেই ঘটনাগুলিতে জড়িত ভাবনাগুলি অনুভব কর। সমস্ত ভাবনাগুলিকে বার কর। তাতে পূর্ণরূপে ডুবে যাও। অন্য কিছু অবহিত হয়ো না।

বিশ মিনিট পরে থাম। পরের দশ মিনিটের জন্য চোখ বোজা অবস্থায় নীরবে বসে পর। কেবল নিজের চিন্তাগুলির প্রত্যক্ষদর্শী হও। নাভি অঞ্চলে হালকা অনুভব কর। তুমি দেখবে সেই অঞ্চলটি কত হালকা ও আনন্দপূর্ণ। তোমার সমস্ত সত্তা খুব হালকা ও সাবলীল হবে।

ধীরে, খুব ধীরে, তোমার চোখ খোল।



পঞ্চম অধ্যায়

যৌন-কামনাকে ঐশ্বরিক প্রেমে রূপান্তরিত কর

যৌন-কামনার সারকথা

সবচেয়ে বেশী আলোচনা, চিন্তাভাবনা ও লেখালেখি হয়েছে যৌনতা বা সেক্স নিয়ে। আবার সেক্স বিষয়টি সবচেয়ে বেশী ভুল বোঝা হয়েছে, ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে! আমরা এই বিষয় এড়িয়ে যাই অথবা একে প্রশ্রয় দিই। আমাদের অচেতন মনে সেক্স গভীরভাবে সমাহিত আছে। শুরু থেকেই আমরা এমন মানুষ দেখি না যে এই বিষয়ে আমাদের সঠিক জ্ঞান প্রদান করতে পারবে।

যৌনতাকে, অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে, চেতনার আলো দিয়ে আলোকিত করা প্রয়োজন!

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে একটি মানুষের বনে হেঁটে যাবার মত এখন আমাদের অবস্থা। কোথাও একটা বড় গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

যে মানুষটি এই বিষয় পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে চায় সে পুরো অচেতন অবস্থায় আছে; সে তো জানেই না সেই গর্তটি কোথায় আছে - তাহলে সে কিভাবে তাকে এড়িয়ে যাবে?

যে মানুষটি একে প্রশ্রয় দেয় সে গর্তটি সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তাতে সিধা ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দেখতে পারে না।

এই দুটির মধ্যে একটিও কি কোন সমাধান হতে পারে?

জানা দরকার যে গর্তটা কোথায় আছে এবং তারপর সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে তার পাশ দিয়ে চলা উচিৎ।

সেক্স বিষয়টি সর্বদা ঝাড়ু মেরে কার্পেটের নীচে রাখা হয়। এটা একটা নিষিদ্ধ বিষয়। বাবামায়েরা এটা বাচ্চাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না। প্রথমত বাবামায়েরা নিজেরাই এই বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যগুলি জানে না! যে কোন বিষয়ে তোমাকে কোন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, নতুবা তুমি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না এবং বিষয়টিকে ভুল বুঝবে।

একটা ছোট গল্প :

> এক মহিলা তার ছেলের স্কুল-টীচারের কাছ থেকে চিঠি পেল।
> টীচার চিঠিতে লিখেছেন যে ছেলেটি বোর্ড ঠিক করে দেখতে না পারার দরুণ লিখতে ভুল করছে। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে এক চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখল।
> তাতে লেখা ছিল, 'চুল কাটতে হবে।'

আমরা এতে হাসছি, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, জীবনে যদি ঠিক লোকের কাছে প্রথমেই চলে যাও, তুমি সঠিক সমাধান পাবে, নতুবা তথাকথিত নানা বিশেষজ্ঞের চারপাশে গোল গোল ঘুরতে থাকবে এবং তারা অযথা তো মার সময় নষ্ট করবে।

আরও খারাপ হল, তুমি এই ভুল নক্শাগুলি পরের প্রজন্মকেও শেখাও। আর এইভাবে রীতি বা প্রথা শুরু হয়। যখন প্রথা চালু হতে দাও, সেটা ভেঙ্গে বেড়িয়ে পড়া এক বিশাল কাজ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ প্রথাটি তোমার কাছে অনেক বছর পর এক সত্য হয়ে গেছে।

যখন এক মাস্টার আসেন, তাঁর প্রথম কাজ হল তোমার ওপরে যা যা করা হয়েছে, সেগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কেবল তাহলেই তিনি তোমায় দেখাতে পারবেন যে তুমি আসলে কি। এটা তাঁর জন্য এক কঠিন কাজ কারণ তুমি তোমার রাস্তায় এতটা চলে গেছ যে তুমি ভাবতেই পার না যে তোমার রাস্তাটা ভুল হতে পারে!

বিষয়টিতে ফেরা যাক, 'সেক্স বা যৌনতা কি?'

সেক্স এক বিশাল সৃজনশীল শক্তি। এটা এক ধ্যানশীল শক্তি। পুরো বিশ্বের উদয় হয়েছে এই সেক্স -এনার্জী থেকে।

আমাদের দেশে আগেকার দিনের জীবনমুক্ত মাস্টারেরা, ঋষিগণ, আমাদের এই বিষয়ে পুরো স্বচ্ছতা দিয়েছেন। তোমরা কি জান, বাৎসায়ন, যিনি কামসূত্র লিখেছিলেন, একজন সন্নাসী ছিলেন? তিনি কুমার-ব্রতী (ব্রহ্মচারী) ছিলেন!

এমন কি তিনি কামসূত্র তাঁর নিজের মাতাকে নিবেদন করেছিলেন।

জীবনমুক্তি লাভ করার পর, তিনি একদিন ঘরে মার কাছে ফিরলেন। মা তাঁকে বললেন যেহেতু তিনি জীবনমুক্ত তাঁর নিশ্চয়ই

পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে। বাৎসায়ন মানলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন যে মা তাঁর কাছ থেকে কি শুনতে চান।

মা বললেন, 'আমি তোমার মা এবং জানি যে তুমি জন্ম থেকেই কুমার-ব্রত ধারণ করে আছ। কোন সুযোগই নেই যে তুমি সেক্স বিষয়টি কোন অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছ। কিন্তু আমাকে এই বিষয়ে কিছু বলতে পারবে?'

বাৎসায়ন মৃদু হাসলেন ও নিবেদন করলেন কামসূত্র - সেক্সের বিজ্ঞান!

বাৎসায়নকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এই বিষয়ে বলার জন্য আপনার কি অধিকার আছে?'

একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন! আমি জানি তোমাদের অনেকেই এই প্রশ্নটি নীরবে আমাকেও করছ।

বাৎসায়ন যে উত্তর দিলেন, আমি তাকে আধুনিক ভাষায় আধুনিক সাদৃশ্যতা দিয়ে অনুবাদ করছি।

একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান ঘরে এলে সে ঘরের প্রতিটি সুইচ অফ ও অন হলে কি হবে তা জানে। সে দেওয়ালের ভিতরে লুকানো সমস্ত ইলেকট্রিক তারগুলি সম্বন্ধে জানে। যদি কোন সমস্যা হয়, সে তার কারণ সঠিক নির্ধারণ করে সেটার সমাধান করে।

সে বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটির বিজ্ঞান বোঝে।

অন্যদিকে, তুমি, যে নাকি দিনে পঞ্চাশ বার ঐ সুইচগুলিকে অফ অন করছ, একদমই জান না যে দেওয়ালের পিছনে কি হচ্ছে! আমি ঠিক বলছি তো?

আমাদের বেশীরভাগই অফ আর অন করা ছাড়া কিছুই জানি না। তাই আমরা মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রিক শক্ পাই! তাই বোঝ যে আমরা বাবা, মা বা ঠাকুরদা হতে পারি - কিন্তু আমরা সেক্স সম্বন্ধে হয়ত কিছুই জানি না।

আমাদের সবার ওপর অবিশ্রাম হর্মোনের অত্যাচার চলছে। টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যম যৌনতা নানা ভাবে দেখায় এবং আমরা তা দেখে ভাবি আমরা সেক্স ও প্রেম সম্বন্ধে সবই জানি।

কেবল একজন জীবনমুক্ত মানুষই তোমাকে সেক্স বিজ্ঞান দিতে পারেন।

ভারতবর্ষ তার অঢেল সম্পদ ও জমির জন্য বারবার লুণ্ঠিত হয়েছে। এইসব লুণ্ঠনে ভারতের কোন বড় ক্ষতি হয় নি এবং প্রতিটি আক্রমণের পর ভারত আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে ও ভারতীয় সমাজ উঠে দাঁড়ায়। সবশেষে, আমাদের গুরুকুল প্রথা, গুরুর পায়ের কাছে বসে শিক্ষার পুরাতন প্রথাকে ব্রিটিশরা ধ্বংস করে এবং কামসূত্র বাচ্চাদের আর শেখানো হয় না। এতে ভারত সবচেয়ে বড় আঘাত পায়। এইসময় লোকেদের আর সেক্সের অর্থ বোঝা হয়ে উঠল না এবং তারা কামাগ্নিতে জ্বলতে শুরু করল।

কখনও দুটি মানুষকে দাবা খেলতে দেখেছ? যখন খেলাটা দেখ, অনেক সময় ঠিক চালটা তোমার মনে আসবে - কিন্তু দুই খেলোয়ারের মাথায় সেটা আসে না! তোমরা কজন এটা লক্ষ্য করেছ? তোমরা এর কারণ কি মনে কর?

কারণ আমরা খেলাটিতে জড়িত নই, স্বামীজী?

হ্যাঁ! আসলে যে মানুষটি লক্ষ্য করছে সে জিতবার চাপে নেই। মানসিক চাপ মনকে ভোঁতা করে দেয়। তাই খালি যে মানুষটি খেলা থেকে বেড়িয়ে এসেছে, যে এক নিছক প্রত্যক্ষদর্শী, তোমাকে এর সম্পর্কে ঠিক ধারণা দিতে পারবে। মাস্টার তিনিই হন যিনি পুরোপুরি জানেন। সেইজন্য তিনি যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন।

তাহলে সেক্স কি?

আজ বায়োলজি প্রমাণ করেছে যে, কোন পুরুষ ১০০% পুরুষ নয় এবং কোন মহিলাও ১০০% মহিলা নয়। এখন পুরুষ ৫১% পুরুষ ও ৪৯% মহিলা। তেমনি, একজন মহিলা ৫১% মহিলা ও ৪৯% পুরুষ; ৫০% থেকে খালি ১% এর পার্থক্য।

তোমার জন্ম হয়েছে তোমার বাবার মূলাধার (সেক্স-এনার্জী কেন্দ্র) এবং মায়ের মূলাধার থেকে। তাহলে তুমি কিভাবে কেবল পুরুষ বা কেবল মহিলা হবে? দুজনের বিশিষ্ট গুণগুলি তোমার ভিতরে থাকতে বাধ্য!

ভগবান শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপের তাৎপর্য এটাই, যাঁর শরীরের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। আমরা স্বীকার করি কি না করি, আমরা নারী ও পুরুষ দুই শক্তিরই মূর্তপ্রকাশ। আমরা পূর্ণ, বিভাজিত নই।

সেক্সের পুরো ধারণা তন্ত্র সুন্দরভাবে বর্ণনা করে। শাস্ত্রে ভগবান শিব এই বিষয়ে দেবী পার্বতীকে বলেন। হাজার হাজার বছর আগের সেই লিখিত অন্তর্দৃষ্টি আজও জীববিজ্ঞানে প্রাসঙ্গিক।

পরিপূর্ণ ও অটুট হবার জন্য আমাদের প্রকৃতির দুটো রূপ, পুরুষ ও নারী, দুটোই গ্রহণ ও প্রকাশ করতে সমর্থ হওয়া অপরিহার্য।

কিন্তু সত্যি কি তা হয়? আমাদের কি দুটি রূপ প্রকাশ করতে অনুমতি দেওয়া হয়?

জন্মের সময় থেকে সমাজ তোমাকে লেবেল করে দিয়েছে ছেলে বা মেয়ে বলে এবং তুমি তদনুরূপ ব্যবহার করবে বলে সমাজ আশা করে। সমাজ ছেলেদের নারীভাব প্রকাশ করতে দেয় না, আবার মেয়েদেরও পুরুষভাব প্রকাশ করতে দেয় না। একদম ছোটবেলা থেকে আমাদের সত্তার একটি ভাগ দমন করে রাখা হয়।

সাত বছর বয়স পর্যন্ত, সমাজের নিয়ন্ত্রণ গভীরে প্রবেশ করার আগে, বাচ্চারা নিজে মেয়ে কি ছেলে, সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাই একদম ছেলেবেলায় বাচ্চাদের পূর্ণতার ভাব থেকে। সে কেন্দ্রিত ও সুরক্ষিত। তাকে দেখতে কত সুন্দর ও আনন্দময় লাগে ! সাত বছরের কাছাকাছি হ'লে বাচ্চা সমাজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

একটা বাচ্চা ছেলেকে পুতুল ও রান্নাঘরের খেলনা নিয়ে খেলতে উৎসাহ দেওয়া হয় না। বাচ্চা মেয়েকে রেসিং কার ও রকেট নিয়ে খেলতে উৎসাহ দেওয়া হয় না। এমনকি তাদের কাপড়ের রঙ ও অন্যান্য বস্তুর বেলাতেও বৈষম্য আছে। ছেলেদের জন্য নীল পছন্দ কর ও মেয়েদের জন্য গোলাপি, তাই না?

আগেকার দিনে বাবা-মায়েরা বাচ্চাকে গুরুকুলে রেখে আসত। গুরুকুল ছিল আবাসিক স্কুল এবং তার প্রধান বৈদিক -মাস্টার হতেন। গুরুকুলে বাচ্চাদের শেখান হত গায়ত্রী মন্ত্র - সাত বছর বয়সে বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করার জন্য এক মন্ত্রদীক্ষা। যদি চৌদ্দ বছর বয়সের আগেই তাদের কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তবে তাদের পড়ানো হত ব্রহ্মসূত্র - বিশ্বদর্শনের সবচেয়ে মহান পুস্তক। নয়ত তাদের শেখান হত কামসূত্র - সেক্স-বিজ্ঞান, যাতে তারা পরিবার জীবনের কলা শেখে। একুশ বছর বয়সের আগে কেউ জীবনমুক্ত হলে, তাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়া হত। তা না হলে তাকে যোগসূত্র পড়ানো হত। এইভাবে মাস্টারের নির্দেশ ও প্রেম দ্বারা একটি শিশুকে তার নিজের মত করে বিকশিত হতে দেওয়া হত।

কিন্তু আজকাল বড় কঠিনভাবে শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তা শিশুর পক্ষে হানিকারক। বাচ্চা তার সেই অংশটিকে চেপে রাখে যেটাকে সমাজ অনুমোদন করে না। আমরা সেটা বুঝি না , কিন্তু সেই সময়টি বাচ্চার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক। সে হঠাৎ মূল থেকে ছিন্ন বোধ করে, যেন তার সত্তার অন্য অর্ধেক অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। তার চেপে রাখা অর্ধেক অংশকে সে বাইরে খুঁজতে শুরু করে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হল সম্পূর্ণতা। সে পূর্ণ থেকে এসেছে এবং তাকে পুনরায় পেতে চায়। তাই ছেলেবেলায় সে তার হারিয়ে যাওয়া অর্ধেক অংশটিকে অচেতনভাবে খোঁজা শুরু করে। সে বহির্জগতে তার হারিয়ে যাওয়া অর্ধেক অংশটির বিকল্প খোঁজা শুরু করে। ছেলেরা খোঁজে মেয়েদের সংস্পর্শ ও মেয়েরা খোঁজে ছেলেদের সংস্পর্শ।

এখানেই সেক্সের পুরো ধারণার শুরু। সেক্সের ধারণার মূল এটাই।

সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত, বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়ের খুব কাছে থাকে। বাবা-মার কাছ থেকে বাচ্চারা আদর্শ পিতা ও আদর্শ মাতা কেমন হওয়া উচিত তার ছবি সংগ্রহ করে। ছেলের জন্য, তার ব্যক্তিত্বের দমিত অর্ধেক অংশ তার মায়ের ছবি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং একটি মেয়ের ব্যক্তিত্বের দমিত অর্ধেক অংশ তার বাবার ছবি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

তাই সমস্ত ছেলের প্রথম হিরোইন হল তার মা এবং প্রতিটি মেয়ের প্রথম হিরো হল তার বাবা। এই গভীর অন্বেষণই ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের ইডিপাস ও ওফেলিয়া কমপ্লেক্স। একটি ছেলে আশা করে যে তার পত্নী তাকে তার মায়ের মত সেবা করবে এবং একটি মেয়ে আশা করে যে তার পতি তাকে তার পিতার মত সুরক্ষা করবে ও আশ্বাসন দেবে।

মৃত্যু বা ডিভোর্সের জন্য ভেঙ্গে যাওয়া ঘরে, যেখানে বাচ্চা মা অথবা বাবার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত, সেখানে বাচ্চা এক অপূর্ণতার ভাব বহন করে। এমনকি সাবালক হবার বহু বছর পরেও, বাবা-মায়ের সাথে যতই মতভেদ হোক না কেন, তুমি তাদের ছাপ তোমার সত্তা থেকে মুছে ফেলতে পার না। তাই বাবা-মার সান্নিধ্য ছোটবেলায় না পেলে, শিশুর মধ্যে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

চৌদ্দ হলে বাচ্চা শারীরিক পরিপক্বতা লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে সামাজিক নিয়ম তাকে আগের মত বিপরীত লিঙ্গের মা-বাবার সাথে একই রকম ঘনিষ্ঠতা করতে দেয় না, তাদের কাজকর্মও বিভিন্ন রকম হয়ে যায় এবং তারা বাবা-মায়ের সাথে বেশী সময় থাকে না।

তাই চৌদ্দ বৎসর বয়স হলে, অন্বেষণ চালু থাকে, কিন্তু এবার বহির্জগতে। আজকাল এটা চৌদ্দ হবার অনেক আগেই হয়ে যায়। বাচ্চারা টেলিভিশন ও ইন্টারনেট কম বয়স থেকেই জেনে যায়। তাই তারা মানসিকভাবেও তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে বহির্জগতে অন্বেষণ শুরু হয়।

বাচ্চা এখন বাইরের মানুষ ও গণমাধ্যম (media) থেকে ছবি সংগ্রহ করা শুরু করে। মিডিয়া সেটা ভাল করে জানে। তাই দেখবে যে সমস্ত বিজ্ঞাপনে যৌনতার অন্তঃপ্রবাহ থাকে।

সমস্ত মোটরবাইকের বিজ্ঞাপনে মেয়েরা থাকে, যদিও খুব কম মেয়েরাই সেই সব বাইক চালায়। যে কোন উৎপন্নদ্রব্যই হোক না কেন দেখবে যে হাসিমুখের মেয়েরা সেটাকে সুপারিশ করছে। বাজারে গেলে তুমি সেই উৎপন্নদ্রব্য উঠিয়ে নাও , এটা ভুলে যাও যে তার সাথে সেই মেয়েটি আসবে না। মিডিয়া তোমার দমিত বাসনাকে ব্যবহার করতে ভাল করেই জানে।

ম্যাচিং গেম

সমস্ত মিডিয়া বা গণমাধ্যম স্বপ্ন বিক্রয় করে। তারা যে স্বপ্ন বিক্রী করে আমরা তাদের সংগ্রহ করি ও তৃষ্ণা মিটানো জন্য আমাদের মনে তাদের চালাতে থাকি। তা কি সম্ভব? তোমার জলের তেষ্টা কি লবণ দেয়ে মেটানো যায়? না! বরং তোমার তেষ্টা বেড়ে যাবে।

তুমি যদি সতর্ক ও সচেতন হও, বিজ্ঞাপনগুলি তোমাকে বোকা বানাতে পারবে না। কোন সন্দেহ নেই যে সেগুলি দেখে তুমি বাজারের সর্বশেষ অবস্থার সাথে ওয়াকিবহাল হবে, কিন্তু সেগুলি তোমাকে ঠকাবে না।

তুমি সেগুলি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তুমি সেগুলিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে সমর্থ হবে ও তাদের সে খানেই ছেড়ে দেবে। তুমি সেগুলির দিকে এক তাৎক্ষণিক ও অচেতন আকর্ষণ অনুভব করবে না। কেবল যখন তোমার প্রভাবিত মনকে সিদ্ধান্ত নেবার কর্তৃত্ব দাও, তুমি সমস্যায় আছ। তোমার প্রভাবিত মনকে বুদ্ধি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন যাতে তুমি সর্বদাই সচেতন থাক। এই ব্যাপারে ধ্যান খুব সাহায্য করে।

একদিকে মিডিয়া তোমাকে তোমাকে স্বপ্ন গেলায়, অন্যদিকে সমাজ তোমাকে দমন করে। সমাজ যত তোমার কল্পনা ও বাসনা দমন করতে চেষ্টা করে, কল্পনা তত বাড়ে, কারণ সমাজ তার মূলকে সম্বোধন করে না। তুমি যখন একটা গাছের কেবল ডালপালা কেটে ফেল এবং তার মূল এমনি ছেড়ে দাও, কি হয়? গাছ আরও সতেজ হয়ে বাড়ে।

এই কয়েক বছরে, চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমরা সমস্ত প্রকার মিডিয়া থেকে আদর্শ নারী বা আদর্শ পুরুষের ধারণা নেই। প্রতিটি মানুষ থেকে আমরা সবচেয়ে ভাল নাক, সবচেয়ে ভাল চোখ, সবচেয়ে ভাল ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের 'আদর্শ মানুষ' সৃষ্টি করি। আমরা একটা 'কাট অ্যান্ড পেস্ট মেথড্' ব্যবহার করি! কম্পিউটারে তো তুমি অনেক কাট-অ্যান্ড-পেস্ট কর।

এই অবস্থা প্রায় সাত বছর ধরে থাকে, তারপর আমরা ২০ বা ২১ বছরের হই। সেই সময়ে মিডিয়ার সাথে সমীকরণ কমতে থাকে - কিন্তু ভাবনাগুলি ইতঃপূর্বে আমাদের মনে গভীরভাবে গেঁথে গেছে। তখন আবার নতুন করে খোঁজা শুরু হয় - আমাদের সেই আদর্শ মানুষকে পাবার জন্য। 'এরকম হবে', 'এরকম হওয়া উচিত' এই ভাবনা নিয়ে এই খোঁজ। এখান থেকেই প্রত্যাশা শুরু হয়।

পরের সাত বছর, সেই খোঁজ চলে। মানুষের পর মানুষ আমরা চেষ্টা করি এবং হতাশ হয়ে পড়ি। কিছু বুদ্ধিমান মানু ষ পরে বোঝে যে এই স্বপ্নগুলি বাস্তব হতে পারে না। যেহেতু স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে না , তাদের স্বপ্ন বলা হয়! কিন্তু বেশীরভাগ মানুষই খুঁজতে থাকে।

একটা ছোট গল্প :

> একজন ৯০ বছরের মানুষ সমুদ্রতীরে একটা বেঞ্চে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকেদের আসা -যাওয়া দেখত।
> আরেকজন এটা লক্ষ্য করে তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি এখানে রোজ বসে বসে কি করেন?'
> লোকটি উত্তর দেয়, 'আমি একজন মহিলা খুঁজছি যাকে আমার পত্নী বানাতে পারি। '
> অন্যজন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি যৌবনে তা খোঁজেন নি কেন?'
> বেঞ্চে বসা লোকটি বলে, 'আমি তো ৩০ বছর বয়স থেকে খুঁজে যাচ্ছি।'
> অন্য লোকটি আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি রকম মহিলা খুঁজছেন?'
> সে উত্তর দিল, 'আমি এক আদর্শ মহিলা খুঁজছি।'
> অন্যজন বলে, 'আর আপনি একটাও পেলেন না।'
> 'আমি একজন মহিলাকে পেয়েছিলাম যে আমার মনের মত মানানসই ছিল কিন্তু তার জন্য ব্যাপারটা ঠিক কাজ করে নি,' সে উত্তর দেয়।

> অন্য লোকটি জিজ্ঞাসা করে কেন।
> বেঞ্চের বুড়ো বলে, 'সে এক আদর্শ পুরুষ খুঁজছিল!'

এটাই হয় যখন আমরা মনের বহন করা ছবি অনুযায়ী নিখুঁত পাত্রপাত্রী পাবার চেষ্টা করি।

কিন্তু লম্বা খোঁজের পর, আমরা হঠাৎ একজনকে পাই যে আমাদের মনের ছবির সাথে মেলে - দূর থেকে। আমাদের মনের ছবিটা সবুজ এবং মানুষটির যে ছবি আমরা দেখি সেটাও সবুজ - তখন সবই সবুজ! মনে হয় যে সঠিক পাত্র বা পাত্রী পাওয়া গেছে!

এই সময়ে যা হয় তাকে বলা হয় 'প্রেমে পড়া।' প্রেমে পড়ার এটাই বিজ্ঞান। লক্ষ্য কর যে এটা সর্বদাই 'পড়া', কখনই প্রেমে 'ওঠা' নয়! কারণ আসলে আমাদের বিরাট প্রয়োজন ও প্রত্যাশার জন্য, আমরা জিনিষগুলিকে সেভাবে দেখি যেভাবে আমরা তাদের দেখতে চাই। আমরা আমাদের মানসিক প্রতিচ্ছবি অপরের ওপরে অভিক্ষেপ করি।

যাই হোক, পৃথ্বী তখন সবুজে ও গানে ভরে যায় এবং জীবন এক কবিতা হয়ে যায়। সবশেষে আমাদের খোঁজ শেষ হয় ! এই মঞ্চে আমরা কবিতা লেখা, ছবি আঁকা ও আরো কত কি শুরু করি।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুরত্ব বজায় রাখা হয়, জিনিষগুলি নির্ঝঞ্ঝাটে চলে। আমরা আমাদের কল্পনা অন্যের ওপরে অভিক্ষেপ করতে থাকি। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষটি আরও সামনে আসে এবং তখন আমরা ভাবি যে যাকে অতটা সবুজ মনে করেছিলাম, সে অতটা সবুজ নয়, সে মলিন সবুজ। কিন্তু সেটা ঠিক আছে মনে হয় ও আমরা চলতে থাকি। তারপর আমরা আরও সামনে আসি এবং মনে করি এটা তো মলিন সবুজও নয়, এটা হলুদ রঙের একটা শেড।

এই পরিস্থিতিতে আমরা মেনে নিতে চাই না যে আমাদের কল্পনা মিথ্যা হয়ে গেছে, তাই আমরা সেই পরিস্থিতির জন্য কৈফিয়ত দিতে থাকি। আমরা নিজেদের বলি, 'এটাই জীবন! সবকিছু নিখুঁত হতে পারে না!' এবং আরও কত কি। বাস্তবে বাস করার জন্য অনেক সাহস, অনেক বুদ্ধি চাই। তাই আমরা এই অজুহাতগুলিকে একটা বাফার (buffer) সিস্টেম হিসাবে ব্যবহার করি।

সবশেষে আমরা যখন একদম সামনাসামনি এসে পড়ি, আমরা দেখি যে এটা হলুদও নয়; এটা কেবল সাদা! যেটা আমাদের ভিতরে সবুজ বলে গণ্য করেছিল, বাইরে সেটা সাদা। কল্পনা ও বাস্তবতা একেবারেই আলাদা।

একটা ছোট গল্প :

> একটা লোক তিনতলা থেকে রাস্তায় পড়ে গেল। এক পথচারী তার দিকে দৌড়ে গেল ও জিজ্ঞাসা করল, 'পড়ে যাওয়া ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক।'
> লোকটি উত্তরে বলে, 'না। পড়তে থাকার সময় কোন ব্যথা নেই; কেবল হঠাৎ থেমে যাওয়াতে ব্যাথা লাগে!'

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালবাসায় ভাসতে থাকি ও মাখামাখি করতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুরত্ব বজায় রাখি ও মিলনসময় ছোট রাখি, আমরা ঠিক আছি; আমরা এক অলীক কল্পনার জগতে আছি; আমরা ব্যবহারিক স্তরে সেই। এই ভাসমান অবস্থা বন্ধ হয়ে প্রকৃত সম্বন্ধ শুরু হলে যখন দুরত্ব কমে ও একসাথে থাকার সময় বাড়ে , তখন সমস্যা শুরু হয়!

অলীক কল্পনা যত সংগ্রহ করবে, মাটিতে ছোঁবার আগে তত বেশী সময় ধরে পড়তে থাকবে এবং তাই আরও বেশী হানি হয়। সংগৃহীত অলীক কল্পনা যত কম হবে, তাদের তত কম জিনিষের সাথে তুলনা করতে হবে এবং তাতে বিপদ কম হবে। কিন্তু তোমার যদি কোন অলীক কল্পনা না থাকে, তোমার আদর্শ জীবনসঙ্গীর সাথে অবিলম্বে দেখা হবে। যদি তোমার অলীক কল্পনা না থাকে, যাকেই বিয়ে কর সে তোমার আদর্শ জীবনসাথী হয়ে যাবে।

আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমাদের মনের কল্পনার ছবির মত জীবন্ত কোন মানুষই হতে পারে না, কারণ ছবিটি বাস্তবতা থেকে সৃষ্টি হয় নি। আমাদের স্বপ্নজগতের নানা স্থান থেকে কাট অ্যান্ড পেস্ট করে ছবিটি হয়েছে ! বাস্তবতা এর সাথে মিলবে না কারণ এটা তো একটা ছবিমাত্র, একটা অলীক কল্পনা!

যদি তুমি তোমার ছবিগুলি সংগ্রহ কর বাস্তব জগতের চরিত্রদের থেকে , যারা তোমার আশেপাশে আছে, তবে তা ঠিক আছে। কিন্তু তুমি তো সেগুলি মিডিয়া বা গণমাধ্যম থেকে সংগ্রহ কর।

মিডিয়া নিজেই বাসনায় ভুগছে! তারা কিভাবে তোমায় পথনির্দেশ করবে বা স্বস্তি দেবে?

তাই সমস্ত তথাকথিত প্রেম প্রায়ই বেদনাতে শেষ হয়। শেষে মনে হয় আমরা ঠকেছি বা আমাদের থেকে সুযোগ নাওয়া হয়েছে। আমাদের প্রাথমিক উপজ্ঞা বা সহজপ্রবৃত্তি (basic instinct) হ'ল, যা হয়েছে তার জন্য অন্যজনকে দোষ দেওয়া।

কিন্তু সেটা কি অন্যের দোষ?

না! কারণ আমরা কিছু আশা করেছিলাম, নিজের কল্পনা অন্যের ওপর চাপিয়েছিলাম, আর সেখানেই তো সমস্যার সূত্রপাত।

দ্যাখো, অনেক সময় কেউ অযৌক্তিক ও খামখেয়ালি ব্যবহার করতে শুরু করে। সেই ঘটনাগুলি ব্যতিক্রম এবং তখন তোমায় ঠিক করতে হবে তুমি এইপ্রকার ব্যবহারের সাথে বাস করতে থাকবে কিনা। আমার আগের কথাগুলো এখানে প্রয়োগ করতে পার না। ব্যতিক্রম সবসময় থাকে।

কিন্তু আমি যা বলছি তা বাস্তবে বহু ঘরে হচ্ছে যেখানে দুজনেই স্বাভাবিক এবং তা সত্ত্বেও ঘরে অশান্তি। কিন্তু আমরা কখনই এতে গভীরভাবে দেখি না। আমরা সত্যের সাথে কাজ করতে কখনই পছন্দ করি না।

আমি কি বলতে চাইছি তা বোঝ। তোমার কল্পনা মুছে ফেল এবং বাস্তবতার সাথে বাস করা শুরু কর।

একটা ছোট গল্প :

> একজন তার বন্ধুকে একটি কুকুরছানা বিয়েতে উপহার দিল।
> তিন মাস পর তাদের রাস্তায় দেখা হল।
> ‘বিবাহিত জীবন কেমন চলছে?’ একজন অন্যকে জিজ্ঞাসা করে।
> ‘ও, কিছু ছোট পরিবর্তন হয়েছে, ব্যাস’, উত্তর এল।
> ‘কিসের পরিবর্তন?’ পরের প্রশ্ন।
> ‘প্রথমে কুকুরছানাটি আমার দিকে ঘেউঘেউ করত এবং আমার স্ত্রী আমার জন্য পত্রিকা নিয়ে আসত । এখন স্ত্রী আমায় লক্ষ্য করে চেঁচায় আর কুকুরছানা আমার জন্য পত্রিকা নিয়ে আসে !’, বিবাহিত লোকটি উত্তর দিল।

একবার মধুচন্দ্রিকা (honeymoon) শেষ হয়ে গেলে কি হয়? আশ্চর্যের কিছু নেই, এটাকে মধুসূর্য (honeysun) না বলে মধুচন্দ্রিকা বলা হয়! সুখ ব্যতিক্রমহীনভাবে কেবল এক পক্ষকাল (১৫ দিন) থাকে! আমি বলছি তুমি যদি এক সুপারমডেল বিয়ে কর, তোমার চোখ থেকে তার সৌন্দর্য ১৫ দিনেই মলিন হয়ে যাবে, কারণ তুমি ইতঃপূর্বে অপর কোন সুন্দরী সম্বন্ধে কল্পনা করতে শুরু করেছ! আর তুমি অলীক কল্পনা করতে থাক, কারণ আসলে তুমি নিজের ভিতরে পরিতৃপ্তি চাইছ, কিন্তু সেটাকে এই সব তৈরী করা ছবির মাধ্যমে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছ।

> এক মহিলা তার মেয়েকে বিবাহ বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছিল। ‘শোন সোনা, যখন তুমি কাউকে ভালবাস, সেটা জীবনভোর হওয়া উচিত; কেবল তবেই সেটা আসল প্রেম।’
>
> মেয়ে মায়ের কথা শুনছিল।
>
> মা বলে চলে, ‘আমার কথা উপদেশ হিসাবে নাও। আমি জানি আমি কি বিষয়ে কথা বলছি। আর যাই হোক আমি তিনবার বিয়ে করেছি।’

সমস্যা হল সবাই পরামর্শ দিতে তৈরি, কিন্তু নেবার কেউ নেই!

যাই হোক, নিদেনপক্ষে আমরা যখন দেখি যে বাইরের জিনিষটা সাদা, যদি আমরা বাস্তবতা গ্রহণ করি, তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা কি চুপ করে থাকি? না! আমরা আমাদের তুলি ও রঙ দিয়ে সাদাকে সবুজ করার চেষ্টা করি ! আমরা আমাদের মানসিক নক্শার মানানসই করে অন্য মানুষটিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি। যেভাবে আমরা তাকে কল্পনা করেছি সেভাবে তার ভাস্কর্য করার করার চেষ্টা করি। আমরা অন্যকে বশে আনার চেষ্টা করি এবং তাদের বস্তুতে বদলে ফেলি। আমরা শক্তিকে বস্তুতে নামিয়ে আনি। এখানেই সমস্যা শুরু হয়!

একটা ছোট গল্প :

> একজন লোক পেশায় ছিল চিত্রশিল্পী বা পেইন্টার।
> সে তার বন্ধুকে বলছিল, ‘একবার আমার কাছে একটি মেয়ে গাঢ় নীল রঙের টুকরা নিয়ে এসে বলে যে আমাকে একই রঙের একটি বাড়ীর মডেল আঁকতে হবে। আমি ভাবলাম এই রঙ মেলাতে গিয়ে আমাকে তো আমার পেশাই ছেড়ে দিতে হবে। মেয়েটি কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল না।’
> বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, ‘অবশেষে রঙ মিলল?’

> সে উত্তর দিল, 'আমার ভাগ্য ভাল। তার মোবাইলে একটা কল এল এবং সে যখন কথা বলছিল আমি তাড়াতাড়ি সেই টুকরাটিকেই রঙ করে ফেললাম!'

সমস্ত দিন ধরে, প্রত্যেক বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা যত্ন সহকারে শোন। তুমি দেখতে পাবে ছেনি-হাতুড়ির কাজ চলছে! আমার মনে হয়, বিয়েতে মঙ্গলসূত্র ও আংটির সাথে ছেনি-হাতুড়ি উপহারে দেওয়া যায়!

আরেকটা ছোট গল্প :

> একটি লোক তার বন্ধুর সাথে সন্ধ্যাবেলা চা খাচ্ছিল।
> লোকটি তার বন্ধুকে বলে, 'আমি আমার বউকে ডিভোর্স করার পরিকল্পনা করছি। গত ছয় মাসে সে আমার সাথে একটা কথাও বলে নি।'
> বন্ধু বলে, 'এরকম সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি এরকম বউ পাবে না।'

জীবনে যদি আমরা আমাদের ভিতরের ছবিগুলি মুছে ফেলি, আমরা অসীম সম্ভাবনা পেয়ে যাব!

তুমি যদি অবিবাহিত হ'লে তোমার অলীক কল্পনা ছেড়ে দাও, যাতে তুমি তোমার জীবনসাথী পছন্দ করতে পার, স্বপ্নসাথী নয়। যখন কাউকে পছন্দ কর, নিজেকে মনে করাও যে তুমি সারা জীবন তার সাথে থাকবে, কিছু মাসের জন্য নয়। এটা কোন মজার ঘটনা নয়। এটা একটা সারা জীবনের ব্যাপার।

এখন পর্যন্ত যে কোন কালো জীন্‌স্ বা নীল টী-শার্ট তোমার কল্পনার জগতে থাকবে এবং তুমি তার দিকে আকৃষ্ট হবে। কিন্তু বোঝার চেষ্টা কর যে কালো ও নীল ছয় মাসের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে যাবে!

তুমি যদি বিবাহিত হও; অলীক কল্পনা ছাড়; তবেই তুমি কারোর সাথে বাস্তব সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে। তুমি ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ালে বাস্তব সম্বন্ধ হতে পারে না। ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করার সময় কি হয়? তুমি খোদাই শুরু করলে এবং যখন ভাবলে খোদাই শেষ হয়েছে, তোমার কল্পনাও পরিবর্তিত হয়েছে; তাই তোমার পরিবর্তিত কল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য খোদাই-কাজ বেড়ে যায়। এই চক্র কখনও শেষ হয় না।

যতক্ষণ অলীক কল্পনা আছে, প্রকৃত সম্বন্ধ কখনই হতে পারে না। যদি তুমি লক্ষ্য কর, একই ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা কারোর সাথে থাকলেও তুমি তার চোখের দিকে তাকাও না, কারণ বাস্তবের সাথে না থেকে তুমি অলীক কল্পনার সাথে বাস করছ। আসলে তুমি সত্যিকার মানুষটার সাথে বাস করছ না। অন্য মানুষটি যা করে তা তোমার কল্পনা দ্বারা দেখছ এবং সিদ্ধান্তে আসছ যে ভগবান তোমায় শাস্তির জীবন দিয়েছেন।

তুমি যদি অবিবাহিত হও, অলীক কল্পনা (fantasy) ছাড়, তোমার রক্ত ঠাণ্ডা হবে।

তুমি যদি বিধবা হও, তোমার কল্পনা (imagination) ছাড়, তুমি নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করবে না।

ছোটদের অলীক কল্পনা না করা শেখাও। সেটা না শিখিয়ে তাদের টিভিতে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত সংগীত দেখতে দিয়ো না। যদি তারা কেবল গান উপভোগ করে ও তার সাথে নাচে, তো ঠিক আছে; কিন্তু ব্যতিক্রমহীনভাবে তারা যা দেখে তা ভিতরে হজম করে ফেলে। এখনেই সমস্যা শুরু হয়। সব কিছু সঞ্চিত হয় মূলাধার চক্রে বা সেক্স চক্রে। তখন একটা নিছক প্রস্তাবই যথে ষ্ট এবং মূলাধার প্রস্তুত হয়ে যাবে।

আশা-প্রত্যাশার নিছক ভার থেকে মূলাধার চক্রে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। এইপ্রকারে এই চক্রটি তালাবদ্ধ থাকে। যখন তোমার অলীক কল্পনা অন্য মানুষের মারফৎ বা টিভি দেখে পূরণ করতে চেষ্টা কর, যখন তুমি তোমার আশা-প্রত্যাশা ও অলীক কল্পনা অন্য মানুষের ওপরে চাপাও বা অভিক্ষেপ কর, তার অর্থ এই চক্রটি তালাবদ্ধ আছে।

জীবনের বাইরের অবস্থার সাথে এর কিছুই করার নেই। এর সাথে ব্রহ্মচর্য বা কুমার-ব্রতের কোন সম্পর্ক নেই। এর সাথে তোমার ভিতরে খণ্ডিত হওয়া স্বরূপের সম্পর্ক আছে।

ব্রহ্মচর্য বা কুমার-ব্রত কি?

তোমার ভিতরে দমিত অর্ধেকের জন্য ব্যাকুল না হওয়াই ব্রহ্মচর্য বা কুমার-ব্রত বা কৌমার্য-ব্রত (celibacy), ব্যাস। তুমি যদি পুরুষ হও, তোমার নিজের এমনই পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা হওয়া উচিৎ যে তুমি তোমার ভিতরে দমিত নারীভাবকে আর হারিয়ে ফেল না। একইভাবে, নারী হলে তুমি নিজে এতই পরিপূর্ণ থাক যে তুমি সেই পরিপূর্ণতার অভিজ্ঞতার জন্য বাইরে তাকাও না।

যদি এটা অর্জন কর, তুমি নারীর সাথে বা নারী বিনা বহির্জগতে বাস করতে পারবে। এটা অর্জন না হলে , বিবাহিত হলেও, তোমার ওপরে সর্বদা হর্মোনগুলি অত্যাচার করতে থাকবে। হর্মোনগুলির অত্যাচার পরিপূর্ণতা পাবা র আকুলতা ছাড়া আর কিছু নয়, সেই পরিপূর্ণতা তো পাওয়া যায় ভিতরে, বাইরে নয়।

যখন তুমি এই পরিপূর্ণতা পাও, তুমি বিয়ে করেছ কি কর নি, তোমার মনে শান্তি থাকবে। তখন তুমি বিবাহিত জীবনাও ব্রহ্মচারী হতে পারবে। এটাই আসল ব্রহ্মচর্য।

এর পরিবর্তে লোকেরা জবরদস্তি ব্রহ্মচারী হতে গিয়ে আরও দমিত ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পড়ে।

মন্তব্য : *কিন্তু স্বামীজী, আমরা তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না যে আমরা আমাদের ভিতরে একটা ছবি বহন করছি ...*

হ্যাঁ, কারণ আমরা কখনও ভিতরে তাকাই নি। আমরা সবদিকে যাই, কিন্তু ভিতরের দিকে যাই না। আমাদের ৮০% পর্যন্ত শক্তি এই শক্তিচক্রে তালাবদ্ধ আছে! এই শক্তিচক্রে শক্তি সঞ্চার করার কোন প্রয়োজন নেই। একে কেবল খুলতে ও সক্রিয় করতে হবে এবং এখান থেকে প্রবাহিত শক্তির বন্যা তোমার সম্পূর্ণ জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারবে!

নিজের ভিতরে গভীরভাবে দেখলে বুঝবে যে 'তুমি যা দেখ' ও 'তুমি যা দেখতে চাও' তাদের মধ্যে কিছু গরমিল আছে বলে সবসময়ের ভাবনাই তোমার কষ্টের কারণ। এই 'তুমি যা দেখতে চাও' ছবিটিকে তুমি ভিতরে বহন করছ।

নিদেনপক্ষে এখন থেকে সচেতন হয়ে লক্ষ্য করার চেষ্টা কর, লক্ষ্য কর যে তুমি যাই দেখ তাতে তোমার মন কিভাবে খেলা করে। মন প্রবেশ করে রায় দেবার আগেই, দৃশ্যগুলি যেমন আছে ঠিক তেমনিভাবে তাদের ধরার চেষ্টা কর। তাহলে দেখবে তোমার মন কিরকম সূক্ষ্ম ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাই দেখ তার সাথে খেলা করে এবং তোমাকে বিশ্বাস করানোর কারণ হয় যে তুমি যা দেখ তাতে কিছু ভুল আছে।

সংস্কৃতে দুটি কথা আমাদের বাস্তবতা শেখায় : 'দৃষ্ট সৃষ্টি' এবং 'সৃষ্ট দৃষ্টি।' 'দৃষ্ট সৃষ্টি' মানে বিশ্ব যেরকম আছে সেরকম দেখা, তা যেভাবে আসে সেভাবে নাওয়া; যা আছে তাকে বাস্তব গণ্য করে স্বাগতম করা। 'সৃষ্ট দৃষ্টি' মানে বিশ্বকে সেভাবে দেখা, যেভাবে আমরা চাই, আমাদের রঙীন কাচের মধ্য দিয়ে, আমাদের অলীক কল্পনা মারফৎ। প্রথমটি শান্তিপূর্ণ জীবনের দিকে নিয়ে যায়, পরেরটি নিয়ে যায় দুঃখকষ্টের দিকে।

একটা ছোট গল্প :

> একবার একটি লোক এসে আমায় বলে, 'স্বামীজী, আমরা বাড়ীতে দুটিমাত্র মানুষ, আমার স্ত্রী ও আমি। কিন্তু তাও ঘরে কোন শান্তি নেই!'
> আমি তাকে বললাম, 'কে বলেছে ঘরে দুটি মানুষ? তোমরা চারজন।'
> লোকটি একদম অবাক।
> আমি বুঝিয়ে বললাম, 'তুমি, তোমার ভিতরের নারী, তোমার স্ত্রী এবং তার ভিতরের পুরুষ! তাই আমি বলি তোমরা চারজন। কেবল তোমাদের ভিতরের নারী ও ভিতরের পুরুষকে মুছে ফেলতে শেখ - আর দ্যাখ ঘরে কি পরিবর্তন হয়!'
> লোকটি চুপচাপ চলে গেল।

প্রশ্ন : স্বামীজী, আমরা অন্যদের সম্বন্ধেও সমস্যা অভিজ্ঞতা করি, যেমন বাবা-মা ও বাচ্চাদের মধ্যে...

উত্তর : হ্যাঁ, যে কোন সম্বন্ধেই প্রত্যাশা থাকে। আমি মনে করি না যে প্রত্যাশা ছাড়া কোন সম্বন্ধ আছে।

বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের ছেনি হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করে এবং ছেলেমেয়েরাও বাবা -মার সাথে একই চেষ্টা করে।

বাবা-মায়েরা তাদের অপরিপূর্ণ অভিলাষ বাচ্চাদের মধ্য দিয়ে পুরো করতে চায়। বাবা -মায়েরা স্বপ্ন দেখে যে তাদের ছেলেমেয়েরা ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনীয়ার হবে। কেন ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও না যে তারা কি হতে চায় এবং তারপর তা পূরণ করার স্বপ্ন দেখ? তাতে তোমার সন্তানের অনেক সাহায্য হবে।

যে দিন তোমার সন্তান তোমাকে পালটে উত্তর দিতে শুরু করে, সেইদিন সে বড় হয়েছে। তখন তোমাকে তার সাথে অনেক সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হবে। তার সাথে একসাথে সময় কাটাও, কথা বল, ভাল বন্ধু হও এবং খুঁজে বের কর সে জীবনে প্রকৃতপক্ষে কি করতে চায়। গভীর প্রেম ও ভরসা দিয়ে তাকে গাইড কর। তারপর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তোমার বাস্তবতা বানাও এবং তাকে সেটা অর্জন করতে সাহায্য কর।

অনেক সন্তানেরা আমায় বলে, 'আমার বাবা চায় আমি এক ডাক্তার হই' বা 'আমার বাবা আমাকে আইনজীবী হতে বলছে।' অবশ্যই, সন্তান যদি নিজে কিছু ঠিক করতে না পারে এবং সে তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে সে কি হবে , তুমি তার প্রতিভা ও সামর্থ্য লক্ষ্য করে তাকে পরামর্শ দিতে পার।

তুমি সর্বদাই পরামর্শ দিতে পার, কিন্তু তার গলা দিয়ে কিছু ঠেলে দিয়ো না। আবার তোমার সন্তানকে বুঝতে দাও যে তুমি তাকে কিছু করার জন্য স্বাধীনতা ও পরিপক্বতা দিচ্ছ এবং তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও যে শেষে তাকে দোষ দেওয়া হবে না। তাকে সেটা স্বচ্ছভাবে বুঝতে হবে।

আজকের হোমওয়ার্কের জন্য আমি চাই যে তোমরা তোমাদের ধারণাগুলি লিখে ফেল যে এক সঠিক পতি, এক সঠিক স্ত্রী, এক সঠিক পিতা, এক সঠিক মাতা, এক সঠিক সন্তান এবং এক সঠিক বন্ধু কি রকম হওয়া উচিৎ। তোমার প্রাসঙ্গিক যে কোন পাঁচটি সম্বন্ধ বেছে নাও এবং লিখে ফেল। সততার সাথে কর। যখন তুমি তোমার কাগজটা পড়বে, আমি নিশ্চিত, তুমি দেখবে যে অচেতনতার গভীরে তোমার সমস্ত ধারণাগুলি জনপ্রিয় গণমাধ্যম বা মিডিয়া থেকে নাওয়া হয়েছে।

কোন টেলিভিশন সিরিয়াল দেখছ ও তাতে একটি চরিত্রকে ভাল লাগছে। সেই চরিত্র তোমার জন্য এক সুদৃঢ় বাস্তব হয়ে যায়। অচেতনভাবে তুমি তোমার বাস্তব জীবনে জড়িত কিছু মানুষের কাছ থেকে সেই রকম ব্যবহার আশা কর।

এমনকি লোকেরা 'আদর্শ গুরু'-র ছবি মনে নিয়ে ঘোরে। সাধারণতঃ সেটা এক বুড়ো মানুষের ছবি, সাদা চুল এবং লম্বা দাড়ি - যা তোমরা বইতে ও টেলিভিশন সিরিয়ালে দেখ! আর যখন তারা আসে ও আমাকে দেখে, তারা মেনে নিতে পারে না যে একজন যুবা 'প্রকৃত মাস্টার' হতে পারে। তাই আমিও একই সমস্যার মুখোমুখি হই ! লোকেদের আমায় গ্রহণ করার আগে, আমাকেও গুরু সম্বন্ধে প্রত্যাশা থেকে তাদের মুক্ত করতে হয়।

প্রশ্ন : কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয় যে আমাদের খোদাই করতে হবে... যেমন আমরা যখন আমাদের কর্মচারীদের পরিচালনা করি। তখন আমরা কি করি?

উত্তর : সচেতন হয়ে খোদাই কর। কি করছ তা সম্বন্ধে সচেতন থাক - তাহলে দরকারের চেয়ে বেশী খোদাই করবে না। এই কর্মচারীদের থেকে তোমার প্রত্যাশাগুলি বাস্তব কিনা, তা দ্যাখো। অন্য কোন সমাধান আছে কিনা যাচাই করে দ্যাখো। একমাত্র ভীষণভাবে প্রয়োজন হলে পরে তুমি কাউকে ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করতে পার।

যখন তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাকে সচেতনতার সাথে প্রয়োগ করতে শেখ! এমনকি ক্রোধ ও যৌন-কামনাও ভগবান প্রদত্ত মহান শক্তি। তোমার যখন সেই শক্তির ওপরে শ্রদ্ধা থাকে, তুমি তার অপচয় বা অব্যবহার করবে না।

আমরা কি টাকা অপচয় করি? তুমি কখনও টাকা অপচয় কর না কারণ তুমি তা শ্রদ্ধা কর। যদি কেউ দশ টাকার কাজ করে , তুমি কি তাকে এক পয়সা বেশী দেবে? কিন্তু ক্রোধ হলে তুমি সর্বদা বেশী খরচা করে ফেল। যদি কেউ দশ টাকার ক্রোধের প্রাপ্যতা লাভ করে, তুমি তাকে পঞ্চাশ টাকার ক্রোধ দেখিয়ে দাও! কেন? কারণ তুমি অচেতন হয়ে ক্রোধ কর, সচেতন হয়ে টাকা খরচের মত কর না। যদি তুমি তোমার ক্রোধ সচেতন হয়ে ব্যবহার কর, তা আসলে তোমার কাজে আসবে এবং পরে তোমার সে সম্বন্ধে দোষীভাব হবে না, আমি আশ্বাস দিচ্ছি।

কখনও নিজের ক্রোধ থেকে বিপর্যস্ত হওয়া উচিত নয়। যদি বিপর্যস্ত হও, তার মানে তুমি সচেতনভাবে ক্রোধ প্রয়োগ কর নি ; তুমি ক্রোধকে তোমাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে দিয়েছ। এই স্কে ল দিয়ে বোঝা যায় যে তুমি ক্রোধ সঠিকভাবে ব্যবহার করেছ কিনা !

একটা ছোট গল্প :

> একবার এক পরিব্রাজক সাধু এক গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সেখানে তিনি শুনলেন যে একটি গোখুরা সাপ সেই গ্রামকে তটস্থ করে ফেলেছে।
> সাধুর জীবের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করার শক্তি ছিল। গ্রামবাসীরা সাধুর কাছে মিনতি করল যে সাধু যেন সাপটিকে বুঝিয়ে দেন এবং সেটি যেন তাদের না কাটে।
> তাই সাধু সাপটিকে বোঝালেন এবং সাপটি প্রতিজ্ঞা করল যে সে আর কাউকে কাটবে না।
> কিছু মাস পর সাধুটি একই গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং গোখুরাটির দেখা পেলেন। সে একদম জীর্ণ হয়ে গে ছে, দেহে অনেক আঘাতের চিহ্ন, প্রায় মর-মর অবস্থা।
> 'তোমার কি হয়েছে? এত আঘাত কেন?', সাধু প্রশ্ন করলেন।
> গোখুরা কেঁদে বলে, 'হে সাধুবর! আপনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে গ্রামবাসীদের কাটবো না! আমি আজ পর্যন্ত

আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি। এদিকে গ্রামবাসীরা যারা আগে আমাকে ভয় পেত, আমার নরমপ্রকৃতিকে দুর্বলতা হিসাবে দেখছে। আমি কামড়াই না দেখে তারা আমাকে রোজ অত্যাচার করতে শুরু করেছে। দেখুন আমার এখন কি নিদারুণ অবস্থা!'

সাধু উত্তর দিলেন, ' হে আমার বুদ্ধু বন্ধু! আমি তোমাকে কেবল কামড়াতে বারণ করেছি। ফোঁস করতে বারণ করেছিলাম কি?'

ক্রোধ সঠিকভাবে ও সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা দরকার। সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানলে ক্রোধ এক প্রচণ্ড শক্তি।

ক্রোধ সম্পর্কে জ্ঞান ক্রোধ লাঘব করে।

অনেকে আমার কাছে এসে বলে, 'স্বামীজী, আমি আমার স্ত্রীকে এত ভালবাসি। তাই আমি চাই সে আরও ভালতে পরিবর্তিত হোক। তাই আমি তার সাথে লড়াই করি।'

আমি তাদের বলি, 'তুমি তোমার পত্নীকে ভালবাস না; তুমি তোমার মনের ছবিটিকে ভালবাস।'

তুমি তোমার ছবিটিকে ভালবাস এবং যখন তোমার স্ত্রী সেই ছবির সাথে মেলে, তুমি তাকে ভালবাস। তোমার আসল প্রেম তোমার স্ত্রীর জন্য নয়; তা তোমার মনের ছবিটির জন্য। যদি তুমি সত্যি পত্নীকে ভালবাসতে, তুমি পত্নীর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তোমার ছবিকে পরিবর্তন করতে। তুমি তাকে তোমার ছবির সাথে মাননসই হবার আশা করবে না।

আমারা বেশীরভাগই আমাদের ছবিগুলির সাথে প্রেম করি। ঘরে অশান্তির তাতেই সূত্রপাত। তাতেই এক অন্তরঙ্গ যুদ্ধের সূত্রপাত। সততার সাথে বলছি প্রেমীরা অন্তরঙ্গ শত্রু। তারা অন্তরঙ্গ কিন্তু সর্বদা অস্ত্র নিয়ে তৈরী। তারা সর্বদাই অপরের ওপরে আধিপত্য স্থাপন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়।

প্রকৃত অন্তরঙ্গতা হল যখন তুমি অপরের সাথে পুরোপুরি স্বস্তিবোধ কর। সেটাই প্রকৃত অন্তরঙ্গতা।

প্রশ্ন : স্বামীজী, আপনি কি বলছেন যে আমাদের অন্য মানুষটিকে তার সমস্ত দোষসহ গ্রহণ করতে মেনে নাওয়া উচিৎ?

উত্তর : না!

এমনকি 'মেনে নাওয়া' কথাটিতে একটা দোষারোপের ভাব আছে। যখন তুমি বল 'সমস্ত দোষসহ তাকে মেনে নিতে রাজী হও', এটা যেন একটা নীরবে অভিযোগ করা। এটা যেন বলা হচ্ছে, 'কি আর করা যায়, আমাদের এর সাথে বাস করতে হবে।' না! আমি বলছি, সেই মানুষটি যেমনই হোক, তাকে তোমার জীবনে সাদরে অভ্যর্থনা জানাও। মেনে নাওয়া ও অভ্যর্থনা করার মধ্যে পার্থক্য আছে। মেনে নাওয়া যেন একটা সমঝোতা করা। অভ্যর্থনা করা যেন নিঃশর্তভাবে, কোন প্রত্যাশা না রেখে, তোমার সত্তাকে অপরজনের কাছে উন্মুক্ত করে মেলে ধরা।

অস্তিত্ব তোমাকে সম্পূর্ণ সৃষ্টি উপহার দিয়েছে। তাকে অনুগ্রহ ও বিনম্রতার সাথে নাও। এটা করলে মূলাধার চক্রের বিরাট শক্তি তোমার কাছে উন্মুক্ত হয়। এই চক্রকে জাগরিত করা মানে এক অফুরন্ত শক্তির উৎসকে স্পর্শ করা। সেই বিরাট শক্তি যা কল্পনা , প্রত্যাশা এবং লোভে তালাবদ্ধ ছিল, সেই শক্তিকে সৃজনশীলতা, ব্যবসা, জীবন ও বাস্তবতার জন্য উপলব্ধ করা যায়।

শুধু তাই নয়, তুমি দেখবে যে তোমার ঘর হয়ে উঠছে এক শান্তির ক্ষেত্র, শান্তির এক মন্দির। আমাদের ঘরের হওয়া উচিৎ ধর্মক্ষেত্র, কিন্তু তা হয়ে গেছে কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র! আর তা যুদ্ধক্ষেত্র হল কেন? কারণ আমরা মানুষদের ছেনি হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করে যাচ্ছি। আমরা যদি মূর্তি বা কাঠ খোদাই করি, সুন্দর আকার এবং আসবাবপত্র তৈরি করতে পারি, কিন্তু যদি মানুষকে খোদাই করি, কেবল কষ্টভোগই তো হবে।

একজন আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনি কি বলতে পারেন, আঠারো হাতের দেবীর সাথে কি ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়?'

আমি তাকে বলেছিলাম, 'প্রথমে তুমি তোমার দুই হাতবিশিষ্ট পত্নীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা কর ; তারপর আমরা আঠারো হাতবিশিষ্ট দেবীর সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা যায় দেখব!'

আরেকজন আমার কাছে এসে ডিভোর্সের জন্য আশীর্বাদ চায়।

আমি তাকে বলি যে আমি বিবাহের জন্য আশীর্বাদ দিই, ডিভোর্সের জন্য নয়।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সমস্যাটা কি এবং আমি তা সমাধান করতে পারি কিনা।

সে আমায় বলে, 'স্বামীজী, আজ সকালে আমি কফি চাই। আমার পত্নী কফি এত তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এল যে কফি আমার কাপড়ে পড়ে গেল।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম যে এই ঘটনাটি ডিভোর্সের জন্য খুবই তুচ্ছ।

সে বলে চলে, 'স্বামীজী, আপনি জানেন না। সে আজ কফি ফেললো, কাল তো আসিড ফেলবে।'

আমি হতবাক। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'ভাই আমার, তুমি কফি থেকে আসিডে কোন কারণ ছাড়াই চলে যাচ্ছ কেন? সে তো কেবল একটু রাগ করে তাড়াহুড়ো করে কফি ফেলেছে এবং আর যাই হোক , তোমার সেই নোংরা কাপড়টাকে ধোবে তো তোমার পত্নীই!'

সে বলে চলে, 'স্বামীজী, আমাদের বিয়ের সময় এক প্রথা আছে যে তিন পাত্রে জল রেখে তার সবগুলিতে হাত ঢুকিয়ে নতুন দম্পতিকে একটা আংটি খুঁজতে হবে। সেই সময়েও সে নোখ দিয়ে আমার হাত আঁচড়ে দিয়েছিল !'

নতুন দম্পতির মধ্যে দূরত্ব ঘোচাবার জন্য, এই প্রকার খেলা ভারতীয় বিবাহে প্রচলিত আছে। আর এই পুরুষটি দশ বছর ধরে এই ধরণের তুচ্ছ ঘটনাবলীর হিসাব রাখছিল।

আমি তাকে প্রশ্ন করি, 'ভাই আমার, তুমি যদি পুলিশের মত এই রকম হিসাব রাখ তাহলে তোমার সাথে কেউ কিভাবে থাকবে?'

দ্যাখো, আমরা দুটি জিনিষ করি : প্রথম, যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বিচারের অপেক্ষা করি; দ্বিতীয়টি, বিচার তৈরি করে তাকে সমর্থন করার জন্য যুক্তিতর্ক সংগ্রহ করি। ৯৯% সময় আমরা দ্বিতীয়টি করি।

আমাদের চারিদিকে অনেক কিছু ঘটছে কিন্তু আমরা যেগুলিকে চাই , কেবল সেগুলিকে তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার) করি, যেগুলি বাস্তবে ঘটছে তা কখনও নয়। তাই আমরা বাস্তবকে হারাই। বাস্তব সর্বদাই বিদ্যমান কিন্তু আমরা যা দেখতে চাই কেবল তাই দেখি। বিবাহের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে পুরুষ ও নারী একে অপরের সম্পর্কে বিচার করে ফেলে এবং সেই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে একে অন্যকে দেখা শুরু করে, অন্যজন যাই করুক না কেন। তাদের সেই বিচার বজায় রাখার জন্য তারা যুক্তিতর্ক খোঁজে ও সংগ্রহ করতে থাকে।

তাই তুমি যদি ঠিক কর যে তোমার বউ বোকা, তাহলে সে যাই করুক না কেন, সবসময়ে তুমি তাকে বোকাই দেখবে। তুমি যদি মনে কর যে তোমার বর তোমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, সে যাই করুক না কেন, তাকে সর্বদা তোমার তেমনিই লাগবে।

যদি এরকম কর তবে তোমার স্বামী বা স্ত্রীর আসল বৈশিষ্ট্যগুলি কখনও দেখতে পারবে না; যে বৈশিষ্ট্যগুলি তোমার করা বিচারগুলিকে সমর্থন করে, কেবল তাদের দেখতে পারবে। যেমন ক্ষুধার্ত হলে রাস্তায় কেবল রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ে। একইভাবে , একটা কুকুর মারার আগে আমরা কি করি? আমরা তাকে পাগল বলে ঘোষণা করি ও তারপর তাকে মারি।

এরকম মনোভাব পরিত্যাগ কর। একমাত্র তবেই তোমার কাছে আসা যে কোন মানুষ বা জিনিষে এক বিশেষ সজীবতা লক্ষ্য করবে।

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক পুলিশ স্টেশনে গিয়ে অভিযোগ করে যে তার স্ত্রী তিন ঘন্টা ধরে হারিয়ে গেছে।
> পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার স্ত্রীর উচ্চতা, ওজন, এসব বর্ণনা করতে পারবেন কি?'
> লোকটি বলে, 'তা তো জানি না।'
> পুলিশ প্রশ্ন করে, 'ঘর ছাড়ার সময় তিনি কি পরেছিলেন?'
> লোকটি বলে, 'তা দেখিনি। কিন্তু দাঁড়ান। সে কুকুরটিকে সাথে করে নিয়ে যায়। সেটা আমি জানি।'
> পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, 'কি রকম কুকুর?'
> লোকটি উত্তর দেয়, 'ডাল্মেশন প্রজাতির। কালোর জায়গায় ছাইরঙের দাগ। তার ওজন ২৩ কিলো এবং লেজটি ধবধবে সাদা ও লেজে কোন দাগ নেই। তার কলারটা বাদামী রঙের ও রূপোর চেন। তার নাম স্পট।'
> পুলিশ বলল, 'যথেষ্ট। আমরা তাদের খুঁজে বার করব!'

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে কয়েক মাস কিছু সজীবতা নিয়ে বাস করে আর সেই কয়েক মাসে , তারা একে অপরের সম্বন্ধে রায় বা বিচার সংগ্রহ করে। তারপর তারা একেবারেই একে অপরের সাথে সম্বন্ধে থাকে না। তারা অপরজনকে আসলে দেখেই না। তাদের সম্বন্ধ থাকে কেবল নিজের বিচারগুলির সাথে, ব্যাস।

পতি তার স্ত্রীর সম্পর্কে সংগ্রহ করা বিচারগুলির সাথে সম্বন্ধ রাখে এবং স্ত্রী তার পতির সম্পর্কে সংগ্রহ করা বিচারগুলির সাথে সম্বন্ধ রাখে। প্রকৃত পতি ও প্রকৃত স্ত্রী থাকল আলাদা! তারা বাড়ীতে চারজন হয়ে গেল।

সততার সাথে একটা পরীক্ষা কর। কতদিন হয়ে গেল যে তুমি তোমার স্ত্রীর বা পতির চোখে চোখ রেখে কথা বল নি? নিশ্চয় বহুদিন হয়ে গেছে। আর আমরা ভাবি যে প্রথমের দিনগুলি সোনার দিন ছিল এবং জীবন এখন একঘেয়ে হয়ে গেছে। যদি তুমি সত্যি সত্যি দেখ, তোমার মনোভাবই ব্যাপারটাকে একঘেয়ে করে ফেলেছে।

তুমি একটি মানুষকে বিকশিত হবার জায়গাই দাও না। তুমি তাদের টাইপকাস্ট করতে এতই ব্যস্ত। তুমি তাদের জন্য নতুন কিছু ভাববে না। আমি বলি, বিয়ের কিছু বছর পর তুমি স্ত্রী বা স্বামীকে দেখ না কারণ তোমার তৈরি তাদের ছবির সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করে বেশ খুশীতেই আছ।

তাহলে কি হবে? তাহলে তোমার সেই লোকটির মত অবস্থা হবে যে তার স্ত্রীর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না! স্ত্রীর বিবরণ না জানা এক উপরিগত স্তরের সমস্যা। আমি যে জানার কথা বলার চেষ্টা করছি তা আরো অনেক গভীরের ব্যাপার। যে প্রকৃত মানুষটা তোমার সাথে বাস করছে তুমি তাকে হারিয়ে ফেলেছ। সেই মানু ষটি সম্পর্কে তোমার ধারণা সহকারে তুমি বাস করছ।

কেবল ২৪ ঘন্টার জন্য মনস্থির কর যে তুমি তোমার স্বামী বা স্ত্রীকে এইভাবে দেখবে যেন তাকে প্রথমবার দেখছ। কোন সিদ্ধান্তে না এসে, তার সমস্ত কথা ও কাজ সজীবতা ও সরলতার সাথে গ্রহণ কর। তোমার ভিতরে তার প্রতি এক প্রেম অনুভ ব কর। তার কথায় সে তোমাকে প্ররোচিত করলেও, তার কথাগুলি সচেতন হয়ে শোন এবং যথারীতি প্রতিরোধ না করে, শান্তভাবে ও ভালবেসে সাড়া দাও। তুমি দেখবে যে তুমি তোমাদের দুজনের জন্য নতুন রাস্তা খুলে দিচ্ছ; তোমাদের দুজনের মধ্যে এক নতুনভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করছ।

হঠাৎ তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার মনোভাবের জন্যই জিনিষগুলিকে দুর্বিষহ লাগছিল। অবশ্য তুমি বলতে পার যে অন্য মানুষটিকেও একইভাবে সাড়া দিতে হবে। নিজেকে ও অপরকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা তোমার আছে। তোমার মানসিক কাঠামোর একটু পরিবর্তন করে তুমি কত কিছু করতে পার। তুমি যখন পরিবর্তিত হবা র জন্য সিদ্ধান্ত নাও, অন্য মানুষটিও স্বতশ্চলভাবে তার পথ বদলাবে।

একটা ছোট গল্প :

> কবরস্থান দিয়ে যাবার সময় একটি লোক সজোরে কান্নার আওয়াজ শুনল। সে ভাবল যদি কিছু সাহায্য করা যায় এবং ভিতরে গিয়ে দেখল যে একটি লোক একটি কবরের কাছে বসে জোরে জোরে কাঁদছে।
> সে বারবার বলছে, 'তুমি কেন চলে গেলে? তুমি কেন চলে গেলে?'
> লোকটির কান্নায় সে দুঃখিত হল ও তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মহাশয়, কিছু মনে করবেন না। তিনি কি আপনার স্ত্রী?'
> লোকটি উত্তর দিল, 'না। সে আমার স্ত্রীর প্রথম পতি।'

কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে নিছক গরমিলের জন্য সম্বন্ধ থেকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। আরও খারাপ হল , লোকেরা একটা সম্বন্ধ থেকে আরেকটা সম্বন্ধে এই ভেবে যায় যে নতুন সম্বন্ধ তাদের কল্পনার সাথে মিলবে। কিছুদিন তা চলে এবং পরে দেখে যে সেখা নাও কিছু ঘাটতি আছে এবং তখন আরেকটা সম্বন্ধের দিকে চলে। কখনও তাদের মনেই হয় না যে অন্যজন বে ঠিক নয়।

আজকাল অল্পবয়স্কদের একে অপরকে সহ্য করা আরও বেশী করে কঠিন হয়ে পড়ছে এবং বিবাহ সহজেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। এসব ঘটনা খুবই দুঃখদায়ক। এখন এক জাগরণ প্রয়োজন। একমাত্র এক গভীর বোধশক্তি এই জাগরণ নিয়ে আসতে পারে।

তুমি যদি আজ পর্যন্ত লেখা সমস্ত প্রেমকাহিনী পড় , দেখবে যে বাস্তবে কোথাও পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে কার্যক্ষেত্রে সব সময় একত্রে বাস করে নি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরন্তন প্রেমের গল্পে নায়ক ও নায়িকা গঙ্গার দুই তীরে চিরন্তন প্রেমিক -প্রেমিকা হয়ে বাস করার সিদ্ধান্ত নেয়। মাঝে মধ্যে তারা নৌকায় করে আসে, দুজনে মেলে ও পরে নিজের নিজের জায়গায় চলে যায়।

এরকম করলে, তারা মিলিত হবার সময় নিশ্চিত শান্তিতে থাকবে। প্রত্যেক সময়ে তারা যখন মিলিত হয়, সেখানে এক সজীবতা থাকবে কারণ তারা জানে যে এই মিলন কিছু ঘন্টার জন্য; তাই প্রতিটি ক্ষণ মূল্যবান হয়ে ওঠে!

সব চিরন্তন প্রেমী, তারা রোমিও ও জুলিয়েট হোক অথবা লায়লা ও মজনু হোক অথবা অম্বিকাপতি ও অমরাবতী হোক , কখনই একসাথে বাস করে নি!

সমস্যা হচ্ছে কি, বাস্তব জীবনে কখনও পার্শ্ব-সংগীত (ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউসিক) থাকে না! টেলিভিশনে যখন প্রেমকাহিনী দেখ, তাতে সর্বদাই পার্শ্ব-সংগীত থাকে এবং তুমি সহজেই এক কল্পনার জগতে ঢুকে পড়। সমস্ত দৃশ্যপট যা দেখ, বিশেষ করে প্রেমের দৃশ্যগুলিতে পার্শ্ব-সংগীত থাকবেই। পার্শ্ব-সংগীতের জন্য তুমি তাদের খুব উপভোগ কর। টেলিভিশন-সৃষ্ট জগত দ্বারা তুমি একেবারে সম্মোহিত হয়ে পড়।

বাস্তব জীবনে তুমি সেই সংগীত খোঁজ এবং তা পাও না ! কিন্তু তুমি যদি সেই সংগীত নিজের ভিতরে পাও, তুমি তাকে বাইরে আর খুঁজবে না। নিজের ভিতরে তাকে পাওয়া মানে নিজের ভিতরে এক সুন্দর স্থান সৃষ্টি করা যেখানে সবকিছুকে অস্তিত্বের এক সুন্দর অংশ বলে অভিজ্ঞতা হয়।

মনে রেখ তোমার স্বামী বা স্ত্রী ভগবানের সৃষ্টি। তোমার সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে না! তাঁর সৃষ্টি সর্বদাই জিতবে!

আজ সমাজে অশ্লীল বিষয়, অলীক কল্পনা, স্বপ্ন ও বিকৃতি বেশী করে দেখা যায়। অলীক কল্পনা (ফ্যান্টাসি) সার্থক করার জন্য লোকেরা সস্তা বিকল্পের দিকে যাওয়া শুরু করেছে। অশ্লীল জিনিষ যৌনজীবন পূর্ণ করে না ; তা থেকে আরও বেশী অলীক কল্পনা ও বিকৃতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু অলীক কল্পনা করা ছাড়া আমরা যেন থাকতেই পারি না। একটা জিনিষ বোঝ : তুমি যদি দুর্বল না হও, কিছুতেই তোমার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। শক্তিমান হলে তুমি যে কোন কিছু ফেলে দিতে পার।

(একটি মহিলা তার দৃষ্টিভঙ্গি জানাচ্ছিল) স্বামীজী, আপনি আমাদের যেমন আছি তেমনি থাকতে বলেন। কিন্তু সমাজে আমরা নিজের মত কিভাবে থাকব? আমার মনে হয় আমাদের পরিবার ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হওয়া উচিৎ।

হ্যাঁ, সবাই ব্যবহারিক স্তরে এই সমস্যার মুখোমুখি হয়। তুমি বল , 'স্বামীজী, আমাকে অন্যজনের সাথে খাপ খাইয়ে কাজ করতে হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করি, অন্যজন তোমার ইচ্ছানুসার কাজ করুক, সেটাও কেন নিশ্চয় কর না? সত্যকথা, সমাজে আমাদের একে অপরের উপরে নির্ভর করতে হবে। আর কোন পথ নেই। তোমার সীমারেখা ভাল করে বুঝে নাও।

স্বাধীনভাবে পরাধীন হও!

পরিষ্কার করে বোঝ, কোন জায়গাটা তোমার এবং কোন জায়গাটা অন্যের। অপরের ক্ষতিসাধন না করে, তোমার নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রবল প্রচেষ্টা করে যাও।

প্রশ্ন : অন্যের মূলাধার চক্র কি উন্মুক্ত করা যায় না, যাতে সে তার প্রত্যাশাগুলি ফেলে দেয়?

উত্তর : সেটা কি করে করবে? তুমি কেবল নিজের প্রত্যাশাগুলিকে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পার, তাহলে ঘরে চারজনের জায়গায় তিনজনমাত্র থাকবে!

অন্য মানুষটিকে কিভাবে পরিবর্তন করা যায়...? আজকাল বিবাহ-উপদেষ্টা সম্মোহনবিদ্যারও পরামর্শ দেয়!

একবার পড়েছিলাম এক মহিলা তার পতির ক্রোধ কমাতে চেয়েছিল। পড়েছিলাম যে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় মানুষের মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড লাগিয়ে তার ক্রোধ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার পরীক্ষা করে। যখন তারা স্বেচ্ছাকর্মী চায় , কয়েকশ' মহিলা জোর করে তাদের স্বামীদের নিয়ে আসে!

পরীক্ষার পর, ৭২ মহিলা, সত্যি সত্যি ৭২ জন মহিলা ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়কে বলে, 'দয়া করে এই ইলেক্ট্রোডগুলি সরিয়ে ফেলুন। আমরা আমাদের পুরানো পতিকে ফিরে পেতে চাই! আমরা আমাদের পুরানো রাগী পতিকে ফিরে পেতে চাই !' যখন জিজ্ঞাসা করা হয় কেন, তারা বলে, 'জীবনে কোন রস নেই! লড়াই না করলে কোন আদানপ্রদান হয় না। পতিরা আমাদের দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছে না!'

সবার মনোযোগ পাওয়া চাই! আচরণ বিষয়ক মনোবিজ্ঞানীরা বলে যে একজন স্বাভাবিক মানুষ খাবার ছাড়া ৯০ দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু মনোযোগ ছাড়া সে কেবল ১৪ দিন বাঁচে! তার বেশী হলে সে পাগল হতে থাকবে।

আমরা একে অপরকে ভালবাসতে ভুলে গেছি, যত্ন করতে ভুলে গেছি! প্রেম এক ভুলে যাওয়া ভাষা! তাই একে অপরের সাথে লড়াই দ্বারা আমরা আশা করি আমাদের মধ্যে আদানপ্রদান হবে ও একে অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করবে!

আমার মনে হয় যারা এখানে বসে আছ এবং নালিশ করছ যে তোমাদের পতিরা বা পত্নীরা আধ্যাত্মিক নয় ... যদি তোমাদের পতি বা পত্নীরা আধাত্মিক হয়ে পড়ে, তোমরা হয়ত ফিরে আসবে এবং অভিযোগ করবে যে তোমাদের পুরানো সাথীকে ফিরে পেতে

চাও!

যেখানেই যাও স্বর্গকে সাথে নিয়ে চল

মূলাধার চক্র সম্বন্ধে সুন্দর ব্যাপার হল, যদি এই চক্র খুলে যায় তাহলে তোমার ৫০% সমস্যা অদৃশ্য হয়ে যাবে! এই একটি চক্র তোমার ৫০% জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। তুমি যাই কর তাতে এই চক্রের চিহ্ন পাবে! এমনকি তোমার স্বাক্ষরেও এর চিহ্ন আছে! মানে, তুমি যেভাবে স্বাক্ষর কর তা দেখায় যে তোমার ভিতরে কি ধরণের ভাবনা ভরা আছে। মূলাধার চক্র সক্রিয় হলে, তোমার স্বাক্ষর অন্যরকম লাগবে। যদি একটা ফুল ছেঁড়, সেই কাজ করায় একটা তফাৎ থাকবে। সেটা অনেক মৃদু ও শান্ত হবে, কোন হিংসা ছাড়াই।

নয়নমার বলে এক তামিল সাধুদের সম্প্রদায় আছে। একটা গানে তাদের সম্পর্কে বলা হয় , তারা যখন ফুল চয়ন করে, গাছ কোন বেদনা অনুভব করে না! এতে তুমি কি বুঝছ? এই চক্র উন্মুক্ত হলে তুমি এত সংবেদনশীল ও প্রেমময় হয়ে পড়।

যখন মূলাধার চক্রের শক্তি রূপান্তরিত হয়, তা তোমার থেকে প্রেম হয়ে উপচে পড়ে।

সেক্স হল কার্বন, প্রেম হীরা। সেক্স পাঁক, প্রেম হল সেই পাঁকে ফোটা কমল। এটা একই সারবস্তু। কিন্তু তোমাকে জানতে হবে যে তাকে কি করে প্রসেস্ করবে। কেবল তোমার প্রত্যাশাগুলি ত্যাগ কর, শক্তির এক ভীষণ উচ্ছ্বাস দেখবে।

আমি চাই আজ তোমরা সবাই বাড়ী গিয়ে এই অভ্যাসটি চেষ্টা কর :

বসো এবং মূলাধারের ওপরে পূর্ণ মনোযোগ দাও। যদি লক্ষ্য কর, দেখবে যে তোমার এই চক্রটি সর্বদাই এক চাপে আছে। এখানে সব সময়ে একটা টানটান ভাব।

পাঁচ মিনিটের জন্য তোমার পতি বা পত্নী যা কিছু অশান্তি করেছে তার জন্য তাদের মন দিয়ে ক্ষমা কর। সত্যি সত্যি ক্ষমা কর। তোমার সমস্ত সংশয়ের মূলে যাও এবং অসন্তুষ্টির ভাবনা ত্যাগ কর। এটা সম্পূর্ণতার সাথে কর। তারা যেমন , সেভাবেই তাদের স্বাগত কর। তাদের তোমার গভীর প্রেম দাও।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে দেখবে যে মূলাধার চক্র পুরোপুরি শিথিল ও রিল্যাক্সড্ হয়ে গেছে।

যদি কেবল পাঁচ মিনিটে এই ফল পাও, কল্পনা কর তোমার পুরো মনোভাবকে পরিবর্তন করলে কি হবে! কি প্রচণ্ড শক্তিপ্রবাহ তুমি অনুভব করবে!

তুমি এখন যেভাবে বাস করছ, তোমার কাছে যেন ১০০,০০০ টাকা আছে, কিন্তু তার মধ্যে ৯০,০০০ টাকা তুমি এক জায়গায় এমনভাবে তালাবদ্ধ রেখেছ যে তুমি তালাটি খুলে এখন সেই টাকা বার করে আনতে পারছ না। বাকী ১০,০০০ টাকা দিয়ে তুমি তোমার সমস্ত জীবন চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছ। তাই স্বভাবতই নিজেকে দীন মনে হবে!

একইভাবে তোমার সমস্ত শক্তি এই চক্রে তালাবদ্ধ ছিল - ক্রোধে, সেক্সে এবং আরো কত কিছুতে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য তোমার যথেষ্ট শক্তি নেই! একবার এই চক্র উন্মুক্ত হলে, তোমার জীবন সমৃদ্ধ হবে। তুমি আরও ভাল করে চিন্তা করতে, বুঝতে ও পরিকল্পনা করতে পারবে। তুমি বুঝবে যে এই শক্তি সচেতনভাবে তোমার ওপরে কাজ করছে। এটা এক এমন নুতন মাত্রা খুলে দেবে যার অভিজ্ঞতা তোমার আগে কখনও হয় নি। তুমি প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ঙ্গম করবে যে তোমার পতি , পত্নী এবং বিশ্বের সবাই হল আধ্যাত্মিক সত্তা!

তোমার বোঝা উচিৎ যে স্বর্গ এবং নরক ভৌগলিক স্থান নয়। তাদের মানচিত্রে নির্দেশ করা যায় না। তারা কেবল মানসিক জগতে বর্তমান। জীবনকে স্বর্গ বা নরকে রূপান্তরিত করা তোমার ওপর নির্ভরশীল।

যখন তুমি প্রত্যাশাতে ভরা, তুমি তোমার নিজের নরক নিজের ভিতরে বহন কর। তাই যেখানেই যাবে তোমার নরক তোমার সাথেই চলবে! সার্কাস পার্টি যেভাবে তাদের তাঁবু নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাঁবু খাটায় , সেভাবে তুমিও তোমার নরক তোমারই সাথে নানা জায়গায় নিয়ে যাও। আর এইভাবে দুজন মিলিত হলে, দুই নরকের ভীষণ যুদ্ধ হয়!

কেন তুমি এই বোঝা নিজের সাথে বহন করতে চাও? এবারে অন্তত এটাকে একদম ফেলে দাও!

কেবল মনে কর যে তোমার প্রত্যাশা পূরণের জন্য অন্যদের খোদাই করার চেষ্টা করে তুমি কত শক্তি অপচয় কর। ছেনি -হাতুড়ি ফেলে দেওয়া কি অনেক সোজা নয়? এমনকি সেই শক্তির ১০% শক্তিকে ধ্যানে ব্যবহার করলে, তোমার জীবন সত্য জীবনে

রূপান্তরিত হতে পারে।

সজীবতা হল : 'সজাগতার সাথে ও স্বাধীনভাবে জীবনে এগিয়ে চলা।' বেছে নেবার কাজটা আমাদের করতে হবে। আমাদের সচেতন হবার সুযোগ আছে। সিদ্ধান্ত নাওয়াটা আমাদের ওপর নির্ভর করে।

যৌনকামনা থেকে প্রেম, এক অ্যাল্কেমি প্রক্রিয়া

ক্রোধের মত যৌনকামনাও এক প্রচণ্ড শক্তি। আসলে যৌনতা সম্বন্ধে বোঝা ও তাকে কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় তা না জানা পর্যন্ত, তুমি যাই কর তা হল যৌনতা-জনিত। এমনকি যখন একটা পেন উঠিয়ে নিচ্ছ বা কোন শিশুকে আদর করছ, তা সবই যৌনতা-জনিত। এতে একটা বিশেষ পশু স্বভাব আছে কারণ তোমার শক্তি লোভ থেকে চালিত হচ্ছে। তা উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় নি।

যেভাবে ক্রোধ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রোধ কমিয়ে দেয়, একইভাবে যৌনকামনা সম্বন্ধে জ্ঞান যৌনকামনা কমায়, কারণ দুটো একই শক্তি! কামনা ও যৌনতা সম্বন্ধে মুশকিল হল, তাদের বাস্তব থেকে অনেক বাড়িয়ে দেখা হয় ও কল্পনা করা হয়। দমিয়ে রাখার জন্য, যৌনতা আসলে যা তার থেকে অনেক বেশী বড় করে দেখা হয়। সেখানেই সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারটিকে গণমাধ্যম বা মিডিয়া অনেক দূষিত করে ফেলেছে।

যখন তোমার যৌনকামনায় অপর ব্যক্তি সাড়া দেয় না, তখন কামনা সেই ব্যক্তির ওপরে ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। তাই তোমরা খবরের কাগজে পড় কোন কলেজের একটি ছেলে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মেয়েটির দিকে আসিড ছুঁড়েছে।

মনুষ্যজাতিকে উচ্চ-নীচ ভেদে সমাজ সর্বদাই বিভাগিত করে। কোন মানুষের যৌনকামনা থাকলে তাকে মানুষের মধ্যে নীচে মনে করা হয়। উচ্চ-নীচ বলে কিছু নেই, কেবল রূপান্তর ঘটাতে হবে, ব্যাস।

যারা এরূপ নৈতিক মানদণ্ড নিরূপণ করে, তারা নিজেদের নীতিজ্ঞ বা নীতিবিদ্ বলে দাবী করে। তারা এইসব ভাবনার গভীরে যেতে ভয় পায় অথবা এই ভাবনাগুলিকে বুঝতে গিয়ে অপরাধবোধে জড়িয়ে পড়ে এবং তাই তারা নীতি বিদ্ হয়ে যায়। তারাই সমাজে নিজেদের মানদণ্ড দিয়ে উচ্চনীচ স্থির করে।

এটা বুঝে ফেল যে উপর নীচ বলে কিছু নেই। যেই মুহূর্তে তুমি ভাববে যে তুমি নীচ , তুমি সেই ভাবনার সাথে লড়াই করা শুরু করবে এবং তখন তোমার পক্ষে তা থেকে বেড়িয়ে আসা খুব শক্ত।

যখন মানুষেরা তোমার মধ্যে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট ভাবনা চাপাবার চেষ্টা করে, মনে রেখো যে প্রতিটি মানুষই অস্তিত্বের অংশ এবং কেউই কারো থেকে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট নয়। এই সত্যটি ভুলে থাকলে তুমি এই প্রকার শব্দ ব্যবহার করবে।

যৌনকামনা গভীর অজ্ঞানতা থেকে আসে। যৌনকামনাকে প্রেমে পরিবর্তিত করা এক অ্যাল্কেমি (alchemy) প্রক্রিয়া। সস্তা ধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া হল অ্যাল্কেমি। একইভাবে আমাদের যৌনকামনা নামক অপক্ব ভাবনাকে প্রেম নামক উচ্চতম ভাবনায় পরিবর্তিত করা এক অ্যাল্কেমি প্রক্রিয়া। এটা এক চূড়ান্ত অ্যাল্কেমি।

আমার হিমালয়ে পদযাত্রার সময়ের একটা সত্য ঘটনা বলি :

> হিমালয়ে যেখানে যাবার ইচ্ছা হ'ত, সেখানেই আমি পায়ে হেঁটে যেতাম। আমার জিনিষপত্র প্রায় কিছুই ছিল না এবং রাত্রে যেখানে ইচ্ছা ঘুমতাম। শিকড় ও ডালপালা ধরে আমি গাছেও চড়তাম। এই সময়ে আমি বহু সাধুর সঙ্গ পাই।
>
> একবার এক সাধুর সাথে দেখা, সে প্রায় উলঙ্গ, জটাধারী এবং ভয়ঙ্কর দেখতে। সে ছিল এক নাগাবাবা, নাগা সম্প্রদায়ের সাধু।
>
> তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে আমি কাছে গেলাম।
>
> সেইসময় আমি ভাল হিন্দি বলতে পারি না, ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি শব্দে কথা বলতাম। আমি তাঁর সাথে কয়েকদিন ছিলাম।
>
> সারাদিন তিনি হুঁকা খান। আমি তাকে অবাক হয়ে দেখতাম। তিনি হুঁকাতে দুটি তামার পয়সা ফেলতেন ও পরে সেখান থেকে দুটি সোনার মুদ্রা বার করে নিতেন ! তিনি সেই স্বর্ণমুদ্রা দোকানে বিক্রি করে আরও তামার মুদ্রা নিয়ে আসতেন ও প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কিভাবে সম্ভব।
>
> তিনি কোন উত্তর না দিয়ে আমাকে পাইপটা এগিয়ে দিলেন। তামাক ও মদের গন্ধ আমি কখনই সহ্য করতে পারতাম না, তাই আমি কয়েক পদক্ষেপ পিছিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম যে আমি হিমালয়ে ধ্যান ও জীবনমুক্তির জন্য এসেছি এবং আমি ধূমপান অথবা স্বর্ণমুদ্রায় আগ্রহী নই।

তিনি আমার দিকে তাকালেন ও প্রথমবার স্পষ্ট তামিলভাষায় বললেন, 'অঙ্গম পাজুতাল তঙ্গম পাজুক্কুম' তার অর্থ : 'তোমার সত্তা পরিপক্ব হলে, সোনা পরিপক্ব হবে।'

আমি তো নির্বাক। অবাক হলাম যে উনি বুঝেছিলেন যে আমি তামিল।

তিনি খেলার ছলে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়ার বৃত্ত বানিয়ে আমার মুখের দিকে ছাড়লেন। তারপর তিনদিন ধরে আমি পরম আনন্দে ছিলাম।

তামা থেকে সোনা বানানো অ্যাল্কেমি প্রক্রিয়া। এটা বহির্জগতের অ্যাল্কেমি প্রক্রিয়া। অন্তর্জগতের অ্যাল্কেমি হল আমাদের সাধারণ শক্তিগুলিকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিবর্তন করা। যখন তুমি সাধারণ শক্তিগুলিকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্ত রিত করা শিখে ফেল, তুমি তামাকে অনায়াসে সোনায় পরিবর্তিত করতে পারবে; এটা কোন বড় ব্যাপার নয়। অন্তর্জগতের অ্যাল্কেমি প্রক্রিয়া আয়ত্তে এসে গেলে, বহির্জগতের অ্যাল্কেমি খুবই সোজা, যেন নিছক ছেলেখেলা।

আমি এই ঘটনা তোমাদের বললাম অ্যাল্কেমির ধারণা দেবার জন্য, বহির্জগতের অ্যাল্কেমি করার জন্য নয়! বহির্জগতের অ্যাল্কেমি সাধারণ ব্যাপার। একমাত্র অন্তর্জগতের অ্যাল্কেমি তোমাকে আসল মাস্টার তৈরি করবে।

ধাতুর অ্যাল্কেমি প্রক্রিয়ায় আসলে কি হয়? প্রথমে প্রাথমিক ধাতু (base metal) থেকে অপদ্রব্য (impurity) দূরীভুত করা হয়। তারপর কিছু উপাদান যোগ করা হয় ও পুরো জিনিষটাকে এক প্রক্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। শেষে প্রাথমিক ধাতু উচ্চতর ধাতু হয়ে যায়।

আমাদের পাশবিক ভাবকে দৈবিক ভাবে রূপান্তরিত করতে হবে। আমাদের যৌনকামনা হল এক পাশবিক ভাব। অন্ততপক্ষে পশুর যৌনকামনা পবিত্র। তারা সমস্ত জগৎ ভুলে যায় যখন তারা যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে, আমাদের যৌনকামনাও খাদহীন নয়। যৌনকামনার সাথে সর্বদা অপরাধবোধ ও অনিশ্চিত বাসনা মিশে থাকে।

হয় আমাদের নিয়ন্ত্রিত অতীতের জন্য অপরাধবোধ আসে এবং আমরা সরে যাই, অথবা ভবিষ্যতে চলতে থাকার তীব্র বাসনার জন্য সেই কর্মে লিপ্ত হই - শুধু অপরাধবোধে আবার জড়িয়ে পড়ার জন্য। এটা টানাহিঁচড়ার এক দুষ্টচক্র যার দরুণ যৌনকামনা দুষিত হয়। তা অশুদ্ধ হয়।

সর্বদা লক্ষ্য করে থাকবে, যে মুহূর্তে তোমার কল্পনা সার্থক হয় তুমি অপরাধবোধে জড়িয়ে পড়। তাই যৌনতা তোমায় দোষী ভাবায়। পরিবার প্রথম তোমার ভিতরে অপরাধবোধের বীজ বপন করে। তারপর তুমি নিজেই নিজের জন্য অপরাধবোধ সৃষ্টি করায় পারদর্শী হয়ে ওঠ!

অপরাধিবোধ প্রথমে বোঝ

প্রথমে অপরাধিতবোধকে বোঝ। যে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে প্রথমে তোমার ভিতরে অপরাধবোধ জাগাবে। তারা তোমাকে যে কোন প্রকারে নিম্নতর ভাবাবে। তারপর তুমি নিজে থেকেই তাদের কথা শুনবে।

সমাজ কেবল অপরাধবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে জানে। বাচ্চাদের জন্য কানুন ঠিক আছে এবং কানুন দিয়ে শুরু করা ভাল। কিন্তু বড় হলে নিজের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়া দরকার। নিজেকে সুসংহত (integrate) করলে, তোমার ভিতরে অপরাধবোধ ঢোকানো যায় না এবং তুমি তখন বুদ্ধিমান হও।

আসলে কোন ঘটনাই অপরাধবোধ দেয় না। ঘটনার পরিণতি থেকে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়।

মানুষ অন্ধভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে বিধিনিয়ম দিয়ে যেতে থাকে এবং সেই বিধিনিয়মের সাথে অপরাধবোধও দিয়ে যায়। রাজমুকুটের মত, অপরাধবোধ পাস করে দেওয়া হয় - ঠাকুর্দা থেকে বাবা, বাবা থেকে ছেলে, ছেলে থেকে নাতি এবং চলতেই থাকে।

সমস্ত সৌন্দর্য-বর্দ্ধনের সামগ্রীর বিজ্ঞাপন তোমাকে বারবার বলতে থাকে যে তুমি পর্যাপ্ত সুন্দর নও। নিজের অপর্যাপ্ত দেহ সম্বন্ধে তোমার অপরাধবোধ শুরু হয়। তুমি কি কর? তুমি সেই সামগ্রী কিনে নাও ও ব্যবহার কর। তুমি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাও। একবার তাদের ব্যবহার করলে আবার এক নতুন অপরাধবোধে ডুবে যাও , 'আমি কি কেবল এসবের জন্য এত সমস্যার মুখোমুখি হলাম?' যেই মুহূর্তে তুমি কিছু অর্জন কর, প্রথম ভাবনা যেটা আসে সেটা হল অপরাধবোধ।

মস্তিষ্ক-স্তরকে ফেলে দাও

যৌনকামনা বিষয়ে ফেরা যাক। এই বিষয়ে তোমরা টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও বই দেখে সেগুলি থেকে কল্পনা সংগ্রহ করে মস্তিষ্কে এক ভারী স্তর সৃষ্টি করেছ। তোমরা মানসিকভাবে সবসময়ে এই স্তরে বাস কর। এমনকি যখন কোন সম্বন্ধে আছ , তুমি এই স্তরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছ করছ, তুমি বাস্তব পত্নী বা পতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছ না। আসল পতিপত্নী তোমার মনে ধরে রাখা প্রতিচ্ছবির তুলনায় নিস্তেজ বিকল্প হয়ে যায়। তোমার যৌনকামনা তখন দুষিত হয়।

এইভাবে নিজেকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে, তুমি এক দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পড় এবং তাই তুমি এর ভিতরে পুরোপুরি ঢুকে আর বেড়িয়ে আস না, বরং কামনা বাড়াতে বাড়াতে ভিতরে ঢুকতেই থাক। এই বিষয়ের গভীরে গেলে তুমি সেখান থেকে প্রস্ফুটিত হবে !

তাই আগেকার দিনে মানুষ চল্লিশ পেড়িয়ে গেলে যৌনকামনা ফেলে দিতে পারত। তাদের মনে কোনরকম জটিল প্রতিচ্ছবি ছিল না। তারা সরাসরি নিজেদের বাস্তব পতি বা পত্নীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত। তাই তারা কম বয়সেই এর থেকে প্রস্ফুটিত হত। তারা যৌনকামনার গভীরে যেতে পারত ও সেটার থেকে বার হয়ে আসতে সক্ষম ছিল। যৌনকামনা তাদের থেকে সরে যেত। তাদের যৌনকামনা সরাতে হত না।

ভারতীয় বিবাহে পুরোহিত দম্পতিকে এক সুন্দর পংক্তি উচ্চারণ করায়। পত্নী পতিকে বলে , 'তুমি আমার এগারতম পুত্র হও' এবং পতি পত্নীকে বলে, 'তুমি আমার এগারতম কন্যা হও।' তার মানে বিবাহের এগার বছর পর তারা একে অপরকে পুত্র কন্যা হিসাবে দেখবে। এই কয় বছরে সম্বন্ধ এতটা রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তোমার পুত্রকন্যাদের দেখে তুমি কত খুশী হও, ঠিক কি না? পতিপত্নীরা একে অপরকে দেখে একই রকম খুশী হবে, কারণ সময়ে পতিপত্নীর সম্পর্কে অনেক রূপান্তর ঘটেছে। পতি মহিলাটির পুত্র হয়ে গেছে এবং পত্নী পুরুষটির কন্যা হয়ে গেছে।

যখন তোমার কল্পনা সম্বন্ধে তোমার পরিষ্কার ধারণা থাকে না, তুমি দুঃখকষ্ট পাও। উপলব্ধিই এর থেকে বেড়িয়ে আসার চাবিকাঠি। দুঃখকষ্ট ছাড়া যখন বাঁচতে শিখেছ, তুমি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছ। দুঃখকষ্ট এড়িয়ে চলতে না জানলে তুমি বস্তুগত জীবন যাপন করছ। দুই প্রকার জীবন আছে - উপলব্ধির জীবন এবং অনুপলব্ধির জীবন। বুদ্ধ-জীবন ও বুদ্ধু-জীবন!

তুমি তোমার কামনাবাসনা ও অলীক-কল্পনা সম্বন্ধে গুলিয়ে ফেলেছ এবং তাই তুমি কোথাও খুশী নও। যখন মেঝেতে মাদুরে বসে আছ, তুমি খুশী নও কারণ তুমি চেয়ারের কথা চিন্তা করছ। চেয়ারে বসে থাকলে , সিংহাসনের কথা ভাবছ। এমনকি সিংহাসন পেলেও তুমি তা উপভোগ করতে অসমর্থ হবে !

তোমার যৌনতা যদি কোন অপরাধবোধ বা বাসনা ছাড়া শুদ্ধ হয়, তুমি এই বিষয়ে কোন অপরাধবোধ বা কল্পনা ছাড়াই গভীরে প্রবেশ করবে এবং এর থেকে প্রস্ফুটিত হবে। তোমার মস্তিষ্ক-স্তরটি কাজ করা শুরু করলেই তুমি সংগৃহীত কল্পনা ও অলীক - কল্পনাগুলিকে নিয়ে আস এবং যৌনতা থেকে প্রস্ফুটিত হতে পার না।

মস্তিষ্কের স্তরটিকে সরিয়ে ফেল এবং তোমার নিজের ও অপরের শরীরের প্রতি প্রেমভাব শুরু কর। তোমার শরীরের ভিতরে অবিচ্ছিন্নভাবে আনন্দ হয়ে চলেছে কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারছ না কারণ তুমি তোমার কল্পনাজালে আটকে আছ। যখন তুমি তোমার ও অপরের দেহ সম্বন্ধে কল্পনা মুছে ফেল , তোমার যৌনতা দুষণমুক্ত হয় এবং অ্যাল্কেমির প্রথম পর্যা য় ঘটে, অশুচিতা দূর হয়।

প্রতিটি দেহই সুন্দর

যখন তুমি তোমার দেহ সম্পর্কে স্বস্তিবোধ কর , তোমার মধ্যে এক সহজ মাধুর্য ঘটে। এটা বোঝ যে চর্মরোগের প্রধান কারণ দেহের প্রতি ঘৃণা। চর্মরোগ হয় কারণ নিজের দেহ সম্বন্ধে তোমার আত্মমর্যাদা ও শ্রদ্ধা খুবই কম ।

তুমি এটা বোঝ না এবং চর্মরোগ উপশমের উপায় চারদিকে খুঁজতে থাক। তার মূল আছে তোমার মস্তিষ্ক -স্তরে যা তুমি কয়েক বছর ধরে নির্মাণ করেছ। তুমি সর্বদাই অন্য মানুষের দেহ দেখে তার মত দেহ চাও। যখন তুমি তোমার দেহকে ভালবাস , যখন তুমি তোমার দেহ সম্বন্ধে আরামবোধ কর , তোমাকে সুন্দর দেখাবে ও সুন্দর অনুভব করবে।

ভারতের মহাকাব্য তুলসীদাসের রামায়ণে লেখা আছে যে সীতা যখন জনকরাজার দরবারে হেঁটে এলেন , বশিষ্ট ও জনক সমেত সমস্ত ঋষি মুনিগণ সীতাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। সীতার থেকে এমন মহিমান্বিত মাধুর্য বিচ্ছুরিত হত।

তন্ত্রে এক প্রক্রিয়ায় তুমি রোজ সকালে উঠে শরীরের সকল জায়গায় গভীর প্রেম সহকারে স্পর্শ কর এবং জাগরণে সূক্ষ্ম শরীরকে

স্থূল শরীরে স্থির হতে দাও।

যাই হোক, যত বেশী প্রতিচ্ছবি বাইরে থেকে সংগ্রহ কর, তোমার মস্তিষ্কের স্তর তত বেশী ঘন হয়। আগেকার দিনে মানুষ এত জটিল ও পাগল ছিল না; তারা সরল ছিল। মস্তিষ্কের এই স্তরটি ছিল না অথবা স্তরটি ছিল খুবই পাতলা।

সম্বন্ধে বন্ধুভাব নিয়ে এস

একবার নিজের ও অন্যের শরীর সম্পর্কে কল্পনা করা ছেড়ে দিলে তুমি অন্যের শরীরের প্রতি করুণা ও বন্ধুভাব প্রদর্শন করা শুরু করতে পারবে। বন্ধুভাব যৌনতা থেকে প্রেমে রূপান্তরের অ্যাক্কেমি প্রক্রিয়ার এক উপাদান।

হিংসা কোন পথ নয়। সমাজে, রাজ্যে ও দেশে হওয়া হিংসা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি। কিন্তু নিজেদের ঘরে এবং নিজেদের দেহ ও মনের ভিতরের হিংসা? আমি বলছি : হিংসা ঘরে শুরু হয়।

তুমি বলতে পার, 'স্বামীজী, আমরা দৈনন্দিন জীবনে হিংসাপরায়ণ নই।' নিজেকে ভাল করে লক্ষ্য কর। যখন রাস্তায় বা তোমার বাগানে হাঁট, তুমি কি কর? তুমি অচেতনভাবে গাছ, পাতা ও ফুলগুলিকে ছেঁড়; চারপাশের পাথরে লাথি মার এবং লতাগুলিকে টান এবং আরও কত কি কর। এগুলি সবই হিংসার কাজ!

একবার নিজের বাগানে যাও এবং একটা ফুল বা পাতার দিকে যথাসম্ভব সম্ভ্রম ও ভালবাসে তাকাও। তার সৌন্দর্য তোমার হৃদয়ে অনুভব কর এবং তার দিকে প্রেম সহকারে দেখ। অনুভব কর যে এটা জীবন্ত। এর মাধ্যমে অস্তিত্বের চমৎকারের সাথে নিজেকে সংযুক্ত কর। তাকে নবজাত শিশুর মত দেখ। তোমার গভীর থেকে উথলে ওঠা ভাবকে অনুভব কর।

এখন ভাব সেই গাছগুলির পাশ দিয়ে চলার সময় তুমি কতবার সেই ফুল বা পাতাকে অচেতনভাবে ছিঁড়েছ। দুটো ভাবনার , দুটো মনোভাবের পার্থক্য বুঝতে পারছ কি? এখন আমাকে বল, তুমি কি প্রকৃতপক্ষে তোমার চারিদিকে সব মানুষ ও সবকিছুর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন?

সবকিছু সচেতন হয়ে দেখ। এখন তুমি অচেতন হয়ে কাজ করছ এবং তুমি হিংসা সহকারে তাদের সাথে ব্যবহার করছ। তাদের দিকে সচেতন হয়ে দেখলে তুমি তাদের মধ্যে অপরিমেয় সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের প্রেম সহকারে দেখবে।

নিজের শরীরের সাথে তুমি কত দুর্ব্যবহার কর? তুমি বেশী খেয়ে ফেল ও তোমার ভিতরের সুন্দর পাচন-প্রক্রিয়াতে বিশৃংখলার কারণ হও। শরীর আকুল হয়ে বিশ্রাম চাইলেও বেশী রাত জাগো ও শরীরের ওপর অত্যাচার কর। ধূম্রপান ও মদ্যপান শরীরের জন্য খারাপ জেনাও সে কাজে লিপ্ত হও। এই সব কাজ কি শরীরের সাথে তোমার বন্ধুভাব দেখায়? তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের শরীরকে ঘৃণা কর এবং তাই তাকে অবহেলা কর।

তাই এটা তোমার ভিতরের হিংসাকে সম্বোধন করার সময়। আপনা আপনি বাইরের হিংসা বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সর্বদাই আমাদের বাইরে অঙ্গুলিনির্দেশ করার জন্য তৈরি। কিন্তু আমাদের নিজেদের অসম্পূর্ণতা কে দেখবে?

একটি লোক একবার আমার কাছে আসে এবং আমায় তার পরিবার সম্বন্ধে বলে। সে বলে যে তার স্ত্রী এক উকিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ও! সে কি আদালতে তর্ক করে?' সে বলে, 'না স্বামীজী, সে ঘরেই তর্ক করে!'

আমরা সর্বদাই অপরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে তৈরি ও তর্ক করি। তার বদলে চল আমরা আমাদের নিজেদের অশুদ্ধতা দূর করা শুরু করি এবং তাহলে স্বতশ্চলভাবে বাইরে তর্ক করার প্রয়োজন হবে না।

তোমাকে ও অপরকে নিরাময় করে, এমন শব্দাবলী নিজের সাথে রাখ। অপরের দেহ, মন ও সত্তার প্রতি প্রেমভাবনা দেখাও। এটাই 'ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতা।' পূজাঘরে নিয়ম করে ঘন্টা বাজানো ও দেবী লক্ষ্মীর কাছে ধন কামনা করা আধ্যাত্মিকতা নয়। দেবী লক্ষ্মীর গুণ যেমন, মাধুর্য ও প্রীতিপূর্ণতা মনোমধ্যে গ্রহণ করাই আধ্যাত্মিকতা। সম্পদ আপনা আপনি হবে।

আমরা সবাই ভাবি যে আমাদের কেবল আচারঅনুষ্ঠান করা উচিত এবং আমরা তাতে ফল পা ব। না। তুমি যদি নিজে রূপান্তরিত হবার ইচ্ছা ছাড়া 'রাম রাম' দিনে হাজারবার বল, জেনে রাখ তা 'কোকা-কোলা' দিনে হাজারবার বলার মত! আচারঅনুষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্য হল তাকে বোঝা ও তার সার অবলম্বন করা যাতে তুমি নিজেকে রূপান্তরিত করতে পার এবং তাহলে বস্তুগত সুফল অবিশ্রাম আসতে থাকবে।

একবার তুমি অপরকে হৃদ্যতা দেখাতে সক্ষম হলে , তোমার রূপান্তরিত অনুভূতিকে প্রসেস্ করার জন্য ধৈর্য ও দৃঢ়সংকল্প রাখ। শেষে তুমি প্রেম নামক সর্বোচ্চ ও পারস্পরিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অন্যজনও তোমার রূপান্তরিত অনুভূতির

প্রতিদান দেবে এবং তার মানে তুমি সঠিক পথে আছ! তোমার সত্তা তখন হয়ে গেছে আনন্দ! তার অর্থ, তুমি তোমার ধ্যান সঠিকভাবে করেছ!

প্রেমের সৌন্দর্য

প্রেম যখন তোমার সত্তার কেন্দ্র হয়, যৌনতা হয়ে যায় দুটি সত্তার গভীর মিলন। সমস্যা হল, আসল প্রেম আচ্ছাদনের নীচে হারিয়ে যায় এবং যৌনকামনা তার জায়গা নিয়ে নেয়। তার ফলে সত্তারা কখনই কাছাকাছি আসে না; কেবল দেহ একসাথে হয়। সম্বন্ধ একদম অগভীর থেকে যায়। যা কিছু অগভীর , তাকে সহজেই ঝাঁকানো যায়।

যৌনকামনা তোমাকে অন্ধ করে দেয়। এটা তোমাকে অচেতন উন্মত্ততায় নিয়ে যায়। প্রেমও তোমাকে নেশাগ্রস্ত করে, কিন্তু প্রেম তোমাকে গভীর সচেতনতায় নিয়ে যায়। যৌনকামনা ও প্রেম একই বর্ণচ্ছটার (spectrum) দুটি বিপরীত প্রান্ত। যা কিছু তোমাকে গভীর সচেতনতায় নিয়ে যায় তা হল ধ্যান। যা কিছু তোমাকে অচেতন অবস্থায় নিয়ে যায় তা সহায়ক নয়। তুমি যে অভিজ্ঞতা পাচ্ছ তা তোমার জন্য ভাল কিনা বোঝার জন্য এটা হল এক মাপদণ্ড বা স্কেল।

আবার দেখ, যখন তুমি গভীরভাবে ভালবাস, সেখানে ঈর্ষার কোন জায়গাই থাকবে না। ঈর্ষা আছে কারণ তুমি ভয়ে আছ যে অগভীর মূল উৎপাটিত হয়ে যাবে। মূল গভীরে গেলে তুমি ভয় পাবে কেন? তুমি ঈর্ষান্বিত হবে কেন? তোমার সাথীর সাথে সম্বন্ধ অগভীর বলে তার ওপরে বিশ্বাসে ঝাঁকুনি আসে, এই সম্বন্ধের ভিত তো অলীক-কল্পনা ও যৌনকামনায় আছে।

রোমান্স আসলে রোমান্স নয় যদি তুমি তা কেবল একটি মানুষের প্রতি অনুভব কর। জীবন নিজেই একটি রোমান্স ! তোমার সত্তাকে রোমান্স বিচ্ছুরিত করতে হবে - অস্তিত্বের দিকে।

যখন তোমার সত্তা নিজেকে মস্তিষ্ক থেকে প্রকাশ করে, তা বুদ্ধি; যখন সত্তা নিজেকে হৃদয় থেকে প্রকাশ করে, তা করুণা; যখন সত্তা নিজেকে দেহ থেকে প্রকাশ করে, তা শক্তি এবং যখন সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে না কিন্তু কেবল আছে, তা হল আনন্দ!

এই পর্যায়ে পৌঁছালে তুমি আনন্দের জন্য বাইরে কারুর ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। সর্বদা তুমি সহজেই নিজের ভিতরে আনন্দে অনুরণিত হতে থাকবে। অবশ্যই তুমি সেই আনন্দ বাইরে অপরের সাথে শেয়ার করে তাকে অনেক বাড়াতে পারবে ।

যখন তুমি কারো সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হও, তার সাথে শারীরিক নৈকট্যের কোন প্রয়োজন থাকবে না। তার প্রতি একমাত্র অনুভূতি সংযোজনেই তুমি খুশী ও পরিতৃপ্ত থাকবে। তুমি নিজের মধ্যেই পূর্ণতার অনুভুতি পাবে এবং পূর্ণতার জন্য বাইরে কোন কিছু চাইবে না। এই সংযোজন থেকে বিচ্ছেদ বা সেরকম কিছু হবে না।

সম্বন্ধতা হল কারোর সাথে গভীরভাবে সংযোজিত হওয়া - সমস্ত জিনিষ পেরিয়ে। তুমি এটা না বুঝে নিজেকে মানুষের সাথে বহু শর্তে বেঁধে ফেল এবং তুমি তাকে সম্বন্ধতা বল। সেটা হয় নড়বরে এবং তুমি তাকে বহাল রাখার জন্য মেহনত কর এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে সম্বন্ধতা সমস্যাসংকুল !

লোকেরা আমায় বলে, 'স্বামীজী, আমি আশ্রমে এসে থাকতে চাই। আমার বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগে না।'

আমি সবসময়ে তাদের বলি যে ঘরে চারজনের সাথে খুশীতে না থাকতে পারলে আশ্রমে একশ লোকের সাথে খুশীতে থাকতে পারবে না। তুমি কি মনে কর যে আশ্রম পলায়নবাদীদের আস্তানা?

পরিষ্কার করে বোঝ যে ঘর তোমার বাইরের কিছু নয়। তোমার আশেপাশের ঘটনা নির্বিশেষে সর্বদা আনন্দে থাকাই 'ঘরে থাকা।' এটা না করতে পারলে কোথাও তুমি ঘর খুঁজে পাবে না।

মাসের পর মাস যখন ৮ ফুট বাই ৮ ফুট ঘরে ছিলাম, আমি তখন ততটাই আনন্দে ছিলাম যেমন আনন্দে এখন এই সিংহাসনে বসে আছি। দয়া করে এটা বোঝার চেষ্টা কর। তোমার এটা বোঝার ক্ষমতা চাই যে তোমার আনন্দের সাথে বহির্জগতের জিনিষের কোন সম্পর্ক নেই।

কল্পনা কর একটা কুকুর হাড্ডি চিবাচ্ছে এবং তার মুখের ভিতরে রক্তপাত হচ্ছে। সে ভাবছে রক্ত হাড্ডি থেকে আসছে , তাই আরও চিবায় ও আরও বেশী রক্তপাত হয় এবং তা চাটতে থাকে। কুকুরটার কি হবে ? তার কেবল বেদনা হবে। একইভাবে আমরা মনে করি যে সুখ বা দুঃখ আমাদের বাইরের জিনিষের সাথে সংযুক্ত এবং তাদের আরো বেশী প্রশ্রয় দিই এবং দুর্দশাগ্রস্ত হই।

প্রশ্ন : আমরা আমাদের সন্তানদের এইসব জটিলতা জন্মানো ও বৃদ্ধি পাওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি ?

উত্তর : খোলাখুলি বলতে গেলে তুমি পুরোপুরি এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার না। তুমি বাচ্চাদের ক্ষে ত্রে সমাজের সাথে সবরকম মিথস্ক্রিয়া (interaction) নিয়ন্ত্রণ করতে পার না। কিন্তু কিছু জিনিষ তুমি ঘরে অভ্যাস করতে পার।

যেটা আমি আগে বলেছি বাচ্চার অন্য অর্ধেকটাকে দমিয়ে রেখো না। তাকে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে দাও এবং নানাভাবে তাকে অনুভব কর। তাকে ছেলে মেয়ে সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখিও না।

বাচ্চাকে নিজেকে অনুসন্ধান করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়ে তাকে নিজের স্বাভাবিক স্বরূপে থাকতে দাও । যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছোটদের ছোঁয় না, তখন তারা স্বভাববশত নিজের সীমার ভিতরে আনন্দে থাকে।

ছোটদের তাদের যৌনাঙ্গ নিয়ে খেলতে বা তাদের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মুখে দিতে অথবা এইপ্রকার জিনিষ করতে দেখে থাকবে। এই ঘটনাগুলি কেবল দেখায় যে তারা নিজের সীমারেখার ভিতরে অনুসন্ধান করতে ও উপভোগ করতে কত ভালবাসে ও আনন্দ পায়। কিন্তু আমরা তাদের এসব করতে দিই না। আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে থামাই এবং বলি যে এসব করা খারাপ। তাদের অনুসন্ধান করতে দেওয়াটা ভাল।

আর যখন তাদের পরিধানের কথা আসে, তাদের দুই টুকরা কাপড়ের জায়গায় সর্বদাই এক ফালি কাপড় পরা উচিত। প্রথমটি তাদের দেহকে দুই ভাগে ভাগ করার বোধ দেয় এবং সময়ের সাথে তারা দেহের নীচের ভাগকে ভুলে যায় ও অসংবেদী হয়ে ওঠে। এটা যেন তাদের চেতনার বিভক্তিকরণ। আজ তাই তোমাকে যদি নিজেকে প্রত্যক্ষবৎ স্মরণ করতে বলা হয়, কেবল দেহের উপরভাগই তোমার মনে আসবে। তুমি নীচেরভাগটাকে অবহেলা কর।

ছোটদের তাদের নিজের মত স্বাধীন থাকতে দাও, তাতে যদি কিছু ঝুঁকি থাকে তাও। বাচ্চাদের কিছু স্বজ্ঞা ও উপজ্ঞা (intuition and instinct) আছে। তাই তুমি আবশ্যক সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলি নাও এবং তাদের অন্বেষণ করতে দাও ।

আবার দেখো, ছোটরা তাদের প্রকাশে কত পরিপূর্ণ। তাই তাদের দমিয়ে রেখ না। তারা তাদের মনকে সামনে নিয়ে আসতে জানে না এবং ভাসাভাসা ও ভণ্ড ব্যবহার করতে পারে না। আমরা সবাই মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ভণ্ডামি করার কলা ভাল করে আয়ত্ত করে ফেলেছি। আমরা কখনই পূর্ণরূপে প্রকাশ করি না।

এছাড়া তাদের দুটি হাত স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে দাও। আমারা তাদের অনেক ক্ষেত্রে বাঁ হাত ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করি। ছোটরা সব্যসাচী কেন হতে পারে না? তাতে কোন ভুল নেই। মহাভারতে অর্জুন সব্যসাচী ছিল। সব্যসাচী মানে যার দুই হাত সমান দক্ষ। আমরা যখন এসব শুনি, আমরা সম্ভ্রমের সাথে শুনি। কিন্তু আমরা বুঝতে অক্ষম হই যে আমাদের মধ্যেও এই সম্ভাবনা আছে এবং যদি আমরা নিজেদের সুযোগ দিই, সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে!

আবার লক্ষ্য করে থাকবে ছোটরা ঘুরপাক খেতে ভালবাসে। এই ঘূর্ণন তাদের নিজেদের এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা তারা নিজেদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত হ'তে দেয়। একমাত্র তোমার দুশ্চিন্তা-কেন্দ্র পরিষ্কার থাকলেই তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুরপাক খেতে পার। বাচ্চারা কত নির্মল ও চিন্তামুক্ত এবং তাই তারা অতি সহজেই ঘুরপাক খেতে পারে। কিন্তু তাদের ঘুরপাক খেতে দেখলে আমাদের মাথা ঘুরে যায় ও তাদের থামিয়ে দিই! আমরা তাদের বলি, 'এক জায়গায় বসো! এটা স্বাস্থের পক্ষে ভাল নয়,' আরও কত কি। আমি বলি তাদের ঘুরপাক খেতে দাও। তাদের নীচে কম্বল রেখে দিতে পার, তাই পরে গেলেও তারা ব্যাথা পাবে না।

কখনই বাচ্চাদের ভিতরে ভয় ঢোকাবে না! তাকে স্বাধীন থাকতে দাও, তাকে চড়তে দাও ও কয়েকবার পড়ে যেতে দাও। যদি অবিশ্রাম তাকে নিরুদ্যম করতে থাক, তার মধ্যে নানা আতঙ্কের (phobia) সৃষ্টি হবে, যেমন উচ্চতা বা অন্ধকার থেকে আতঙ্ক, সেগুলো থেকে পরে সে উঁচু কোথাও উঠতে ভয় পাবে অথবা নতুন কোন সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাবে ইত্যাদি। এই সহজ জিনিষগুলি মনে রেখো, তাহলেই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : স্বামীজী, আপনি বলছেন যে আদর্শ সঙ্গী বলে কিছু নেই। তাহলে বিবাহের আগে জ্যোতিষ ব্যবহার করে আদর্শ জুড়ি খোঁজা হয় কেন?

উত্তর : এখন যদি এই বিষয়ে বলা শুরু করি তাহলে আমাকে জ্যোতিষশাস্ত্রের কাঠামোটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হবে! আজকাল আমরা যেভাবে তাকে অনুসরণ করি তা বোকামি ও অর্থহীন।

বোঝ, এটা তোমার জীবন। তুমি এটাকে ধারণ করেছ, তার ভালমন্দ তোমার জানা উচিৎ। কিন্তু তুমি নিজের জীবন সম্পর্কে কিছুই জান না এবং তাই তুমি অপরের কাছে জিজ্ঞাসা কর! তোমার বুদ্ধি কোথায়?

একজন আগন্তুকের কাছে নিজেকে সমর্পিত করা ও তাকে তোমার জীবনের দিক্‌নির্দেশ করতে দেওয়া, এসব দেখায় যে তুমি নিজের জীবন চালাতে জান না। তোমাকে নিজের জীবনের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে।

যখন লোকেরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে আসে, আমি তাদের বলি : তোমার ভবিষ্যৎ বলার জন্য আমার কাছে এসো না। তোমার ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য কাছে এসো। সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী দুর্বলচিত্তের জন্য এবং সেটা স্বচ্ছভাবে বুঝে নাও।

পুরাতন জ্যোতিষতত্ত্ব এক শুদ্ধ বিজ্ঞান। তাতে সত্য ছিল।

তোমাদের বলি কিভাবে জ্যোতিষ বিকশিত হয়।

অতীতে যখন কোন বাচ্চাকে গুরুকুলে মাস্টারের কাছে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হত , জ্যোতিষ ব্যবহার করে সেই বাচ্চার ব্যক্তিত্ব, মনোভাব ও প্রবণতা বোঝা হত এবং সেই হিসাবে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

মাস্টার দেখতেন বাচ্চার স্বাভাবিক ঝোঁক কোন দিকে। যদি তার 'ব্রাহ্মণ প্রবণতা' থাকে, যার জন্য বুদ্ধি হল প্রাথমিক উপাদান, তাকে বেদ-বিদ্যায় দীক্ষিত করা হত - বৈদিক গ্রন্থাবলী পড়ানো হত। তার যদি 'ক্ষত্রিয় ব্যক্তিত্ব' হত, যা সাহসিকতা ও বল প্রধান, তাকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। সে যদি 'বৈশ্য-প্রবৃত্তি' প্রকাশ করত, সেই বিষয়ে সে নানা দক্ষতা দেখাত, তাকে ব্যবসা শেখান হত। যদি তার শূদ্র-গুণ থাকত ও তার সময় নিয়মমাফিক কায়িক শ্রম অর্পণ করে সন্তুষ্ট হত, তাকে সেবায় দীক্ষা দেওয়া হত। চারটি ভূমিকার একই মূল্য ছিল এবং তা একই প্রকার সম্মান আদায় করত।

এই উদ্দেশ্যেই জ্যোতিষ ব্যবহার করা হ'ত। প্রসঙ্গক্রমে জ্যোতিষ মানুষের জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভবিষ্যৎবাণী করতে সাহায্য করত। জ্যোতিষ এক বিজ্ঞান, যা অধিকন্তু এইপ্রকার নির্ণয়নে সহায়তা করত। তোমার চারিদিকে আজ দেখ। যে স্বভাব-বশত ডাক্তার, হয়ে গেছে ইঞ্জিনীয়ার। স্বভাব-বশত ইঞ্জিনীয়ার হয়ে গেছে কেরানী এবং এরকম অনেক উদাহরণ আছে। তাই সমাজে এক সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি বোধগম্য হয়।

প্রশ্ন : তাহলে পুরাতন জ্যোতিষ এক প্রমাণিত বিজ্ঞান?

উত্তর : এতেই আমি শঙ্কিত! যেই মুহূর্তে আমি বলব 'হ্যাঁ', তোমরা সবাই জ্যোতিষের পিছনে দৌড়াবে! আগামীকাল আমি একটা লম্বা লাইন দেখব, তোমরা সবাই নিজের কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকা নিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করবে, 'স্বামীজী, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলুন!'

জ্যোতিষ সম্বন্ধে এত চিন্তা কোরো না!

জ্যোতিষের প্রশ্নে বিবেকানন্দ খুব ভাল উত্তর দিয়েছিলেন, 'যাও, ভাল করে খাও, ব্যায়াম কর, ভাল করে ঘুমাও। তুমি কায়িক ও মানসিক দিক দিয়ে সবল হবে। তাহলে তুমি এইসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না!'

একমাত্র মানসিক দিক থেকে দুর্বল মানুষই জ্যোতিষের ওপরে বেশী নির্ভর করে।

প্রশ্ন : তার মানে কি যারা জ্যোতিষ অনুসরণ করে তারা সবাই দুর্বল-চিত্ত?

উত্তর : না, সেটা তুমি বলতে পার না। কিন্তু অধিকাংশই দুর্বল-চিত্ত। এমনকি যে মানুষটি সাধারণত বুদ্ধিমান সেও মাঝে মাঝে এই ব্যাপারে বোকার মত ব্যবহার করে। তারা এসে আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, এরকম এরকম রত্ন ধারণ করলে কি আমি ভাগ্যবান হব?' তুমি একটা পাথরের ওপরে কিভাবে নির্ভর করবে? তুমি চেতনা। তুমি ভগবান ছাড়া কিছুই নও! আমি কল্পনা করতে পারি না ... আমি তোমাদের মহাজাগতিক শক্তিকে আহরণ করার বিজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছি, আর তুমি আমাকে পাথর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ!

তোমরা হয়ত স্বামী যতীশ্বরানন্দের নাম শুনেছ। তিনি এক মহাপুরুষ ও মুক্তপুরুষ ছিলেন। তিনি যখন বিদেশে প্রথমবার যান , তিনি রাহুকালে যাত্রা করেছিলেন। রাহুকাল দিনের অশুভ সময় যা গ্রহের অবস্থান দেখে হিসাব করা হয়।

কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্বামীজী, আপনি রাহুকালে কিভাবে যাত্রা করলেন?'

তিনি উত্তর দেন, 'আরে বোকা! আমিই সেই শক্তি যে গ্রহগুলিকে গাইড করে! তারা কিভাবে আমায় নিয়ন্ত্রণ করবে?'

তাঁর সাহস দেখ! এই সাহস গভীর উপলব্ধি থেকে আসে।

আমি তোমাদের সমস্ত গ্রহদের নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দিচ্ছি! তাই তুমি কোন গ্রহ কোথায় তা সম্পর্কে চিন্তিত কেন? তারা তোমায় কিভাবে প্রভাবিত করবে? ধ্যান বিজ্ঞান অনুসরণ কর, তাহলেই হবে। তখন কিছুই তোমাকে ছুঁতে পারবে না।

চেতনার সাথে যাও

আমাদের সমস্ত মূল্যবোধ চেতনার বিকল্প।

তুমি যদি সচেতন থাক, যা করছ তার সম্বন্ধে সচেতন থাক, তাহলে কি করতে হবে তার জন্য মূল্যবোধের দরকার নেই। তোমাকে কোন বিধিনিয়ম মানতে হবে না। নিয়ম তোমাকে মানবে! যদি তুমি সচেতন হও, সকল গুণ, শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিকতা তোমার মধ্যে হবে এবং তুমি স্বাভাবিকভাবে আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে প্রস্ফুটিত হবে।

যে করেই হোক, যখনই আমরা চেতনা বা আধ্যাত্মিক উন্নতি এসব শব্দাবলী শুনি, আমরা সর্বদা ভাবি, 'না, না, এটা আমার জন্য নয়!' কোনরকম ধ্যান প্রক্রিয়া বা চেতনাকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবার ব্যবহারিক উপায় অভ্যাস না করেই, আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এসব আমার জন্য নয়। তাই আমরা এক বিকল্পের দিকে যাই, কৃত্রিম চেতনার জন্য - যাকে বলা হয় নৈতিকতা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ।

শুরুতে মূল্যবোধ ঠিক আছে, কিন্তু শেষে নয়!

বিবেকানন্দ সুন্দর বলেছিলেন, 'চার্চে জন্মানো ভাল, কিন্তু সেখানে মরা ভাল নয়!'

আমাদের প্রথমে এই ধারণা ত্যাগ করতে হবে যে আধ্যাত্মিক হওয়া খুবই কঠিন ও ভিন্নতর। ভারতের এক জীবনমুক্ত পুরুষ ভগবান রামানা মহর্ষির একটি গান আছে :

'আইয়ি, অতি সুলভম, আত্মবিদ্যায়ি, আইয়ি, অতি সুলভম!'
তার মানে, 'ও, এত সোজা, এই আধ্যাত্মিকতা; ও, এত সোজা!'

পরের এক লাইনে তিনি গান :

টাকাপয়সা চাইলে তোমাকে মেহনত করতে হবে।
নাম যশ চাইলে তোমাকে মেহনত করতে হবে।
আত্মজ্ঞান চাইলে, তোমাকে কেবল স্থির হয়ে থাকতে হবে!

তুমি যদি গভীর অলসতায় ডুবে যাও, তুমি দেবত্বলাভ করবে! এই অলসতা তা নয় যাকে আমরা সাধারণত অলসতা বলে জানি। এটা শারীরিক অলসতা নয়। বলা যায় এটা একটা মানসিক অলসতা! যদি তুমি সম্পূর্ণভাবে - আবার বলছি 'সম্পূর্ণভাবে' - নিজেকে শান্ত করতে পার, তুমি যথার্থই আধ্যাত্মিক হতে পার।

আধ্যাত্মিক হওয়া সোজা নয়, আবার কঠিনও নয়। এটা তোমার ধারণা। সোজা ভাবলে সোজা। কঠিন ভাবলে কঠিন। নিজের মত হতে আবার কি চাই? সেটা কি সোজা না কঠিন?

তুমি 'সোজা' শব্দটাও প্রয়োগ করতে পার না! এটা তুমি যেরকম আছ, ঠিক? তুমি ইতিপূর্বেই সেটা, তাহলে তুমি কিভাবে বল যে সেটা হওয়া সোজা?

কেবল ভিতরে তাকাও। অন্তর্দেশে ফের। আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যানে একটু বিশ্বাস রাখ ; তবেই হবে! আধ্যাত্মিক হওয়া খুব কঠিন কাজ - এই ভয় যখন তুমি মুছে ফেল, তোমার আত্মবিশ্বাস হয়, 'হ্যাঁ, আমি আধ্যাত্মিক হতে পারি। আমি সচেতন হতে পারি।' তাহলে 'মূল্যবোধ ফেলে দেওয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে কিনা' প্রশ্নটির কোন মূল্যই থাকবে না।

এখন তুমি তোমার মূল্যবোধ ফেলে দিতে ভয় পাও কারণ ধরে থাকার জন্য তো মার আর কিছু নেই! আমরা জানি, যেই তুমি মূল্যবোধগুলি ফেলে দেবে, সমস্ত চেপে রাখা বাসনাগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়ে পড়বে যেন প্যান্ডোরার বাক্স খোলা হয়েছে! আর আমরা জানি, এই বাক্স খুললে কেবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আমরা আমাদের অবচেতন মনকে ভয় পাই।

অবিশ্রাম ধ্যান করলে তোমার অবচেতন মন পরিষ্কার হয়। তাহলে দেখবে, সেই প্যান্ডোরার বাক্স খুললেও সেখান থেকে লাফিয়ে

বাইরে আসার কিছুই নেই। তুমি সেখানে তোমার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখবে, এক স্বচ্ছ আয়না দেখবে!

এখন এক ধ্যানপ্রক্রিয়া করা যাক যার নাম দুঃখহরণ ধ্যান। এটা মূলাধার চক্রের ওপরে কাজ করে ও তার শক্তি জাগ্রত করে।

আবেগ : যৌনকামনা, বাসনা, লোভ
চক্র : মূলাধার চক্র
অবস্থান : মেরুদণ্ডের মূলে

সংস্কৃতে, মূলাধার মানে মূল ও অস্তিত্বের আধার বা ভিত।

এই চক্রটি অলীক-কল্পনা দ্বারা তালাবদ্ধ থাকে এবং অলীক-কল্পনা করা ছেড়ে দিলে ও বাস্তবকে মেনে নিলে এই চক্র প্রস্ফুটিত হয়!

যৌনকামনাকে প্রেমে রূপান্তরিত করার ধ্যান প্রক্রিয়া : দুঃখহরণ ধ্যান। এটি কুলার্ণব তন্ত্র থেকে নাওয়া হয়েছে।

দুঃখহরণ ধ্যান

(সময় : ৩০ মিনিট। খালি পেটে করা উচিত)

দুঃখহরণ ধ্যান কুলার্ণব তন্ত্র থেকে নাওয়া হয়েছে। এটা তোমার ভিতরে সমস্ত দমিত ভাব বার করে আনবে। অনেক মাস্টার এই প্রক্রিয়া শিখিয়েছেন। এটা পুরো ৩০ মিনিট সময় নেয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস মহাবিশ্বের সেতু। এই প্রণালীতে তুমি মন নিয়ে বেঁচে আছ। যদি তোমার চিন্তা শান্ত হয়, তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস আরামে হবে। যদি তোমার চিন্তা উত্তেজিত হয়, তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসও উত্তেজিত হবে। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তোমাকে প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এখন, আমাদের দমিত অবস্থায়, আমাদের প্রায় সবাই অর্ধ-জীবিত বা অর্ধ-মৃত। এই ধ্যানের প্রথমে গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস নাওয়া হয় এবং তাতে তোমার অবদমিত মনে এক মন্থন হয়। গৃহীত বর্ধিত অক্সিজেন দ্বারা তোমার মানসিক প্রণালীকে পুরোপুরি জীবন্ত করা হয়; তা অনেক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তোমার কোষগুলি বেশী শক্তি পাবে এবং বেশী জৈবতড়িৎ বা জৈবশক্তি সৃষ্টি করবে। এই শক্তি সমস্ত অবদমিত ভাবনাকে বরফ গলানোর মত গলিয়ে ফেলবে। এটা মূলাধার চক্রে হাওয়া দিয়ে তাকে উস্কে দেবার মত - যেভাবে কামার তার উনানে হাওয়া দিয়ে আগুন উস্কে দেয়।

এটা তুমি খালি পেটে করবে, সকালে করা শ্রেয়। একুশ দিন ধরে দুঃখহরণ করলে তোমার সত্তা রূপান্তরিত হবে ও তোমার মুখে ও শরীরে এক জ্যোতি প্রকাশ পাবে। এটা যেন একটা মানসিক স্নান। তুমি তোমার ভিতরে নীরবতার অভিজ্ঞতা লাভ করবে। যখন তুমি দুঃখকে হরণ বা হত্যা কর, আনন্দ তোমার ভিতরে প্রস্ফুটিত হবে এবং তোমার থেকে এক সুগন্ধ আসবে।

চোখ বন্ধ করে দাঁড়াও। গভীরভাবে ও ছন্দের সাথে শরীরের গভীর থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নাও। মুখ বন্ধ রেখে কেবল নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নাও। হাত নাড়াও, হাঁটু ভাঙ্গো এবং অর্ধেক বসার অবস্থিতিতে যাও এবং তারপর উঠে পড়। তুমি যেন একটা উড়ন্ত পাখী, ওপরে ও নীচে, হাঁটু ওপরে ও নীচে, বাহুদ্বয় ওপরে ও নীচে, সবই একটা ছন্দে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মিলিয়ে।

গতি আলতোভাবে রাখ। শ্বাস ভিতরে নেবার সময় উপরে ওঠ এবং শ্বাস ছাড়ার সময় নীচের দিকে যাও। হার্টের সমস্যা থাকলে, যতটা পার ততটাই কর। একইভাবে গর্ভবতী মহিলারা ও অন্যান্য শারীরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা যতটা পার কর।

এটা ১০ মিনিট ধরে কর।

পরের দশ মিনিট চোখ বন্ধ রাখ এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ টানটান কর বা সংকুচিত কর , তারপর তাকে আরাম করতে দাও; একটা অঙ্গ টানটান কর ও আরাম কর এবং তারপর পরের অঙ্গে যাও। পায়ের নীচের থাকে শুরু কর, তারপর পা, কাফ-মাস্‌ল্‌, থাই বা উরু, পাছা, তারপর পেট, নীচের পৃষ্ঠদেশ; তারপর ছাতি ও ওপরের পিঠ; তারপর তোমার হাত, আঙ্গুলের ডগা থেকে কাঁধ পর্যন্ত; তারপর ঘাড় ও কাঁধ; পরে মুখমণ্ডল এবং সবশেষে মাথার ওপরে। পরের অঙ্গে যাবার আগে প্রতিটি অঙ্গকে আরাম দিয়ে নেবে। তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গের এটা যেন একটা সমমাপের (isometric) অনুশীলন।

এই দশ মিনিটের শেষে তুমি ভিতরে শূন্য হয়ে পড়বে। তুমি ঠাণ্ডা , শান্ত হবে।

পরের দশ মিনিট চোখ বন্ধ রেখে বসে পর এবং 'হু'-কার স্তব কর। কেবল 'হু' শব্দ। এটাকে গভীরভাবে এবং সজোরে করার দরকার নেই। খালি আরাম করে স্তব কর। যখন স্তব করছ, তোমার সত্তার ভিতরে ও বাইরে কি হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর।

এই প্রক্রিয়ার প্রথম দুটি ভাগ আসলে তৃতীয় ভাগের জন্য প্রস্তুতিকরণ। তৃতীয় ভাগটি আসল ধ্যান। তৃতীয়ভাগে দেখবে মন বিনা প্রচেষ্টায় নিজে নিজেই নীরব হয়ে যায়। নীরবতা তোমার ওপরে চাপানো যায় না; তা কেবল নিজে থেকে ঘটতে পারে।

এই অবস্থায় হাসিমুখে ও আনন্দের মেজাজে আরাম করে বসে থাক। এই সময় অনেক অভিজ্ঞতা হতে পারে , তাদের খালি টেলিভিশন দেখার মত লক্ষ্য কর। চিন্তা থেকে চিন্তায় তোমার মনকে প্রত্যক্ষ কর। এই ধ্যানের কোন সময়েই মূলাধারের দিকে মন দিও না, তাহলে অলীক-কল্পনা শুরু হবে। প্রকৃতপক্ষে তুমি তো এই অলীক-কল্পনাগুলিকেই সরিয়ে ফেলতে চাইছ।

দশ মিনিট পরে খুব আস্তে আস্তে চোখ খোল। এই শক্তি ও নীরবতা নিজের সাথে রাখ।

ধন্যবাদ।



ষষ্ঠ অধ্যায়

ভয়ের সম্মুখীন হও



মরা মৃত্যুকে কেন বুঝতে চাইব?

আমাদের সমস্ত ভয়ের আসল কারণ হল মৃত্যুভয়, কিন্তু সমস্ত ভয়গুলি নানা ছদ্মবেশে থাকে। প্রতিটি ভীতি মৃত্যুভয়ের সাথে সংযুক্ত, কিন্তু পরোক্ষভাবে। যেহেতু তা পরোক্ষভাবে, আমরা তাদের মৃত্যুভয় বলে দেখি না। 'মৃত্যু' শব্দটির যে অর্থের সাথে আমরা জড়িয়ে আছি, ভয় বিনা তা অর্থহীন হয়ে যায়।

তাহলে মৃত্যু কি?

তোমরা আমাকে বলবে, 'আমাদের জীবনের শেষে যে ঘটনা ঘটে, তা হল মৃত্যু।' মৃত্যু যদি এর চেয়ে বেশি কিছু না হ'ত, তো ব্যাপারটা অনেক সরল ছিল!

কিন্তু মৃত্যু আমাদের জীবনের শেষে হয় না। এটা আমাদের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে ঘটছে। আমাদের প্রতিটি কাজ অচেতনভাবে আমাদের মৃত্যুর সাথে সম্বন্ধ রাখে, মৃত্যুভয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। মৃত্যু আমাদের জীবনের গুণগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে দেয়। এটা সমাপ্তি নয়; এটা আমাদের জীবনের চরম পরিণতি - যার দিকে আমাদের সমস্ত জীবন মুখ করে আছে।

আমি কেন এটা বললাম? কারণ আমাদের সমস্ত জীবন মৃত্যুর ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমনকি আমাদের সামাজিক গঠনও মৃত্যুর ধারণা দ্বারা নির্দেশিত। আসলে সব মহান ধর্ম ও বিশ্ব-দর্শন একটা প্রশ্ন থেকে উঠে এসেছে, 'মরণের পর কি হয়?'

এই একটা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নানা জীবন-সমাধানের সৃষ্টি হয়েছে।

যে সংস্কৃতি পুনর্জন্মের ধারণা ছাড়া একটিমাত্র জীবনে বিশ্বাস করেছে , তারা জীবনে খুব উন্নতি করার দিকে তাদের সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা, জ্ঞানলাভ করা এবং বস্তুগত আরামে তারা অতি উন্নত হয়েছে।

এই সংস্কৃতি বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে আরামদায়ক করে তোলে।

যে সব সংস্কৃতি পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখে, তারা তাদের জীবনকে অন্তর্মুখী করেছে। তাদের অন্বেষণ অন্য প্রকার। তারা জীবন তাড়াহুড়ো করে বাঁচতে চায় না, কারণ তারা অসীমতা স্বীকার করে নিয়েছে।

তুমি মানুষের ব্যবহারে তা দেখতে পাবে। ভারতে যদি কোন প্রোগ্রাম ছ'টার সময় হবার কথা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে তা সাড়ে সাতটার আগে শুরু হবে না, কারণ এখানকার লোকেদের সামনে অনন্তকাল আছে!

আমাদের সম্পূর্ণ মানসিক কাঠামো, জীবনের ধারা, আমাদের সমাজ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ধর্ম - সবকিছুই আমাদের মৃত্যুর ধারণার ওপর ভিত্তি করা। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করি মৃত্যু সম্বন্ধে না ভাবা , কিন্তু মৃত্যু আমাদের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে!

মৃত্যুর গভীরতা, গুপ্ত কথা ও রহস্য যখন জানতে পারি, আমরা জীবনের রহস্য জানতে পারব। আমাদের মৃত্যুকে সমাধান করতে হবে এবং তাকে 'অন্য রূপে এক নিছক অবিচ্ছিন্নতা' হিসাবে দেখতে হবে। নয়ত আমরা জীবনকেই হারিয়ে ফেলব।

যদি আমরা বুঝি যে মৃত্যু হল অন্যরূপে অবিরাম চলমানতা , আমাদের মৃত্যুভয় থাকবে না। আর যখন আমরা মৃত্যুকে ভয় করা বন্ধ করব, আমরা তখন জানব যে জীবনকে আমরা কতটা হারাচ্ছিলাম।

আমরা জীবনকে মেনে নিয়ে এত অগভীরভাবে বাস করি যে আমরা জীবনের অনেক অভিমুখ হারিয়ে ফেলি। মৃত্যু সহজেই আমাদের জীবনকে আরও সচেতনভাবে দেখতে শেখায়। মৃত্যু সর্বকালের সবচেয়ে মহান গুরু।

কোন বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় আমরা দুভাবে নিয়ে আসতে পারি : আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে সত্যকে যাচাই করতে পারি অথবা যিনি সত্যকে অভিজ্ঞতা করেছেন তাঁর কথা মেনে নিতে পারি। আমরা এখন প্রাচীন ভারতের বৈদিক গ্রন্থ উপনিষদের এক কথা শুনব।

মৃত্যু সবচেয়ে মহান শিক্ষক

কঠোপনিষদ উপনিষদের এক ভাগ। তাতে আছে একটি বালকের সাথে যমরাজের কথোপকথন। হিন্দু পুরাণে যম হল মৃত্যুর দেবতা।

> বাজশ্রবা নামে এক সুবিদিত রাজা ছিল। তার হঠাৎ সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা জাগল এবং বাজপেয় (বিশ্বজিৎ) যজ্ঞ করল। সমগ্র বিশ্বকে শাসন করার ইচ্ছা জাগলে এই যজ্ঞ করা হয়।

এই যজ্ঞের নিয়ম অনুযায়ী যে সমস্ত মূল্যবান জিনিষে সে অনুরক্ত, তাদের যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে। একমাত্র তবেই সে সমগ্র বিশ্বের রাজা হতে পারবে।

রাজারা সর্বদাই ভাল ব্যবসায়ী হয়। তাদের তা হতে হবে, নয়ত তারা রাজা হতে পারবে না এবং তাদের বিশাল ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তারা দেখে যে কত কম দিয়ে কত বেশী নিয়ে নাওয়া যায়।

রাজা দান করতে লাগলেন, যেমন বেশী বয়সের গরু, যারা আর দুধ দেয় না ও অনেক বাছুরের জন্ম দিয়ে ফেলেছে এবং মরবার জন্য তৈরি। রাজা এরকম সব মূল্যহীন জিনিষ দান করতে থাকলেন।

তার সাত বছরের পুত্র নচিকেতা এইসব দেখছিল। নচিকেতা এই গল্পের নায়ক। সে জানত তার পিতা ঠিক কাজ করছে না, কিন্তু বুঝতে পারছিল না পিতাকে কিভাবে বলা যায়।

দ্যাখো, শিশুরা খুব তীক্ষ্মধী ও বুদ্ধিমান। তাদের বোকা বানানো যায় না। সমাজ তাদের বিকৃত ও নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে নি। সে তার পিতাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। অবশেষে সে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'পিতা, আপনাকে বেশী মূল্যবান সমস্ত জিনিষগুলি দান করতে হবে। আমিও তো আপনার এক বহুমূল্য স্বত্ব। আপনি আমাকে কাকে দান করছেন?'

রাজা বুঝতে পারল যে তার কাজের জন্য ছেলে তাকে খোঁচা দিচ্ছে। কিন্তু নিজের আমিত্ব তাকে টলাতে পারল না। সে আজেবাজে দান করেই যেতে থাকল।

আরও একবার, বালক পিতাকে একই প্রশ্ন করে ও রাজা নিরুত্তর থাকে।

তৃতীয়বার সে পিতাকে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে পিতা তাকে কাকে দান করছে।

রাজা এবার রেগে গেল ও বলে ফেলল, 'আমি তোমাকে যমরাজকে দিলাম। তুমি যমের কাছে যাও।'

সাধারণ বালক হ'লে বলত, 'আমি কেন যাব? তুমি তোমার পুরো জীবন উপভোগ করে নিয়েছ, তুমি যাও!'

কিন্তু নচিকেতা খুবই আন্তরিক ও দায়িত্ববান ছিল। দায়িত্বশীলতা ও সততা তার ওপরে যেন ভুতের মত ভর করেছিল। তার পিতার কথার সম্মান রাখার জন্য সে যমরাজের কাছে যাওয়া ঠিক করল।

মনে রেখ যে নচিকেতা হল প্রথম ও শেষ মানুষ যে পৃথিবী থেকে গিয়ে যমরাজের সাথে দেখা করেছে। সাধারণত যম মানুষের সাথে দেখা করতে আসে, কিন্তু প্রথমবার এমন হল যে একজন যমের সাথে দেখা করতে গেল।

সে যমের রাজ্যে গেল, কিন্তু যম সেখানে তখন ছিলেন না! তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। নচিকেতা তিন দিন অপেক্ষা করল।

এখানে একটা জিনিষ বোঝ : গল্পের এই জায়গায় একটা বড় সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন আমরা মৃত্যুর সন্ধানে যাই অথবা আমাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হবার সাহস থাকে, মৃত্যু সেখানে আমাদের জ্ঞান-মাফিক থাকবে না!

যাই হোক, যমরাজ তিন দিন পরে ফিরে এলেন। তাঁর লোকেরা তাঁকে বলল যে একটা ছোট ছেলে তার জন্য অপেক্ষা করছে। যম নচিকেতাকে দেখার জন্য দৌড়ে গেলেন। তিনি নচিকেতাকে সময়ে অভ্যর্থনা না করতে পারার জন্য ক্ষমা চাইলেন। তিনি আরও বললেন, 'তোমাকে তিন দিন অপেক্ষা করাবার জন্য আমি তোমাকে যে কোন তিনটি বর দিতে রাজী আছি।'

নচিকেতার জন্য মৃত্যু হয়ে গেল এক ভগবান, যে তাকে বরপ্রদান করে!

নচিকেতা তিনটি বর চায়।

প্রথমটি হল, 'আমার পিতা যেন আর ক্রুদ্ধ না হন। আমি ফিরলে তিনি যেন আমাকে চিনতে পারেন ও আমাকে প্রেমপূর্বক গ্রহণ করেন।' নচিকেতা পিতার প্রতি গভীর প্রেমের জন্য এই বর চেয়েছিল যাতে পুত্রকে যমরাজের কাছে পাঠিয়ে তার পিতা কোনরূপ কষ্টভোগ না করেন।

যম সেই বর দিলেন।

দ্বিতীয় বরটি হল, 'আমি অগ্নিহোত্র-বিধি শিখতে চাই যার দ্বারা মর্ত্যের মানুষ হয়েও নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে অবস্থান করতে পারি যেখানে মৃত্যু নেই, দুঃখ নাই।'

যম তথাস্তু বলে নচিকেতাকে অগ্নি আহুতির মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন ও সেই অগ্নির নাম রাখলেন নচিকেতা অগ্নি। এই অগ্নি কারোর চেতনাকে স্বর্গীয়সুখের অভিজ্ঞতায় উন্নীত করে।

তৃতীয় বরের জন্য নচিকেতা বলে, 'আমাকে অস্তিত্বের ও জীবন-মৃত্যুর সত্যতার শিক্ষা প্রদান করুন। আমি মৃত্যুর পরে

বিদ্যমান থাকি কি না? দয়া করে আমাকে বলুন!'

যম নচিকেতার প্রশ্নে বিকম্পিত হলেন।

তিনি বললেন, 'দয়া করে আমায় এ প্রশ্ন কোরো না। তুমি মৃত্যুর রহস্য জিজ্ঞাসা করছ যা আমি তোমাকে বলতে পারি না। যদি চাও, তোমাকে অঢেল ধনদৌলত দেব, কিন্তু এই প্রশ্ন কোরো না।'

কিন্তু নচিকেতা নাছোড়।

সে বলে, 'আমি যদি আপনার কাছ থেকে ধনসম্পদ নিই, আমি তো খালি তার ট্রাস্টি হয়ে একশ থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচব, ব্যাস। তাহলেও তো আমার সময় ফুরিয়ে গেলে আমাকে আপনার রাজ্যে আসতে হবে ! তাহলে সেই ধন আমার কি কাজের? তাই অনুগ্রহ করে বরঞ্চ আমাকে মৃত্যুর রহস্য বলুন।'

সত্য জানার প্রতি বালকের পরিপক্বতা ও অঙ্গীকারকে যম দেখলেন। তিনি ঠিক করলেন নচিকেতাকে সত্য জানাবেন। যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি বালককে নিয়ে গেলেন সেটা বালকের আত্মার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল এবং নচিকেতা প্রস্ফুটিত হলেন এবং জীবনমুক্তি লাভ করলেন।

এটি উপনিষদের এক সুন্দর কাহিনী। বিশ্লেষণ করতে যেও না যে ঘটনাটি সত্য কিনা। ইতিহাস থেকে এর তারিখ ও সময় খুঁজতে যেও না। গল্পটি সত্যকে বহন করে, সেটাই যথেষ্ট। সত্যে পৌঁছুবার জন্য এটাকে কেবল সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার কর। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থেকো না, তাহলে সত্যকে পাবে না।

একজন সাধারণ মানুষের যমের সাথে সাক্ষাৎ এবং নচিকেতার যমের সাথে সাক্ষাতে কি পার্থক্য ?

যমের সাথে সাধারণ মানুষের দেখা হলে, যম মানুষটির অনুমোদন ছাড়াই তাকে তার পরিবার থেকে সরিয়ে ফেলেন। যম তার সমস্ত সুখ কেড়ে নেন। সবশেষে যম তার জীবনকেও নিয়ে নেন। তার পরিবার, সুখ ও জীবন, এসব প্রিয় জিনিষ, যম তার সম্মতি না নিয়েই হঠাৎ করে নিয়ে নেন। আবার একজন সাধারণ মানুষ যমের কাছে কখনই যায় না। অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে যমই তার কাছে আসেন। কিন্তু নচিকেতা যমের কাছে গিয়েছিল এবং যম প্রথম বরে তার পরিবার ফিরিয়ে দেন। দ্বিতীয় বরে যম তাকে স্বর্গীয়সুখের অভিজ্ঞতা দেন এবং সবশেষে তৃতীয় বরে যম তাকে জীবনমুক্তি দেন।

এই গল্প থেকে চারটি জিনিষ শেখার আছে। যখন আমরা মৃত্যুর খোঁজে যাই , যখন আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াই, মৃত্যু সেখানে আমাদের ভাবনা অনুযায়ী থাকবে না। নচিকেতার আগমনকালে যমের যমরাজ্যে অনুপস্থিত থাকা এতে প্রতীকায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যু থাকলেও আমাদের ভাবনামত সে ভয়ঙ্কর নয়; সে প্রেমপূর্ণ ও দাতা। সেটা দেখা যায় যম কিভাবে নচিকেতাকে অভ্যর্থনা করেন ও তার সাথে বার্তালাপ করেন। তৃতীয়ত, মৃত্যু আমাদের সর্বকালের সবচেয়ে মহান শিক্ষক। তাই যম নচিকেতাকে অনেক শিক্ষাদান করেছিলেন। সবশেষে, মৃত্যু আমাদের চূড়ান্ত উপহার দিতে পারে - জীবনমুক্তি - যা যম দিয়েছিলেন!

বেশীরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে জীবন মৃত্যুভয়কে ছাড়িয়ে যায় না। আমরা বাসনা ও ভয়ের মাঝ খানে বাঁচি ও মরি। আমরা অন্য কোন প্রকার জীবনধারণ জানি না। অথবা অন্যরকম জীবন অনুসরণ করার সাহস আমাদের নেই।

আগেকার দিনে মানুষ জীবনের নিরাপত্তা ছাড়াই বাস করত; আজ জীবন অনেক নিরাপদ। মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে কোন টিকা বা ভ্যাক্সিনেশন তখন ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে উন্নত সতর্কতামূলক সংকেত আসত না এবং দুর্ভিক্ষ ও বন্যা থেকে কোন নিরাপত্তা ছিল না। তাই লোকেরা সর্বদাই মানসিকভাবে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত ছিল, এমনকি মৃত্যুর জন্যও। বিশেষ করে যোদ্ধৃবর্গ যে কোন সময়ে মরবার জন্য সদা-প্রস্তুত থাকত।

প্রাচীন জাপানে সামুরাই যোদ্ধারা শান্তভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া জানত।

সচেতনভাবে মৃত্যু-অভিজ্ঞতা

আমরা সবাই মৃত্যুভয় নিয়ে আছি। আমরা মৃত্যুকে যে কোন প্রকারে এড়িয়ে যেতে তৈরি এবং তাকে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে ভাবি।

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস সম্বন্ধে একটা ছোট গল্প :

সক্রেটিসকে হেমলক নামে বিষাক্ত লতার রস খাইয়ে মারা হয়। বিষপান করার ঠিক আগে তাঁর এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'মাস্টার, আপনি কি মরতে ভয় পান না? আপনাকে কত শান্ত লাগছে।'

> সক্রেটিস উত্তর দিয়েছিলেন, ‘কেন ভয় পাব? আমি জানি যে মরার পর দুটি জিনিষ হতে পারে। হয় আমি অন্য কোন রূপে বা নামে বিদ্যমান থাকব অথবা আমার অস্তিত্বই থাকবে না। প্রথম ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা করার জন্য কে থাকবে? তাই দুটি ক্ষেত্রেই ভয়ের কোন কারণ নেই!’

মৃত্যু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ও তার ফলাফল জানার জন্য সক্রেটিস মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভয় ছিলেন। মৃত্যুকে সর্বদাই শেষ হয়ে যাওয়া হিসাবে দেখা হয় এবং তাই মানুষেরা মৃত্যু দেখলে কষ্ট পায়।

মৃত্যু থেমে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এটা অন্য রূপে চলমান থাকা অথবা পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করা। মানুষ এটা বুঝলে মৃত্যুর জন্য কষ্ট পাওয়াকে বোকামি মনে করবে।

মানুষ শারীরিক আকারের সাথে খুব সংযুক্ত এবং তাই সে এত কষ্ট পায়। শরীর তো আত্মার বাহনমাত্র। এই জিনিষটা স্বচ্ছভাবে বুঝতে হবে।

যদিও পৃথিবীতে মানুষের জন্য একমাত্র নিশ্চিত জিনিষ হল মৃত্যু, তবুও এটা ঘটলে মানুষ বিস্মিত হয়! মনুষ্য-বিষয়ে এটাই সবচাইতে বিস্ময়কর জিনিষ।

একটা ছোট গল্প :

> এক মহিলা তার একশ’তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করছিল। তার সমগ্র পরিবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত। তারা সমস্ত পরিজন ও বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া উপহারগুলি খুলছিল এবং সব গ্রীটিংস কার্ডগুলি পড়ছিল।
> তারা মহিলাটিকে ৯৪ বছরের এক পুরান বন্ধুর পাঠানো কার্ড দেখাল।
> মহিলাটি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘হে ভগবান! সে এখনও বেঁচে আছে!’

আমরা নিজের ছাড়া অন্য সবার মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবতে পারি! আমরা জীবনে নিজেদের মৃত্যু ছাড়া সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু অবাক ব্যাপার হ’ল মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছু সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। জীবনে একমাত্র নিশ্চিত জিনিষ হ’ল মৃত্যু। কিন্তু আমরা শুনতে চাই না যে কোন না কোন সময়ে আমাদের মৃত্যু হবে।

> ভগবান রামানা মহর্ষি মৃত্যুকে সচেতনভাবে অভিজ্ঞতা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। ছোটবেলায় দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইতে মামার বাড়ীতে একদিন রামানা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ভাবনা এল যে তিনি মরে যেতে চলেছেন! তিনি দেখলেন মৃত্যু তাঁর নিকটে আসছে।
>
> বেছে নেবার জন্য তাঁর দুটি সম্ভাবনা ছিল - হয় ভাবনাটাকে আটকাতে হবে, অথবা মৃত্যুকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে চলতে হবে। সাধারণত লোকেরা ভাবনাটাকে আটকায়, তাই তারা কোমায় চলে যায় এবং অচেতন অবস্থায় শরীর ছেড়ে যায়।
>
> ৯৯% মানুষেরা অচেতন অবস্থায় শরীর ছেড়ে যায়।
>
> জন্ম থেকে যদিও আমরা জানি যে আমাদের এই জীবন মৃত্যুতে পৌঁছাবে, আমরা কখনই তা প্রত্যক্ষবৎ স্মরণ করার চেষ্টা করি না। আমরা কখনও সম্ভাবনাকে বাস্তব বলে ভাবি না; আমরা তাকে স্বাগত করি না। কমপক্ষে একবার যদি সচেতনভাবে তার মধ্য দিয়ে যাও, তার প্রতি ভীতি চলে যাবে।
>
> রামানা দ্বিতীয় পথটি বেছে নেবার জন্য সাহসী ছিলেন। তিনি তাঁর ভাবনার সাথে সাথ দিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুকে ঘটতে দিলেন ও মরণের পরে কি হয় তা দেখা ঠিক করলেন। তিনি তাঁর শরীরের একটার পর একটা অংশকে পরিষ্কারভাবে মরে যেতে দেখলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত শরীরের মৃত্যু হ’ল। তিনি তাঁর পুরো শরীরকে ভস্মীভূত হতে দেখলেন।
>
> তিনি হঠাৎ বুঝলেন যে মৃত্যুর পরেও তাঁর কিছু একটা রয়ে গেছে; যাকে বিনাশ করা যায় না। তিনি হঠাৎ বুঝলেন যে দেহ ও মন ছাড়িয়ে তিনি বিশুদ্ধ চেতনা। তিনি নিজের মৃত্যুকে কেবল সাক্ষী হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন!
>
> এই জ্ঞান ছিল অতি শক্তিশালী এবং সেটা তাঁকে কখনও ছেড়ে যায় নি এবং যখন তিনি তাঁর শরীরে ফিরে এলেন, তিনি হলেন ভগবান রামানা মহর্ষি - জীবনমুক্ত মাস্টার।

তুমি যখন মৃত্যুভয়কে জয় কর, তুমি মৃত্যুকেই জয় কর, কারণ মৃত্যুও কেবল আরও একটি কল্পনা! ঠিক যেভাবে আমাদের বাসনা বিশ্বকে বাস্তব থেকে আরও বেশী সুন্দর কল্পনা করায়, সেভাবে আমাদের ভয় মৃত্যুকে বাস্তব থেকে আরও বেশী ভয়ঙ্কর হিসাবে কল্পনা করায়।

আমরা বাসনা ও ভয়ের চশমা পড়ি এবং বাস্তব দেখতে পারি না। মানসিকভাবে মৃত্যু অভিজ্ঞতা করলে তুমি ভয়-শক্তিকেন্দ্র স্বাধিষ্ঠান চক্রে তালাবদ্ধ শক্তিকে বিমুক্ত করবে। স্বাধিষ্ঠান চক্র মূলাধার চক্র ও মণিপুরক (নাভিকেন্দ্র) চক্রের মাঝখানে অবস্থিত। এই শক্তিকেন্দ্র সক্রিয় হলে তোমার জীবনের সমস্ত গুণগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হবে।

মৃত্যুকে 'অন্যরূপে অবিরাম চলমানতা' হিসাবে গ্রহণ করার সামর্থ্যের জন্য তোমার জীবনকে উপভোগ করার সামর্থ্য পরিবর্তিত হয়। তোমার সমস্ত শরীর আরাম করে; তোমার চেতনা প্রসারিত হয়, তোমার বেঁচে থাকার সামর্থ্য বাড়ে। মৃত্যু ও মৃত্যুভয়কে বুঝে তোমার জীবন সমৃদ্ধ হয়; হয়ত বিত্তবান নয়, কিন্তু সমৃদ্ধ। জীবনে সমৃদ্ধি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু তোমাদের এসব বললে এখন আমায় বিশ্বাস করবে না। ভাববে আমি সব অবাস্তব কথা বলছি।

একটা ছোট গল্প :

> এক ডাক্তার এক জন্মান্ধ ব্যক্তিকে ভাল করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।
> ডাক্তার বলেন, 'এই অপারেশনের পরে আপনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন! আপনাকে আর লাঠি ব্যবহার করতে হবে না!'
> সে কথা শুনে অন্ধ লোকটি ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, 'ডাক্তারবাবু, বুঝলাম যে আমি আমার দৃষ্টি ফিরে পাব। কিন্তু লাঠি ছাড়া হাঁটব কি করে?'

লাঠি অন্ধ ব্যক্তির এক অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে এবং সে বুঝতেই পারছে না যে সে লাঠি ছাড়াই চলতে পারবে! জন্মান্ধকে কিভাবে বোঝাবে যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে কোন লাঠির দরকার হয় না? এখন সে খুব ভীত। এখন তাই তুমি কেবল অপারেশন করতে পার এবং পরে তাকে নিজে থেকে বুঝতে দাও। সে নিজেই লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

একইভাবে, আমি যদি বলি যে তোমার সব ভয়ের মূল হ'ল মৃত্যুভয় এবং তোমার আত্মা অমর অবিনশ্বর, কেবল তোমার শরীর নশ্বর, তবুও তুমি তোমার আগের ভয়ের ভাবনাতে সেঁটে থাকবে, কারণ তুমি অবিনশ্বরতার অভিজ্ঞতা লাভ কর নি।

সচেতন হয়ে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা না হ'লে ভয় তোমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না। কিন্তু তুমি একটা জিনিষ করতে পার। বারবার এই কথাগুলি শোন। এই সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে তোল। কিভাবে তোমার প্রধান ও অপ্রধান ভীতিগুলি কিভাবে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুভয়ের সাথে জড়িত তা লক্ষ্য করার চেষ্টা কর। দৈনন্দিন সমস্ত ভয়গুলিতে স্পষ্টতা নিয়ে এস। দেখ ভয়গুলি কিভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। ভয়গুলিতে সচেতনতা নিয়ে এস। তাহলে তুমি নিয়মিতভাবে বিকশিত হবে ও সত্যের নিকটবর্তী হতে থাকবে।

পাঁচ প্রকার ভয়

আমরা সমস্ত ভয়কে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

প্রথমটি আমাদের ধনসম্পদ, আরাম, নাম, যশ এবং অন্য পার্থিব জিনিষ হারাবার ভয়।
দ্বিতীয়টি হ'ল আমাদের স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা বা অসুখে শরীরের কোন অঙ্গ হারাবার ভয়; শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত ভয়।
তৃতীয়টি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক দৃঢ়তা হারাবার ভয়।
চতুর্থটি আমাদের প্রিয়জন ও তাদের ভালবাসা হারাবার ভয়।
পঞ্চমটি হ'ল অজ্ঞাত ব্যাপারে ভয়, ভগবানকে ভয়, ভূতের ভয় এবং মৃত্যুভয়।

আসলে গভীরভাবে ভয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখবে যে সমস্ত পাঁচ শ্রেণীর ভয় মৃত্যুভয়ের সাথে সম্পর্কিত। তারা কেবল নানাভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যাস।

সম্পূর্ণরূপে সজীব থাক

জীবনে সম্পূর্ণরূপে সজীব না থাকাই মানুষের মৃত্যুভয়ের প্রধান কারণ। তারা ভয় পায় কারণ তারা বেপরোয়া হয়ে ভাবে যে জীবনকে তারা যথেষ্ট উপভোগ করে নি। তারা এরকম ভাবে কারণ তারা সমস্ত জীবন ধরে অতীত-স্মৃতিতে বা ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় বা অপরের জন্য বাস করছিল, কখনই বর্তমানে বাস করে নি। আমাদের প্রতিটি ক্রিয়ার কারণ হল পরস্পরের আমিত্ব বা পরস্পরের বাসনা বা পরস্পরের ভাবনা ইত্যাদির মধ্যে টানাহিঁচড়া।

তুমি যদি গভীরভাবে নিজের জীবনকে বিশ্লেষণ কর, আমি কি বলছি তা বুঝতে পারবে। তোমার বাবা-মা যেখানে ছেড়ে গেছে সেখান থেকে তুমি তোমার জীবন শুরু কর। বাসনা, অপরাধবোধ, ভয় ইত্যাদির মুকুট যা কয়েক প্রজন্মের পুরানো, তা তুমি

সহজেই বাবা-মায়ের থেকে নিয়ে পড়ে ফেল। তুমি কখনই সম্পূর্ণরূপে সজীব থাকো নি।

সম্পূর্ণরূপে সজীব থাকা বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি? আরও বেশী স্পষ্টতা নিয়ে বাঁচ, ব্যাস। অন্যেরা তোমার ওপরে যা কিছু চাপাবার চেষ্টা করছে, তাদেরকে সেগুলির অর্থ বুঝতে সাহায্য কর। স্পষ্টতার সাথে, তুমি শনাক্ত করতে পারবে যে তোমার নিজের বাসনাগুলি কি, অন্যরা তোমার ওপর কি চাপিয়েছে এবং অন্যের থেকে তুমি কোন বাসনা ধার করেছ। কেবলমাত্র এই প্রথম বাসনাগুলির কোন মানুষের বা কোন সম্পত্তির ক্ষতি ছাড়াই পূরণ হওয়া উচিৎ। পরের দুটিকে স্পষ্টতার সাহায্যে ফেলে দেওয়া উচিৎ।

এইভাবে বাঁচলে আর অপর থেকে ধার করা বাসনা পূরণ করতে থাকবে না এবং আর অপরের জীবন যাপন করবে না। তুমি অপরের জীবন না বেঁচে তোমার নিজের জীবন যাপন করবে ও পূর্ণতা অভিজ্ঞতা করবে এবং সময় এলে তুমি মরণের জন্য প্রস্তুত থাকবে। তোমার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিভ্রান্তি ও ভীতি থাকবে না। আমি তোমাকে স্বার্থপর হতে বলছি না। আমি তোমাকে পুরো ব্যাপারে কেবল একটা স্পষ্টতা নিয়ে আসতে বলছি।

একটা ছোট গল্প :

> একবার এক জেন-সাধুকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দিলেন। পরের দিন তাঁর সেই দণ্ড পাবার কথা।
> জেন সাধু শান্ত ও নীরব রইলেন। তাঁর এক শিষ্য এই শান্তরূপ দেখে জিজ্ঞাসা করল , 'আপনি কি বুঝতে পারছেন যে আপনার কাছে বাঁচার জন্য কেবল ২৪ ঘন্টা আছে? আপনি কি ভয়ভীত নন?'
> জেন সাধু শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'আমি বেঁচেছি এবং তাই আমার মরতে ভয় নেই।'

তিনি বোঝাতে চাইছেন যে তিনি তাঁর জীবনে প্রতিটি ক্ষণ বেঁচেছেন, প্রতিটি নিমেষ বেঁচেছেন। প্রতিটি মূহুর্ত তাঁর কাছে ছিল মূল্যবান ও প্রিয়! তিনি ভয় কেন পাবেন?

যদি তুমি গভীরভাবে দেখ, আমরা প্রায় সবাই মৃত্যুকে ভয় পাই না, কিন্তু আমরা জীবনকে যথেষ্টভাবে না বাঁচার জন্য ভয় পাই। আমরা ভয় পাই যে আমরা এক কৃত্রিম জীবন বেঁচেছি। আমরা এই পুরো ব্যাপারে এক অব্যাখ্যেয় অনুতাপ বোধ করি। আমরা ভাবি আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে বাঁচি নি। আমরা সম্পূর্ণতা বোধ করি না এবং সেখান থেকে মৃত্যুভয় শুরু হয়।

অপরের জন্য অবিশ্রাম আপোস-মীমাংসা করা, নিজের সাপেক্ষে একটা কৃত্রিম জীবন যাপন করা, আমাদের জন্য সমাজ দ্বারা নির্মিত ধাঁচে নিজেকে উপযোগী করা; এই সমস্ত জিনিষ অপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। জীবন থেকে ভয়ই মৃত্যুভয় রূপে প্রতিফলিত হয়।

পুরো সন্তুষ্টি সহকারে তুমি যখন যথাসাধ্য গভীরভাবে বেঁচেছ, তুমি মৃত্যুকে ভয় পাবে না। ভয় ছাড়া বাঁচ।

যতটা পার গভীরভাবে নিজের ব্যক্তিস্বভাব নিয়ে বাঁচ। পুরো সন্তুষ্টি নিয়ে বাঁচ, তবে মৃত্যুভয়কে হারিয়ে ফেলবে।

কোন ভাবনার বশীভূত না হয়ে তুমি যদি সম্পূর্ণভাবে বাঁচ, তুমি যদি তোমার ভাবনাগুলিকে স্পষ্টতা ও সম্পূর্ণতা সহ প্রত্যক্ষ করে বাঁচ, তোমার কখনই নিজের আত্মীয়-পরিজন হারাবার ভয় থাকবে না।

প্রিয়জন হারাবার ভয়

তুমি প্রিয়জন মরে যেতে পারে বলে ভয় পাও, তার একমাত্র কারণ তুমি ভাব যে সেই সম্বন্ধকে তোমার জীবনে তুমি পুরোপুরি ন্যায্যতা প্রতিপাদন কর নি। তুমি অনুভব কর যে সেই সম্বন্ধতে সম্পূর্ণভাব ছিল না, তাই তুমি বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত নও। শারীরিক বিচ্ছেদ ভয়ের এক অভিমুখ। আসল কারণ হ'ল সম্বন্ধে পূর্ণতার অভাব।

সম্বন্ধে 'ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা' কথাটি বলা হ'ল কারণ তোমাকে সর্বদা শেখানো হয়েছে অপরের জন্য বাঁচতে, তাদের প্রয়োজন ও বাসনা পূরণ করার জন্য বাঁচতে। আর যদি তা না কর, তুমি অপরাধবোধ ও ভয়ের আবর্তে ঢুকে পড়। যদি তুমি সম্পূর্ণতার সাথে বাঁচ, সমাজের খেলা একদম স্পষ্ট ভাবে বোঝ, তুমি কখনই এইসব বাধ্যবাধকতায় জড়িয়ে যাবে না।

তুমি সম্পূর্ণতার সাথে বাস করতে পার এবং তাতে সম্বন্ধগুলিতে ভালবাসা হারাবে না। যদি সম্পূর্ণভাবে বাঁচ , লেনদেন সম্বন্ধ ছাড়া অপরের দিকে প্রেমশক্তি বিকীরণ করতে করতে বাঁচ, তাহলে অপরাধবোধ ও ভয়ের কোন জায়গাই থাকবে না। যদিও মানুষটি মারা যায়, তুমি তার প্রতি প্রেম অনুভব করতে থাকবে, বিচ্ছেদের ভীতি কখনই থাকবে না।

একে অপরকে হারাবার দীর্ঘস্থায়ী ভয়ের জন্য সম্বন্ধ প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তুমি যদি গভীরভাবে কোন সম্বন্ধের সাথে যুক্ত ভয়কে

বিশ্লেষণ কর, বুঝবে, যেহেতু আমাদের সম্বন্ধ কেবল লেনদেনের সম্পর্কের মত , তাই এই ভয় পরিব্যাপ্ত।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ভয় থাকে যে একজন বিবাহের বাইরে সম্বন্ধ শুরু করতে পারে। মা-ছেলের মধ্যে একটা ভয় থাকে যে ছেলে বিয়ের পর মায়ের থেকে বউকে বেশী যত্ন করা শুরু করতে পারে। বাবা-ছেলের মধ্যে ভয় থাকে যে বাবা তার সম্পত্তি ছেলেকে নাও দিতে পারে অথবা ছেলে পরিবারের মর্যাদা নাও রাখতে পারে।

এইভাবে আমাদের যে কোন সম্বন্ধে একটা মূল প্রত্যাশা আছে যেটাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে ও সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং তা থেকেই ভয়ের উৎপত্তি। কিন্তু তুমি কোন সম্বন্ধেই পুরোপুরি পরিতৃপ্তি দিতে পার না । যে মানুষটি পরিবারে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করছে, সে ব্যর্থ হবেই।

এটা বোঝ : ভয় সবসময় কয়েদ করে, কিন্তু প্রেম সর্বদাই মুক্ত করে। কিন্তু সমাজ তোমার ভিতরে ভয় না ঢুকালে তুমি সমাজকে শুনবে না এবং তাই সে তোমার ভিতরে যথাসম্ভব ভয় ঢুকিয়ে দেয় - নিরাপত্তাহীনতা, আইনকানুন, পূজা এসব মারফৎ।

ভয়ই সম্বন্ধগুলিতে ঈর্ষার রূপ ধারণ করে। ভয় আমাদের বেশীরভাগ কাজ ও ভাবনার ভিত্তি। ঈর্ষা, ক্রোধ, লোভ - এই আবেগগুলির মূল হ'ল ভয়। কিন্তু আমরা সে সম্পর্কে সচেতন নই। আমরা জানি না যে ভয় এই সবগুলির উৎসের কারণ। সেটাই সমস্যা। আচরণগত দিক থেকে তাই আমরা অন্ধকারে পড়ে থাকি। সম্বন্ধগুলি তাই জটিল হয়ে পড়ে।

এটা বোঝ যে প্রেম ও ভয় কখনও একসাথে থাকতে পারে না। সম্বন্ধে যদি পবিত্র প্রেম থাকে, সেখানে ভয় থাকতে পারে না। যদি ভয় থাকে, তবে পবিত্র প্রেম কখনই থাকবে না। সম্বন্ধে ভয় থাকা মানে কোন কায়েমি স্বার্থ আছে। তখন সম্বন্ধে আছে কোন উদ্দেশ্য বা কোন অভীষ্ট লক্ষ্য বা বিনিময়ে নিরাপত্তা ও বাসনা পূরণের প্রত্যাশা।

আমরা সমস্ত সম্বন্ধে নিরাপত্তা খুঁজি। আমাদের জীবনটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য কিছু নিরাপত্তা চাই । এটা এক প্রকার কারাবন্ধন যা আমরা উপভোগ করি। লোকেরা স্বাধীনতার কথা বলে, কিন্তু আমি তোমাদের বলি, তারা স্বাধীনতাকে ভীষণ ভয় পায়! তারা কেবল কয়েদ পছন্দ করে। কারাগারের আরামদায়ক ব্যবস্থায় তারা নিজেদের স্বাধীন ভাবে।

একটা ছোট গল্প :

> একটি ছোট মেয়ে তার বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা, গ্যারান্টি শব্দটার মানে কি?'
> বাবা বলে, 'তার মানে কোন একটা জিনিষ ভাল করে তৈরি করা হয়েছে ও সেটা বহুদিন চলবে।'
> সেই রাত্রে ঘুমাতে যাবার আগে মেয়েটি বলে উঠল , 'শুভরাত্রি, গ্যারান্টি করা বাবা!'

আমরা সবাই জীবনে লাগাতার নিরাপত্তা চেয়ে আসছি। কিন্তু আমরা বলছি যে আমরা স্বাধীনতা খুঁজছি। সত্যি যদি স্বাধীনতা চাই , আমরা নিরাপত্তা খুঁজছি কেন? ভয় কেন? যতক্ষণ তোমার ভিতরে ভয় আছে, তুমি নিরাপত্তা খুঁজবে এবং তখন স্বাধীনতা চাই বলে তুমি নিজেকে কেবল বিভ্রান্তই করবে।

একজন মাস্টার তোমাকে জীবনের ঘোর নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেবেন। একমাত্র তিনিই তোমাকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাই তাঁর সাথে তুমি প্রথমদিকে নিরাপত্তাবোধ কর না, তুমি ভয় পাও। স্বাধীনতা ভয় সৃষ্টি করে।

অন্যান্য সম্বন্ধে তোমার নিজেকে কখনই ঘোরতর নিরাপত্তাহীন মনে হবে না কারণ সেখানে সর্বদাই লোভ, ভয় ও ক্রোধের টানাপোড়ন আছে আর সম্বন্ধ বিষয়ক এই আবেগগুলির সাথে তুমি খুবই পরিচিত। কিন্তু মাস্টারের সাথে তুমি একেবারে স্বাধীন। তাই তুমি ভীত হয়ে পড়।

একটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষ ২০ বছর কারাগারে ছিল। ছাড়া পাবার দিন তাকে খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।
> জেলের ভিতরে তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, 'কি ব্যাপার? তুমি এত চিন্তিত কেন?'
> লোকটি উত্তর দেয়, 'আমার ভয় লাগছে। ছাড়া পেয়ে বাইরে গিয়ে আমি কি করব?'

কারাগার মানুষটির মনে এইপ্রকার একটা নিরাপত্তার ছক সৃষ্টি করেছে যে সে জেলের বাইরে বেরিয়ে কি করবে তা বুঝতে পারছে না! ছক (pattern) ও নিরাপত্তায় আটকে যাবার এটাই বিপদ।

মাস্টার কখনও তুমি যে নিরাপত্তা চাইছ তা দেবেন না। তিনি কখনও তোমার চাওয়া নক্ শা (প্যাটার্ন) তোমায় দেবেন না। যখন তোমার চাওয়া নিরাপত্তা পাও না, তুমি নিজেকে গভীরে কেন্দ্রিত করে বিকশিত হও। তুমি ভয়হীন হয়ে বিকশিত হও কারণ তুমি

বুঝে ফেল যে তোমার হারাবার কিছুই নেই। আর যখন তুমি জান যে হারাবার কিছুই নেই , তুমি নির্ভয় হও।

কিছুই যে হারাবার নেই তার জন্য মাস্টার তোমাকে ঘোর নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেন। তোমার প্রতি অগাধ করুণা ও তোমার বিকাশের গভীর চিন্তার জন্য তিনি তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন না। তুমি যখন নীরস নিরাপত্তা পাও না , তুমি ভগবান লাভ কর!

তোমার সমস্ত ভয়গুলির কারণ হ'ল তুমি পরিষ্কার করে জান না যে হারাবার জন্য কিছুই নেই। মৃত্যুর নিকটবর্তী একমাত্র একটি ঘটনাই তোমাকে দেখিয়ে দেবে যে হারাবার জন্য কিছুই নেই এবং তোমার সমস্ত ভয়গুলি ভিত্তিহীন। মাস্টার তাঁর নিজের মত করে তোমাকে এই অভিজ্ঞতা দেন।

তাই মাস্টারের কাছ থেকে পালিয়ে যেও না। বোঝ যে তিনি এখানে আছেন কেবল তোমাকে দেখাবার জন্য যে তুমি আসলে কে। তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'ল ভয়হীনতা। বছরের পর বছর তোমার ভিতরে ভয় ঢোকানো হয়েছে। তুমি নিজেকে যেসব নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নিয়ে গেছ, মাস্টার সেগুলিকে ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। তুমি যদি বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে তাঁকে তোমার ওপরে কাজ ক রতে দাও, তুমি তোমার চোখের সামনে নিজেকে রূপান্তরিত হতে দেখবে।

আমার এক পরিচিত স্বামীজী সম্বন্ধে তোমাদের বলি :

> এই স্বামীজীর ঘরে অনেকগুলি ঘড়ি ছিল এবং প্রত্যেকটি ঘড়ি আলাদা আলাদা সময় দেখাত!
> একদিন আমি তাঁকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম।
> তিনি উত্তর দিলেন, 'সময় আমার মাস্টার নয়। আমিই মাস্টার! আমার যে সময় চাই, সেই মত আমি ঘড়ি পছন্দ করি।'
> এই স্বামীজী আগে থেকেই ঠিক জানতেন কবে ও কখন তিনি দেহ ছেড়ে যাবেন। মৃত্যুর আগের দিন তিনি সব শিষ্যদের তাঁর সামনে ডেকে ঈশ্বরবন্দনা করতে বললেন। একজন গায়ক তার গান গাইবার সামর্থ্যের জন্য খুব উদ্ধ ত ছিল। সে এই উপলক্ষে গাইল না। প্রথা অনুযায়ী স্বামীজী একটা কাগজে কিছু লিখে তাকে পাস করে দিলেন। শিষ্যটি এই তোষামোদিতে খুশী হ'ল, ভাবল তাকে কোন বিশেষ গান গাইতে বলা হয়েছে। সে যখন কাগজটি খুলে দেখে , দেখল স্বামীজী লিখেছেন, 'দয়া করে আমি মরবার পরে গেয়ো না!'
> এমন কি তাঁর মৃত্যুশয্যাতেও তিনি রসিক মেজাজে ছিলেন!
> পরে রাত্রিবেলা তিনি তাঁর শিষ্যদের আশ্রমের অনাথদের ভাল করে দেখাশুনা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, 'বিশেষত আগামীকাল তোমরা সবাই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকবে; কিন্তু এই শিশুদের খাবারের বন্দোবস্ত করতে ভুলে যেও না!'
> শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাদের ছেড়ে যাচ্ছেন তাদের সম্পর্কে তাঁর করুণা ছিল। পরদিন সকালে ঠিক যে সময় তিনি আগে বলেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি সবাইকে নমস্কার করার জন্য হাতজোড় করলেন ও তারপর তাঁর হাত পড়ে গেল, একদম নাটকের মত।

কত সুন্দর, শান্ত ও সাহসী ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া! এইভাবে আমাদের মৃত্যুর কাছে যাওয়া উচিৎ এবং এইভাবেই আমাদের পরিজন ও আত্মীয়দের মৃত্যুকেও গ্রহণ করা উচিৎ। এটা বুঝলে তোমার ভয় সম্বন্ধে ভাবনা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে , কারণ আমি যেমন আগে বলেছি, ভয়ের ভিত্তি হ'ল মৃত্যু নিজেই।

প্রশ্ন : স্বামীজী, ভয় কি সাধারণত স্ত্রীজাতির সাথে বেশী সংযুক্ত?

উত্তর : পুরুষেরা প্রধানত যৌনকামনার বন্ধনে এবং স্ত্রীজাতি প্রধানত ভয়ের বন্ধনে আটকে থাকে। বাস্তব হ 'ল, তারা দুজনেই এটা জানে ও পরস্পরকে নিজের স্বার্থের জন্য যথাযথ ব্যবহার করে!

পুরুষ জানে স্ত্রীজাতির দুর্বল জায়গাটা ঠিক কোথায়। সে তার নিরাপত্তা ও ভয়বোধ নিয়ে খেলা করবে ও তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে। একইভাবে মহিলা জানে পুরুষের চাবিকাঠি কোথায় ! মহিলা তার খেলা ঠিকমত খেলবে ও পুরুষকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে। বিবাহে সর্বদাই এটাই হয়ে আসছে।

আসলে হিন্দু বিবাহের সময়, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের কাছে শপথ নেয় যে তারা এই জীবনে আরও কর্ম পুঞ্জীভূত না করে অপূর্ণ কাজ ও বাসনাগুলি স্বচ্ছন্দে মিটাবার জন্য কাজ করবে - একে অপরের কর্ম নিঃশেষ করার জন্য কাজ করবে।

কিন্তু আজকাল মানুষেরা জানেই না যে তারা বিয়ের সময় এই শপথ নিয়েছিল , কারণ বিবাহ তো তারা করছে না। কেবল

পুরোহিতেরা এই সব মন্ত্র উচ্চারণ করে ও তারাই বিবাহ করে !

কত সুন্দর এই শপথ। আমরা আমাদের জীবনগুলিতে যথেষ্ট কর্ম পুঞ্জীভূত করেছি। এই কর্মগুলিকে নিঃশেষ করে এজন্মে মুক্তি পাওয়াই আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত।

তুমি যদি বিবাহের নাটক বাইরে থেকে লক্ষ্য কর, তুমি বুঝবে দম্পতি কিভাবে পরস্পরের জন্য কর্ম সৃষ্টি করে।

একমাত্র যখন তুমি বাইরে থেকে লক্ষ্য কর তুমি বুঝবে যে কত বোকার খেলা খেলা হচ্ছে। আমি সর্বদা লোকেদের বলি যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সহজেই জীবনকে একটা খেলা বলে দেখতে পারে, কারণ তারা সর্বদা কোন না কোন ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা গ্রহণ করছে ও তা মঞ্চস্থ করছে। তারা জীবনকে একটা বড় নাটক হিসাবে দেখতে খুব সহজেই সমর্থ হতে পারে।

ছোট ছোট ব্যাপারে ভয়

প্রথমে এটা বোঝ যে সমস্ত ছোট ছোট ভয় নিছক মৃত্যুভয়েরই প্রক্ষেপণ। দ্বিতীয়ত, তোমার ভিতরে ভয়কে প্রতিরোধ কোরো না। বারংবার নিজেকে বল যে তুমি ভয় পেয়েছ এবং সেই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে যাও, ব্যাস! সত্বর দেখবে যে ভয় চলে গেছে কারণ তুমি তার মধ্য দিয়ে গেছ। প্রতিবার ভয় পেলে এই জিনিষটা করা শুরু কর।

যখন সচেতনভাবে এই বিষয়ে কাজ কর, তুমি বুঝবে যে যাকে ভয় বল সেটা কোন ঘটনা বা চিন্তার জন্য কেবল তোমার সাড়া দেওয়া বা প্রতিক্রিয়া। তোমার প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে তুমি বলতে পার তোমার ভয় ছিল কি ছিল না এবং আরও সচেতনতার সাথে তুমি ভয়ের সাথে নির্ভয় হয়ে প্রতিক্রিয়া করতে পার !

একটা জিনিষ মনে রেখ : কেউ ভয়হীনতা দাবী করতে পারে না। মানুষ ভয়কে ভয় ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে পারে। কেউ যদি ভয়হীন হবার দাবী করে, সুস্পষ্টভাবে বোঝ যে সে ভয় ও তাতে মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখে নি। ভাবতে বোস না যে তারা অতিমানব এবং তুমি ক্ষুদ্রতর মানব।

একটা ছোট মেয়ে বলে : স্বামীজী, আমার মনে আছে আপনি মাকড়শা থেকে আমার ভয়কে দূর করতে কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন! আমাদের আলোচনা চলাকালীন একদিন আমি মাকড়শা দেখে লাফিয়ে পালিয়ে গেলাম ও আপনি তা দেখে হাসলেন। আপনি আমাকে মাকড়শা দেখলেই তার ধ্যান করতে বললেন। তাই প্রতিবার আমি যখন মাকড়শা দেখি, আমি তার দিকে সচেতনতা ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাকাই। ধীরে ধীরে আমি বিস্মিত হলাম যে আমি তাদের কেন ভয় পেতাম!

হ্যাঁ। ভয়ে সচেতনতা নিয়ে আসতে হবে। তখন তুমি আগে কেন ভয় পেয়েছিলে ভেবে অবাক হবে !

তুমি নিজের সাথে বসে ভয়গুলিকে কল্পনা করতে পার। কল্পনায় তাদের সাথে গভীর সচেতনতা ও শান্তভাব সহকারে মুখোমুখী হও। প্রত্যক্ষবৎ-স্মরণ প্রক্রিয়ায় যদি কষ্ট পাও, তো ঠিক আছে। তাকে দমিয়ে রেখো না অথবা শাস্তি দিয়ো না। তোমার শরীর যদি ভয়ে কাঁপে, কাঁপতে দাও। কেবল তার সাথে সাথ দাও। যা কিছু তুমি পূর্ণতার সাথে করেছ, তোমার ওপরে তার কোন প্রভাব থাকবে না। তোমার সমস্ত ভয়ই তোমার ভয়ের জন্য ভয়, ব্যাস্!

একটা ছোট গল্প :

> এক শিষ্য একদিন নদীতে আটকে গিয়েছিল। সে মরে যাবে বলে ভয়ভীত হয়েছিল এবং তার মাস্টারের প্রতি সে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য চিৎকার করছিল।
> মাস্টার বলেন, 'উঠে দাঁড়াও!'
> শিষ্য চেঁচিয়ে বলে, 'কি করে? আমি তো ডুবে যাচ্ছি।'
> মাস্টার বলেন, 'আমি কি তোমাকে নিজেকে সাহায্য করতে শিক্ষা দিই নি? এখন উঠে দাঁড়াও!'
> শিষ্য বলে, 'মাস্টার, আমার এই মৃত্যুকালে আমায় উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু আমাকে বাঁচাচ্ছেন না কেন?'
> মাস্টার অনড়, 'আমি বলছি, উঠে দাঁড়াও।'
> শিষ্য মাস্টারের অনড় অবস্থানে রুষ্ট হ'ল।
> কিন্তু এবারে সে সহজেই দাঁড়িয়ে পড়ল। জল ছিল কেবল তার হাঁটু পর্যন্ত!

প্রকৃতপক্ষে তোমার সমস্ত ভয়গুলি হল কেবলমাত্র তোমার ভয়গুলি থেকে পাওয়া ভয়। যদি তুমি তোমার ভয়গুলিকে ঝেড়ে ফেলতে পার এবং বুদ্ধিকে সামনে আসতে দাও, তুমি দেখবে যে তোমার ভয়গুলি কেবল এমন কোন জিনিষের ছায়া যার অস্তিত্বই নেই।

প্রতিটি ক্ষণে সজীব হয়ে বাস কর ও এগিয়ে চল!

যদি তুমি গভীরভাবে মৃত্যুভয়কে বিশ্লেষণ কর, তুমি জানতে পারবে যে লোকেরা মরতে ভয় পায় কারণ অচেতনভাবে তারা মনে করে যে তারা এখন যেখানে আছে তার চেয়ে উচ্চতর স্থানে তাদের অবস্থান করা উচিৎ ছিল। তারা ভাবে যে জীবনে আসল জায়গায় তারা পৌঁছায় নি এবং তাই তারা চলে যেতে প্রস্তুত নয়।

কিছু লোক ভাবে যে অন্যেরা তাদের দিকে খারাপ নজর দিয়েছে এবং তাই তারা উন্নতি করতে পারে নি ! সত্যি কথা হ'ল, তুমি নিজের দিকে ঠিকভাবে নজর দাও নি। সেইজন্য তোমার শেষ দিনগুলিতেও তুমি চাও মৃত্যু অপেক্ষা করুক।

যদি তোমার বাসনা, ভয় এবং অন্যান্য আবেগগুলিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ কর ও নিজে বোঝ, তবে তুমি কাউকে কোন কিছুর জন্য দোষ দেবে না।

এইপ্রকার জটিল ভয় ছাড়া যারা জীবন ধারণ করে, তারা মৃত্যুকেও ধারণ করতে পারবে। আমি যেরূপ তোমাদের আগে বলেছি যে মাস্টারদের জীবদ্দশায় বহু গল্প আছে যেখানে তাঁদের মৃত্যুর দিনক্ষণ তাঁরা শিষ্যদের বলে দিয়েছেন এবং তাঁরা সেই সময়েই দেহ ছেড়ে গিয়েছেন।

অনেক শিষ্যরা মাস্টারের মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিয়েছে যা তারা মাস্টারের জীবনকালে দেওয়া শিক্ষা থেকে শিখতে ব্যর্থ হয়েছিল। যখন বলছি যে তাঁরা মৃত্যুকে ধারণ করেছিলেন, তার মানে তাঁরা মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিলেন ও সচেতনভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁদের মৃত্যু ছিল আক্ষরিক অর্থে 'দেহ ত্যাগ করা', ব্যাস।

আমরা সবাই আমাদের শরীর অচেতনভাবে ছেড়ে যাই, অনেক কষ্ট পেয়ে - একদিকে অতৃপ্ত বাসনার অত্যাচার, অন্যদিকে শরীরের ওপর অত্যাচার - এদের টানাহেঁচড়ার মধ্যে। শরীর বলে যে অনেক হয়েছে এবং সে অনেক সহ্য করেছে। মন ও শরীরের মধ্যে গরমিল আমাদের জীবনকালে যন্ত্রণা দেয়, এমনকি মরণকালেও পীড়া দেয়। জীবনকালে নিজের সীমার ভিতরে, নিজের শরীরের ভিতরে বাস করলে আমরা আমাদের শরীর শান্তিতে ছেড়ে যাব। সমস্যা হ'ল, যখন বেঁচে থাকি, আমরা সর্বদাই শরীরের বাইরে থাকি, কখনও ভিতরে নয়।

আমি এটা তোমাদের বুঝিয়ে দিই। নিজের জীবনধারার দিকে গভীরভাবে কেবল তাকাও। খুব সকালে যখন দাঁত মাজছ , তো কি করছ? তুমি কাজে যাবার কথা চিন্তা করছ। যখন কাজে আছ , তুমি বাস ধরে ঘরে যাবার কথা ভাবছ। যখন ঘরে আছ , তুমি পরের দিনের কাজের কথা চিন্তা করছ! যখন ছুটিতে আছ, অফিসের কথা ভাবছ এবং যখন অফিসে আছ ছুটির কথা ভাবছ।

যেখানেই তোমার শরীর আছে, তুমি নিশ্চিত হতে পার যে সেখানে তোমার মন নেই ! তুমি তোমার জীবনের কোন মুহূর্ত সম্পূর্ণভাবে বাঁচ নি। তুমি সর্বদা হয় অতীতে না হয় ভবিষ্যতে বাস করেছ । এটাকেই বলে নিজের সীমার ভিতরে না বাঁচা। সেইজন্য মৃত্যুকালে তুমি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অতৃপ্ত থাক যে চলে যেতে চাও না। তাই তুমি মৃত্যুকে ভয় পাও।

তুমি প্রশ্ন করতে পার যে সচেতনভাবে মরা সম্পর্কে কেন জানা প্রয়োজন। যখন তুমি মৃত্যু সম্পর্কে জান , কেবল তখন তুমি জীবনকে ঠিকভাবে বুঝে বাঁচতে পারবে। নয়ত , তুমি সঠিকভাবে জীবন ধারণ করবে না।

গড়িমসি করা ছাড়

জীবনে তুমি সবকিছুই স্থগিত রাখ। তুমি তোমার খুশী মুলতবি রাখ , তোমার কাজ মুলতবি রাখ, সব কিছু আগামীকালের জন্য মুলতবি রাখ। তুমি একটা জিনিষ বোঝার চেষ্টা কর যে 'আগামীকাল' কেবল 'আজ' হয়েই আসে! যখন তা আজ হয়ে আসে, তুমি আবার তাকে 'আগামীকাল' বল! এই খেলা তুমি নিজের সাথে খেলতে থাক।

সবশেষে যখন মৃত্যু আসে, তুমি কত অপ্রস্তুত! তুমি মনে কর কত কিছু করার আছে। তুমি জীবন দ্বারা প্রতারিত হয়েছ বলে মনে কর। সত্য হ'ল, তুমিই তো প্রথম থেকে নিজেকে প্রতারিত করছিলে। কিন্তু তুমি সবকিছুর জন্য জীবনকে দোষী ঠাওরাও। সেইজন্য তোমার বাঁচার জন্য মৃত্যু সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা চাই। তাহলে কোন বিভ্রান্তি থাকবে না এবং তুমি যে কোন সময়ে মরতে প্রস্তুত থাকবে।

গড়িমসি করা একটা মানসিকতা যার দ্বারা আমরা জীবনকেই হারিয়ে ফেলি। লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনি এত স্বল্প সময়ে এত কিছু কিভাবে করতে পারেন ?' আমার পুরো বছরের ক্যালেন্ডার দেখে তারা অবাক হয় ! সারা বিশ্বে নানা জিনিষ সারা বছর ধরে হবে দেখে তারা খুব বিস্মিত হয়। আমি তাদের বলি, 'এটা খুবই সোজা - আমি সম্পূর্ণরূপে বর্তমানে বাস করি। আমি তোমাদের মত গড়িমসি করি না।'

আমাদের ধ্যান প্রোগ্রামে আমারা লোকেদের একটা নিয়ন্ত্রিত ধ্যানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাই। তাদের ছবির মত মনে করতে হয় যে তারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যাচ্ছে এবং মরার আগে তাদের যা কিছু করার ইচ্ছা তা সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। এটা একটা সুন্দ র ধ্যান-প্রক্রিয়া। তাদের নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও প্রত্যক্ষবৎ স্মরণ করতে বলা হয়।

একবার এই ধ্যানের পর একটি বাচ্চা মেয়ে তার ভাবনা জানাচ্ছিল।

সে বলে, 'স্বামীজী, আমি একটা দোকানে একটা পোস্টার দেখেছিলাম যাতে লেখা ছিল - যখন তুমি পরিকল্পনা করছ, তোমার ভবিষ্যতের বছরগুলিকে মনে রেখে পরিকল্পনা কর। যখন কার্য সম্পাদন কর, তুমি পরের মিনিটে মরে যাবে ভেবে কার্য নির্বাহ কর। এই ধ্যান করে আমি তার মানে যথার্থ বুঝলাম।'

দ্যাখো, তুমি যখন পরিকল্পনা কর, তোমার ভবিষ্যৎমুখী পরিকল্পনা চাই, যাতে বেশ কয়েক বছর ধরে বেশী কিছুর জন্য আর নতুন ব্যবস্থা করতে না হয়। কিন্তু যখন কার্য নির্বাহ কর, তোমাকে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় মনে রেখে মাস্টার-প্লান থেকে সাব-টাস্ক, সফলভাবে সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পাদন করতে হবে - কোন ত্রুটি না রেখেই।

তাহলে তোমার মরণকাল পর্যন্ত তুমি যে কার্যসমূহ সম্পাদন করেছ তা সবই নিখুঁত হবে এবং পরের লোকেদের জন্য মাস্টার-প্লান থেকে যাবে যা থেকে তারা অনুসরণ করতে বা দরকারমত সেগুলিকে আরও উন্নত করতে সক্ষম হবে। সেটা সম্ভব হবে , একমাত্র যদি তুমি গড়িমসি ছাড়া প্রতিটি ছোট ছোট কার্য (সাব-টাস্ক) সম্পাদন করে থাক।

প্রায়শ গড়িমসি তোমাকে দারিদ্র্য প্রদান করে। দারিদ্র্য তোমার নিজের পছন্দ। যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিতে দেরী কর, তুমি দরিদ্রতার দিকে এগিয়ে যাও। কিন্তু তোমরা এই ব্যাপারে মহানন্দে অচেতন। তুমি ভাব যে ভগবান তোমাকে ঠিক করে দেখে নি এবং তোমার স্বপ্ন সার্থক করার নিমিত্ত তোমার জীবন খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। যদি তুমি তোমার সর্বশক্তি ঠিক পথে চালিত করতে, তোমার এরকম ভাবনা আসত না এবং তুমি সর্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে।

যদি রোজ আয়নায় দেখ এবং নিজেকে বল যে আজ জীবনের শেষ দিন, তুমি তবে গড়িমসি করবে না। তোমাকে সমস্ত জীবন ধরে রোজ এটা বলতে হবে না; এক মাস করলেই চলবে। নিজে থেকেই তুমি গড়িমসি ছাড়া তোমার জীবন ধারণ করতে শুরু করবে। কেবল তাই নয়, তোমার মর্যাদা, লজ্জা, গর্ব ও প্রত্যাশা হারাবার ভয় সবই মিলিয়ে যাবে, কারণ তুমি জেনে গেছ যে তোমার কিছুই হারাবার নেই।

দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া, ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠা বা সেরকম কিছু থেকে বেড়িয়ে আসা লোকেদের অনেক সময় 'প্রায়-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা' (NDE, near death experience) হয়। এই প্রকার মানুষেরা আরও নির্ভয় হয়ে বাঁচে কারণ তারা জানতে পেরে গেছে যে তাদের হারাবার জন্য কিছুই নেই! তারা তাদের বাকি জীবন আরও বেশী স্পষ্টতা ও বুদ্ধি সহকারে কাটায়।

তোমাকে সমস্ত শিক্ষা থেকে প্রথম পাঠ শেখা দরকার যে সঠিক জিনিষ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করে এগিয়ে চলা উচিৎ। যে করেই হোক, আমরা সবশেষে এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে লাভ করি! অন্য সমস্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে যাবার পর আমরা এটা শিখি!

গড়িমসিকে তুমিই নিজের জীবনে নিয়ে আস। কিন্তু সমাজ তোমার ভিতরে অন্যান্য ভয় ঢোকায়। সমাজ তোমাকে ভয় পাইয়ে দেয় নিজের, অপরের ও ভগবানের থেকে। নৈতিকতা, নাম ও আকার, সম্মান প্রভৃতি সাধারণ জিনিষ দিয়ে সমাজ তোমাকে নিজের ওপরেই ভয় পাইয়ে দেয়।

নৈতিকতার নামে সমাজ তোমাকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলায় এবং তাই তুমি নৈতিকতা বিষয়ে নি জের সম্বন্ধে এত অনিশ্চিত। যখন তুমি ভয়ের দরুণ নৈতিকতাকে মেনে নাও, তোমার ভিতরের বুদ্ধি তোমাকে গাইড করার সুযোগ পাবে না।

নৈতিকতা সর্বদাই ভয় ঢোকায়

আমাদের জীবনে নৈতিকতা বুদ্ধির এক দুর্বল বিকল্প। তুমি নিজের বুদ্ধি-বশত কাজ করলে, তুমি নিজের সম্বন্ধে আস্থাশীল হবে। কিন্তু আইন-কানুন অনুযায়ী কাজ করলে তুমি নিজের সম্বন্ধে কখনও নিশ্চিত থাকবে না, কারণ প্রথমত তুমি তোমার মধ্যে নেই! তুমি নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত নেই; তুমি আইন-কানুনে কেন্দ্রীভূত আছ।

তুমি যদি বুদ্ধি থেকে জীবন ধারণ কর, এই প্রকার ভয় তোমাকে কখনও আঁকড়ে ধরবে না। যারা নৈতিকতা প্রচার করে তারা গভীরভাবে ভয়ভীত। তাই তারা সে সম্বন্ধে প্রচার করে। তারা ভয়ভীত, কারণ হয় তারা নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নয় অথবা তারা কেবল ভয় সহকারে নীতিবিদ হতে জানে। নীতিবিদেরা তাদের নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার ধারণা অনুযায়ী স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত হতে পারে।

একটা ছোট গল্প :

এক নীতিবিদ সাধারণত রাস্তায় সাবধানে মাপা পদক্ষেপে চলত।
একদিন হঠাৎ খুব বৃষ্টি। নীতিবিদ ভীড়কে অনুসরণ করল ও দৌড়ে চলল।
কিছুক্ষণ দৌড়াবার পর সে বুঝল যে সে আদবকায়দা সম্বন্ধে অসাবধান হয়ে পড়েছিল।
সে মনে মনে বলল, 'আমি কি করছি! দৌড়ানো অমর্যাদাকর। একজন ভদ্রলোক ভুল করলে তাকে অনুতপ্ত হয়ে সংশোধন করা উচিৎ।'
তাই সে যেখান থেকে দৌড় শুরু করেছিল সেখানে ফিরে এল ও মেপে মেপে চলতে থাকল।

নৈতিকতা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে স্থূলবুদ্ধি ও মৃতবৎ বানিয়ে ফেলে!

আমি তোমাকে যখন এসব বলছি তার মানে এই নয় যে আমি বলছি যে এটা এক নির্বাধ পৃথিবী এবং তুমি এখানে যা ইচ্ছে তাই করতে পার। আমি বলছি যে তোমাকে তোমার নিজের বুদ্ধি বিকশিত করতে হবে এবং এইভাবে জীবনযাপন করবে যে তুমি ইতিমধ্যে যা জান বা ভাব, বিধিনিষেধগুলি কেবল সেগুলির পাকাপাকি স্বীকৃতি হবে। এটাই আসল বুদ্ধিমত্তা। কোন যথোচিত নিয়ম কেবল সঠিকভাবে প্রস্ফুটিত বুদ্ধি থেকে আসা ভাবনার পাকাপাকি স্বীকৃতি হবে। তাই তোমার ভয় মুছে ফেল এবং তোমার অন্তরের বুদ্ধিকে খুঁজে পাবার চেষ্টা কর, সে-ই তোমার অন্তরের মাস্টার।

একটা ছোট গল্প :

একজন কমবয়সী সন্ন্যাসী ছিল। সে এক সুন্দরী বেশ্যার রাস্তায় বাস করত।
সন্ন্যাসীর সবসময়ে ধ্যান করার চেষ্টা।
বেশ্যার পয়সা রোজগারের ধান্ধা। অনেক মানুষ তার বাড়ীতে আসে যায়।
সন্ন্যাসী তার সাধ্যমত ধ্যান করার চেষ্টা করত কিন্তু তার মনোযোগ প্রধানত সেই কমবয়সী মহিলার দিকেই থাকত। সে মহিলাটিকে তার অনৈতিক ব্যবহারের জন্য শাপ দিত।
অন্যদিকে বেশ্যাটি জানতই না যে রাস্তার উল্টোদিকে এক সন্ন্যাসী থাকে। পুরুষদের খুশী করার জীবনশৈলী সত্ত্বেও, বেশ্যাটি কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে ছিল ও যখন পারত তাঁর প্রার্থনায় ও তাঁর মূর্তির সাথে খেলায় রত থাকত।
সন্ন্যাসী ও বেশ্যা একই দিনে মারা গেল এবং মৃত্যুরাজ যমের দুয়ারে পৌঁছাল।
তাদের রেকর্ড বিশ্লেষণ করার পর বেশ্যাকে স্বর্গে পাঠানো হ'ল এবং সন্ন্যাসীকে নরকে যেতে বলা হ'ল। যমের অবিচারের জন্য সন্ন্যাসী গভীর দুঃখপ্রকাশ করল।
যম শান্তভাবে সন্ন্যাসীকে ব্যাখ্যা করলেন, 'তোমার সমস্ত জীবনে ধ্যান করার অজুহাতে তুমি বেশ্যাটির ওপরে যৌনকামনাকে আশ্রয় দিচ্ছিলে। অন্যজন কিন্তু যে পেশাই অবলম্বন করুক না কেন, ভগবানের বাস্তবতাতে কেন্দ্রিত ছিল।'

নীতিবিদেরা এক ভাসা ভাসা, ভয়যুক্ত ও অগভীর জীবন যাপন করে। তারা সম্পূর্ণভাবে সজীব থাকে না। তারা নৈতিকতা থেকে বাইরে পদক্ষেপ রাখার ভয়ে সর্বদা জর্জরিত। তাদের আসল অভিসন্ধি নৈতিকতার ছদ্মবেশে লুকানো থাকে।

মান-সম্মান হারানো ঠিক আছে

নৈতিকতার মত মান-সম্মানও ভয়ের কারণ হয়। সম্মান, নাম ও যশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা - এগুলি সবই ভয়ের কারণ হয়। এই ভয়গুলি কিছুই নয়, কেবল নিজের আমিত্বকে আঘাত করার ভয়। কোন সম্মান তুমি রক্ষা করার চেষ্টা করছ? কেবল অন্তরের পরিপূর্ণতা ও মর্যাদা নিয়ে থাক; তবেই যথেষ্ট। যে মানুষ নিজের সম্মান প্রহরা দেয়, সে ভণ্ড।

এমন মানুষও আছে যারা অবিশ্রাম ভয়ে বাস করছে। তথাকথিত সম্মান তাদেরকে ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে।

একটা ছোট গল্প :

একদিন নদীতে একজন মাছ ধরছিল। অনেকক্ষণ কোন মাছ ধরা দিল না এবং সে বসেই আছে। ছিপ হাতে করে সে ঘুমিয়ে পড়ল।
হঠাৎ একটা বড় মাছ ধরা পড়ল এবং ছিপে টান পড়ল। লোকটি জাগার আগেই জলে পড়ে গেল।
একটি বালক দূর থেকে দেখছিল। সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, লোকটা মাছ ধরছিল, নাকি মাছটি লোক ধরছিল।'

মান-সম্মান বিষয়ে তোমাকে খুব সাবধান হতে হবে। যখন সম্মান তোমার জীবন থেকে বড় হয়ে যায়, তা তোমাকে নিঃশেষ করতে থাকবে।

মান-সম্মান তোমাকে ভাবায় যে তুমি অসাধারণ। সম্মান তোমাকে সমাজে এক দৃঢ় পরিচয় দেয়। যাদের ধনসম্পদ ও সম্মান আছে, তারা সমস্ত রকম অর্থহীন ও অনৈতিক কার্যকলাপ করে ও তা থেকে পার পেয়ে যায়। লোকেরা তাদের পিছনে কথা বলে এবং তাদের ক্ষমতা ও মান-সম্মানকে ভয় করে বলে তাদের মুখোমুখি হলে আপ্যায়ন করে।

এই প্রকার সম্মান তারা এত যত্ন সহকারে প্রহরা দিতে চাইছে। বোঝ : তুমি এরকম হলে অস্তিত্ব তোমাকে কখনও বেছে নেবে না। বস্তুগত জগতে হয়ত তুমি যা চাও পেতে পার , তোমাকে হয়ত সফল দেখাবে, কিন্তু অস্তিত্বের চোখে তুমি দরিদ্রই থাকবে। বেছে নেবার ব্যাপারে অস্তিত্বের নিজের নিয়মাবলী আছে।

বোঝ যে মান-সম্মান, নাম, যশ ও ক্ষমতা সমস্তই তোমার নিজের কল্পনা। তুমিই তাদের জীবনদান কর। তুমি তাদের সৃষ্টি কর ও তাদের হারাবার ভয় তৈরি কর।

তোমার চারিদিকের সবকিছু ও সব মানুষের প্রতি অসীম প্রেম সহকারে বাস কর। যা কিছু বা যে কেউ তোমার কাছে আসে তার জন্য গভীর প্রেম অনুভব কর। এইভাবে বাঁচলে মান-সম্মান নিজে নিজেই তোমার কাছে আসবে। মানুষেরা তোমায় শ্রদ্ধা করবে তোমার গুণের জন্য, পরিমাণের জন্য নয়। আর এই প্রকার সম্মান থাকলে হারাবার ভয় থাকে না। তোমাকে তাকে সর্বদা প্রহরা দিতে হবে না।

নিজের আমিত্বতে আঘাত পাবার ভয়

এমনকি জনসাধারণকে সম্ভাষণ করার ভয়ও একভাবে নিজের সম্মান হারাবার ভয়। যখন তুমি লোকেদের সামনে কথা বলতে ভয় পাও, তুমি আসলে ভয় পাও যে তারা তোমার সম্বন্ধে কি বলবে। তুমি ভয় পাও যে তা দের কোন মন্তব্যে তোমার আমিত্ব কষ্ট পেতে পারে। তাই তোমার মঞ্চ-ভয় (stage fear) হয়। এটা তোমার আমিত্বকে প্রহরা দেবার এক অক্রিয় প্রয়াস। ভয় আমিত্বেরই এক প্রকাশ এবং সেটা ভাল করে বোঝ।

তাহলে লোকেরা তোমার কথা সমর্থন না করলে কি হবে? যেই মুহূর্তে অন্যেরা কি বলবে তাতে ভয় পাও, তখন তুমি তো নিজের আমিত্বকেই প্রহরা দিচ্ছ।

আমিত্বের কষ্ট পাবার ভয় থেকে অনেকে ধ্যান করতে ভয় পায়। যখন ধ্যান কর, সর্বদাই নিজেকে হারাবার ভয় থাকে - অস্তিত্বের কাছে, তোমাকে পরিবৃত অস্তিত্ব-শক্তির কাছে। তাই তুমি থেমে যাও। তুমি ধ্যানকে প্রতিরোধ কর। বরঞ্চ আমি যদি তোমাকে কিছু স্তব গাইতে বলি, তুমি খুশী হয়ে তা গাইবে। তাতে কোন ভয় থাকবে না।

তোমার আমিত্ব দ্রবীভূত হয়ে যাবে ভেবে ভীষণ ভয়ে থাকে। যদি তা গলে, সমস্ত লেবেলগুলি যেগুলির সাথে তুমি নিজেকে পরিচয় করাও, তাও গলে যাবে। তুমি 'কেউ না' হয়ে যাবে! তাই তুমি প্রতিরোধ কর এবং নিদেনপক্ষে নিজের কাছে 'কেউ একটা' হয়ে থাক। এই প্রতিরোধ পুরোপুরি আমিত্বেরই ভয়।

অজানার ভয়

প্রশ্ন : স্বামীজী, আপনি অজানার থেকে ভয়ের কথা বলেছেন? সেই বিষয়ে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি সেখানে আসছি।

অজানা থেকে ভয় আর কিছুই নয়, অন্ধকার, ভুত, অশরীরী, ভগবান এবং সবশেষে আমাদের মৃত্যু থেকে ভয়।

একটা ছোট গল্প :

> একটা মানুষ ট্রেনে যাচ্ছিল। টিকিট কালেক্টর তার কাছে এল ও টিকিট দেখতে চাইল।
> সে উত্তেজিতভাবে টিকিট খুঁজতে লাগল তার ওয়ালেটে , মালপত্রে ও প্যান্টের পকেটে।
> টিকিট কালেক্টর তাকে লক্ষ্য করছিল ও বলল, 'স্যার, আপনার কোটের পকেটে দেখুন না।'
> লোকটি উত্তর দিল, 'দয়া করে এখন তাতে দেখতে বলবেন না। আমার একমাত্র আশা যে সেটি ওখানেই আছে।'

আমরা তাকাতে এত ভয়ভীত। আমরা আমাদের ভয়ের দিকে তাকাতে ভয় পাই; সেটাই পুরো সমস্যা। তাই আমরা নিজেদের

আরামদায়ক অঞ্চলে বিভ্রান্ত রাখি এবং চলতে থাকি।

কখনও তাকাতে ভয় পেও না। যেই মুহূর্তে তাকাতে ভয় পাও, তুমি তখন আরও ভয় সৃষ্টি করছ কারণ সেটা তোমার কাছে আরও অজানা হয়ে যায়।

যখন আমরা অজানা থেকে ভয়ের কথা বলি, অশরীরী ও ভুত থেকে ভয় খুবই স্বাভাবিক। তাদের ভয় পাবার কিছুই নেই। এটা বুঝে নাও যে অশরীরী ও ভুতেরা আমাদের চেয়ে কম বলবান। আমরা তাদের স্বাভাবিক থেকে অনেক বেশী বলপ্রদান করে ফেলি এবং ভয় দ্বারা তাদের আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে দিই। সেখানেই সমস্যার শুরু।

অশরীরী ও ভুতের বিষয়ে বেশী ভেবো না। এতে কোন কাজ হবে না। তুমি যদি ভালভাবে নিজেতে কেন্দ্রিত থাক ও নিজের সম্বন্ধে স্পষ্টতা রাখ, তাহলেই যথেষ্ট। তাহলে কোন কিছুই তোমাকে ছুঁতে পারবে না এবং এসব জিনিষ থেকে তোমার ভীতি উৎপন্ন হবে না।

অন্ধকার থেকে ভয়ও অজানার ভয়। অন্ধকার থেকে ভয় আসলে মৃত্যুভয়। তোমার বাড়ীর বাগানে দিনের বেলা বেড়াবে, কিন্তু সেখানে রাত্রিবেলা যাবে কি? না! তুমি ভয় পাও! কেন? তুমি তোমার বাগানের সীমারেখা ভাল করে জান, তাহলে ভয় কেন? তুমি বাগান থেকে ভয় পাও না, ভয় অন্ধকার থেকে।

তুমি ভাব যে অন্ধকারে তোমার কিছু হতে পারে। আমি সেটাই বোঝাতে চাইছি যে তোমার সমস্ত ভয়গুলি মৃত্যুভয়ের সাথে সম্পর্কিত। অন্ধকারের ক্ষেত্রে এটা খুব স্পষ্ট, কিন্তু তোমার অন্যান্য ভয়ের বেলায় সেটা সূক্ষ্ম।

আসলে অন্ধকার তো সুন্দর! সেটা তোমার মায়ের গর্ভের মত। যখন তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে তুমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলে। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর তুমি সেই অন্ধকারের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছ। তুমি সেটাকে অজানা ভেবে ভয় পাও। তান্ত্রিকেরা অস্তিত্বের নিবিড়তা অনুভব করার জন্য অন্ধকারের ধ্যান করেন।

অন্ধকার থেকে ভয় পাবার দরকার নেই। কেবল একবার যদি অন্ধকারকে গভীর প্রেম সহকারে দেখ, শান্তভাব নিয়ে তাকে মায়ের গর্ভাশয় হিসাবে ভাব, তুমি অন্ধকার থেকে আর ভয় পাবে না।

শিশু অন্ধকার থেকে ভয় পেলে তাকে বোলো না, 'সাহসী হও!' তাকে এটা বললে সে ভয়কে দূর করার জন্য আরও স্নায়বিক চাপে পড়বে। তার অন্ধকারের থেকে ভয় দূর হবে না। তাকে অন্ধকার-ভয়ের মধ্য দিয়ে যেতে দাও। তাকে একটু কাঁপতে দাও। নিদেনপক্ষে সে ভয়কে পরীক্ষা করার এক সুযোগ পাবে। এটি কয়েকবার করলে ধীরে ধীরে অন্ধকা র থেকে শিশুর ভয় দূর হয়ে যাবে।

এবার আসি ভগবান থেকে ভয়। ভগবান আমাদের অজানা এবং তাই আমরা তাঁকে ভয় পাই। এটা বোঝ যে অস্তিত্ব, ব্রহ্মাণ্ড, অস্তিত্ব-শক্তি ও মহাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত জীবনীশক্তি - এগুলিকেই আমরা আরেকটা নাম দিয়েছি - ভগবান। এই অস্তিত্ব ও মহাশক্তি কেবল প্রেম করতে জানে। যদি তুমি এটা বেশী করে বোঝ, আপনা আপনি মস্ত ভয় দূর হয়ে যাবে।

ভগবানকে ভয় পাবার প্রয়োজন নেই

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, লোকেরা বলে পুণ্য করলে স্বর্গে যাব আর পাপ করলে নরকে যাব। এটা কি সত্যি?'

প্রথমত, বোঝ যে স্বর্গ ও নরক ভৌগলিক স্থান নয়। তোমার মাথার ওপরে কোন স্বর্গ নেই অথবা তোমার পায়ের নীচে কোন নরক নেই। তোমার ভিতরে ভয় ও লোভ ঢুকানোর জন্য কেবল এগুলি বানানো হয়েছে। নরক ও স্বর্গকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে একটা হ'ল বিশৃঙ্খল মৃত্যু, অপরটা সচেতন মৃত্যু, ব্যাস।

যে মুহূর্তগুলিতে তুমি ধ্যান করে কাটিয়েছ, সেগুলি পুণ্যের সময়। ধ্যান মানে আমি চোখ বুজে বসে থাকা বলছি না। তার মানে সচেতনভাবে বর্তমানে থাকা, যখন সচেতনতা তোমার সাথে থাকে।

যে মুহূর্তগুলি এই রকম অবস্থায় কাটানো হয় নি সেই সময়গুলি পাপ। সমস্ত সচেতন মুহূর্তগুলি তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সের মত। মৃত্যুকালে এই অবস্থাগুলি সামনে আসবে ও তোমাকে মুক্ত করবে।

লোকেরা ভাবে মন্দিরে দেবমূর্তিকে পাত্রভর্তি দুধ অর্পণ করলে তাদের পুণ্য বাড়বে এবং স্বর্গে যাবে! আমি তোমাদের বলি : ভগবানকে দুধ অর্পণ করলে কিছুই হবে না। অস্তিত্বের জন্য পরম কৃতজ্ঞতা অনুভব করলে দেবমূর্তিকে অস্তিত্ব মনে করে সেই কৃতজ্ঞতা তুমি দুধ অর্পণ করে প্রকাশ করতে পার। সেটা একদমই ঠিক আছে। তাকে পুণ্যের সাথে জুড়ো না।

এমনকি বিশুদ্ধ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে এক ফোঁটা দুধ অর্পণ করার মুহূর্তটি এক আন্তরিক ধ্যান এবং তা তোমাকে মৃত্যুকালে সাহায্য করবে। অন্যদিকে পুণ্যসঞ্চয়ের সুযোগ হারানোর ভয়ে পাত্রের পর পাত্র ভর্তি দুধ অর্পণ করেও কোন লাভ নেই। তাই দয়া করে তোমার সজাগতা বাড়াও ও সচেতন হয়ে বাঁচ। যাই কর না কেন, প্রতিটি নিমেষকে এক ধ্যান বানাও। তবেই যথেষ্ট। তাহলে তুমি পাপের ভয় ছাড়া বাঁচতে পারবে।

তোমাদের একটা ঘটনা বলি :

> আমি সুদূর গ্রামে এক শিবমন্দিরে যাই। সেখানে গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারে একটা টিউবলাইট জ্বলছিল। আলো প্রায় ছিল না কারণ তাতে কালো কালিতে লেখা ছিল, বিষ্ণুনাথন বি এস্‌সি।
> আমি অবাক হয়েছিলাম যে ভগবান শিবকে কিভাবে বিষ্ণুনাথ বলা হয়। তারপর তার নীচে ছোট্ট করে লেখা দেখলাম, কৈলাসনাথন - যেটা শিবের এক নাম।
> আসলে বিষ্ণুনাথন বলে একজন লোক মন্দিরে টিউবলাইট দান করেছিল!

আমাদের জীবনে ভাল কাজ সংগ্রহ করতে শেখানো হয়েছে। তাই আমরা ভাল কাজের ব্যাংক ব্যাল্যান্স তৈরি করি। আর আমরা তাতেও থামি না। আমরা ভগবানকে বারংবার আমাদের ভাল কাজগুলি মনে করিয়ে দিতে থাকি - যাতে ভগবান ভুলে না যান! এমনকি ভগবানের ক্ষেত্রেও আমরা বস্তুবাদী হয়ে পড়ি।

বোঝ : ভগবান স্বর্গে কোন রিসর্ট বা ভ্রমণ বিনোদনের জায়গা চালাচ্ছেন না, যেখানে তুমি পৃথিবীতে ভাল কাজ করার জন্য প্রবেশ করতে পারবে। এই রকম মনে করা একটা স্বপ্ন - যেন তুমি স্বপ্নে একটা বাড়ী বানাচ্ছিলে, তাকে রঙ করছিলে, সাজাচ্ছিলে - জেগে উঠে দেখলে সেটা এক স্বপ্ন ছিল। কোথায় গেল বাড়ীটা? জেগে ওঠার পরে সেটার কি কোন মূল্য আছে? না! একইভাবে এই 'ভাল কাজ'-এর ধারণা দিয়ে তুমি নিজেকে বিভ্রান্ত করছ।

আমি দেখেছি অনেক লোকেরা ঠিক করে যে তারা একটি বিশেষ মন্দিরে এক বিশেষ দেবতাকে প্রতি সপ্তাহের এক বিশেষ দিনে, ধর শনিবারে, পূজা করবে। একটি শনিবারে তা করতে না পারলে তারা ড্রাইভারের হাতে করে তাদের পূজা পাঠিয়ে দেবে !

তুমি নিজেকে যতটা জান, ভগবান তোমাকে তার চেয়ে বেশী জানেন। তাই তাঁকে ভয় পাওয়ার বা খুশী করার কোন কারণ নেই। এমনকি তোমার বাবা-মায়ের থেকেও তিনি তোমায় বেশী চেনেন। খালি এই জন্মেই তিনি তোমাকে চেনেন তা নয়, তিনি তোমাকে সব জন্ম ধরেই চেনেন। তুমি তাঁর সামনে একটা খোলা খাতা। তিনি যে কোন সময়ে তার যে কোন পাতা উল্টে দেখতে পারেন!

তাই তোমার ভগবান-ভীতি মুছে ফেল এবং তাঁকে সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হিসাবে দেখ। তাঁকে পরম বন্ধু হিসাবে দেখ। সমাজ যতই তোমার মনে ভগবান-ভীতি ঢোকাক, তুমি তাতে কান দিয়ো না। তাঁর সাথে তোমার নিজের সম্বন্ধ গড়ে তোল - একটা বলিষ্ঠ ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ; একমাত্র যে সম্বন্ধ তোমার জীবনে প্রয়োজন।

যখন তুমি ভগবানের অথবা অস্তিত্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু কর, তুমি নিজের সাথে আগের তুলনায় অনেক ভাল সম্পর্ক স্থাপন করবে। তুমি জানবে তোমার ভিতরে কি চলছে। তোমার অন্তর্বুদ্ধি বিকশিত হতে থাকবে। তোমার ভয় দূর হবে। কোন জিনিষ থেকে ভয় পাবার আগে তার দিকে সঠিকভাবে তাকাতে শিখবে। কোন কিছু করার জন্য বাধ্যবাধকতা বোধ করবে না। বুদ্ধি ভয়কে প্রতিস্থাপিত করবে। তুমি আরও আরাম ও আনন্দে থাকবে। তুমি মুক্ত অনুভব করবে।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে এটা বুঝলে ধর্মের নামে যত যুদ্ধ চলে তা আর থাকবে না। যে মানুষেরা তাদের ধর্মকে ভয় করে , যারা তাদের ধর্মের নামে যুদ্ধ করে, তারা প্রেমময় অস্তিত্বকে বোঝে নি। তারা পুরো জিনিষটাই ধরতে পারে নি। তারা যেন সবাই অন্ধ এবং একে অপরের সাথে লড়াই করে।

আর সবচেয়ে দরকারী হ'ল, দয়া করে তোমার সন্তানদের মধ্যে ভগবান সম্বন্ধে তোমার ধারণা পাস করে দিও না এবং ভগবান-ভয় ঢুকিয়ো না। তাদের ভগবানকে আলিঙ্গন করতে শেখাও। তাদের শেখাও যে ভগবান সর্বব্যাপী অস্তিত্ব। তাদের শিক্ষা দাও যে ভগবান বিশুদ্ধ প্রেম ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের ভগবান ও অস্তিত্বের প্রতি প্রেমভাবনা নিয়ে সমগ্ররূপে বিকশিত হতে সাহায্য কর।

প্রশ্ন : আমরা প্রায়ই অবাক হই, আমাদের সাথে যা কিছু ঘটছে, তা নিয়তি নাকি আমাদের পছন্দ।

উত্তর : প্রশ্নটা অনেক জায়গায় করা হয়।

তোমার বর্তমান মুহূর্ত সমস্ত অতীত সিদ্ধান্তগুলির সমগ্রতা। এখন তুমি এখানে আছ। তুমি একদম ভোরে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে , ঠিক রাস্তা বেছে নিয়েছ, এখানে এসেছ, বসেছ এবং এখনও বসে আছ, ঠিক কিনা?

সেইভাবে, তোমার অতীতের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি তোমার বর্তমান তৈরি করে - যেমন এখানে বসে থাকা। তোমার ভবিষ্যৎ তোমার বর্তমানের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির উপরে নির্ভর করবে। আমরা যখন অচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিই এবং তাতে পাওয়া ফলগুলির মধ্যে কিছুকে আশা না করে থাকি, আমরা তাকে অদৃষ্ট বা নিয়তি বলি।

আমরা যখন সচেতন হয়ে সিদ্ধান্ত নিই, আমরা তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী-প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন থাকি। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী-প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে আমরা তাকে নিয়তি বলি। আসলে জীবন তো আমরা পুরোপুরি বেছেই নিয়েছি । আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিই; আমাদের জন্য অন্যরা কখনও নেয় না। হতে পারে কিছু প্রধান জিনিষ ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকেও পরিবর্তন করা যায়। সমস্ত কিছুর জন্য ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলা তো পলায়নবাদ।

ভগবান কত করুণাময় তা দ্যাখ, এটা তাঁর বিশ্ব হলেও, তিনি আমাদের বেছে নিতে দেন! সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র পথ হ'ল তোমার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যাতে করে তোমার প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত সচেতনতা সহকারে হয় এবং তুমি যেন কখনও অবচেতন বা অচেতন অবস্থায় সিদ্ধান্ত না নাও। তাহলে তোমাকে নিয়তি, ভাগ্য এবং অদৃষ্ট - এসবের জন্য চিন্তা করতে হবে না।

নিরাপত্তাহীনতার ভয় দূর কর

আরেকটা জিনিষ বোঝ : কেউই তোমার ধন-সম্পদে হাত লাগাবার জন্য এবং দুর্ভাগ্য দেবার জন্য অপেক্ষা করে না। যে করেই হোক আমরা একটা ভয় নিয়ে সর্বদা থাকি যে লোকেরা আমাদের সম্পত্তি লুঠে নেবার ধান্ধায় আছে। সেটা সত্যি নয়।

এই ভয়ের দরুণ আমরা আমাদের চারিদিকে নানা দেওয়াল নির্মাণ করি। সবশেষে আমরা নিজেদের সেই প্রকোষ্ঠের ফাঁদেই আটকে পড়ি। তাই আমি বলি, 'দরজা খোল, বাতাস আসতে দাও।' বিশ্বাস রাখ যে জীবনীশক্তি তোমার যত্ন নেবে। আমি বলছি না যে বাড়ীতে তালা লাগাবে না। বাড়ীতে না থাকলে তালা লাগানো দরকার। কিন্তু তালা লাগাবার পরে তালার ওপর আচ্ছন্নতা দূর কর, ব্যাস!

একটা উদাহরণ নাও। তুমি ট্রেনে যাচ্ছ। কামরাতে আরাম করে বসার পর তুমি কি কর ? তুমি পাশে বসা লোকেদের সাথে কথা বলা শুরু কর। তুমি জিজ্ঞাসা কর তারা কোথায় থাকে, বোঝার চেষ্টা কর তারা কোন ধর্ম অবলম্বন করে। তুমি তাদের ব্যাকগ্রাউণ্ড ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কর। কেন? তুমি কি সত্যি সত্যি তাদের সম্বন্ধে আগ্রহী? না! এর কারণ তুমি তাদের অচেনা বলে ভাব এবং তাদের সম্পর্কে এইসব জানলে, মানসিক দিক থেকে তুমি তাদের সাথে সফর করা নিরাপদ মনে কর , ব্যাস।

তুমি যদি হিন্দু হও ও তারাও হিন্দু হয় তুমি স্বস্তিবোধ কর। তুমি হি ন্দু হয়ে সে যদি মুসলমান হয় তুমি অস্বস্তিবোধ কর , ভয় পাও; তাদের সন্দেহের চোখে দেখ। তুমি হয়ত অন্য সীট নেবার কথা চিন্তা করা শুরু করে দেবে। এইভাবে তোমার ভয় কাজ করে। তুমি সর্বদা অচেতন অবস্থায় কিছু হারাবার ভয়ে আছ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঐশ্বরিক সঙ্গিনী সারদা দেবী বলেন, 'শোষিত হলেও অপরের ওপর আস্থা রাখ। মহাবিশ্বের ওপর আস্থা রাখার গুণই তোমাকে এই পৃথিবীতে ভগবানের মত থাকতে দেবে।'

যখন সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয়, তুমি বিজ্ঞানীর মত বুঝতে পারবে। যখন সূক্ষ্ম আবেগ হয়, আস্থা প্রস্ফুটিত হয়। যখন সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়, জীবনমুক্তি প্রস্ফুটিত হয়! তাই ভয় দূর কর এবং তোমার মধ্যে উপলব্ধি ও আস্থা হতে দাও।

তোমার সম্পত্তি থেকে ভয় দূর কর। সবকিছুর মালিক হ'ল অস্তিত্ব। তুমি কেবল তার এক অস্থায়ী স্বত্তাধিকারী, ব্যাস। তুমি যদি এই উপলব্ধিতে আরাম কর, তবেই যথেষ্ট।

ভয়-স্ট্রোক

প্রশ্ন : স্বামীজী, যখন আমরা ভয় পাই, আপনি আমাদের আরও সচেতন হয়ে তার দিকে তাকাতে বলেছেন। কিন্তু কোন কোন সময়ে, ভয় এতই অকস্মাৎ যে সেটা হঠাৎ একটা বিরাট ধাক্কা দিয়ে আসে ও চলে যায়। আমাদের তার দিকে তাকাবার সময় পর্যন্ত পাই না।

তুমি যা বলছ তার হ'ল ভয়-স্ট্রোক।

ভয়-স্ট্রোক সেকেণ্ডে আসে ও চলে যায়; কিন্তু বড় কাঁটার মত খুব গভীরে বিঁধে। ধর, তুমি রাস্তায় হাঁটছ। হঠাৎ একটা দড়ি দেখে তাকে সাপ ভাবলে। হঠাৎ করে তোমার ভয় উৎপন্ন হবে, কিন্তু সেটা কয়েক সেকেণ্ডে মিলিয়ে যায়, কারণ তুমি বুঝে গেছ যে সেটা একটা দড়ির টুকরা। এটাই ভয়-স্ট্রোক।

আমাদের মধ্যে সর্বদাই ভয়ের এক তরঙ্গ আছে। মাঝে মাঝে সেটা চূড়ায় ওঠে, ব্যাস্। কম সময়ের জন্য হলেও ভয়-স্ট্রোক কখনও প্রচণ্ড তীব্র হতে পারে। ভয়-স্ট্রোক আমাদের প্রতিষেধক বা ইমিউন্ সিস্টেমকে দুর্বল করে দেয়। এতে বিষাদ জনিত রাসায়নিক ক্ষরণ হয় এবং শীঘ্র বার্ধক্য নিয়ে আসে। বলা হয় যে এতে হার্ট-অ্যাটাক্ হতে পারে বা চুল সাদা করে দিতে পারে।

বলা হয় যে গড়পড়তায় প্রতিটি মানুষের দিনে ছয়বার ভয়-স্ট্রোক হয়, অচেতনভাবে বা সচেতনভাবে। ভয়-স্ট্রোকের উদাহরণ : মধ্যরাতের পরে টেলিফোন বেজে ওঠা বা গাড়ী চালাবার সময়ে হঠাৎ করে সামনে এক মোটর সাইকেল এসে যাওয়া বা ভয়ের সিনেমা দেখছ, তখন কেউ তোমার কাঁধে টোকা দিল ... এরকম কত ঘটনাই যে আছে।

তুমি স্বপ্নেও ভয়-স্ট্রোক পাও, কিন্তু জেগে উঠলে তা ভুলে যাও। ভয়-স্ট্রোক যেন গোলাপ গাছকে শিকর থেকে ঝাঁকানো। আমাদের সিস্টেমের জন্য এটা খুবই বিপজ্জনক।

তুমি যা বললে, ভয়-স্ট্রোকের সময় তোমার সচেতন হবার কোন সময় থাকে না। তুমি ভগবানের নাম করার সময় পাবে না। কিন্তু ভয়-স্ট্রোকের পরে তাকে ভাল করে বিশ্লেষণ করতে পার এবং ভয়কে আরও ভাল করে গভীরভাবে বুঝতে পার । এতে ভয় ভাবনা দূর করার জন্য সাহায্য পাওয়া যাবে।

আমাদের নিয়মিত-ভয়ের প্রাবল্য ও গভীরতা কমিয়ে ভয়-স্ট্রোকের প্রাবল্য ও সংখ্যা অনেক কমানো যায়। একমাত্র নিয়মিত-ভয় থেকেই ভয়-স্ট্রোকের উৎপত্তি হয়। যদি গভীরতর উপলব্ধি ও স্পষ্টতা দ্বারা নিয়মিত-ভয় কমানো যায়, ভয়-স্ট্রোকও কম হবে।

সাধারণত ভয় এত শক্তিশালী যে তুমি তোমার নিয়ন্ত্রণ পুরো হারিয়ে ফেলবে।

একটা ছোট গল্প :

> দীক্ষার জন্য এক সুফি মাস্টারকে এক শিষ্য খুব অতিষ্ট করে তুলেছিল। শেষে মাস্টার তাকে বলেন যে তিনি দীক্ষা দেবেন যদি সে কাছের শহরে গিয়ে একটা বোরখা পড়া মেয়েকে চুমু খায় ও তারপর বনে গিয়ে একটা বাঘকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আসে।
> অন্যান্য শিষ্যরা বলে যে এটা তো সোজা কাজ। মাস্টার হাসলেন এবং তাদের অপেক্ষা করতে বললেন।
> এক সপ্তাহ পরে সেই শিষ্য ফিরে এল। সে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত ছিল।
> মাস্টার জানতে চাইলেন কি হয়েছে।
> শিষ্য বলল, 'জানি না কেন, কিন্তু আমি এক মহিলাকে লাঠি মেরেছি ও বাঘকে চুমু খেয়েছি!'

ভয় তোমাকে সহজেই অন্ধ করে দেয়! ভয় তোমার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি কয়েকক্ষণের জন্য সরিয়ে ফেলে। তাই তোমাকে ভয়কে গভীরভাবে বুঝতে হবে এবং তাকে জয় করতে হবে।

কত ঘটনায় দেখা যায় যে আগুন লাগলে বা অন্য কোন দুর্যোগের সময় লোকেরা চতুর্দিকে ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। তারা ভুল দরজা খুলে ফেলবে। তারা ভুল প্রস্থান দ্বারের দিকে দৌড়াবে যদিও তারা জানে যে সেটা ঠিক প্রস্থান দ্বার নয়। ভয় এত অন্ধ করে দেয়।

যেভাবে যৌনকামনাকে সচেতনতা দ্বারা প্রেমে পরিবর্তিত করা যায়, স্পষ্ট সচেতনতার দ্বারা ভয়কে নির্ভয়তা ও বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তিত করা যায়।

কোন কিছুকে দাবিয়ে রাখলে তা অন্য আকার ধারণ করে। তা মূল থেকে পুরোপুরি ধ্বংস হয় না। তাই দাবিয়ে রেখে ভয়কে জয় করা যায় না। সচেতনতাই পথ। আসলে ভয়কে দাবিয়ে রাখলে তুমি তাকে জয় করার সুযোগ হারিয়ে ফেলছ।

যদি তোমার ভয়গুলির দিকে একটানা সজাগতা সহকারে তাকাও, তাহলে এমনকি মৃত্যুর সময়েও তুমি মৃত্যুর দিকে সজাগ হয়ে তাকাবে এবং মৃত্যুকে তোমার মধ্যে ঘটতে দেবে। এটা করা খুব দরকার কারণ পরিণামে তোমার সমস্ত ভয়গুলিই তো মৃত্যুভয়। তুমি তোমার দৈনন্দিন ভয়ের ওপরে কাজ করলে তোমার মৃত্যুভয় অচেতনভাবে কম হবে এবং যখন তোমার মৃত্যুভয় কম হয় , তোমার দৈনন্দিন ভয়গুলি কমতে থাকে! এটা এক পবিত্র ঘটনাচক্র।

ভয়ের সাথে সরাসরি কাজ করার জন্য আমরা এখন একটা সুন্দর ধ্যান করব। ধ্যানটির নাম 'নির্ভয় ধ্যান' এবং এটা আমাদের ভয়গুলির সাথে সরাসরি কাজ করে।

আবেগ : ভয়
চক্র : স্বাধিস্থান চক্র
অবস্থান : নাভি থেকে ২" নীচে।

সংস্কৃতে স্বাধিস্থান মানে স্ব-অধিস্থান, যেখানে তোমার সত্তা প্রতিষ্ঠিত।

এই চক্র তালাবদ্ধ থাকে ভয়ের দরুণ, বিশেষ করে মৃত্যুভয় এবং এটাকে প্রস্ফুটিত করা যায় ভয়ের মুখোমুখি হয়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে।

ভয়ের মুখোমুখি হবার ধ্যান :
নির্ভয় ধ্যান - প্রক্রিয়াটি বেদান্ত থেকে নাওয়া।

অন্ধকার-ধ্যান

(পুরো সময় : ৩০ মিনিট। লাইফ ব্লিস ফাউণ্ডেশন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপস্থিতি ছাড়া এই ধ্যান কেউ যেন না করে)

নির্ভয় ধ্যান প্রক্রিয়া বেদান্ত থেকে নাওয়া হয়েছে। এটা অন্ধকার-ধ্যান। অন্ধকার-ধ্যান মনকে জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে ভাবা বন্ধ করায়। মন যখন পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে ভাবা বন্ধ করে, চিন্তাগুলি নিজে নিজেই মিলিয়ে যায়। এই ধারণা দিয়ে ধ্যানটি তৈরি।

মেঝেতে আরাম করে বস। মেঝেতে যারা বসতে পার না, তারা চেয়ারে বস। মাথা, ঘাড় ও মেরুদণ্ড সরলরেখায় থাকতে হবে।

চোখ বন্ধ কর। গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নাও। কল্পনা কর যে তুমি এক ঘন জঙ্গলে হাঁটছ। তুমি বনের সবচেয়ে ঘন অঞ্চলে ঢুকছ।

তুমি এক গভীর, অন্ধকার গুহায় ঢোক। তুমি চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পারছ না। তুমি অন্ধকার গুহায় বসে পড়। তুমি নিজের শরীর দেখতে পারছ না। সেখানে থাকার ভাবনা ছাড়া তোমার কোন পরিচয় নেই।

যতই চেষ্টা কর, তুমি কিছুই দেখতে পারছ না। গভীর অন্ধকারে তুমি একমাত্র স্পর্শ দ্বা রা বুঝতে পারছ যে তুমি আছ। (এক মিনিট)

তুমি মায়ের গর্ভাশয়ে অন্ধকার থেকে জন্মেছ এবং তুমি সেই প্রেমময় , করুণাময় অন্ধকারে মিলিয়ে যাও। (এক মিনিট)

তোমাকে বেষ্টিত ঘোর অন্ধকারকে তুমি গভীর শ্বাসের সাথে ভিতরে নাও । যে অন্ধকার তোমার পরিচয় মুছে দিয়েছে তাকে গভীর শ্বাসের সাথে ভিতরে নাও।

ধীরে, খুব ধীরে, উপলব্ধি কর যে তোমার শরীর অন্ধকারের সাথে মিলিয়ে যাচ্ছে। (৫ মিনিট)

ধীরে, খুব ধীরে, উপলব্ধি কর যে তোমার শরীর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। (৫ মিনিট)

শরীরের প্রতিটি কোষ দ্বারা গভীরভাবে অন্ধকারকে শ্বাস দ্বারা নাও ও শ্বাস দ্বারা ছাড়। (১৫ মিনিট)

নিজেকে অনুভব করতে শুরু কর। পুরো শরীরকে তোমার সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করতে শুরু কর। বসা অবস্থায় তোমার শরীর খুব ধীরে নাড়াও। উঠে পড় ও গুহার বাইরে এস। গভীর জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে এস।

এই ধ্যান-হলঘরে ফিরে এস ...(৩ মিনিট)

এই নীরবতাকে নিজের সাথে ধরে রাখ।

ধন্যবাদ।





সপ্তম অধ্যায়

তুমি অনন্য, অদ্বিতীয়

তুলনা বীজ, ঈর্ষা তার ফল!

আমরা সবসময়ে নিজেদের অপরের সাথে তুলনা করি এবং প্রায়ই ভাবি যে অন্যদের যা আছে , অন্যরা যা পেয়েছে তা আমাদের যা আছে তার তুলনায় অনেক বেশী এবং আমরা ঈর্ষাকাতর হতে শুরু করি। যখন আমরা অপরের উৎকর্ষতা সহ্য করতে পারি না, আমরা ঈর্ষাকাতর হই। তুলনা বীজ, ঈর্ষা তার ফল!

(ঈর্ষাকে পরশ্রীকাতরতা বা মাৎসর্য অথবা অসূয়া-ও বলা হয়।)

তুলনা এবং ঈর্ষা, দুইটিরই প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই! আমরাই তাদের সৃষ্টি করি ও তাদের কিভাবে জয় করা যায় সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে থাকি। তুলনা যেন বস্তু বিনা ছায়া। তুলনার ধারণার কোন ভিত্তি নেই। এটা কেবল আমাদের কল্পনার এক মিথ্যা বস্তু।

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক এক সঙ্গীতদলের অংশ ছিল ও তারা সমস্ত পৃথিবীতে লাইভ -শো করত।
> একটা বিশেষ শো-তে সে কিছু গানের জন্য কালো পরচুল ও বাকী গানের জন্য লাল পরচুল পড়া ঠিক করল। সে পরচুলগুলি পরিবর্তন করতে থাকল এবং অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগ শেষ হ'ল।
> বিরতির সময় শো-ডাইরেক্টর ড্রেসিংরুমে এসে তাকে বলে, 'স্যার, আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি বাকী শো লাল পরচুল পড়েই করুন।'
> শিল্পী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'
> ডাইরেক্টর বলে, 'লোকেরা লালচুলের কণ্ঠস্বর কালোচুলের কণ্ঠস্বরের চেয়ে অনেক বেশী পছন্দ করে!'

আমরা সর্বদাই তুলনা করতে এত ব্যস্ত যে আমরা কখনই জিনিষগুলি যেভাবে আছে সেভাবে দেখি না ! আমাদের মন তুলনা করতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তা সত্যকে দেখতে পায় না। আমরা তুলনা করার মনোভাব পরিত্যাগ করলে , আমরা যেটা যেমন সেটাকে তেমন দেখতে পারব।

তুলনা কি?

প্রধান কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা তুলনা করি?

সৌন্দর্য স্বামীজী...
ধন-সম্পদ...
নাম ও যশ...
বল, মান-সম্মান...
জ্ঞান...
স্বাস্থ্য...

ঠিক আছে, সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের অপরের সাথে তুলনা করি। আমরা এগুলিকে চারটে শ্রে ণীতে ভাগ করতে পারি : ধন, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য যার মধ্যে স্বাস্থ্য আছে এবং প্রতিষ্ঠা। আমাদের সমস্ত সমস্যা, মনের সব জটিলতা, এই চারটি শ্রেণীর অন্তর্গত, ঠিক কি না?

এখন...ধর তুমি বিশ্বের সব মানুষকে ধনের পরিমাণের ক্রম ঊর্ধ্বগামী হিসাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তুমিও সেই লাইনে আছ। তুমি সেই লাইনে কোথায় থাকবে বলে তোমার মনে হয়?

মাঝখানে কোথাও স্বামীজী...

ঠিক তাই! তুমি মাঝখানে কোথাও থাকবে। এমনকি তুমি লাইনের আগে বা পিছনে লোকসংখ্যা গুনতেও পারবে না।

আর লোকেদের নিজের জায়গা হয়ত পরিবর্তন করতে থাকতে হবে কারণ তাদের টাকাকড়ির পরিমাণ প্রতি মিনিটে বদল হচ্ছে! এখন তোমাকে ঠিক করতে হবে যে তুমি তোমার সামনে লোকেদের লম্বা লাইন দেখে ঈর্ষাকাতর হবে নাকি পিছনের লম্বা লাইন দেখে কৃতজ্ঞ হবে! এটা তোমারই হাতে।

তুমি ভাল করেই জান যে লাইনে তুমি কোথায় আছ সে সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না , কিন্তু সেই চিন্তা তোমাকে সর্বদাই উত্তেজিত

করে! আমরা এমন একটা ব্যাপারে অস্বস্তিতে থাকি, যার কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই! তুলনার একটা পরিষ্কার নকারত্মক অস্তিত্ব আছে।

তোমাদের বোঝাই নকারত্মক (negative) অস্তিত্ব কি জিনিষ। আমার পাশে এই ঘন্টাটাকে দেখ। যদি আমি এই ঘন্টাটি সরাতে চাই, আমি তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে রেখে আসব এবং তা এখানে আর থাকবে না, ঠিক কিনা? এই ঘন্টার একটা সকারত্মক অস্তিত্ব আছে তাই আমার পক্ষে এই কাজটি করা সম্ভব। এখন ধর, আমরা বলি যে এই ঘরে অন্ধকার আছে। তোমার পক্ষে কি সেই অন্ধকারকে বাইরে রেখে দিয়ে আসা সম্ভব? না।

কিন্তু আমি যদি এই ঘরে আলো নিয়ে আসি, অন্ধকার নিজে নিজে অদৃশ্য হয়ে যাবে, ঠিক? তার কারণ অন্ধকারের কোন সকারত্মক অস্তিত্ব নেই; সেটার অস্তিত্ব নকারত্মক। যেহেতু তার নকারত্মক অস্তিত্ব আছে, আমরা তাকে ঘন্টার মত সরাসরি সরিয়ে ফেলতে পারি না।

একইভাবে, তুলনার কোন সকারত্মক অস্তিত্ব নেই এবং তা আছে কেবল আমাদের মনেতে। কোন বিশেষ চিন্তা মনে চর্চা করলে তুলনা ঘটে। যেহেতু তুলনা বাস্তবে বিদ্যমান নেই, তুমি কেবল তাকে চলে যেতে বললে সে যায় না। তার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে তুমি তাকে পরাভূত করতে পার, যেভাবে আলো নিয়ে এসে অন্ধকারকে দূর কর।

সংস্কৃতে মায়া শব্দটি বাংলাতেও ব্যবহার করা হয়। ইংরাজীতে তাকে ইলিউশন্ (illusion) বলা যায়।
আমরা বলি 'য মা ইতি মায়া', অর্থ, 'যার অস্তিত্ব নেই তাই হ'ল মায়া'!
যার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু যা অবিশ্রাম উত্তেজিত করে! মায়ার এটাই স্বধর্ম।

তুলনা মায়ামাত্র।

বাসনা ধার করা বন্ধ কর

যখন আমি লোকেদের টাকাকড়ির পরিমাপে মানুষের এই লাইন সম্বন্ধে বলি, তারা আমায় বলে, 'স্বামীজী, লাইনের কোন দিকে না তাকালেই ভাল।' আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, 'কেন? তুমি তাকাতে ভয় পাবে কেন?' তুমি তাকাতে চাইছ না মানে তুমি নিজের মনের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছ। যদি তাকাতে পার, কিন্তু যা দেখছ তাতে প্রভাবিত না হও - তাহলে তুমি সঠিক পথ পেয়ে গেছ!

তোমার যা আছে ও যা অপরের আছে - যখন তুমি সবকিছুর দিকে তাকাতে পার এবং সর্বদাই পরিপূর্ণতা বোধ কর, তাহলে তুমি ঠিক আছ।

আমি ইচ্ছা করেই 'সন্তুষ্টি' শব্দটা ব্যবহার করছি না। লোকেরা প্রায়ই বলে, 'সন্তুষ্ট থাকতে শেখ।' তুমি কখনও সন্তুষ্ট থাকা শিখতে পার না। সন্তুষ্টি প্রস্ফুটিত হবে যখন তুমি তুলনা ও ঈর্ষার নকারত্মক অস্তিত্ব বুঝতে পারবে। সন্তুষ্টি প্রস্ফুটিত হবে যখন প্রতি মি নিটে তোমার ওপরে যা বর্ষিত হচ্ছে তার জন্য তুমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা অনুভব করবে। সন্তুষ্টি বাইরে থেকে চাপানো যায় না।

যখন তুমি বাড়ীতে নিজের মত আছ, তুমি ভাব যে নিজের একটা বাড়ী ও গাড়ি থাকলেই যথেষ্ট। তুমি এই ভাবনাতে আরাম বোধ কর। তুমি ক্ষণিকের জন্য কৃতজ্ঞতা ও পূর্ণতা অনুভব কর। কিছুক্ষণ পরে যখন গাড়ি নিয়ে বাড়ীর বাইরে যাও ও ট্রাফিক লাইটে থাম, তখন কি হয়? এটা মার্সেডিস্ বেঞ্জ্ তোমার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়, আর তোমার মন উল্টো চিন্তা করতে থাকে। মন বলে যে তোমার গাড়িটা অতি সাধারণ। মন বলে যে তোমার নতুন গাড়ি কেনার সময় হয়ে গেছে, মার্সেডিস্ বেঞ্জ্ হলেই ভাল।

কয়েক মিনিট আগে তুমি তোমার জিনিষে খুশী ছিলে, কিন্তু এখন কি হ'ল? তুমি একটা নতুন বাসনা তৈরি করে ফেললে, একটা 'ধার করা বাসনা।' পরিষ্কার করে বোঝ যে এটা তোমার নিজের বাসনা নয়। এটা যার মার্সেডিস্ বেঞ্জ্ - তার বাসনা। এইভাবে তুমি তুলনা ও ঈর্ষার দরুণ অন্যের বাসনাকে নিজের মনে নিয়ে এসে কাজ কর।

আরেকটা উদাহরণ নাও : তুমি হয়ত তোমার ঘরে রেফ্রিজারেটারের প্রয়োজন কখনই মনে কর নি, কিন্তু তোমার প্রতিবেশী ফ্রিজ কিনলে, তুমি সাথে সাথে ভাব যে ফ্রিজ ছাড়া থাকা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার ফ্রিজ কেনার সমস্ত কারণগুলি আবিষ্কার করে ফেলবে। তখন পর্যন্ত তুমি ফ্রিজ ছাড়া আরামেই ছিলে! কিছুই পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু কি হ'ল? তোমার মন তুলনা করতে শুরু করেছে।

ধার করা বাসনা মনে এত সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে তারা অবিশ্রাম ঘটা সত্ত্বেও আমরা বলতে থাকি যে আমরা অপরের দ্বারা প্রভাবিত নই!

একটা ছোট গল্প :

> একটা লোক তার পাড়ায় প্রায় দশ বছর পরে ফিরে এল।
> সে তার বন্ধুর সাথে পাড়াতে ঘুরতে লাগল ও সেখানে অনেক পরিবর্তন ঘটাতে অবাক হল। সে তার বন্ধুকে বলে , 'সমৃদ্ধি পুরো পাড়াটাকে বদলে দিয়েছে!'
> তার বন্ধু বলে, 'সমৃদ্ধির জন্য নয় নয়, কেবল ঈর্ষার জন্য।'

আমরা সর্বদাই অপরকে টেক্কা দিতে প্রচেষ্ট। যখন তুমি ধার করা বাসনা পুরণের জন্য দৌড়াও , তুমি কখনই থাম না, কারণ তুমি যেই সেটা প্রায় পুরণ করছ, আরেকটা ধার করা বাসনা কোথা থেকে এসে যায় এবং তুমি দৌড়াতেই থাক !

তুমি দৌড়াতে থাক কারণ তুমি নিজের মধ্যে কেন্দ্রিত নও , বাইরে কোথাও কেন্দ্রিত। তোমার কেন্দ্র অন্য লোকের ভিতরে। আর তাদের কেন্দ্র অন্য জায়গায়, তাদের নিজেদের ভিতরে নয়! কল্পনা কর, সামুদায়িক বিকেন্দ্রিত ও আন্দোলিত ভাবনা ও আবেগের জন্য তোমাকে কত দৌড়াতে হবে, তোমাকে কত টানাহ্যাঁচড়া করতে হবে! তুমি তো পুতুল হয়ে গেছ।

আমি তোমাদের বলি : প্রতিবার তুমি যখন কিছু চাও, নিজের পাশে বসে পড় এবং ভাব যে তুমি কি সত্যিই তা চাও নাকি অন্য কারো সেটা আছে বলে তুমি সেটা চাইছ। তোমার প্রতিটি বাসনা সামনে এলে , তাকে সততার সাথে বিশ্লেষণ করে দেখ। সমস্ত সুখ্যাতিজনিত সম্মানগুলি (prestige) ফেলে দাও এবং আত্ম-বিশ্লেষণ কর। একা থাকার সময় যদি প্রেস্টিজ সরিয়ে না রাখতে পার, তো মানুষের মধ্যে থাকলে তা সরাবে কিভাবে?

তুমি যদি কেবল নিজের বাসনাগুলি পূরণ করতে থাক , তোমার শান্তিতে মৃত্যু হবে; তা রেলের প্লাটফর্মে হলেও। যদি তুমি সমস্ত জীবন ধার করা বাসনাগুলি নিয়ে বাঁচ, তুমি আসল সম্পূর্ণতা কখনই দেখবে না এবং শ্বেতপাথরের প্রাসাদে থাকলেও অসম্পূর্ণ বাসনাগুলি থেকে মুক্ত না হতে পেরে টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে তোমার মরণকাল লম্বা হবে।

জৈনদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে জন্মের সময় তোমার পুরো জীবনকালে যত খাদ্য ও শক্তি প্রয়োজন তা তোমার সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার মানে তোমার এই জীবনে যা কিছু প্রকৃত প্রয়োজন , তা পূরণ করার জন্য অস্তিত্ব তোমায় পৃথিবীতে পাঠাবার আগেই তোমাকে প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে সজ্জিত করেছে।

কিন্তু সেই শক্তি তুমি যখন ধার করা বাসনা পূরণের জন্য ব্যবহার করতে শুরু কর , তুমি ভাব যে তোমাকে কিছুই দেওয়া হয় নি; কিছুই যথেষ্ট নয়। কিছুই হচ্ছে না বলে তুমি ক্লান্ত , নিঃশেষিত ও হতাশ বোধ কর।

'আবশ্যকতা' ও 'চাহিদা'-র মধ্যে তফাৎ আছে। তোমার আবশ্যকতার প্রতি যত্ন নাওয়া হয়েছে। তোমার আবশ্যকতাকে তৃপ্ত করা যায়, কিন্তু তোমার চাহিদাকে কখনও মিটানো যায় না কারণ তা সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

উদাহরণস্বরূপ : তুমি একটা দোকানে ঘরের জন্য পাখা বা ফ্যান কিনতে গেছ। কিন্তু রাস্তায় কিছু বন্ধুর সাথে দেখা হ 'ল। তারা বলে যে তারা অন্য দোকানে অন্য কিছু কিনতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তুমি তাদের সাথে গিয়ে সেই জিনিষ কিনতে প্রলুব্ধ হও এবং তুমি রাস্তা বদল করে তাদের সাথে গিয়ে সেই জিনিষটা কিনে ফেল। তারপর দেখ যে তোমার কাছে ফ্যান কেনার জন্য যথেষ্ট টাকা নেই!

ভারতে কথাও কোথাও বাঁদরখেলা হয় এবং কিছু লোক এই বাঁদরখেলা দেখিয়ে রোজগার করে। তারা একটা লাঠি বহন করে এবং সেই লাঠি দিয়ে ইচ্ছামত বাঁদরকে নিয়ন্ত্রণ করে। লাঠি ঘুরিয়ে তারা চেঁচায়, 'নাচ রাম! নাচ!' আর বাঁদর নাচতে থাকে।

তারপর তারা বলে, 'ঠেলাগাড়ি চালাও রাম! ঠেলাগাড়ি ঠেল!' আর বাঁদর ঠেলাগাড়ি চালায়।

বাঁদর লাঠির সুরে নাচতে থাকবে।

সেইভাবে তুলনা নামক একটা লাঠিকে আমাদের জীবন চালাতে দিই। আমরা তার সুরে নাচি , লাঠির দ্বারা নির্দেশিত হয়ে যে কাজ আমাদের নয় তা করি।

আমরা অবিশ্রাম ইঁদুর-দৌড় বা র‍্যাট-রেস (rat race) করে যাচ্ছি। র‍্যাট-রেস মানে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য বেপরোয়া প্রতিযোগিতা। আর ইঁদুর-দৌড়ে অংশগ্রহণ করে জিতলেও, তুমি তো ইঁদুরমাত্র।

কিন্তু যে করেই হোক জীবনে বিলম্বে কোন একটা সময়ে তুমি বোঝ যে এই ইঁদুর-দৌড়ে সফলতা তোমাকে সম্পূর্ণতার ভাব দেয় না। এমনকি সাফল্যও এক গভীর অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় কারণ, তুমি বহির্জগতে বস্তুগত সমস্ত বাসনাগুলি পূরণ করলেও

তুমি নিজের সত্তাকে সর্বদাই অগ্রাহ্য করেছ।

অসন্তুষ্টির আওয়াজ আসে তোমার সত্তা থেকে। যখন সেটা বোঝ, তুমি আধ্যাত্মিকতার দিকে তাকাও। আর সেটা না বুঝলে তুমি বিষাদগ্রস্ততার দিকে চল, কারণ তুমি জান না যে সেটাকে কোথায় হারিয়ে ফেলছ। তুমি জান না যে সূত্রটা কোথায়। তুমি বোঝ না যে কোথায় ভুল হয়েছে।

তুমি আরও কি চাও?

আমি আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা বলছি : অস্তিত্ব সর্বদা আমাদের ওপরে বর্ষণ করছে। তার এত প্রাচুর্য। কিন্তু অসন্তুষ্টি বিষয়ে এত ভাল প্রশিক্ষণ পেয়েছি যে আমরা যা পাই তাতে আমরা একেবারে সংবেদনহীন। আমরা সবসময়ে আরও চাই।

একটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষ ভগবানকে পাবার জন্য বনে গিয়ে ঘোর তপস্যা করছিল।
> ভগবান তার সামনে এলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে কি চায়। লোকটি অনেক খুশী হয়ে বলে যে সে এক জমিদার, কিন্তু সে সব ধনসম্পদ হারিয়েছে, তাই সে আবার ধনী হতে চায়।
> ভগবান তার ওপরে করুণা করলেন ও বললেন যে পরের দিন লোকটি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৌড়ায়, যেখান দিয়ে সে যাবে, সেই জায়গার সে মালিক হয়ে যাবে।
> লোকটি প্রচণ্ড খুশী হ'ল।
> পরের দিন সে সকাল থেকে দৌড় শুরু করল এবং যত জোরে পারে দৌড়াল।
> দুপুরবেলায় তার খিদে পেল কিন্তু সে তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দৌড়ে চলল।
> বিকালবেলার দিকে তৃষ্ণা ও অবসাদ তাকে আঁকড়ে ধরল কিন্তু সে পাশের জমিদারের কথা চিন্তা করছিল যার বহু একর জমি ছিল। তার সময়কালীন সমস্ত ধনী লোকেদের ছবি তার মনে আসছিল এবং সে দৌড়ে চলল।
> সূর্যাস্তের একটু আগে, তার মাথা ঘুরছিল ও সে দুর্বল বোধ করছিল, কিন্তু তাও সে কয়েক পদক্ষেপ এগিয়ে গেল। গোধূলিতে সে আর পারল না...পড়ে মারা গেল।
> আমরা এইভাবেই আমাদের জীবন যাপন করি। একবার থেমে, কেন দৌড়াচ্ছি তা না ভেবেই আমরা দৌড়ে চলি! আমরা দৌড়াই কারণ সবাই দৌড়াচ্ছে! শঙ্করাচার্য সুন্দরভাবে এটাকে বলেছেন, 'ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।' মানে 'এরপর কি, এরপর কি।' আমরা সবসময়ে চিন্তা করি 'এরপর কি।'

আরেকটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষকে তার দরজায় কাঁদতে দেখা গেল। তার বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার। সে বলে, 'আমার ঠান-মাসীমা তার সমস্ত সম্পদ আমার জন্য রেখে গেছেন।'
> বন্ধু অবাক হয়ে বলে, 'কিন্তু তার তো অনেক বয়স হয়েছিল এবং তার ওপরে সে তোমাকে সব সম্পদ দিয়ে গেছে। তো তুমি কাঁদছ কেন?'
> মানুষটি উত্তরে বলে, 'তুমি জান না...তার আগের সপ্তাহে আমার জেঠু মারা যায় আর তার সব সম্পদ আমায় দিয়ে যায়।'
> বিস্মিত বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে তুমি কাঁদছ কেন?'
> লোকটি বলতে থাকে, 'আর তার আগের সপ্তাহে আমার পিসী মারা যায় এবং তার সব সম্পত্তি আমাকে দিয়ে যায়।'
> বন্ধু বুঝতে পারল না এই সব ঘটনায় সে কাঁদছে কেন। সে জিজ্ঞাসা করে, 'দয়া করে আমায় বল এই সবের জন্য তুমি কাঁদছ কেন?'
> লোকটি বলে, 'আমার আর কোন আত্মীয় নেই যে মরবে ও আমার জন্য সম্পত্তি রেখে যাবে!'

অবশ্যই গল্পটি অতিরঞ্জিত, কিন্তু আমরা কি এই প্রকার নই? যা কিছু আছে তা নিয়ে আমরা খুশী থাকি না।

একদিন খালি চব্বিশ ঘন্টার জন্য কল্পনা কর যে তুমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছ। চোখ বন্ধ করে সমস্ত কাজ করার চেষ্টা কর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি অসুবিধা বুঝতে পারবে। চোখ খুলতেই দুচোখ ভরে চারিদিকে দেখে কত স্বস্তি পাবে। তখন হয়ত তোমার দৃষ্টিশক্তির জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেবে!

তুমি কি কখনও নিজেকে অন্ধলোকেদের সাথে তুলনা করেছ এবং তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দেবার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছ ? না! কেন নয়? কারণ তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তুমি তাকে সর্বদা নিশ্চিতভাবে ধরে নাও । সেটাই কারণ। তুমি ভাব, 'এটা তো

আছেই, পরেরটার জন্য দেখা যাক।'

ক্রিয়া, ভোগ, সত্তা

আমরা সবাই এই তিনটি অক্ষে (আক্সিস্) কাজ করি : ক্রিয়া, ভোগ ও সত্তা (doing, having and being)। 'সত্তা'-তে আনন্দ অনুভব না করে, 'ভোগ'-এর জন্য 'ক্রিয়া'-ই আমাদের দুঃখদুর্দশার একমাত্র কারণ। 'ক্রিয়া' কখনও 'ভোগ'-এর নাগাল পায় না। প্রতিবার যখন আমরা কঠিন পরিশ্রম করে কোন বাসনা পুরণ করি, আরও নতুন বাসনা আমাদের দৌড়াতে প্রবৃত্ত করে।

কখনও ভেবো না, 'এখন কাজ করি, পরে আনন্দ করব।' ভেবো না যে তুমি পরে ফিরে আসবে ও আনন্দ করবে! আমি বলছি যে তা কখনও হবে না। প্রতিটি আগামীকাল আজ-রূপে আসে। প্রতিটি মুহূর্তে 'করা' যেন সত্তাকে ছোঁয়, তবেই তুমি সঠিক পথে আছ।

সজীব থাকা স্থগিত রেখ না! আনন্দ কর! জীবনকে উপভোগ কর - এখন অথবা কখনও নয়। আমরা সবাই পরে আনন্দ করতে পারব ভেবে সারা জীবন কাটিয়ে দিই, কিন্তু সবশেষে শ্মশানে গিয়ে পৌঁছাই। তুমি যখন দৌড়পথে (রেসিং ট্র্যাক) প্রবেশ কর, তুমি আনন্দ করার প্রকৃত সামর্থ্য হারিয়ে ফেল। তুমি আনন্দ করা ভুলে যাও।

বলা হয়, 'অভীষ্টলাভের চেয়ে অনুসরণে বেশি মজা।' সর্বদাই যতক্ষণ তুমি কিছুর পিছনে ধেয়ে যাচ্ছ, মনে হয় তা সারা বিশ্বের মত মূল্যবান, কিন্তু তা পাবার পর, যে ভাবেই হোক তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলো! যদি তুমি নিজের সম্বন্ধে সচেতন হও এবং ঠিক কি চাও তা বোঝ এবং তা একা করার চেষ্টা কর, তুমি কখনই নিজেকে এই প্রকার স্ববিরোধী ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখবে না।

রামানা মহর্ষি সুন্দর বলেছেন :

'অডৈভাদর মুন্ খাড়ুগে অনালুম্ মলয়াই কাটি
অডৈন্ধা পিন্ মলৈয়ে অনালুম্ কাড়ুঘাই কাঠুম্ মায়া মনম্'

তার মানে, 'মন হল সেই মায়া যা সরষেদানাকে না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিশাল পর্বত হিসাবে দেখায় এবং পর্বতকে পাবার পর তাকে তুচ্ছ সরষেদানা হিসাবে দেখায়!'

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, তুলনা না করলে কিভাবে জানব যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?'

এই পৃথিবীতে এমন কেউ নিশ্চিত আছে যে তুমি যাই কর না কেন, তোমার চেয়ে সে সেই কাজে ভাল। ৯৯.৯৯% চান্স যে তুমি বিশ্বের সবচেয়ে ভাল ইঞ্জিনীয়র, দ্রুততম রানার অথবা সবচেয়ে মেধাবী চিত্রশিল্পী নও। তার মানে কি এই যে তুমি এই কাজগুলি কম উপভোগ কর? কেবল যখন তুমি ভাব যে তুমি হয়ত অন্য কারো চেয়ে কম উপভোগ করছ, তখন তুমি কম উপভোগ করা শুরু কর! যে মুহূর্তে 'অন্য কেউ হয়ত তোমার চেয়ে বেশী উপভোগ করছে' চিন্তা আসে, তোমার পুরো স্বাদগন্ধ পরিবর্তিত হয়। তুমি অস্বস্তিকর বোধ কর ও ঈর্ষাপরায়ণ হও।

এটা এরকম : দারিদ্র্য নিজে আমাদের সমস্যায় ফেলে না। 'আমরা দরিদ্র' - এই চিন্তা আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে! আমরা যে রকম আছি তাতে আমরা হয়ত এক শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছি, কিন্তু যেই 'আমরা গরীব' এই চিন্তা আমাদের ভিতরে ঢোকে, আমরা কষ্ট পাই। আর এই চিন্তা কিভাবে আসে? অন্যদের দেখে ও তুলনা করে। আমরা এরকম ভাবি কারণ এই চিন্তা আমাদের আমিত্বকে সরাসরি আঘাত করে এবং আমরা আমের মত চুপসে যাই।

একটা ছোট গল্প :

> রাস্তার দুই পাশে দুটি দোকান একই প্রকার জিনিষ বিক্রি করত। তাদের মধ্যে সবসময়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা।
> একজন দোকানদার একদিন তার দোকানের বাইরে এক সাইনবোর্ড লাগাল : '১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত।'
> অন্য দোকানদার তা দেখছিল। সে পরদিন তার দোকানের বাইরে সাইনবোর্ড লাগাল : 'সব তাজা মাল। পুরানো জিনিষ নেই।'

তুমি অদ্বিতীয়

যখন তোমার পাওয়া আশীর্বাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বোঝ না, যতক্ষণ আবিষ্কার কর নি যে তুমিই তোমার জন্য পর্যাপ্ত, তখন তুমি নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী নও এবং তুমি অন্যদের অনুসরণ করতে থাক।

বুদ্ধ বলেন, 'যেখানে তুলনা নেই সেখানে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।' মনে কর এক নতুন গ্রহে তুমিই কেবল একমাত্র মানুষ, তুমি কি নিজেকে লম্বা বা বেঁটে বলবে? কুৎসিত বা সুন্দর? গরীব বা ধনী? বল! তুমি নিজেকে কিছুই বলতে পারবে না, ঠিক কিনা? তুমি কেবল 'তুমি' হবে! ব্যাস্। বোঝার চেষ্টা কর যে, তুমি যখন আমাদের এই গ্রহে, তখনও সেটা সত্য।

প্রতিটি মানুষ অদ্বিতীয় ও অনন্য। একটা সিংহ ও ঘোড়াকে তুলনা করতে পার ? আমরা কি কখনও নিজেদের ফুল বা পাখী বা পর্বতের সাথে তুলনা করি? আমরা কেবল তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করি। একইভাবে তুমি কেন অন্যান্য মানুষদেরও দেখ না এবং তাদের উপভোগ কর না?

মানুষদের একই প্রকার মনে হলেও, প্রত্যেকেই অদ্বিতীয় এবং আলাদা আলাদা পথে চলছে। যতক্ষণ তুমি নিজের পথে পুরো মনোযোগ দিয়ে চলছ, প্রতি মিনিটে তোমার সম্পূর্ণতার অভিজ্ঞতা হবে। তুমি জানবেই না যে অন্য মানুষের পথের দিকে তাকানোর কি অর্থ।

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক অন্ধকার গ্রামের মধ্য দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। পথে কোন ল্যাম্পপোস্ট নেই। সুরক্ষার জন্য সে তার সামনে একটি গাড়ীকে অনুসরণ করছিল। তারা একই দুরত্ব গেল। হঠাৎ সামনের গাড়িটা থামল ও লোকটি পিছন থেকে এসে তাতে ধাক্কা লাগাল।
> 'আপনি থামবেন বলে সিগ্নাল দিলেন না কেন?', লোকটি চ্যাঁচাল।
> সামনে গাড়ি থেকে মাথা বার করে অন্যজন প্রশ্ন করে, 'আমার নিজের গ্যারেজের ভিতরে?'

তুমি নিজের পথের দিকে মনোযোগ দিলে তুমি অবিশ্রাম এগিয়ে চলবে ও নিজের সামর্থ্য প্রসারিত করতে থাকবে। নিজেকে কেবল নিজের সাথে তুলনা করবে, অন্যের সাথে কখনও নয়। নিজেকে একমাত্র নিজের দ্বারাই জিততে হবে, অন্যের দ্বারা নয়। অন্যের সাথে তুলনা করার প্রতিটি মিনিট তোমার অগ্রগতির জন্য সময়ের অপচয়।

আরেকটা ছোট গল্প :

> একজন ১০০০ মিটার দৌড়ে দৌড়াচ্ছিল। ২০০ মিটার যাবার পর সে পিছনে তাকাল এবং দেখল যে অন্যেরা অনেক পিছনে। সে খুশী হয়ে দৌড়ে চলল।
> ৫০০ মিটার পরে সে আবার পিছনে দেখল এবং সে সবার আগে আছে বলে খুশী হল।
> এরকম করতে করতে সবশেষে সে জিতল।

মানুষটি যদি পিছনের দিকে মনোনিবেশ না করে কেবল জোরে দৌড়বার দিকে মনোযোগ দিত , সে হয়ত অনেক কম সময়ে জিততে পারত - হয়ত কোন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হত! একইভাবে জীবনে আমরা যদি অন্যদের দিকে মন না দিয়ে নিজের অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দিই, আমরা নিজেদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারব।

আমরা সর্বদা পেট্রল, জল ও বিদ্যুৎ সংরক্ষণের কথা বলে যাই। আমাদের নিজেদের শক্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে কি হবে? নিজের শক্তিকে যথোচিত ভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে কি হবে? আমরা যদি আমাদের সমস্ত শক্তি নিজের প্রসারণের জন্য ব্যবহার করতাম, ভেবে দেখ আমরা তবে কত কিছু অর্জন করতে পারতাম।

দ্যাখো, তুলনা করার সময় তুমি সর্বদা তোমার বা তোমার সম্পাদিত কার্যের সবচেয়ে দুর্বল লিংককে (আংটা) মানদণ্ড করে নিজেকে মাপ। সেটাই সমস্যা। কখনও নিজেকে সবচেয়ে দুর্বল লিংকের মানদণ্ড দিয়ে মাপতে যেও না। অহংবাদী হয়ে তোমায় নিজেকে মহান বলে ঘোষণা করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি একটু আত্মসম্মান রেখে হৃদয়ঙ্গম করতে পার যে তুমি নিজেই অনন্য। তাহলে তুমি এভাবে নিজেকে মাপবে না।

আত্মসম্মান থাকলে তুমি কদর করবে যে সবাই অনন্য এবং বুঝবে যে তুলনা করার কোন সুযোগই নেই। কেবল বিদ্যমানতার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করার দিকে সত্তার এটাই প্রথম ধাপ!

একটা ছোট গল্প :

> এক রাজা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য এক মাস্টারের কাছে জাদু শক্তি পাবার জন্য গেল। সে মাস্টারের সামনে বসল ও তার সেখানে আসার উদ্দেশ্য বলতে লাগল।
> মাস্টার ধৈর্য ধরে শুনলেন।

তিনি রাজাকে তাঁর বাগানে যেতে বললেন যেখানে গোলাপ ও ক্যাক্টাস্ পাশাপাশি রয়েছে। তিনি বললেন, 'তারা তোমার শিক্ষক। তারা তোমার যা শেখার দরকার তা শেখাবে।'
রাজা বাগানে গেল, দুটি গাছ দেখল এবং বুঝতে পারল না তিনি তাদের থেকে শেখা বলতে কি বলতে চেয়েছেন।
সে মাস্টারের কাছে ফিরে এল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বলতে চেয়েছেন, মাস্টার? আমি বুঝতে পারছি না যে তারা আমায় কিভাবে শিক্ষা দেবে।'
মাস্টার তাকে গাছগুলির কাছে নিয়ে গেলেন ও ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এই ক্যাক্টাস্ বহু বছর ধরে গোলাপ গাছের পাশে আছে। সে কখনও গোলাপ হতে চায় নি। একইভাবে গোলাপ গাছটিও ক্যাক্টাস্ গাছ হতে চায় নি। তাদের নিজের প্রাত্যহিক কাজ হ'ল বৃদ্ধি পাওয়া ও প্রস্ফুটিত হওয়া এবং তা তারা অবিশ্রাম করে চলেছে। মানুষ যদি ক্যাক্ টাস্ হত সে সর্বদাই নিজেকে গোলাপের সাথে তুলনা করত এবং গোলাপ অপরকে কত আকর্ষিত করতে পারছে দেখে ঈর্ষাকাতর হত। আর মানুষ যদি গোলাপ হত, সে ক্যাক্টাস্কে দেখত আর ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাবত যে সারাদিন মানুষের ছেঁড়াছেড়ি থেকে অব্যাহতি পেয়ে সে কত শান্তিতে আছে!'
মাস্টার বললেন, 'এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুশক্তি এবং তা তুমি পেতে পার!'

দুটি গাছ সমৃদ্ধিলাভ করেছিল কারণ তারা তাদের শক্তি নিজের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছিল। অপরের বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এতটুকু শক্তিও তারা অপচয় করে নি।

এখন আত্ম-অনুসন্ধানের সময়

এই বিশ্বে, মানুষেরা তোমায় শ্রদ্ধা করবে যদি তুমি বহির্জগতে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কিছু সাফল্যলাভ করতে পার। কলেজের ডিগ্রী, সুন্দরীর খেতাব, কোম্পানীর উচ্চপদ, পেপার পাব্লিশ, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, এই সব মাত্রায় সমাজ তোমায় শ্রেণীভুক্ত করে।

দ্যাখো, তোমাকে কারো থেকে গ্রেড (grade) নেবার দরকার নেই। নিজের বুদ্ধিতে বিশ্বাস রাখ ও নিজে নিজেকে গ্রেড দাও।

কিন্তু এটা বোঝ যে অন্তর্জগতে অনেক কিছু লাভ করার আছে। বহির্জগতের সাফল্যগুলি তো আনুষঙ্গিক। তারা তোমায় তাৎক্ষণিক নাম, যশ ও ধন পাইয়ে দেবে। আসল সাফল্য তো অন্তর্জগতের বিকাশে হয়।

নিজেকে সুতীক্ষ্ম সচেতনতার সাথে কেন্দ্রীভূত কর ও বহির্জগতের কাজে লিপ্ত হও; যেভাবে কমল পুকুরে অস্পৃষ্ট থাকে। চৌহদ্দির কার্যকলাপ নির্বিঘ্নে হতে থাকুক, কিন্তু নিজেকে নিজের সত্তায় কেন্দ্রীভূত রাখ। তবেই তুমি বহির্জগতের কাজ অনেক ভাল করে সম্পাদন করতে পারবে, কারণ তোমার অন্তর্বুদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও তা তোমাকে গাইড করবে।

তাহলে তুমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহির্জগতের সাফল্যলাভে প্রভাবিত হওয়া থেকে থামবে এবং তোমার সত্তার কেন্দ্রে সুস্থিত ও আনন্দ অনুভব করবে। তুলনা ও ঈর্ষার এই আবর্ত থেকে বেড়িয়ে আসার একমাত্র উপায় হল নিজের কেন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া।

কতজন সফল ব্যবসায়ী আজ 'সাফল্য-বিষণ্ণতা'-র মুখোমুখি? তারা যা চায় সব পেয়েছে। সার্থক হয়েছে তাদের নিজের স্বপ্ন, ধার করা স্বপ্ন ও সবকিছু। কিন্তু তারা পরিপূর্ণ বোধ করে না। এত পাওয়ার পরেও তাদের ভিতরে একটা রিক্ততা আছে।

তারা অবাক হয় যে নিজেরা এত দৌড়াল কেন? কারণ সচেতন না হয়ে, নিজেকে সময় না দিয়ে, আত্ম-অনুসন্ধান না করে তারা দৌড়ে চলেছিল। ফলে যখন তারা দৌড় থামায় অথবা যখন তারা হঠাৎ আর দৌড়াতে পারে না, তখন তারা পশ্চাদপসরণ করে নিজের দিকে তাকায় এবং দেখে যে তারা সুসংগতিতে নেই ও নিজের সত্তার সাথে অ-সুস্থ সম্বন্ধে আছে। এটাই হয়ে দাঁড়ায় বিষণ্ণতা বা অসুখ।

সাফল্যের বিষণ্ণতায় পড়লে, তুমি তিনটি পথ অবলম্বন করতে পার। এক হল, ড্রাগ নাওয়া - যার নেশা আরও বিষণ্ণতা দেবে। দ্বিতীয়টি হল আত্মহত্যা - যেটা হল পলায়নবাদ। তৃতীয়টি হল ধ্যান - সমাধানের জন্য অন্তর্জগতে খোঁজ করা। বুদ্ধিমানেরা তৃতীয়টি বেছে নেয়।

আত্ম-অনুসন্ধান তোমাকে বিষণ্ণতা থেকে মুক্ত করার পথ। সমস্যা ভিতরে আছে আর তুমি সমাধানের জন্য বাইরে খুঁজছ। তুমি তোমার সত্তাকে অনেক লম্বা সময় ধরে অবহেলা করেছ এবং বিষণ্ণতাবোধ আসলে তোমার সত্তারই ডাক। তাই নিজের অন্তঃস্থলে কেন্দ্রিত হবার জন্য ও স্রেফ নিজের চৌহদ্দিতে কাজ করার জন্য মাস্টারেরা বারবার অনেক প্রকার প্রক্রিয়া দিয়ে গেছেন।

পেশার শীর্ষে থাকাকালীন তোমায় যখন এই একই জিনিষ বলা হয়, তুমি তা গ্রাহ্য কর না, কারণ তখন তোমার যথেষ্ট শক্তি আছে। এবার তোমার শক্তি ক্ষীণ হতে থাকলে তুমি বোঝ যে কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। এই ব্যাপারটাই মাস্টারেরা তোমাদের বারংবার বলার চেষ্টা করেন।

> মহান পদার্থবিদ এল্‌বার্ট আইনস্টাইন মৃত্যুশয্যায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন পাশে বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে যে তিনি আবার জন্ম নিলে কি হয়ে জন্ম নিতে চাইবেন।
> সবাই আশা করছিল যে তিনি আবার একজন বিরাট বড় বিজ্ঞানী বা সেরকম কিছু হতে চাইবেন।
> আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'আবার জন্মালে জলের মিস্ত্রি (প্লাম্বার) হয়ে জন্মাবার ইচ্ছা।'

তিনি অনুভব করেছিলেন, যা কিছু অর্জন করার সবই অর্জিত হয়েছে, কিন্তু 'যার' জন্য অর্জন করেছেন, 'তাকে'-ই অর্জন করে উঠতে পারেন নি। তিনি পুরো পৃথিবীকে মহান সত্য দিয়ে গেলেন , কিন্তু অনুভব করেছিলেন যে তাঁর পুরো জীবনটাই মিথ্যা হয়ে গেছে।

দ্যাখো, তুলনা ও দৌড়ের এই প্রক্রিয়ায়, তুমি আসলে মেশিন হয়ে যাও। তোমার দৈনন্দিন কার্যকলাপ অচেতন অবস্থায় হয়। তুমি গাড়ি চালান সম্পর্কে সজাগ না হয়েই গাড়ী চালাতে সমর্থ হও। তুমি ঠিক গাড়ীটার মতই মেশিন হয়ে যাও।

সকালে দাঁত মাজা থেকে শুরু করে বিছানায় যাওয়া, নিজের প্রতি কোনরকম সচেতনতা ছাড়াই তুমি এক প্রোগ্রাম করা রোবটের মত কাজ কর। কোন সন্দেহ নেই, যা করছ তাতে তুমি খুবই সুদক্ষ, কিন্তু তুমি মানবতা হারিয়ে ফেলেছ! যে উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলে তা থেকে তুমি অনেক দূরে সরে গেছ। তুমি নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ !

অবিশ্রাম সচেতনতার সাথে থাকলে তুমি যে কেবল সুদক্ষভাবে তোমার কাজ করতে সক্ষম হবে তা নয় , তুমি সব কাজ সম্পূর্ণতার সাথে করবে, একটা পরিপূর্ণতার ভাব নিয়ে করবে, কারণ তুমি-রূপী 'ক্ষুদ্র জগৎ' অস্তিত্ব-রূপী 'নিখিল বিশ্ব'-এর সাথে সঙ্গতি সাধন করবে এবং নিজের শিকড় পৃথিবীতে গেড়ে তুমি উড়বে। শিকড় ছাড়া উড়লে সর্বদাই যে কোন সময়ে তোমার আঘাত পাবার আশঙ্কা থাকে। তাই বোঝ, সচেতনভাবে কাজ করলে কেবল তোমার দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় তা নয়, কিন্তু নিশ্চিত করে যাতে তুমি তোমার সত্তার উদ্দেশ্য থেকে পথভ্রষ্ট না হও।

অন্যের শরীর সম্পর্কিত ঈর্ষা

ঠিক আছে ... চল, ঈর্ষা সম্বন্ধে আরও কিছু বলি! তোমারা জান যে ঈর্ষা তুলনা থেকে উদ্ভূত হয়। কোন বিষয়ে অপরের সাফল্য সহ্য করতে না পারলে আমরা ঈর্ষান্বিত হই। আমাদের ঈর্ষাপরায়ণ হবার নানা কারণ আছে।

প্রথমত বোঝ যে ভগবান এক শিল্পী, তিনি ইঞ্জিনীয়র নন। যদি ইঞ্জিনীয়র হতেন, তাহলে তিনি সমস্ত নর নারীকে একই ছাঁচে বানাতেন। হয়ত তিনি তাহলে সমস্ত নারীকে বিশ্বসুন্দরীর ছাঁচে ও পুরুষদের মিস্টার ইউনিভার্সের ছাঁচে বানাতেন!

কিন্তু ভগবান ইঞ্জিনীয়র নন। তিনি শিল্পী। তিনি সবাইকে অনন্য অদ্বিতীয় করে তৈরি করেছেন।

তুমি সৌন্দর্যকে কোন মাপদণ্ডে মাপছ? কোনও মাপদণ্ড নেই। সেটা কেবল তোমার চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা। একজন সিনেমা স্টার যদি সুন্দর হয়, তুমি কি তার আকারের মাধ্যমে এক কাপ চা উপভোগ করতে পার?

তুমি অন্য লোকের দেহ আকাঙ্ক্ষা করলে তুমি তোমার ভিতরে এক কীলক বা গোঁজ সৃষ্টি কর। তোমার ভিতরে এক দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি কর। ধীরে ধীরে তুমি নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু কর।

জান কি, যে চোখ অন্যের দেহের চারদিকে ঘুরঘুর করে না তাতে এক সৌন্দর্য ও নিষ্পাপতা আছে? ভগবান তোমাকে যা দিয়েছেন তাতে ভরসা রাখ। তোমার সেই ভরসা না থাকলে তুমি নিজেকে আধুনিকরণের জন্য কত কিছু প্রক্রিয়ার আশ্রয় নাও। যখন তুমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কর, একপ্রকার সৌষ্ঠব তোমার মধ্যে আসে। এই সৌষ্ঠব বা মাধুর্য কেবল শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠতর।

শারীরিক সৌন্দর্য এক জিনিষ ও মাধুর্য অন্য। শারীরিক সৌন্দর্য নানাভাবে অর্জন করা যায়। আজকাল শরীরের সৌন্দর্য প্রাপ্ত করার অনেক প্রক্রিয়া আছে। বিউটি প্যাক, প্লাস্টিক সার্জারী এবং আরও কত প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু মাধুর্য আসে যখন তুমি অসাধারণ আত্মবিশ্বাসী ও প্রশান্ত হও, যখন তোমার কোন ব্যগ্রকামনা নেই, যখন তুমি তোমার শরীরের সাথে পুরোপুরি স্বচ্ছন্দে আছ।

আমি যখন আমেরিকায় প্রথম যাই, এয়ারপোর্টের অফিসারেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে যে আমি এই গেরুয়া বস্ত্র পড়ে ভাষণ দিলে আমার কথা কে শুনবে! আমি তাদের বলি, 'আমাকে এক সপ্তাহ দাও এবং আমি আমেরিকাতে এটা ফ্যাশন বানিয়ে দেব!' একজন লীডার হ'ল সে, যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেছে। যখন তুমি নিজেকে স্বীকার কর , তুমি এক অদ্বিতীয় ফুল হয়ে যাও এবং অসাধারণ স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস তোমার মধ্যে ঘটবে।

নিজের দেহের সঙ্গে বাস করতে শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেই মুহূর্তে তুমি ভাব যে অন্য কোন শরীর ও তার আকার তোমার শরীরের চেয়ে আকর্ষণীয়, তুমি 'তুমি' ও তোমার শরীরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি কর। আমি অনেককে দেখেছি যারা নিজের ঘরের দেওয়ালে পুরুষ বা নারী মডেলদের ছবি লাগায় এবং সেই প্রকার শরীরের আকৃতি লা ভ করার জন্য শরীর-চর্চা বা ব্যায়াম করে। যখন তুমি ভাব যে অন্য কোন শরীর বেশী সুন্দর, তুমি 'তুমি' ও তোমার মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি কর।

আমরা কেউ আমাদের শরীরকে গভীরভাবে ভালবাসি না। আমরা তাকে কেবল বোঝা হিসাবে বহন করি। আমরা কখনও নিজের শরীরের ভিতরে নেই কারণ আমরা তাকে ঘৃণা করি। শরীর ছাড়া আমরা সব জায়গায় আছি। তাই আমরা এক একটানা অস্বস্তিতে আছি এবং আমরা যে কোন সময়ে ফেটে পড়ার জন্য তৈরি।

উদাহরণস্বরূপ, তোমার ড্রাইভার সামান্য ভুল করলে তুমি বিনা-প্রচেষ্টায় ফেটে পড়। কর্মস্থলে তুমি সর্বদাই এক খিটখিটে মেজাজে। ভেবো না এসবের কারণ তোমার আশেপাশের লোকজন। লোকেরা আমায় বলে, 'স্বামীজী, আমার সমস্ত কর্মচারী অদক্ষ এবং তাই আমার মেজাজ চড়ে যায়।' দয়া করে বুঝে নাও যে তোমার রোষপ্রবণতার বা মেজাজ চড়ার এটা কারণ নয়। তুমি তোমার শরীরের সাথে স্বচ্ছন্দে নেই এবং সেজন্য তোমার মধ্যে অস্বস্তি ও বিরক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এটা খুবই সূক্ষ্ম কারণ এবং তাই এটা বোঝা কঠিন।

প্রশ্ন : আপনার মুখ সর্বদাই পরিবর্তন হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। এটা কি আমার কল্পনা নাকি এটা সত্যি ?

একজন জীবনমুক্ত সত্তা যেন তরল - আমিত্ব ছাড়াই তিনি বয়ে চলেন। তাই মনে হয় তাঁরা সর্বদাই পরিবর্তনশীল! আমিত্ব-বিনা অবস্থা কিভাবে প্রকাশ করে তা বুঝতে পারবে যখন আমরা আমিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব।

অধিকার করার মনোভাব ছাড়

প্রশ্ন : আমরা অধিকার করার মনোভাব ও ঈর্ষাপরায়ণতা কিভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি?

হ্যাঁ, কিভাবে তাদের থেকে রেহাই পাই? বাস্তবিক তুমি এই প্রশ্নটি করেছ মানে তুমি উচ্চতর উপলব্ধির জন্য প্রস্তুত।

মানুষকে কখনও অধিকার করা যায় না। যখন কাউকে অধিকার করতে চেষ্টা কর, তখন তুমি আসলে তাকে এক বস্তুরূপে নামিয়ে আনো। তুমি মানুষটিকে মৃত বস্তু বানিয়ে দেখ। কেবল মৃত জিনিষ অধিকার করা যায়। যদি তুমি এটা বোঝ , তুমি অধিকার করার বাসনা ও তার থেকে উৎপন্ন ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকবে।

তুমি কি একটি নদীকে অধিকার করতে পার? তুমি যদি নদীর জলকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নদীকে অধিকার করতে চাও , তুমি বোকার মত কাজ করবে, তাই নয় কি? একই প্রকারে মানুষকে অধিকার করতে চেষ্টা কোরো না; তারা যেমন সেভাবে উপভোগ কর এবং তুমি ঈর্ষাকাতরতার দৃঢ়মুষ্টি থেকে মুক্ত হবে।

যখন একজন মানুষকে অধিকার করতে যাও, সেটা তার জন্যও কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তুমি তোমার সমস্ত ভাবনা তার ওপরে অভিক্ষেপ করবে। তাকে তোমার অভিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলি অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। সে নিজেকে বন্দী ভাববে। সে তোমার জন্য তার স্বাভাবিক সত্তায় থাকতে পারবে না। তখন সেটাকে আর কোন সম্বন্ধ বলা চলে না!

যদি তুমি সত্যিই কাউকে ভালবাসো, তাকে মুক্ত কর! তাকে অধিকার করতে যেও না। তার ওপরে কোন টান বা আসক্তি ছাড়াই তাকে ভালবাসো।

একটা গল্প মনে আসছে :

> দক্ষিণ ভারতে এক দূরের গ্রামে সভ্যতা আছে বলে কোন ধারণা ছিল না। সেই গ্রামে এক বয়স্ক দম্পতি ছিল।
> সেই গ্রামে প্রথমবার একটি মেলা বসল। লোকটি মেলায় গেল এবং সেখানে নানা রকম জিনিষ দেখল। সে একটি আয়না তুলে দেখল এবং অবাক হয়ে গেল ! সে তার জীবনে কখনও আয়না দেখে নি। সে একটি আয়না ঘরে নিয়ে এল। প্রায় সে আয়নাটাকে বার করে দেখত ও তার বউ দেখার আগে সেটাকে রেখে দিত।
> তার বউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল এবং একদিন লোকটি ঘর থেকে বাইরে গেলে তার বউ আয়নাটি নিয়ে দেখল।
> বউ অবাক হয়ে বলল, 'আরেকটি মহিলা! আমি যা ভেবেছিলাম!'

অধিকার করার বাসনা ও ঈর্ষাকাতরতার জন্য আমাদের কল্পনার কোন শেষ নেই!

অবশ্যই তুমি বলতে পার, 'স্বামীজী, আমার স্বামী বা স্ত্রী অন্য কারো পিছু নিলে আমি কিভাবে চুপ থাকব?' যদি তোমার স্বামী বা

স্ত্রী সত্যিই অন্য কারোর দিকে আকর্ষিত হয়, ঘটনাটির দিকে সচেতনভাবে তাকাও এবং ব্যাপারটা তোমার স্বামীর সাথে সমাধান করে নাও। এই ব্যাপারটা অধিকার করার প্রবণতা থেকে আলাদা।

ঈর্ষাকে কিভাবে জয় করা যায়?

ঈর্ষা কোরো না বললে তুমি কখনও ঈর্ষা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কেবল তুমি যদি পুরো ব্যাপারটায় সচেতনতা নিয়ে আস এবং গভীরভাবে বোঝ, তবেই সাহায্য পাবে।

ঈর্ষা দমন করার জন্য দেখ যে ঈর্ষা তোমার ভিতরে কিভাবে এসেছিল। যে চিন্তা ও ভাবনাগুলি তোমায় ঈর্ষার দিকে নিয়ে গেছে, সেই চিন্তা ভাবনাগুলির অনুক্রম বিশ্লেষণ কর।

শীঘ্র বুঝতে পারবে যে ঈর্ষা, বস্তু বিনা ছায়ার মত এবং ঈর্ষা তোমায় নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে। কারো জীবনে ঈর্ষা থেকে মুক্তি হল এক মহান মুক্তি।

দ্বিতীয়ত, তোমার ঈর্ষার বস্তুটিকে নিন্দা কোরো না। কেবল ঈর্ষার বস্তুটিকে দোষ দিয়ে তুমি ঈর্ষামুক্ত হতে পারবে না।

ঈর্ষার বস্তুটিকে নিন্দা করে তুমি হয়ত সেই বস্তু থেকে মুক্ত হবে, কিন্তু তুমি আরও অন্য কোন ঈর্ষার বস্তুর সাথে জড়িয়ে পড়বে, ব্যাস! এটা যেন 'আঙুর ফল টক' বলে আরেকটা আঙুর-বাগানে চলে যাওয়া! তাই ঈর্ষার বস্তু থেকে মুক্তি পাওয়া সমাধান নয়। তোমাকে কর্তার ওপরে কাজ করতে হবে আর সেই কর্তা হ'ল 'তুমি।'

যদি তুমি মনে কর যে তুমি একটি আবেগের বশীভূত এবং সেই আবেগ থেকে তুমি ছাড়া পেতে চাও কারণ তুমি বুঝেছ যে সেই আবেগ তোমার অগ্রগতির সহায়ক নয়, তাহলে সেই আবেগকে বাধা দিও না। বাধা দিলে তুমি সেই আবেগে আরও শক্তি প্রদান করবে। যখন তুমি বল যে 'আমার ঈর্ষাকাতর হওয়া উচিত নয়' তুমি 'ঈর্ষা' শব্দটিকে একই ক্ষমতা প্রদান করবে, যতটা ক্ষমতা তুমি 'আমার উচিত নয়' কথায় দাও।

তার পরিবর্তে নিজেকে বল, 'আমি যেন সবার প্রতি সর্বদা করুণাময় হই।' কখনই 'ঈর্ষা' শব্দটা ব্যবহার কোরো না। এই প্রসঙ্গে কেবল কিছু সম্পূর্ণভাবে সকারাত্মক শব্দ ব্যবহার কর, ব্যাস।

আবার, ঈর্ষাকে না এড়িয়ে বা তার থেকে পালিয়ে না গিয়ে, তার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতনতার সাথে যাও। যখন তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর, সে অন্য কোন সময়ে আগের চেয়ে বেশী তীব্রভাবে তোমার মুখোমুখি হবে। কেবল মনে রেখ যে ঈর্ষা তোমার বাস্তব প্রকৃতি নয়। সমাজ তোমাকে ঈর্ষাপরায়ণ হতে শিখিয়েছে।

ঈর্ষা তোমার আসল রূপ নয়। এটা বুঝতে পারলে তুমি ঈর্ষাতে না জড়িয়ে তাকে পরিহাস করবে। যখন তাকে পরিহাস করতে পার, তার মানে তুমি ঈর্ষার অংশ না হয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছ। আর যেই নিমেষে তুমি প্রত্যক্ষদর্শী হও, তোমার পক্ষে যে কোন জিনিষের ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া সহজ হয়।

এছাড়া, যদি তুমি দেখ যে সম্পূর্ণ অস্তিত্ব এক ঐশ্বরিক খেলামাত্র, তুমি ঈর্ষাপূর্ণ ভাবনাকেও এক ঐশ্বরিক খেলা হিসাবে দেখবে।

যদি বোঝ যে তুমি অনন্য এবং তোমার মত এই বিশ্বে কেউ নেই, তখন তোমার তুলনা করার স্বভাবকে অর্থহীন মনে হবে এবং স্বতশ্চলভাবে তোমার ঈর্ষার ভাবনা বন্ধ হবে। সর্বদা মনে রেখ : অস্তিত্ব সবাইকে ও সব বস্তুকে সমানভাবে ভালবাসে।

মাস্টারদের বাণীর পুরো সদ্ব্যবহার কর

প্রশ্ন : মাস্টারেরা বারংবার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন, যেমন, ঈর্ষা ছাড়া প্রেম, আরও ভাল উপলব্ধি এবং বিচার না করার মনোভাব। কেন এই উপলব্ধিগুলি আমাদের মধ্যে হচ্ছে না?

দ্যাখো, এতে দুটি জিনিষ আছে। যখন আমরা মাস্টারের বাণী ঠিক বুঝে নিজেদের অকপটভাবে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা করি, তার অর্থ আমরা ঠিক রাস্তা খুঁজে পেয়েছি এবং আমরা মহানন্দসাগরে প্রবেশ করেছি! কিন্তু তার বদলে আমরা যখন মাস্টারের ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া আরম্ভ করি, সেখানেই সমস্যার শুরু।

মাস্টারের শিক্ষা অনুসরণ করলে তুমি আধ্যাত্মিক ফল পাবে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখলে, তুমি এক ধর্মীয় উন্মাদ হয়েই থাকবে। ধর্মীয় উন্মাদেরাই সমাজে বিভ্রান্তি ও সংঘাত সৃষ্টি করে।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী হোক, পবিত্র কোরাণে মহম্মদের বাণী হোক অথবা পবিত্র বাইবেলে যিশুর বাণীই হোক, সবার বাণীই এক, কেবল নানা প্রকার প্রকাশ। যে মাস্টারকে তোমার অনুসরণ করার ভাগ্য হয়েছে, তাকে অনুসরণ কর। কিন্তু তুমি যখন কৃষ্ণকে অনুসরণ করছ, আর ভগবদ্‌গীতা থেকে শ্রীকৃষ্ণ তোমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় , তুমি নিজের ও অন্যের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছ।

কৃষ্ণ ও যিশুর দেখা হলে তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করবেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণের গরু ও যিশুর ভেড়া একত্র হয়, তারা লড়াই করবেই!

প্রত্যেকে শান্তি ছড়াতে চায় এই ব'লে যে তার মাস্টারের দর্শন সবচেয়ে ভাল। তো কি হয়? শান্তি ছড়াবার বদলে আমরা নিজেরা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ি!

পৃথিবী গ্রহে নিছক করুণা-বশত মাস্টারেরা সম্ভব হতে থাকেন। কিন্তু যেভাবেই হোক, মানুষেরা তাদের এড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নেয়!

শীঘ্র রূপান্তরিত হবার আরেকটা পথ হ'ল, অন্যদের দিকে আঙ্গুল না দেখিয়ে অথবা অভ্যাস করার জন্য ভাল সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে, যদি সবাই বাণী শুনেই সেই মুহূর্তে অভ্যাস করা শুরু করি। তাহলে আমাদের চারিদিকে শুভ ঘটনাবলী স্বতশ্চলভাবে ঘটতে থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, আমি তোমাদের উদ্ভিদ, পশু, গাছ ও মানুষকে সমানভাবে প্রেম করতে বললাম। এটা অভ্যাস করার জন্য কোন শুভ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা না করে তুমি তা এক্ষুণি শুরু করতে পার। শুভ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করে করে তুমি হয়ত তা ভুলেই যাবে।

শুরু করার সহজ উপায় হ'ল রাস্তা দিয়ে চলার সময় বা তোমার বাড়ীর ভিতরে থাকার সময় প্রকৃতির সাথে অপব্যবহার বর্জন করা। হাঁটার সময় আমাদের কারো কারো অভ্যাস আছে গাছের ডাল ভাঙ্গা বা ফুল ছেঁড়া। তুমি সচেতনভাবে এসব করা বন্ধ কর এবং এসবের দিকে আরও সচেতনতা ও প্রেম সহকারে দেখ।

মাস্টারের শিক্ষাগুলি হারিয়ে না ফেলার জন্য এই উপায়গুলি বিদ্যমান।

কিন্তু তুমি কি কর? মাস্টারদের ভাষণ শোন অথবা তাদের কিছু বই পড় এবং বল, 'কি বিরাট বক্তা তিনি', এবং পরে সেই সম্বন্ধে সব ভুলে যাও। অথবা তুমি কিছু বন্ধুকে তাঁর ভাষণ শুনতে পরামর্শ দাও এবং তোমার ঘরে গিয়ে আগের মতই জীবন যাপন করতে থাক। তাহলে আর কি করা যায়?

দয়া করে বোঝ : আমি চাই না যে তোমরা কেবল আমার দেওয়া শিক্ষা প্রচার কর; আমি চাই যে তোমরা তা অভ্যাসও কর।

এই ছোট গল্পটি শোন :

> একজন আফ্রিকায় ছুটিতে গেল। সে তার পিছনের উঠানে একদি ন হাঁটছিল। এমন সময় একটি সিংহ তার দিকে লাফ দেয়। সে সত্বর নীচু হয় এবং সিংহ পাশের ঝোপে গিয়ে পড়ে।
> পরের দিন লোকটি আবার হাঁটতে বেরুল এবং সিংহটি পুনরায় তাকে আক্রমণ করল। লোকটি ঠিক সময়ে আবার নীচু হবার জন্য সিংহ তাকে ধরতে পারল না ও পাশের ঝোপে আরও দূরে গিয়ে পড়ল।
> পরের দিন লোকটি ঘরের ভিতরেই ছিল এবং সিংহটি বাইরে কোথাও আছে কিনা ঘর থেকে দেখতে থাকল। সিংহটিকে সে ঝোপের পিছনে দেখতে পেল। অতি বিস্ময়ে সে দেখে যে সিংহটি নীচু লাফ দেওয়া অভ্যাস করছে।

দ্যাখো, যখন সংগ্রহ করা জ্ঞানকে কাজে লাগাও, তুমি জীবনে এগিয়ে চলবে। আর জ্ঞান যদি কেবলমাত্র সংগ্রহ করতে চাও, তা কোন কাজের নয়। কেবল জ্ঞান সংগ্রহ করলে তোমার স্মৃতি বাড়তে পারে, কিন্তু তোমার সত্তার কিছুই হবে না।

মাস্টারেরা পরম সত্য ভাষণ করেন যা অন্য কেউ প্রকাশ করতে পারে না।

এটা এরকম : একটা বিস্তীর্ণ ঘন জঙ্গলের অন্ধকারে তুমি একটা ছোট প্রদীপের আলোয় অনুসন্ধান করছ। সেই আলোতে তুমি কয়েক ফুট আগে দেখবে এবং যা দেখবে তাকে সত্য বলে লিখে রাখবে।

বিজ্ঞানীরা এটাই করে। তারা আজ কয়েক ফুট দেখে তা থেকে একটা থিয়োরি (তত্ত্ব) লিখে ফেলে। তারপর সেই আলো নিয়ে তারা আরও কয়েক ফুট এগিয়ে চলে ও আরও কিছু দেখে। তারপর তারা আগের ঘোষি ত সত্যকে বাতিল করে ও নতুন সত্য প্রদান করে। পরিষ্কার করে বোঝ যে, যা আজকে সত্য ও আগামীকাল সত্য নয়, তা আজকের জন্যও সত্য হতে পারে না।

যাই হোক, এভাবে বিজ্ঞানীরা তাদের মন দ্বারা একটা ঘন জঙ্গলে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে।

এখন ভাব যে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল এবং সেই পুরো জঙ্গল একটি চমকেই দৃষ্টিগোচর হ'ল! তাহলে তুমি পুরো জঙ্গলকে জানবে এবং দরকার পড়লে তুমি তাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারবে।

জীবনমুক্তি এরকমই! তা যেন বিদ্যুতের এক ঝলকে পুরো জঙ্গল দেখে নাওয়া। তাই জীবনমুক্ত মাস্টারেরা চরম সত্যকে জানেন।

দূর গ্রামের বেশীরভাগ চায়ের দোকানে এক পরিচিত দৃশ্য দেখতে পাবে। কিছু লোক প্রায় রোজই সেই দোকানে আসবে, তারা পৃথিবীর সমস্ত মহান দর্শনগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। তারা সব দেবতাদের , মাস্টারদের ও রাজনীতিবিদ্দের মাথাগুলি ভাল করে চিবাবে ও হজম করবে।

কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই শহরে ঘটা সমস্ত জঘন্য কাজগুলি সম্বন্ধে আলোচনা হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বের অবস্থা ও শৃঙ্খলা দেখে তাকে গভীরভাবে তদন্ত করা হবে। সবশেষে যে মানুষটি এসব কথা বলল, সে তার চা শেষ করে এবং পরের দিন চায়ের দাম দেবে বলে চলে যায়!

যে মানুষটি চায়ের দাম দিতে পারে না, সে চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে সমস্ত খবরগুলি সম্বন্ধে নিজের রায় দেয়। সেই কাগজের সম্পাদক মহাশয়ও পুরো পেপারটা হয়ত এত ভালভাবে পড়ে না ।

তাই অভ্যাস শুরু কর। প্রাচীন ভারতের ঋষি যোগগুরু পতঞ্জলির কথামত, 'যদি তুমি আজকে পাঁচ ইঞ্চি বেঁকতে পার, কাল আরও আধা ইঞ্চি বেঁকোবার চেষ্টা কর।' এইভাবে আমি যে সত্য তোমাদের দিচ্ছি তা উপলব্ধি করার জন্য নিয়মিতভাবে কাজ করবে। নয়ত, তুমি চায়ের দোকানের মানুষগুলির মতই হয়ে থাকবে। তারা দোকানের বেঞ্চে টোল খাওয়ায়, আর তুমি এখানে মাদুরে গর্তের কারণ হচ্ছ, ব্যাস!

সমস্যা হ'ল, বেশীর ভাগ সময়ে আমরা যখন জ্ঞানের কথা শুনি, আমরা ভাবি যে ঠিক এই কথাগুলি আমাদের সাথে বসা বন্ধু বা আত্মীয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! আমরা গোপনভাবে ইচ্ছা করি যে তারা যেন বার্তাটি পায়। কিন্তু আমরা নিজেরা বার্তাটি হারিয়ে ফেলি! মনে রেখ : যদিও হলঘরে হাজার মানুষ আছে, আমি কিন্তু 'তোমার' সাথেই কথা বলছি।

আমার প্রতিটি কথাই শক্তিতে গর্ভবতী, সেই শক্তি তোমারই জন্য। তাই ওসব ভাবনা মনে এনে আমার কথা শুনো না। বিশেষ করে যখন পতি পত্নী একসাথে ভাষণ শুনতে আসে, আমি যখন তাদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে কিছু বলি, পতি ভাববে 'পত্নীর এটা শোনা উচিৎ' এবং পত্নীও ভাববে যে তার পতি যেন সেটা শোনে। শেষে তারা দুজনেই জিনিষটা হারিয়ে ফেলে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'ল ধনদৌলত ও বস্তুগত সামগ্রী স্তূপাকার করা। এক সময় সে বোঝে কিছু জিনিষ ধন দ্বারা পাওয়া যায় না। তার ধন সঞ্চয় করার গতি স্বতশ্চলভাবে কমে যায়। সে তখন শব্দ অথবা বৌদ্ধিক জ্ঞান সঞ্চয় করতে থাকে। যে করেই হোক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সে বেশি ও আরও বেশি শব্দের জন্য লোভী হয়ে পড়ে।

যে ধন ও শব্দ সঞ্চয় করা বন্ধ করেছে সে আসল জ্ঞান প্রাপ্ত করবে। প্রায়ই আমরা প্রশ্ন করি এই ভেবে নয় যে আমরা আসলে জানতে চাই, কিন্তু আমরা আরও বেশি শব্দের জন্য লোভী অথবা আমরা দেখাতে চাই যে আমরা কিছু জানি।

যদি গভীরে তাকাও, কেবল একটা প্রশ্নই উঠবে এবং সেটাই তোমার জন্য একমাত্র আদি প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর পেলে তুমি জীবনমুক্ত হবে!

আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্বামীজী, ভগবান কি?'

আমি ধীরে বিষয়টি পরিবর্তন করি এবং তার পরিবার ও ব্যবসা সম্বন্ধে জানতে চাই। আমরা প্রায় দুই ঘন্টা কথা বলি। সেই দুই ঘন্টায় সে তার প্রথম প্রশ্নে ফিরে গেল না।

সবশেষে আমি বললাম, 'ভাই, ঠিক আসার সময় তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন কর। আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দিই নি কারণ সেটা তোমার গভীরতা থেকে আসে নি।'

প্রশ্ন আমাদের গভীরতা থেকে এলে তা কখনই ভুলতে পারি না বা সন্তুষ্টিকর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম করতে পারি না। কিছু মানুষ প্রশ্ন করে, নিজেরাই নিজেদের উত্তর দেয় এবং পরে আমাকে উত্তর দিতে বলে!

প্রশ্ন : আমরা যদি তুলনা করা ছেড়ে দিই, তার মানে কি আমরা সবকিছু ত্যাগ করব এবং আধ্যাত্মবাদী হয়ে যাব?

যেই মুহূর্তে আমি তুলনা করা, দৌড়ানো ইত্যাদি করতে বারণ করি, বেশীর ভাগ মানুষেরা ভাবে আমি তাদের পার্থিব বস্তু থেকে পলায়ন করতে বলছি এবং আধ্যাত্মবাদী হতে বলছি।

আধ্যাত্মিকতা বা সন্ন্যাস মোটেই ত্যাগ সম্বন্ধীয় নয়। তা হ'ল গভীর সচেতনতা সম্বন্ধীয়, যা পাগলের মত বাসনা কমিয়ে তোমাকে মৌলিক প্রয়োজনের স্তরে নামিয়ে আনে এবং তা পূরণ করার জন্য তোমায় শক্তি দেয়।

বহির্জগতে যা করা দরকার তা তো করতে হবে, সেখানে কোন সন্দেহ নেই। তোমাকে বাঁচার জন্য রোজগার করতে হবে; তোমাকে তোমার শরীর সতেজ রাখতে হবে ইত্যাদি। সব মিলিয়ে আমি বলছি যে এই সব কাজে সচেতনতা নিয়ে এসো যাতে করে বহির্জগতের অপ্রয়োজনীয় প্রবৃত্তিগুলি স্বতশ্চলভাবে মুছে যায় এবং তুমি তোমার জন্ম ও জীবনের উদ্দেশ্য স্বচ্ছভাবে বুঝে জীবনযাপন করতে পার।

মায়ার সকল আকার, যাবতীয় বাসনা, সমস্ত সঞ্চারিত ভয়, সব রকম ঈর্ষা ও তুলনা, প্রচণ্ড আবেগ ও কামলালসা তখন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হবে এবং তোমার কাছে মহানন্দের শক্তি হয়ে যাবে।

আরেকটা ছোট গল্প :

> এক মাস্টার তাঁর শিষ্যদের সাথে চলতে চলতে এক নদীর ধারে এসে পৌঁছালেন।
> শিষ্যেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মাস্টার, এখন কি আমরা নদী পার হব?'
> মাস্টার শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তাই। তোমাদের সাবধান হতে হবে যাতে তোমাদের পা না ভিজে!'

শিষ্যেরা বুঝতে পারল না মাস্টার কি বলতে চাইছেন! মাস্টার তাদের বলতে চাইছেন যে আধ্যাত্মিকতা পুরোটাই হ'ল পা না ভিজিয়ে সাগর পার হওয়া। যেন পুকুরে পদ্ম হবার মত - গভীর জলে থেকেও জল দ্বারা অস্পৃষ্ট।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা

আধ্যাত্মিকতা হ'ল জীবন-ইঞ্জিনীয়ারিং। কলেজে তোমাদের নানারকম ইঞ্জিনীয়ারিং শেখায়। জীবন-ইঞ্জিনীয়ারিং আমাদের সকলের শেখা উচিৎ। আধ্যাত্মিকতা পরমহংসের মত বাস করা শেখায়, বস্তুজগতে গলা পর্যন্ত জল, কিন্তু তা থেকে অস্পৃষ্ট।

কোন মানুষকে বা কোন বিষয়কে লঙ্ঘন না করে জীবন-ইঞ্জিনীয়রিং তোমাকে এক প্রগাঢ় ও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে শিক্ষা দেয়। তা তোমাকে তোমার বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শেখায় এবং অস্তিত্বের বিস্ময়গুলিকে অতি সরলভাবে ও নিষ্পাপতার সাথে দেখতে শেখায়। তা অস্তিত্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শেখায় এবং তা অভিজ্ঞতা দেয় সমকালীনতার (coincidence) ক্ষমতার - তোমার অন্তর্দেশের আনন্দে সাড়া দিয়ে স্বতশ্চলভাবে ঘটনাগুলি ঘটে।

আধ্যাত্মিকতা সর্বদাই এক প্রার্থনাপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ মেজাজে থাকতে শেখায়। তা প্রতিটি মুহূর্তকে আবেগে আন্দোলিত না হয়ে , অন্তর্দেশের গভীর থেকে উপভোগ করতে সাহায্য করে। তা জীবনকে প্রতি মুহূর্ত খুশীতে উদ্‌যাপন করতে দেখিয়ে দেয়।

তা তোমার অন্তর্বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করে এবং বহির্জগতে কার্য সম্পাদন ত্বরান্বিত করে। তা তোমার সচেতনতা জাগরিত করে এবং তোমাকে গভীরতর চেতনায় নিয়ে যায়। তা তোমায় নিয়ে যায় যৌনলালসা থেকে প্রেমে, দুশ্চিন্তা থেকে বিস্ময়ে, মিথ্যা থেকে সত্যে, বেদনা থেকে মহানন্দে, ঈর্ষা থেকে খুশীর উদ্‌যাপনে।

লোকেরা ভাবে আধ্যাত্মিকতার জন্য আলাদা করে সময় ভাগ করে রাখা উচিৎ। একদম নয়! আমি যা বললাম তা থেকে বুঝবে তার দরকার নেই। যে আধ্যাত্মিকতার হেতু আলাদা সময় বার করার জন্য বলে , সে আধ্যাত্মিক নয়, সে তো ধর্মীয় ব্যক্তি।

ধর্মাচরণের জন্য সময় চাই, কারণ তাতে আচার অনুষ্ঠান আছে। সময়ের পরিমাণের সাথে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। তার সাথে তোমার জীবনের গুণমানের সম্পর্ক। সত্য অন্বেষণ করার সৎ ইচ্ছা থাকলেই যথেষ্ট। তাহলে তোমার পুরো সময়কে ঐকান্তিক ধ্যান হিসাবে সমস্ত কাজ করার জন্য তুমি সমর্পণ করতে পারবে এবং তোমার লক্ষে উপনীত হবে। নিজের ভিতরে শক্তিপ্রবাহের কোন অবরোধ ছাড়াই স্বতশ্চলভাবে তুমি উদ্ভাসিত হবে কর্মক্ষত্রে , বাড়ীতে এবং আন্তঃব্যক্তিগত (interpersonal) সম্পর্কসাধনে।

তুমি যে কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে। তুমি যে কোন জায়গায়, যে কোন মানুষের সাথে স্বচ্ছন্দে থাকবে। যে জায়গায় থাক, কেবল সেটা তোমার ঘর হবে তা নয়, সমস্ত অস্তিত্ব তোমার ঘর হয়ে যাবে। তুমি মানসিক ও শারীরিক সর্তকরণ (conditioning) থেকে বেড়িয়ে আসবে এবং অস্তিত্বের সাথে এক হবার জন্য ও তাতে মিশে যাবার জন্য উত্থিত হবে।

সমস্যা হ'ল লোকেরা কেবল আচার অনুষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত। তাতে তারা কিছু নিরাপত্তা উপভোগ করে। আচার অনুষ্ঠানের পিছনের বিজ্ঞান সম্বন্ধে লোকেদের জানা নেই, কিন্তু এই আচার অনুষ্ঠানে তাদের আমিত্ব-সন্তুষ্টি ঘটে। আচার অনুষ্ঠানগুলি জটিল এবং জটিল জিনিষ করতে আমরা সর্বদাই একটা চ্যালেঞ্জ পাই।

লোকেরা আমার কাছে তাদের সমস্যা নিয়ে এসে তার সমাধান জিজ্ঞাসা করে। আমি তাদের বলি যে আমি তাদের যত্ন নেব এবং আশ্রমে থাকার সময় তাদের কিছু সময় বটগাছের নীচে বসতে বলি। আশ্রমে বটবৃক্ষ এক শক্তিস্থল। কিন্তু তারা সেই উত্তরে খুশী নয়। তারা জিজ্ঞাসা করে যে কি কি আচার আনুষ্ঠান করলে তাদের সমস্যার সমাধান হবে।

আমি যদি তাদের বটগাছের চারিদিকে ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করতে বলি, তারা তা করতে খুব খুশী হবে! দ্যাখো, বটের চারিদিকে ১০৮ বার ঘুরলে তোমার আমিত্বের সন্তুষ্টি হয়। তুমি তখন ভাব যে তুমি অনেক খেটেছ এবং তুমি তার উপকার পাবার যোগ্য হয়েছ।

এমনকি ধর্ম ও অনুষ্ঠানে আমি দেখেছি লোকেরা কিভাবে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে ! তোমার প্রতিবেশী যদি কোন মন্দিরে কোন নৈবেদ্য দিয়ে আসে, তুমিও পরের দিন সেই মন্দিরে গিয়ে একই নৈবেদ্য দিয়ে আসবে। ফোকাস্ কোথায়? ঈশ্বরে নাকি প্রতিবেশীতে?

লোকেরা বলতে গর্ববোধ করে যে তারা বিশ্বের নানা পবিত্র মন্দির দর্শন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে, যারা তা শুনছে, তারা সেই বাহাদুরিকে ছাপিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে।

এত মন্দির দর্শনের পরেও তোমার চক্রগুলি তালাবদ্ধ! কখনও কি সেটা ভেবেছ? মন্দির দর্শন করা হয় কেবল অন্তর্জগতে এগিয়ে যাবার জন্য, তুলনা, ঈর্ষা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাবার জন্য, কিন্তু এখানাও তুমি আসল জিনিষটা হারিয়ে ফেলেছ। তুমি বহির্জগতের জন্য কাজগুলি করছ।

আমি দেখেছি যে দেবতার মূর্তির সামনে কেউ স্তব করছে। তারা কিছু লাইন পড়ে ও কাজের লোককে ডেকে জিজ্ঞা সা করে যে তার নির্ধারিত কাজ শেষ হয়েছে কিনা। অথবা কিছু লাইন পড়বে ও দেখবে যে শেষ করতে আর কত পাতা বাকী ! তারা এইভাবে ভগবানের সাথে সম্পর্ক জোড়ে এবং স্তব পাঠ করে সন্তুষ্ট হয়।

তার ওপরে তারা এই পাঠ ২১ দিন ধরে পুনরাবৃত্ত করবে কারণ তারা এটা করার জন্য আগে একটা মানত করেছিল। তারপর তারা গর্বভরে যাবে এবং প্রতিবেশীদের ও আত্মীয়-স্বজনদের বলবে যে তারা এক দুঃসাধ্য মানত পরিপূর্ণ করেছে !

প্রতিটি জিনিষ যা আমরা করি তা বেশীরভাগই কেবল মানুষকে বলার জন্য করি এবং তাদের মধ্যে একটা তুলনার বীজ বপন করি। যদি তুমি কোন আচার অনুষ্ঠান করতে চাও, তা একদম সততার সাথে কর, অস্তিত্বের সাথে এক গভীর সংযোগ ভাবনা নিয়ে কর। যখন তুমি এভাবে কর, তুমি তা নিয়ে বাইরে কোন কথাও বলবে না।

আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান ও সাহস

প্রশ্ন : আমরা যখন আচার-আনুষ্ঠান বিষয়ে আছি, আপনি কি আমাদের অনুষ্ঠানের পথ ও ধ্যানের পথ সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

যখন আচার-অনুষ্ঠানের পথ বেছে নাও, তখন অঙ্গীকার ও আন্তরিকতাকে তোমার সর্বখোল চাবি (master key) হওয়া উচিত। তাই তা একদম আন্তরিকতা ও সততার সাথে কর। তাহলে আচার-অনুষ্ঠানও আধ্যাত্মিকতা হয়ে যায়। আজকের দিনে আচার-আনুষ্ঠান সহ পূজা করার কয়েকশ' পথ আছে। কোনটা অনুসরণ করবে তা নিয়ে গুলিয়ে ফেলার দরকার নেই। যে কোন একটি অনুসরণ করার নির্ণয় নাও এবং তা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কর। এই অঙ্গীকার তোমায় সুফল প্রদান করে, কেবল অনুষ্ঠানটি নয়।

আবার তাৎক্ষণিক ফল চেয়ো না। আজকাল সবাই ইন্সট্যান্ট চা বা কফির মত তাৎক্ষণিক ফল চায়। আমরা অনেকেই ভাবি যে অপরের প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনার চেয়ে শীঘ্র উত্তর পাচ্ছে এবং তাই আমরা আমাদের পুজার প্রক্রিয়া বদলে তাদের মত করা উচিৎ বলে মনে করি। পুজাতেও এত তুলনা! যা করছ তা অঙ্গীকার ও বিশ্বাস সহকারে কর এবং বাকিটা খোলা রেখে দাও। স্বতশ্চলভাবে জিনিষগুলি হবে।

যে কোন ধর্ম বা আচার-অনুষ্ঠানের চরম লক্ষ্য হ'ল অস্তিত্বের সাথে ঐকতানে থাকা। আচার-অনুষ্ঠান ভগবানকে ঘুষ দেবার কোন ব্যাপার নয়।

আমার একটা গল্প মনে পড়ছে :

> তিনজন মিলে একটা ব্যাবসা শুরু করল। তারা ভগবানকে এক পার্টনার বানানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা রাজী হল যে লাভের এক প্রতিশত (পারসেন্টেজ) ভগবানকে দেবে।
> তারা ব্যবসা শুরু করল ও অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক লাভ হল।
> সমস্যার শুরু তারপর থেকে : ভগবানকে কিভাবে এত দিয়ে দেওয়া যায়?
> সবাই একটা করে প্রস্তাব দিল।
> প্রথমজন বলে, 'ঠিক আছে, চল একটা বৃত্ত আঁকা যাক এবং সমস্ত টাকা ওপরে ছোড়া হবে। যা বৃত্তের ভি তরে পড়বে তা ভগবানের হবে আর যা বাইরে পড়বে তা আমাদের।'
> দ্বিতীয়জন বলে, 'না। আমার প্রস্তাবটি আরও ভাল। আমরা একটা বিরাট বৃত্ত আঁকব ও সব টাকা ওপরে ছুড়ে দেব। যা ভিতরে পড়ে তা আমাদের, বাইরের টাকাগুলি ভগবানের।
> তৃতীয়জন বলে ওঠে, 'দ্যাখো, ভগবান আমাদের ওপরে। আমরা সব টাকা ওপরে ছুড়ব। তিনি যা চান, তাঁকে তা রাখতে দাও। যা নীচে পড়বে তা আমাদের!'

যতক্ষণ আমরা কিছু চাই, আমরা ভগবানকে তার জন্য উৎকোচ বা ঘুষ দিই। যেই আমরা চাওয়া জিনিষ পেয়ে যাই , আমরা তাঁকে ফেলে রাখি, যতক্ষণ না পরবর্তী বাসনা জাগ্রত হয়! আমাদের এইভাবে কাজ করতে শেখানো হয়েছে।

আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়ে ফিরি। সেগুলির বিষয়ে কিছু নির্দিষ্টতা আছে। সেগুলি ছকে বাঁধা এবং তুমি জান যে তা ঠিক কখন শুরু করতে হয়, কখন শেষ হয়, কোথায় সেটা করতে হয় ইত্যাদি। আচার-আনুষ্ঠানের নিয়মগুলি তুমি পালন কর ও শেষে একই মানুষ হয়ে ফের। পুরো প্রক্রিয়ায় বেশ নিরাপত্তা আছে। তাই তা এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। যাই সুনির্দিষ্ট , তাই ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু ধ্যানের বেলায় কি হয়? প্রথমত আচার-আনুষ্ঠানের তুলনায় ধ্যান খুবই সোজা বলে মনে হয়। লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে যে আমি আশ্রমে এত আচার অনুষ্ঠান করি কেন। আমি তাদের বলি , 'যদি আমি লোকেদের বলি যে আশ্রমে আস আর বটগাছের নীচে বসে ধ্যান কর, যা নাকি আসলে যথেষ্ট, তারা তা শুনবে না।'

যদি আমি মন্দির না বানাই, সেখানে প্রতিমা না রাখি, আমাকে হয়ত কেবল একাএকা বটগাছের নীচে বসে থাকতে হবে ও সেখানে ধ্যান করতে হবে!

মানুষকে অন্তর্যাত্রার দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেবার জন্য আমাকে তাদের কিছু জিনিষ দেখাতে হবে যা তাদের মনের ভিতরে আছে। আমাকে তাদের ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

তারা বটগাছের নীচে 'দক্ষিণামূর্তি' দেখে খুব খুশী হবে। যদিও দক্ষিণামূর্তি ছাড়াই এই বটগাছের চারিদিকে যে শক্তিক্ষেত্র আছে তা সম্বন্ধে তারা মহানন্দে অনবহিত থাকবে। এই বটগাছ এক জীবন্ত শক্তি। তার নীরবতা এক স্পন্দনশীল নীরবতা। তার নীচে কেবল ধ্যানে বসলেই যথেষ্ট। তোমাকে কোন জটিল জিনিষ করতে হবে না। এখানে প্রতিটি পাতা ও ডাল কথা বলে।

দ্যাখো, যখন তুমি প্রতিমা পূজা করতে থাক, তোমাকে আরও বেশী করে অস্তিত্বের ঐকান্তিক উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, এই অস্তিত্বের সাথেই তো তুমি প্রতিমা মারফৎ সংযোগসাধন করার চেষ্টা করছ। তবেই তুমি স্বতশ্চলভাবে সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখতে শুরু করবে। তুমি বুঝবে যে কেবল এই প্রতিমাই নয় , সমগ্র সৃষ্টি ভগবানের উপস্থিতিতে গর্ভবতী। তারপর তুমি সম্পূর্ণ অস্তিত্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

ধ্যানের বিষয়ে তুমি যদি সততা সহকারে প্রবেশ কর , তার পরিণতি সুনির্দিষ্ট নয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হতে পারে। তুমি হয়ত এক অন্য মানুষ হয়ে উদ্ভূত হলে এবং তা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ লাগতে পারে ! এটা জুয়া খেলার মত। রূপান্তর ঘটতে শুরু হয়। আসলে তুমি এই রূপান্তরই খুঁজে বেড়াচ্ছ, কিন্তু যখন সেটা ঘটতে থাকে, তুমি ভয় পাও।

তুমি আচার-অনুষ্ঠানের সুরক্ষাতে আরামবোধ কর। আচার-অনুষ্ঠান তোমার দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে যায়।

যখন ধ্যান কর, তোমার সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং যখন তা হয়, নিজের চারিদিকে যে বেড়া তুমি কল্পনা করেছিলে, যে বেড়া আসলে সমাজ তোমার চারপাশে লাগিয়েছিল, তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় এবং তুমি নিজেকে বিদ্রোহীর মত মনে কর , বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু তোমার নিজের অচেতন ও অজ্ঞ অবস্থার বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহী তোমাকে বিদ্রোহের কারণের আরও

গভীরে অনুসন্ধান করতে ঠেলে দেয় এবং তোমার জন্য আরও প্রশস্ত পথসমূহ খুলে দেয়।

এইভাবে তুমি গভীর থেকে গভীরতর জায়গায় চলে যাবে , যেখানে তুমি আগে কখনও যাও নি; যে স্থান সম্বন্ধে সমাজ জানেই না; যে স্থান সর্বক্ষণ তোমারই ভিতরে ছিল, কিন্তু তালাবদ্ধ ছিল; এমন এক স্থান যেখানে প্রবেশ করার জন্য তুমি অজান্তে তা র তালা খোলার জন্য চাবি খুঁজে চলেছিলে। যখন সেই জায়গা খুঁজে পেয়েছ, তুমি পৌঁছেছ!

এটা এরকম :

> একটা গরুকে একটা গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে এবং সে কয়েক মিটার ব্যাসার্দ্ধের বৃত্তে ঘুরতে পারে। সে চারপাশে ঘুরতে থাকে ও তার বুদ্ধি দ্বারা সে সেই বৃত্ত সম্পর্কে পরিপ ক্ব ও সচেতন হয়।
> এখন দড়িটা একটু ঢিলা করা হ'ল, যাতে বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ কিছু মিটার বাড়ে। তখন গরু আরও একটু বেশী জায়গায় ঘোরে ও আরও বেশী বুদ্ধিমান হয়। তারপর তাকে আরও জায়গা দেবার জন্য দড়িটা আরও ঢিলা করা হয়।
> গরুর বাড়ন্ত বুদ্ধি ও সচেতনতার ওপরে নির্ভর ক'রে এক সময়ে তাকে পুরোপুরি ছেড়েও দেওয়া যায়!
> মানুষের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। তার সচেতনতা যত বাড়ে , সে তত বেশী স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং এই আবর্ত চলতে থাকে।

মাস্টার কিভাবে সাহায্য করেন

প্রশ্ন হ'ল যে তোমার শক্তির রূপান্তর ঘটানোর জন্য তুমি কতটা ইচ্ছুক।

কিন্তু সেটা যখন ঘটে, সমাজ তোমাকে বলবে যে তুমি দূরে সরে যাচ্ছ। তোমাকে কেবল অস্তিত্ব ও নিজের ওপরে বিশ্বাস রেখে সাহস করে এগিয়ে চলতে হবে।

এখানে, কোন পুস্তক বা ভাষণের চেয়ে একজন মাস্টার তোমার জন্য 'যোগ-দণ্ড' হয়ে সেবা করতে পারেন, যে দণ্ড বা লাঠি তোমাকে নিজের জন্য দাঁড়াতে সাহায্য করে। প্রতিবার তুমি যখন তোমার আধ্যাত্মিকতার পথে সমাজ দ্বারা প্রহৃত হয়েছ বলে মনে করেছ বা মনে করেছ যে তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে, মাস্টার তাঁর নিজের উপায়ে তোমাকে উঠিয়ে নেবেন ও তোমাকে এগিয়ে চলতে বলবেন।

তার মানে এই নয় যে তুমি মাস্টারের ওপরে নির্ভরশীল। এটা এর কম : তুমি কোন একটা জায়গায় রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছ। তোমার ওপরে ছেড়ে দিলে তুমি বহু জায়গায় সঠিক রাস্তার জন্য জিজ্ঞাসা করবে। কখনও হয়ত কেউ তোমায় ভুল পথ দেখাবে ও তোমাকে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে হবে। অনেক সময় অপচয় করার পরে তুমি তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাও। হয়ত বহু সময় লাগল, কিন্তু সবশেষে তুমি পৌঁছে যাবে। কিন্তু তোমার কাছে একটা মানচিত্র বা একজন গাইড থাকলে কি হয় ? তুমি কোন সময় অপচয় না করেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে! তার মানে কি এই যে তুমি ম্যাপ বা গাইডের ওপরে নির্ভরশীল? না। এটা দ্রুততর উপায়ে কাজটা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া, ব্যাস। একইভাবে মাস্টার হ'ল একজন গাইড, যিনি রাস্তাটা চেনেন, যিনি ইতঃপূর্বেই তোমার খোঁজা জায়গাটায় গেছেন এবং তোমার গাইড হবার জন্য প্রস্তুত।

সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা এটা হয়

যখন তোমার কাছে কেবল উৎসর্জন আছে, কোন সন্দেহ নেই যে তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য ক ঠিন পরিশ্রম করবে। কিন্তু যখন তোমার উৎসর্জনের সাথে সাহস থাকে, তুমি তোমার লক্ষ্যের দিকে এক ঝাঁপ দেবে। এই সাহস আসবে যদি তুমি অপরের দিকে তাকানো বন্ধ কর এবং কেবল নিজের দিকে দেখ, যদি তুমি নিজেকে অপরের সাথে তুলনা করা ছাড় এবং নিজেকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ কর এবং নিজের মধ্যে আবশ্যক পরিবর্তনগুলি নিয়ে আস।

তোমাকে নিজের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস সহকারে দাঁড়াতে হবে। তোমার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস তখন হয় যখন তুমি নিজেকে অপরের সাথে তুলনা না করে দৃঢ়রূপে নিজেতে কেন্দ্রীত হও।

সমাজ তোমাকে টানার চেষ্টা করছে সমাজের চেনাজানা ছকের (pattern) ভিতরে, পরিচিত দুঃখকষ্ট যা সে পরিচালনা করতে পারে তার ভিতরে, অনেক-চলা ও ক্ষয়প্রাপ্ত পথেতে। এটা খুব সোজা এবং এই পথে আসতে সাহসের আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কম-চলা পথে আসার জন্য সাহসের প্রয়োজন। যখন আমি সাহস বলছি, আমি সাধারণ সাহস বলছি না, আমি সম্পূর্ণ সাহস বোঝাচ্ছি।

জিপ্‌সি গুটি (gypsy bead) পরার জন্য সাহসের দরকার নেই, কিন্তু রুদ্রাক্ষ মালা পরার জন্য সাহসের আবশ্যকতা আছে! আমি

তাদের রুদ্রাক্ষের গুটি দিই যারা তা পড়তে চায়। রুদ্রাক্ষ গুটি শক্তির ভাণ্ডারগৃহ। তারা মহাজাগতিক শক্তি তোমার জন্য সঞ্চয় করে। তারা যেন ব্যাটারি-ঘর এবং যখন তুমি একটু নিস্তেজ হও তা তোমাকে রি-চার্জ করে। কিন্তু সমাজ এই গুটিগুলিকে সন্ন্যাসের নিশ্চিত প্রতীকী বস্তু হিসাবে দেখে! ত্যাগের মানে না জেনেই তারা গুটিগুলিকে ত্যাগীর পরিধেয় বলে দেখে।

সংসারে থেকে রুদ্রাক্ষ পড়লে তারা তাদের নিন্দা করে। কিন্তু যখন তারা প্রতিমা অথবা সন্ন্যাসীর দেহে রুদ্রাক্ষ গুটি দেখে, তারা খুশী হয় ও তাদের কাছে প্রার্থনা করে। কমবয়সী অনেকে আমার কাছে এসে বলে যে তাদের পরিবার রুদ্রাক্ষ পড়ার জন্য কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

এটা শ্লেষাত্মক (ironical)। যখন লোকেরা প্রার্থনা করে, তারা মহাজাগতিক শক্তির কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু একই শক্তি তাদের কাছে সরলতর উপায়ে উপলব্ধ হলে, তারা সেটা নিতে চায় না! তারা তার কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু আবার তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়!

যদি তুমি এটাকে বিশ্লেষণ কর, তুমি দেখবে এটা কত পরস্পরবিরোধী। তারা স্পষ্টভাবে নিজেদের ভগবান থেকে কত আলাদা কর দেখে; সেটাই সমস্যা। তারা নিজেকে ভগবান বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এখন আমি তোমায় বলি : তুমি জান কি না জান, মানো কি না মানো, পছন্দ কর কি না কর, বিশ্বাস কর কি না কর, 'তুমি' ভগবান। এটাই বিশুদ্ধি চক্রের অন্তর্নিহিত ভিত্তি - তোমার অনন্যতা ও অসীম শক্তিকে আবিষ্কার করা।

যখন তোমার সাহস বৃদ্ধি পায়, সমাজ স্বতশ্চলভাবে তাৎপর্যহীনতায় মিলিয়ে যায়। যখন তোমার সাহস কম, সমাজ সহজেই তোমার ওপরে জোর করে। এটা সবই তোমার মনের ব্যাপার। সমাজকে যত ক্ষমতা দাও, ঠিক ততটা ক্ষমতা সমাজও তোমার ওপরে দেখাবে। সমাজকে কখনও কোন কিছুর জন্য দোষ দিও না।

পছন্দ সর্বদা তোমারই। নিছক সাহসের অভাবে সমাজের কথামত তুমি পথ বেছে নাও ; তুমি তুলনা করে টানাহিঁচড়া করার পথ বেছে নাও ও একে অপরের আগে থাকার চেষ্টা কর এবং তারপর তার জন্য সমাজকে দোষ দাও। এটা করা ঠিক নয়। মনে রেখ, পছন্দ সর্বদা তোমারই।

কেবল সচেতনতা দ্বারা কাজ কর, অসীমতা তোমার সামনে খুলে যাবে। যখন তা হয়, তুমি ভয় পাও কারণ তুমি এরকম খোলা জায়গা দেখতে অভ্যস্ত নও। তুমি সর্বদাই সীমারেখা দেখতে অভ্যস্ত। এখন তুমি আর কোথাও প্রাচীর দেখছ না। তুমি উৎকণ্ঠিত বোধ কর।

তুমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নাও যে তুমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছ। বাস্তবকে হজম করা খুব কঠিন মনে হয়। তুমি অসুরক্ষিত মনে কর। তোমার আগের বিশ্বাস ও মায়ার উষ্ণতায় ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়। তোমার মনে হয় যে সমাজের কথা না শুনে তুমি ভুল করেছ ; ভুল পথে ঢুকছ বলে সমাজ তোমায় সাবধান করেছিল। তুমি সন্দেহ করা শুরু কর এবং তারপর সন্দেহকেও সন্দেহ কর। তুমি মরুভুমির মাঝে ফেলে রাখা একাকী শিশুর মত বোধ কর।

এরকম সময়েই তোমার মনে রাখা আবশ্যক যে অস্তিত্ব সর্বদাই তোমার সাথে আছে। কেবল তোমার সাহসকে পরিপক্ব হতে হবে ও অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে তার হাতে হাত রেখে চলতে হবে এবং তবেই সব ঠিক হবে। বিশ্বাস হ'ল সাহসের জন্য খোঁচানি দেবার লাঠি।

তোমার ভিতরে আবর্তন বা বিপ্লব না ঘটলে, তোমার কখনই বিদারণ হবে না এবং বৃদ্ধি পেয়ে এক বৃক্ষ হতে পারবে না। আমাদের অধিকাংশই সাহসের অভাবে বীজ অবস্থাতেই মরে যাই। আমরা সর্বদা বীজকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে চাই যে ফুল ও ফল কোথায়? তাতে কি কোন সাহায্য হবে? না! বীজের বিদারণ হতে হবে, তার অনেক পরে ফুল ও ফল আসবে। একইভাবে যখন এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, মানুষের মধ্যে যখন এক বিপ্লব বা আবর্তনের সৃষ্টি হয়, তার বিদারণ হবে ও বিকাশ হবে। সমস্ত ধ্যানসমূহ হ'ল বীজকে বিদারণ করারই নানা প্রক্রিয়া।

যখন তুমি বিদারণ করা শুরু কর, তোমার সব অগ্রাধিকার (priority) পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। আগে যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখন তার গুরুত্ব কম। একমাত্র যে জিনিষ তোমার সত্তাকে প্রতিপালন করে, তাকেই গুরুত্বপূর্ণ লাগবে। তোমার সম্পূর্ণ মনোভাব পরিবর্তিত হবে। তোমার সামগ্রিক উপস্থিতি পরিবর্তিত হবে।

তোমার উপস্থিতি মানুষকে স্বতশ্চলভাবে তোমার দিকে আকর্ষিত করবে, যদিও তারা তা সমর্থন নাও করতে পারে! তোমার অন্তঃস্থলে অনুভূত প্রভা (radiance) তাদের গভীর ঔৎসুক্য সহকারে আকর্ষিত করবে। তোমার পরিবর্তিত মনোভাবের জন্য সমাজ তোমার সমালোচনা করবে, সে তোমার উপস্থিতিকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নতর বলে দেখতে শুরু করবে।

যখন রূপান্তর ঘটছে, তখন অতীতের কিছুই একেবারে গ্রাহ্য কোরো না। অতীত বারবার তোমায় টেনে আনার চেষ্টা করবে আগের পরিচিত ছকে ও বন্দীদশাতে। যদি তুমি তার কথা শোন , তুমি নিজেকে বন্দীদশায় যাবার অনুমতি দিচ্ছ। কেবল পরমানন্দে থাকার সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাক এবং তোমার মধ্যে যে রূপান্তর ঘটছে তাতে দৃঢ় প্রত্যয় রাখ । এটা তোমার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা, সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হবার জন্য অধ্যবসায়ের পরীক্ষা। যতক্ষণ না রূপান্তর সম্পূর্ণ হয় ও পরিপক্ব হয়, আঁকড়ে থাক।

এক মহাজাগতিক শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূর্ণ করে এবং এক শক্তি আছে যা তোমায় পরিপূর্ণ করে। তোমার সেই শক্তির সাথে মহাজাগতিক শক্তির জীবন্ত সংযোগসাধনই আধ্যাত্মিকতা। যখন তোমার ব্যক্তিগত চেতনা বিশ্বজনীন চেতনায় নিমজ্জিত হয়, তুমি জীবনমুক্ত হও।

কেবল জীবনমুক্ত হবার বাসনা থাকলে হবে না। সেটাকে সচেতন সিদ্ধান্ত হতে হবে। দ্যাখো, সাধারণ বাসনাগুলি হ'ল লোভ যা আসলে তোমাকে তোমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে না। সচেতন সিদ্ধান্ত তোমাকে সফল হবার জন্য কাজ করাবে।

লোকেরা এইসব সঠিকভাবে বুঝতে পারে না এবং ভাসা-ভাসাভাবে কথা বলে। যখন তুমি বোঝ না, তুমি ভুল বোঝ। কিন্তু তুমি ভাব যে তুমি বুঝেছ এবং সেখানেই সমস্যার শুরু।

অবিরত লেগে থাক এবং তা হবে

আধ্যাত্মিকতা এক বিজ্ঞান যা আমাদের দেহ, মন ও আত্মা সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি দেয়। এতে সচেতন হয়ে প্রবেশ করলে বহির্জগত ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। যখন লোকেরা তোমায় বাইরে থেকে দেখে, তারা ভাবে তুমি ত্যাগ করছ। একমাত্র তুমিই বোঝ যে তুমি কিছুই ত্যাগ কর নি; বহির্জগতের জিনিষগুলি আপনা আপনি মিলিয়ে যাচ্ছে। মায়ার অন্তর্ধান হয় ও তুমি আর সম্মোহিত থাক না।

আমাদের এক প্রোগ্রামে আমি অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করি যে তাদের মধ্যে ক'জন ভাবে যে আমি তাদের সম্মোহিত করেছি। আশী জনের মধ্যে তিনজন হাত তোলে। একটি মেয়ে হাত তুলল। পাশে বসা এক মহিলা মেয়েটিকে দেখে হাসল। আমি মহিলাটিকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েটি তো সততার সাথেই হাত তুলেছিল।

আমি নিশ্চিত যে সেই দলে আরও অনেকে হাত তুলতে চেয়েছিল , কিন্তু আমি কি বলব তার ভয়ে আর হাত তোলে নি! যাই হোক, তিনজন হাত তুলেছিল। তাদের বললাম যে আমি তাদের সম্মোহন করি নি, কিন্তু আসলে তাদের সম্মোহিত অবস্থা থেকে বার করে নিয়ে আসছি।

তারা মায়া বা বিভ্রম অন্তর্ধান হওয়া অনুভব করতে শুরু করেছে। কিন্তু কি হয়, তুমি মায়ায় থাকতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছ যে তা মুছে যেতে থাকলে, তুমি কিছু একটা ভুল হচ্ছে বলে ভাব! সমস্যা হ'ল, মানুষকে বেশী বেশী সত্য কথা বললে তাদের মধ্যে এক প্রকার ভয় ঢুকে যায়। যে আরাম তারা অজ্ঞতার আশ্রয়ে উপভোগ করছিল , তা কষ্ট পায়।

দ্যাখো, তোমার অজ্ঞতা যতটা মেটে, ততটা পরিমাণ ভগবান বা অস্তিত্ব তোমার ভিতরে ঢোকে। তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবনে যাই প্রচেষ্টা কর তা নিজেকে খালি করার দিকে চালিত কর, যাতে তুমি অস্তিত্বে ভরে যেতে পার। অন্য কোন প্রচেষ্টা নিছক নৈমিত্তিক ও নগণ্য। এটা মনে রেখ।

তোমার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস নিজের চেতনা প্রসারণের জন্য নাওয়া উচিৎ। একমাত্র তবেই তুমি অস্তিত্ব বা ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য সত্যি সত্যি সচেতন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। তোমার মধ্যে এই দৃঢ় সঙ্কল্প না হওয়া পর্যন্ত তুমি অন্বেষণ করার ভান করে যাবে , ব্যাস। তুমি সাদামাটাভাবে নিজেকেই ঠকাচ্ছ। এক মুহূর্তের জন্য কখনও ভেবো না যে তুমি অন্যদের ঠকাচ্ছ। তুমি নিজে কে ঠকাচ্ছ।

বাইরে না রেখে ভিতরে পদক্ষেপ রাখা শুরু করাই প্রথম ধাপ। ঘুরে দাঁড়ানোর সেই মুহূর্তটি সবচাইতে অর্থপূর্ণ। তুমি জানবে কখন তোমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে বা ইউ-টার্ন নিতে হবে। সেই সময় পর্যন্ত, জনতাকে, অবস্থাকে বা বহির্জগতের পরিস্থিতিকে, নিজেকে একীভূত করতে না পারার কারণ হিসাবে দেখিয়ে তোমার মন নানা কৈফিয়ৎ দিতে থাকবে। একবার ইউ-টার্ন নিলে এই সমস্ত চিন্তাসমূহ তাৎপর্যহীনতায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে। তারা ধীরে ধীরে তাদের প্রাধান্য হারাবে। চিন্তাগুলি সেখানে থাকবে , কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তুমি সহজেই নিয়মিতভাবে এগিয়ে চলবে। চিন্তাগুলি তাদের কাজ যথাযথ করে যাবে, কিন্তু সেগুলি তোমাকে আরও বাস্তবিক প্রত্যক্ষদর্শী হতে সাহায্য করবে।

প্রথম পদক্ষেপ বা ঘুরে দাঁড়ানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঘুরে দাঁড়ালেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়া। তখন তুমি অস্তিত্বের পথে আরও নমনীয় হও।

যখন তুমি ইউ-টার্ন নাও সবকিছু ধ্যান হয়ে যায়। হাঁটা, কথা বলা, গান করা, নাচা, কাপড় পড়া, সবকিছুই ধ্যান হয়ে যায় এবং তা করা হয় বর্দ্ধিত সচেতনতা সহকারে।

তুমি কেবল নিজেকে এসব করতে প্রত্যক্ষ করবে এবং আস্তে আস্তে বুঝবে যে সম্পূর্ণ বিশ্ব একটা মায়া বা ভ্রম। তুমি যখন ভিতরের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছ, বস্তুত তুমি এক লাফ দিয়েছ, কারণ প্রথম ধাপের জন্যই আসল লাফ দরকার। তার আগে পর্যন্ত তুমি দর্শনশাস্ত্রের কথা বলবে, অন্যদের ও নিজেকে বোঝাবে যে তুমি অন্বেষণ করছ; এদিকে দিনের পর দিন দৃঢ়সঙ্কল্প দুর্বল হয়ে যাবার জন্য সবকিছু আরও গুলিয়ে ফেলতে থাকবে।

যখন তুমি প্রথম পদক্ষেপ নাও, তুমি নিজেকে জয় করার জন্য প্রস্তুত। অপরকে জয় করা খুব সোজা - কেবল কিছু অস্ত্রশস্ত্র নাও বা জিহ্বা ব্যবহার কর এবং তাদের ধ্বংস কর, ব্যাস। কিন্তু নিজেকে জয় করতে প্রকৃত সাহস লাগে। এই বিশুদ্ধি চক্র হ'ল নিজেকে জয় করা সম্বন্ধে।

যখন তুমি ভিতরে দেখ, তুমি নিজেকে জয় করার জন্য তৈরি। অবশ্যই যখন ভিতরের পথে চল, তুমি কি করছ তাতে আশেপাশের লোকেরা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কিছুই জানতে পারবে না। কেবল তুমি বুঝতে পারবে, যা হচ্ছে সব ভিতরে, বাইরে নয়। তোমার ভিতরে ঘটা বিপ্লব সম্পর্কে তুমি কেবল সজাগ থাকবে। কে বল তুমিই তোমার ভিতরে বিকাশমান বুদ্ধি সম্বন্ধে বলতে পারবে।

তোমার যে অভিজ্ঞতাগুলিতে আনন্দ পাচ্ছ তা আশেপাশের লোকেরা বুঝতে পারবে না। আমি তোমাদের বলি : তুমি যে ভিতরে বিকশিত হচ্ছ তা অন্য কাউকে কখনও বোঝাতে যেও না। নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে তুমি তোমার আধ্যাত্মিক বন্ধুদে র সাথে আলোচনা করতে পার, যারা তোমার মানানসই হয়। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা তুমি যদি এমন কারো সাথে আলোচনা কর যে এই অন্তর্দেশ-যাত্রা সম্পর্কে অচেতন, তোমারই অনেক কষ্ট হবে।

তোমার ভিতরে অভিজ্ঞতাগুলি ঘটতে দাও; তাদের ধরেও থেকো না আবার তাদের পিছনে দৌড়িও না। তাদের তোমার ওপরে বাষ্পের মত কাজ করতে দাও যাতে তুমি পুরোপুরি সিদ্ধ হও। তাদের ধরে রাখলে তুমি কোন সময়ে নিশ্চল হবে এবং পুরো জিনিষটাই হারিয়ে ফেলবে।

মনে রেখ, তুমি যে অন্তর্যাত্রায় গমন করেছ, এই সকল অভিজ্ঞতা তারই লক্ষণ। সেগুলি রাস্তায় দেখা সাইনবোর্ডের মত। তুমি কি সাইনবোর্ডে থেমে যাও আর বল যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছ? না। তাদের আঁকড়ে থেকো না। লক্ষের দিকে এগিয়ে চল।

সম্পূর্ণ অঙ্গীকার ও দৃঢ়সংকল্প আবশ্যক এবং তা স্বতশ্চলভাবে আসবে যখন তুমি প্রস্তুত হও; যখন তুমি মন অর্থাৎ সমাজকে ফেলে দিয়ে হৃদয় সহকারে জীবন্ত থাকতে প্রস্তুত হও; যখন তুমি যে কোন পরিস্থিতিতে অন্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা বন্ধ করে নিজের দিকে নির্দেশ করতে প্রস্তুত হও; যখন তুমি অভিজ্ঞতা দ্বারা শেখ যে তোমার মন হ'ল সামাজিক এবং তোমার হৃদয় হ'ল প্রাকৃতিক।

আবার যখন লোকেরা তোমার অভিজ্ঞতার প্রমাণ চায়, একদম বুঝে নাও যে তাদের তা প্রমাণ করার কোন দরকার নেই। তোমার অভিজ্ঞতা এতই প্রগাঢ় ও নিজস্ব যে তুমি তা কার্যকরভাবে অপরকে বুঝিয়ে উঠতে পারবে না। বস্তুত যদি তুমি তা অপরকে বোঝাতে যাও, তুমি তোমার পুরো অভিজ্ঞতাকে নামিয়ে আনবে। আবার অন্য মানুষটিরও তোমার কথা বিশ্বাস করার ইচ্ছা নাও থাকতে পারে। তারা হয়ত তোমাকে বলবে যে তুমি নিজেকে বিভ্রান্ত করছ। তারা হয়ত পুরো জিনিষটা তোমায় যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করতে বলবে।

যুক্তি এইসব অভিজ্ঞতাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ভগবান যুক্তির উর্ধ্বে। যদি যুক্তি ভগবানকে বোধগম্য করাতে পারত, তবে তো যুক্তি ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়ে যেত এবং তা তো একদমই হতে পারে না! তাই স্বস্তিতে থাক এবং তোমার ভিতরে অভিজ্ঞতাগুলি হতে দাও। যদি তোমায় কেউ প্রশ্ন করে, কেবল মৃদু হেসে এগিয়ে চলার পরিপক্বতা রাখ। একটু মৃদুহাসি অনেক কথার চেয়ে বেশী বুঝিয়ে দেবে।

মহান জীবনমুক্ত মাস্টারেরা অস্তিত্বের সাথে যোগাযোগ করে পর মানন্দ অভিজ্ঞতা করেছিলেন। লোকেরা আমায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলে। কিন্তু তোমাদের বলি, এগুলি এতই ব্যক্তিগত ও প্রগাঢ় যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি তোমাকে গাইড করতে পারি; আমি তোমাকে পথ দেখাতে পারি - অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তোমার পথ। যেই মুহূর্তে আমি তা ব্যাখ্যা করা শুরু করি, তা নীরস হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে তুমি তা অভিজ্ঞতা করবে, যদি তোমার ভিতরে সেই আগুন থাকে। তোমার

তা পাবার জন্য মাস্টারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট শক্তি।

তোমার ধ্যান ও আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নের উত্তরে আমি এত কথা বললাম। তোমরা মনে করতে পার যে আমি প্রকৃত বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। না! এই বিশুদ্ধি চক্র নিজেকে প্রসারিত করার বিষয়; জীবনে তুলনা ও ঈর্ষার যে কোন স্থান নেই সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ও উপলব্ধি ক'রে তোমার অনন্য সত্তাকে আবিষ্কার করার বিষয়। আমি যা বলছি সেটাকে অন্তরে প্রবেশ করাও এবং সেটার পিছনের শক্তিকে তোমায় রূপান্তরিত করতে দাও। আমি বলছি, তোমার ভিতরে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে! তা তোমার সম্পূর্ণ সত্তার গুণমান পরিবর্তিত করে দেবে।

শক্তির তিনটি স্তর

ঠিক আছে...এখন, আমরা যা আলোচনা করলাম, তাতে তোমরা বুঝলে যে তুলনা ও ঈর্ষা অস্তিত্বহীন এবং তোমাদের কাছে তার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। এবার বিশুদ্ধি চক্র সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা করি ও এটা কেমন শক্তি-স্থল তা বলি।

আমাদের তিনটি স্তরের শক্তি আছে। প্রথম স্তরের শক্তি আসে মন থেকে এবং তা আমরা দৈনন্দিন কাজের জন্য সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্যবহার করি। এই শক্তি খরচা হলে আমরা ক্লান্ত বোধ করতে আরম্ভ করি এবং আরও কাজ এলে বিরক্ত হই।

দ্বিতীয় স্তরের শক্তি হ'ল জরুরি অবস্থার স্তর। এই শক্তি আমাদের আবেগ থেকে আসে। জরুরি অবস্থায় এই শক্তি উদ্ঘাটিত হয়। ধর, তুমি খুব পরিশ্রান্ত ও কাজ করে বাড়ীতে হেঁটে ফিরছ। তুমি ভাব যে তোমার কেবল ঘরে গিয়ে বিছানায় ঝাঁপ দেবার শক্তিটুকুই আছে। সেই সময় হঠাৎ একটা কুকুর তোমায় তাড়া করল, তুমি কি করবে? তুমি ভীষণ জোরে দৌড়াবে এবং অত জোরে হয়ত আগে কখনও দৌড়াও নি। যদিও একেবারে পরিশ্রান্ত ছিলে, যদিও একটু আগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালাতে অসুবিধা হচ্ছিল, হঠাৎ তুমি অন্য প্রকার শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে দৌড়ালে! আবেগবশত এই জরুরি শক্তি উদ্ঘাটিত হয়।

তৃতীয় স্তরের শক্তি হ'ল সত্তা-স্তরের শক্তি। এটা তোমার ভিতরে এক অসীম শক্তির উৎস, যা তুমি ব্যবহার কর না। এই শক্তি স্তর গভীর ধ্যানে উন্মুক্ত করা যায় ও তার অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। তুমি মান কি না মান, তুমি এই তিনটি শক্তি স্তরের সাথে সংযুক্ত। বিশুদ্ধি চক্রের কাছে এই উচ্চতর শক্তিস্তরের চাবিকাঠি আছে।

পরিব্রাজক হয়ে ঘোরার সময়ের আমার একটা অভিজ্ঞতা বলি :

> হিমালয়ে আলমোরা একটি সুন্দর শহর। সেখানে কয়েকটি কুটীর সহ একটি ছোট আশ্রম আছে এবং যার ধ্যান করার ইচ্ছা সে সেখানে ধ্যান করতে পারে।
> সেখানে রাত্রে প্রায়ই বাঘ আসে বলে শোনা যায়! আমি পরিব্রাজক হয়ে ঘোরার সময় সেখানে অল্প কয়েক দিন ছিলাম। আমি সেখানে অনেক ঘন্টা ধরে ধ্যান করতাম।
> তাদের একটা নিয়ম ছিল যে বাঘ আসার আঁচ পেলে আশ্রমের প্রধান ঘন্টা বাজাবেন এবং সমস্ত সন্ন্যাসীরা তাদের কুটীরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করবেন এবং যতক্ষণ না বলা হয় ভিতরেই থাকবেন।
> একদিন আমরা যখন ধ্যান করছিলাম, ঘন্টা বাজল ও আমরা সবাই নিজের নিজের কুটীরে প্রবেশ করলাম।
> পরদিন আশ্রমের প্রধান আমরা সবাই ভাল আছি কিনা দেখতে এলেন। তিনি দেখলেন একটি কুটীরের জানালা দিয়ে একজন সন্ন্যাসী মুখ বার করে জোরে জোরে কিসব বলছেন। সেই কুটীরের দরজা বন্ধ ছিল। আমরা দৌড়ে তাঁর দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। সবশেষে আমাদের কয়েকজন জানালা দিয়ে সেই ঘরের ভিতরে ঢুকলাম এবং অবাক হয়ে দেখলাম যে সেই সন্ন্যাসী একটি বিরাট পাথর দরজার সামনে রেখেছেন যাতে বাঘ দরজা ঠেলে ঘরে না ঢুকতে পারে। সবাই একসাথে মিলে পাথরটা সরালাম ও দরজা খুলল।
> হঠাৎ আমাদের মনে হ'ল তিনি কিভাবে ঐ পাথরটা দরজায় রাখলেন! আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে পাথরটা তিনি কিভাবে ঠেললেন।
> তিনি উত্তর দিলেন, 'ঠেললাম? পাথরটাকে ওঠালাম ও সেখানে রাখলাম!'
> বাঘ আসার সঙ্কেত পেয়ে তিনি সহজেই পাথরটা তুলে দরজার পিছনে রাখলেন, ব্যাস!

জরুরি অবস্থার শক্তি বলতে আমি ঠিক সেটাই বোঝাচ্ছি। সাধারণ পরিস্থিতিতে একই মানুষ সেই পাথরটা তুলতে সমর্থ হবে না। বুঝতে পারলে? এই গল্পে বাঘ আসার জরুরি অবস্থা চলে যাবার পর, তিনি নিজেই সেই পাথর দরজা থেকে সরাতে পারলেন না!

ভয় ও লোভ থেকে দ্বিতীয় স্তরের শক্তি উন্মুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটা জরুরি মিটিং থাকলে কি তুমি ক্লান্ত বোধ কর? না! তুমি জীবন্ত ও সতেজ থাকবে। মিটিংয়ে যাওয়ার বাসনা ও লোভ তোমাকে তেজোময় অবস্থায় রাখে।

বিশুদ্ধি চক্র এমন একটা দরজা যার মধ্য দিয়ে তিনটি শক্তিস্তর উন্মুক্ত করা যায়, কিন্তু তুমি তা জানো না কারণ তুমি এই স্তরগুলি বহু সময় ধরে সঠিকভাবে ব্যবহার কর নি।

এটা এরকম : সমস্ত হার্বার বা পোতাশ্রয়ে বোট-জেটীতে নৌকা রাখা হয়। বলা হয় যে জেটিতে বেশীদিন বোট রাখলে তা জলযাত্রা করা ভুলে যায়!

একইভাবে তৃতীয় স্তরের শক্তি বহুদিন ব্যবহার না করার দরুণ তুমি ভুলে গেছ সেই শক্তি তোমাতে পরিব্যপ্ত বা সেটা তোমার আছে। ধ্যান তোমার জন্য এই তৃতীয় স্তরের শক্তি উন্মুক্ত করতে পারে।

এই চক্র পবিত্র অবস্থায় রাখলে, তুমি বহির্জগতে অনেক উচ্চস্থানে পৌঁছুতে পারবে এবং অন্তর্জগতের গভীরে যেতে পারবে। যখন তোমার নিম্ন আত্ম-মর্যাদা বা ঈর্ষা থাকে, এই চক্রটি তালাবদ্ধ থাকে। নিজের সম্পর্কে নিম্ন ধারণা পোষণ বা নিম্ন আত্ম-মর্যাদা ঈর্ষাকাতরতার অক্রিয় প্রকাশ, ব্যাস। ঈর্ষা সক্রিয় আর নিম্ন আত্ম-মর্যাদা অক্রিয়। দুটোই তুলনা করার ফল। নীচু আত্ম-মর্যাদার সাথে তুমি নিজেকে কোন কিছুর উপযুক্ত মনে কর না এবং নিজেকে সেই ভাবনায় ডুবিয়ে রাখ। ঈর্ষা হ'লে তুমি তা সহ্য করতে পার না এবং প্রতিক্রিয়া কর; এটাই পার্থক্য।

তোমার কোন আত্মমর্যাদা যদি নিজেকে ভগবানের চেয়ে কম বলে ইঙ্গিত করে তা হ'ল নিচু আত্মমর্যাদা, কারণ তুমি ভগবান। তাই আমি বলি, তোমাকে অন্য কারো সাথে তুলনা করার কোন সুযোগই নেই।

তোমার ভিতরে যে অসীম সম্ভাবনা গুপ্ত আছে তা বোঝার জন্য এই চক্রে লুকানো দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শক্তির অভিজ্ঞতা তোমার হওয়া প্রয়োজন। এই চক্র আমাদের জন্য বাস্তবিকই শক্তিস্থল। আমরা যখন সেখানে কেন্দ্রীভূত হই, আমরা এর থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত হওয়া অনুভব করতে পারি।

প্রারম্ভিক দিনগুলিতে পরিব্রজ্যার সময়ে আমি হিমালয়ে মাইলের পর মাইল খালি পায়ে চলতাম। বিশুদ্ধি চক্রে কেন্দ্রীভূত হয়ে আমি ধীর গতিতে চলা শুরু করতাম। এই চক্রে কেন্দ্রীভূত থেকে আমি ধীরে ধীরে গতি বাড়াতাম। কিছু সময় পরে আমার শরীর এক ছন্দে চলতে থাকত ও আমি কেবল তা প্রত্যক্ষ করতে থাকতাম! এইভাবে বহু মাইল চলে যেতাম।

যা খাদ্য খাও ও ব্যায়াম কর তা কেবল প্রথম স্তরের শক্তিকে সাহায্য করে। কেবল খাদ্যই শক্তির উৎস নয়। এটা একটা সাধারণ ভুলধারণা যে কেবল খাদ্যই তোমাকে শক্তি দেয়। খাদ্য শক্তির একটা উৎস, ব্যাস।

তিব্বতে যোগীরা কিছু খান না। তাঁরা কেবল বেলফলের খোলে জল খান। আমি সেইভাবে ছয় মাস হিমালয়ে ছিলাম। আমি শক্তি পেতাম সূর্য থেকে, স্নান করার সময় জল থেকে, শ্বাস নেবার সময় বাতাস থেকে। এগুলি সব যৌগিক প্রক্রিয়া। সমস্ত জীবন ধরে জীবনমুক্তির জন্য তপস্যা করা হয়। তা তোমার সত্তায় স্পন্দিত হয়।

যখন তুমি অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু কর, তুমি নিজের সত্তা ভুলে যাও। তুমি নিজের সত্তা সুদৃঢ় করতে ভুলে যাও - যে সত্তা কিনা তোমার অব্যবহৃত শক্তির আসল উৎস। আত্মশক্তি বিনা তোমার শারীরিক শক্তি ও বৌদ্ধিক শক্তি কোন কাজের নয়। একমাত্র যখন তুমি নিজের আত্মার শক্তি আবিষ্কার কর, তখন তুমি তোমার জীবনের উৎস ও শক্তিকে স্পর্শ কর।

প্রশ্ন : একবার ঈর্ষা ছাড়া হতে পারলে কি আমরা আমাদের ঘাটতির একটা দিক থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েছি?

অবশ্যই! যদি তুমি একটা জায়গা দেখতে পেয়েছ যেখানে ঈর্ষা ও তীব্র আবেগ ছাড়াই প্রেম থাকতে পারে , তুমি নিশ্চিতভাবে এগিয়ে গেছ। কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতনতার সাথে এগিয়ে চলতে থাক কারণ তুমি খুব সহজেই পুরানো অচেতন পথে পিছলিয়ে ফিরে যেতে পার এবং নিজেকে আবার সেই পুরানো ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে চলছ বলে দেখতে পাবে।

নতুন আবিষ্কৃত চেতনাকে আঁকড়ে থাক এবং তাকে সাথে নিয়ে চল। তাহলে অনুসন্ধান করার জন্য তোমার সামনে আরও অনেক সুন্দর প্রশস্ত পথ খুলে যাবে। নিশ্চল হয়ে যেও না। কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে বিরাট ভেবে তাদের আঁকড়ে থাকাই সবচেয়ে বড় বিপদ।

মাস্টারেরা তাঁদের শিষ্যদের কখনও নিশ্চল হতে দেন না। তাঁরা শিষ্যদের ক্রমাগত উৎসাহিত করতে থাকেন যাতে তাদের অন্বেষণ গভীর থেকে গভীরতর হয়। যারা দেব দেবীর দর্শন পায়, প্রায়ই তারা আধ্যাত্মিক পথে নিশ্চল হয়ে পড়ে। তারা ভাবে আর কিছু দেখার নেই এবং তাই তারা সেই অভিজ্ঞতাকে আঁকড়ে থেকে সেখানে পড়ে থাকে। কখনই এটা ঘটার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

নিত্য আনন্দের অবস্থায় পৌঁছানো না পর্যন্ত তুমি যে কোন সময়ে তলিয়ে যেতে পার। তাই সেটা মনে রেখ ও গভীর থেকে

গভীরতর উপলব্ধির জন্য তোমার সজাগতাকে অবিশ্রাম প্রতিপালন কর।

একটা জিনিষ বোঝ : একজন মাস্টারের কাজ কতই সূক্ষ্ম। তাঁকে তোমাদের সকলকে অনেক যত্ন ও সূক্ষ্মতা সহকারে তৈরি করতে হয়। তাঁকে দেখতে হয় কোন পথে তোমরা সবাই বিকশিত হবে এবং তোমাদের সেই পথে প্রস্ফুটিত করান। তোমরা সবাই কত জন্ম ধরে কত অজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ। তাঁকে সেই সবের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয় এবং তোমাকে জাগ্রত করতে হয়।

জীবনে অনেক সমাধান পাওয়া যায়, কিন্তু তার মধ্যে কিছু তোমার জন্য উপযুক্ত হয়। সেটাকে খুঁজে পাবার জন্যই বুদ্ধির দরকার। নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে তা খুঁজে পেলে তুমি তার উপকার উপভোগ করবে। অন্যদিকে তুমি অপরের দিকে তাকাতে থাকলে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত সমাধান নিজের ওপরে প্রয়োগ করতে শুরু করলে, তুমি নিজের রাস্তা হারিয়ে ফেলবে।

একটা ছোট গল্প :

> দূরের গ্রামে এক বৃদ্ধা তার পুরানো বাড়ী সাফ করছিল। হঠাৎ দরজা খুলে গেল ও এক সেলস্ ম্যান ঢুকে পড়ল। সে বৃদ্ধাকে ধূলা ঝাড়তে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে যে তার কাছে নানা যন্ত্র আছে যা দিয়ে বাড়ী পরি ষ্কার করা যায়।
> বৃদ্ধা বলল, 'কিন্তু...'
> লোকটি তাকে বাধা দিয়ে ব্যাগ থেকে অনেক নোংরা বার করে মেঝেতে রাখল।
> বৃদ্ধা বলতে চাইল, 'কিন্তু...'
> লোকটি তাকে পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে বলল। সে একটা মেশিন বার করে ব্যাখ্যা করতে থাকল, 'এই মেশিন দেখছেন? এটা যে কোন পরিমাণ ধূলা নিমেষে পরিষ্কার করে দেয়। এটা কত হালকা এবং আপনার এই বয়সে তা ব্যবহার করা খুব সোজা। আমাকে প্রমাণ করতে দিন।'
> বৃদ্ধা বলতে চেষ্টা করল, 'কিন্তু...'
> সেলস্ম্যান বলে, 'খালি আমায় প্লাগ-পয়েন্ট দেখিয়ে দিন।'
> বৃদ্ধা সবশেষে বলতে পারল, 'কিন্তু...আমাদের গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ আসে নি!'

জীবনে আমাদের বার করতে হবে কোন জিনিষটা আমাদের সবচেয়ে উপযোগী! যদি আমরা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট হই, আমরা কোন দুশ্চিন্তা ছাড়াই বিকশিত হব। কিন্তু বেশীরভাগ সময়ে আমরা অন্যের সমাধান লোভ করি ও তা নিজেদের জন্য ব্যবহার করি এবং পরে কষ্ট পাই।

আমরা যদি সুনিশ্চিত হই যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ও আমাদের কি প্রয়োজন, আমরা নিয়মিতভাবে এগিয়ে যাব। এমনকি এই পথে বাধা বিপত্তিও আমাদের আরও বুদ্ধি সহকারে কাজ করা শেখাবে। এইভাবে , আমরা অন্তত নিজের বুদ্ধি দ্বারা কাজ করব এবং তাই তা এক অভিজ্ঞতামূলক উপলব্ধি হবে।

তুমি অপরের সমাধান অনুসরণ করলে তোমার ভিতরে কিছুই হয় না; তুমি তখন তোমার বাহ্যসীমা থেকে কাজ করছ। যখন তোমার ভিতরে কিছুই হয় না, তুমি প্রসারিত হতে পার না; সেটা মনে রেখ। যখন আমি বলছি যে তুমি প্রসারিত হচ্ছ না, তার মানে তোমার অন্তরের বিকাশ ঘটছে না। বস্তুগত লাভ হতে পারে, কিন্তু তুমি ভিতরে মৃতবৎ থেকে যাও।

মনে রেখ যে কেবল যখন তুমি ভিতর থেকে বিকশিত হও, তুমি সত্যি সত্যি বিকশিত হচ্ছ। বহির্জগতের দৌড়ে বিপজ্জনকভাবে জড়িয়ে যেও না। তাদের নিছক খেলা বলে দেখ এবং তাদের ভাল করে খেল। বেঁচে থাকার জন্য বস্তুগত লাভ দরকার, কিন্তু এইসব যেন কেবল বাহ্যসীমায় থাকে। তোমার অন্তঃস্থল যেন নিয়মিতভাবে বিকশিত হয়। এটাই তোমাকে বাইরের খেলায় গাইড করবে।

তোমার অসীম বুদ্ধিকে আবিষ্কার করার প্রক্রিয়াই জীবন। তাই আমি সবসময়ে বলি , 'জীবন এক পথ, কোন লক্ষ্য নয়।' তোমার বুদ্ধি বিকশিত হতে থাকলে তুমি আরও হর্ষোৎফুল্ল হবে এবং জীবনের খেলা আর ও কার্যকরভাবে খেলতে পারবে। তাই তুলনা করা বন্ধ কর এবং আবিষ্কার করা আরম্ভ কর - সেটাই তোমার আসল বিকাশের উৎস।

বিশুদ্ধি চক্র উচ্চতর সৃজনশীলতার পীঠ। এই চক্রের শক্তি উন্মুক্ত হলে, দেখবে যে সৃজনশীলতার এক প্রচণ্ড প্রবাহ তোমার কাছে লভ্য হয়েছে।

তুমি যখন তোমার সত্তার গুণমান পরিবর্তন কর, স্বভাবত তোমার 'ক্রিয়া'-র গুণমানও পরিবর্তিত হয়। তুমি যাই কর, আরও বেশী দক্ষতার সাথে কর, আরও বেশী সৃজনশীলতার সাথে কর। এর ফলে, তোমার 'ভোগ'-র গুণমানও বদলে যায়। তোমার পথে যা আসে তাতেই তুমি খুশী হবে এবং তুমি দেখবে যে বস্তুগত ধনসম্পদ ও সফলতা তো মার দিকে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

তাই তুলনা করা ছাড় এবং তোমার সত্তায় ফিরে যাও এবং আবিষ্কার কর শাশ্বত চিরন্তন আনন্দ , নিত্যানন্দ।

এখন আমরা একটা ধ্যান প্রক্রিয়া করি যাকে বলা হয় 'শক্তি-সাগর।' এটা তোমাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝাবে যে বিশুদ্ধি চক্র দ্বারা তোমাতে উপলব্ধ অসীম শক্তির উৎসকে কিভাবে আহরণ করা যায়।

আবেগ : তুলনা এবং ঈর্ষা
চক্র : বিশুদ্ধি চক্র
অবস্থান : কণ্ঠস্থান

সংস্কৃতে বিশুদ্ধি মানে 'শুদ্ধ ও অশুদ্ধের উর্ধ্বে।' নাম থেকে বোঝা যায় যে এই চক্র অশুদ্ধ হতে পারে না এবং তাই শোধন করার কখনও প্রয়োজন নেই। তাই 'তুলনা' যা এই চক্রকে তালাবদ্ধ করে, তা যেন এক বস্তু বিনা ছায়া। তুলনা নামক ধারণার কোন ভিত্তি নেই। এটা কেবল আমাদের কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট।

এই চক্র তুলনা ও ঈর্ষা দ্বারা তালাবদ্ধ। এটা প্রস্ফুটিত হয়, যখন অপরকে ঈর্ষা না করে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রদর্শন করি এবং আমাদের ক্ষমতা, অনন্যতা ও সৃজনশীলতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি।

নিজের অনন্যতা ও শক্তির অসীম ভাণ্ডার উপলব্ধি করার জন্য ধ্যান প্রক্রিয়া :
শক্তি-সাগর ধ্যান - জেন্ বৌদ্ধদের প্রক্রিয়া।

শক্তি-সাগর ধ্যান

(পুরো সময় : ৩০ মিনিট)

শক্তি-সাগর ধ্যান জেন্ বৌদ্ধদের থেকে নাওয়া। এই ধ্যানের মূলকথা হ'ল, মনকে বিশুদ্ধি চক্রে নিবদ্ধ রেখে শরীর চালানো।

চোখ বন্ধ করে দাঁড়াও এবং বিশুদ্ধি চক্রে কেন্দ্রিত হও। চেয়ারের পিছনে দাঁড়াও বা অন্য কোন সাহায্য নাও ও তাকে ধর (যদি দরকার হয়) এবং ধীরে ধীরে হাঁটতে থাক, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে সেই একই জায়গায় খুব ধীরে হাঁট।

এবার ক্রমশ বেগ বা গতি বাড়াতে থাক। একই জায়গায় তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাক। নিজেকে কোন কষ্ট না দিয়ে যতটা পার জোরে হাঁট। কখনও বেশী জোর করতে যেও না। সর্বদাই বিশুদ্ধি চক্রে নিবিষ্ট থাক। তুমি সেখান থেকে শক্তি আসছে বলে অনুভব করতে সমর্থ হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল হাঁটার বেগ যেন কখনও মন্দীভূত না হয়। যে বেগে জগিং করছ (এক জায়গায় দৌড়াচ্ছ) তার থেকে দ্রুততর হবার চেষ্টা কর কিন্তু মন্দীভূত হয়ে যেও না। ২০ মিনিট পরে থাম।

পরের ১০ মিনিট, যেখানে আছ শান্ত হয়ে বসে পড়। চোখ বন্ধ রাখ এবং বিশুদ্ধির দিকে ফোকাস রাখ। শরীর চালানোর সময় যে শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল, তা তুমি আত্মভূত করবে। যখন সেটা কর, মহাজাগতিক শক্তি বিশুদ্ধি চক্র দিয়ে প্রবেশ করে এবং তা তোমার কাছে এক বিশাল শক্তির ভাণ্ডার হয়ে যায়। এই ধ্যান করার সময় তুমি তোমার মালা গলার চারপাশে পড়তে পার। যে শক্তি তুমি এই ধ্যান করার সময় সৃষ্টি কর, তা মালাতে সঞ্চিত থাকবে।

ধন্যবাদ। আমাদের পরের সেশনে দেখা হবে।



অষ্টম অধ্যায়

আমিত্বকে মুছে ফেল

গম্ভীরতা হ'ল আমিত্ব

গাম্ভীর্য বা গম্ভীরতা কি?

গম্ভীরতা আর কিছুই নয়, বাকীদের অবজ্ঞা করে নির্দিষ্ট কিছুকে অন্যায্য গুরুত্ব দেওয়াই গম্ভীরতা। পুরো জীবন একটি নাটক যেটা প্রতিটি মিনিটে উন্মোচিত হয়ে চলেছে - এই সত্য অনুধাবন করতে না পারার অক্ষমতা থেকেই গম্ভীরতা উদ্ভূত হয়। জীবন থেকে অতি প্রত্যাশা করার ফল গম্ভীরতা।

একটা ছোট গল্প :

> দুই বালক সমুদ্রতীরে বালির দুর্গ বানাচ্ছিল। তারা হঠাৎ ঝগড়া শুরু করে এবং একটা ছেলে রেগে গিয়ে বালুর দুর্গ ভেঙ্গে দেয়। অন্য বালকটি রাজাকে গিয়ে নালিশ করল।
> কেবল বালুর দুর্গের জন্য এত কিছু হচ্ছে দেখে রাজা হাসতে আরম্ভ করল। কিন্তু রাজার পরামর্শদাতা, একজন জেন্ সাধু, রাজাকে দেখে হাসতে লাগলেন।
> তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি তো পাথরের দুর্গের জন্য কত যুদ্ধ করেন ও রাত্রের ঘুম নষ্ট করেন; তাহলে বালির দুর্গের জন্য ছেলেদের লড়াই দেখে হাসছেন কেন?'

যদি বাস্তবিক দেখতে পার, আমাদের সমস্ত গম্ভীরতা বালির দুর্গের জন্যই! ছোটদের জন্য কম বয়সে বালুর দুর্গ মূল্যবান বলে মনে হয় আর বড় হলে পাথরের দুর্গ মূল্যবান হয়ে যায়, ব্যাস। দুর্গ বালির হোক কি পাথরের হোক, দুটোর জন্য গম্ভীরতা একই; কেবল গম্ভীরতার বস্তু পৃথক। তাই বাচ্চারা বালুর দুর্গ নিয়ে ঝগড়া করলে হেসো না।

গম্ভীরতা তোমার মনকে জীবনের উন্মুক্ততা ও স্বাধীনতা থেকে বন্ধ করে রাখে। তা তোমাকে ভোঁতা ও মৃত বানিয়ে ফেলে। গম্ভীরতা তোমার চিন্তায় লাগাম দেয় এবং তোমাকে চেনা পরিচিত ছকে বা প্যাটার্নে আটকে রাখে। তা তোমায় অহংবাদী করে তোলে।

> একটি জেন্ আখড়ায় শিষ্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছিল যে কার বাগান কত সুন্দর।
> একজন শিষ্য খুব গম্ভীর ধাঁচের। সে প্রতিযোগিতাকে খুব গম্ভীরতার সাথে নিল। সে বাগান সর্বদাই পরিষ্কার রাখত। তার বাগানের সমস্ত ঘাস একই সাইজের। সমস্ত ঝোপ সুন্দরভাবে ছাঁটা। সে প্রথম পুরষ্কার পাবার জন্য সুনিশ্চিত।
> প্রতিযোগিতার দিন মাস্টার সমস্ত বাগানে গেলেন ও ফিরে এসে সবাইকে র‍্যাঙ্ক দিলেন। এই শিষ্যটির বাগান সবচেয়ে নীচের র‍্যাঙ্ক পেল। সবাই অবাক।
> শিষ্যটি মাস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'মাস্টার, আমার বাগানে কি সমস্যা? আমাকে সবচেয়ে নীচের র‍্যাঙ্ক দিলেন কেন?'
> মাস্টার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যেখানে সমস্ত পাতাগুলি মরা?'

বাগানকে এইভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে যে সেটা জীবন্ত নয়! সেটা মৃত।

গম্ভীরতা সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে। তা স্বতঃস্ফূর্ততা ধ্বংস করে।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে তুমি যখন কোন কাজ খুশী হয়ে ও হালকা হয়ে কর, তোমার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা স্বতশ্চলভাবে বেড়ে যায়। একই কাজ গম্ভীরভাবে করলে তা তোমার মনকে ভোঁতা করে দেয়।

আমাদের সব গম্ভীরতাই ব্যাধি। যখন আমি বলছি 'সব', আমি বোঝাচ্ছি 'স---ব।' আমাদের সব ব্যাধি গম্ভীরতা থেকেই উৎপন্ন হয়। গম্ভীরতা জন্ম দেয় ব্যাধির এবং ব্যাধি জন্ম দেয় গম্ভীরতার।

এক রাতে একজন আমায় ফোন করে ও কাঁদতে শুরু করে।

সে বলে, 'আপনার পায়ে পড়ি, স্বামীজী! দয়া করে আমায় সাহায্য করুন। আমি খুব বিষাদে আছি। আমি আমার জীবনকে শেষ করতে চলেছি!' আর সে বলেই চলে।

আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম এবং শেষে বললাম, 'কাল সকালে আশ্রমে এস এবং কিছু সময় আমার সাথে কাটিয়ে যাও না কেন? দেখা যাক কি করা যায়।'

সে উত্তর দিল, 'আগামীকাল স্বামীজী? ও...কালকে আমাকে অফিসে যেতে হবে। ...আমি পরের সপ্তাহ-শেষে আসব?'

আমরা বেশীর ভাগই এরকম : নিজেদের তথাকথিত সমস্যায় অহেতুক উদ্বেগিত। কেবল একটা ধাক্কাই যথেষ্ট ও গম্ভীরতা চলে

যাবে। আমরা যখন বাস্তবে জাগ্রত হই, আমারা দেখি যে আমাদের সমস্যাগুলি আসলে কতই তুচ্ছ।

যখন তুমি কোন কিছু খুব গম্ভীরভাবে কর, যখন তুমি ফল সম্বন্ধে খুব উদ্বিগ্ন থাক, তখন তুমি নিজেকে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় কাজ করতে দিচ্ছ না।

অবশ্যই তোমাকে পরিকল্পনা করতে হবে, তোমাকে আগে চিন্তা করতে হবে, কিন্তু আন্তরিকতার সাথে, গম্ভীরতার সাথে নয়। গম্ভীরতা আর আন্তরিকতা এক নয়। আন্তরিকতা হ'ল কাজটিতে উৎসাহ ও তারুণ্য সহকারে নিবিষ্ট হওয়া। আন্তরিকতা হ'ল, ফলের জন্য অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন না হয়ে, সাধ্যমত সবচেয়ে ভাল করে কাজটি করা।

যখন তুমি গম্ভীর, তুমি উপভোগ কর না; তুমি হাস না। গম্ভীর থাকলে তুমি কিভাবে হাসবে? হয় তুমি গম্ভীর, অথবা তুমি হাসছ। তোমার দুটো একসাথে হ'তে পার না কারণ গম্ভীর শব্দটির সংজ্ঞা সেভাবেই হয়।

কিন্তু আন্তরিক হ'লে, তুমি হাসবে ও ক্রীড়াপরায়ণ থাকবে। তুমি ক্রীড়াপরায়ণ ও হর্ষোৎফুল্ল অবস্থায় কাজ করতে থা কবে এবং আন্তরিকভাবে কাজ সুষ্ঠভাবে সমাপন করবে!

আন্তরিকতার সাথে কোন উদ্বিগ্নতা নেই, কেবল প্রবল উৎসাহ আছে।

যখন তুমি গম্ভীর, তুমি অহংবাদী, কারণ তুমি পুরো জিনিষটাকে একটা মহাজাগতিক খেলা বলে দেখতে সমর্থ হও না। তুমি ভাব তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে ... সেটাই তো 'আমি'-র জন্য যথেষ্ট এবং তাই তুমি গম্ভীর। যদি তুমি বোঝ যে এই পুরো ব্যাপারটাই একটা নাটক, তুমি কখনই গম্ভীর হবে না। যখন এই বোধ একটা গভীর স্তরে হয়, মহাজাগতিক নাটক বা অস্তিত্বের সাথে ঐকতানে চলার জন্য তুমি পূর্ণ আনন্দে কাজ করতে থাকবে।

কালানুক্রমিক পরিকল্পনা বনাম মনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা

তুমি দ্যাখো, দুই প্রকার পরিকল্পনা আছে : কালানুক্রমিক পরিকল্পনা ও মনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা।

কালানুক্রমিক পরিকল্পনা সময়ের মাপদণ্ডে হয়। তুমি ঠিক করলে যে তুমি এতটার সময় উঠবে, নির্দিষ্ট সময়ে সকালের রুটিন কাজ শেষ করবে, নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে পৌঁছাবে এবং সেইদিন অফিসে কি কি কাজ শেষ করবে। এসব ঠিক আছে। এটা সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়ার জন্য তোমার কাজ গুছিয়ে নাওয়ার প্রায়োগিক পদ্ধতি। এই প্রকার পরিকল্পনা ও তার সাথে আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করলে, তুমি আনন্দ থেকে আরও আনন্দে চলে যাবে।

অন্যদিকে স্থান-কালের সাথে প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা মস্তিষ্কতে হয়। কালানুক্রমিক পরিকল্পনা ছাড়া, নিছক গম্ভীর এই পরিকল্পনা তোমার মস্তিষ্কে অবিশ্রাম হয়ে চলেছে। এটা কেবল ইতঃপূর্বে হয়ে যাওয়া কালানুক্রমিক পরিকল্পনাতে জটিল নকারাত্মকতা ঢুকিয়ে দেওয়া। এটা তোমাকে মনে করায় যে তুমি গম্ভী র, রাশভারী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। কিন্তু তুমি আসলে একটি ভোঁতা অবস্থায় চলে যাচ্ছ কারণ তোমার সকল শক্তি বারংবার একই পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

মনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা তোমার আমিত্বকে বৃদ্ধি করে। তা তোমাকে মহান ও উপযুক্ত মনে করায়। তা তোমাকে মনে করায় যে তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিরাট কাজ করছ। কাজে উদ্বিগ্ন হওয়া ও তা সম্পন্ন করা, সব তোমারই হাতে পুরোপুরি আছে বলে তা মনে করায়। এটা মনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা।

এটা প্রকৃতপক্ষে আনন্দকে স্থগিত রাখার পন্থা, জীবনকে স্থগিত রাখার পন্থা, যেন বিশেষ কিছু ঘটার পরেই জীবন উপভোগ করা শুরু করবে।

আমরা সর্বদা ভাবি, বিয়ে করলে আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই বিয়ে করার জন্য কাজ করা যাক।
আমার দুটি সন্তান হলে জীবন পূর্ণ হবে।
রিটায়ার বা অবসর করলে শান্তি পাব।

এই মনোভাব হ'ল : 'এখন আমি গম্ভীর, পরে আমি সুখী হব!'

সবশেষে, তুমি এখন বা পরে, কখনও খুশী হলে না। তুমি যে কোন সময়ে খুশী হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেল।

কেবল সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও নিষ্পাপতার সাথে সজীব থাক, তা নিজেই কার্য সম্পাদন করবে।

পূর্ণতার জন্য উদ্যমী হও, নিখুঁত হবার জন্য নয়

নিখুঁত হবার জন্য বেশী প্যানপ্যান কোরো না। আমি বলছি : নিখুঁত হবার মানসিকতা তোমাকে বাতিকগ্রস্ত করে তুলতে পারে। যাই কর, সমগ্রভাবে কর, সম্পূর্ণতার সাথে। তাহলে স্বতশ্চলভাবে, তুমি নিখুঁত হবার জন্য কখনও উদ্বিগ্ন হবে না।

নিখুঁত হওয়া ব্যাপারটা তোমার মন থেকে আসে। তা তোমার লক্ষ্য হয়ে যায়। তুমি তার দিকে লক্ষ্য হিসাবে কাজ কর। আর যখন তুমি তার দিকে লক্ষ্য হিসাবে কাজ কর তা মৃত ও নীরস হয়ে যায়। কিন্তু যখন তুমি সম্পূর্ণ থাক তখন তুমি তোমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাক ও তা এক গভীর অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। পরিণতি সুন্দর হবেই এবং তা তোমাকে আনন্দ দেবে। তাহলে যা কিছু করবে, তুমি অস্তিত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে।

নিখুঁত হবার মানসিকতা কখনও আনন্দ দেয় না; তা কেবল তোমার আমিত্বকে তৃপ্ত করে। যদিও তুমি শেষে তৃপ্ত মনে কর, তা কেবল তোমার আমিত্বের তৃপ্তি, সত্ত্বার পরিতৃপ্তি কখনও নয়। পরিষ্কার করে বোঝ যে যাদের নিখুঁত হবার বাতিক আছে, যারা নিখুঁতবাদী, তারা সবচেয়ে বড় আমিত্ববাদী। তারা পূর্ণ হবার মাত্রা হারিয়ে ফেলে। সম্পূর্ণতা সম্ভব যখন তুমি তাতে তোমার সত্তা থেকে গভীরভাবে প্রবেশ কর। নিখুঁত কখনই হওয়া যায় না কারণ সেটা মনেতে আছে এবং তোমার মন নিখুঁত হবার মাপকাঠি পরিবর্তন করতে থাকে।

আবার, ভুল করার সাহস রেখো। গম্ভীর লোকেরা ভুল করতে ভয় পায়। তারা নিজেদের ভীষণ গুরুতররূপে নেয়। তারা নিজেদের সম্বন্ধে খুব বেশী বেশী ভাবে। ভুল করা এবং কারো দ্বারা ভুল ধরিয়ে দেওয়া, ভীষণ ব্যাপার। আসলে যে মানুষগুলি ছোট ছোট ভুল করার জন্য ভয় পায়, তারা শেষে সাংঘাতিক ভুল করে বসে!

ভুল করায় বেঠিক কি? তুমি বলবে, 'স্বামীজী, আমি কাজে কোন ভুল করার ঝুঁকি নিতে পারি না; তাই আমি এত গম্ভীর।' তা তোমার কথা সত্যি হতে পারে; তোমার কাজ তোমাকে হয়ত ভুল করতে অনুমতি দেয় না, কিন্তু আমি এখানে সেই কথা বোঝাচ্ছি না। যখন তুমি ভুল কর, লোকেরা সেটার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করবে এবং তুমি সেটা সহ্য করতে পার বে না। তোমার আমিত্ব আঘাত পাবেই এবং তুমি সে ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল; তুমি এটা জান। তাই তোমার আমিত্বকে আঘাত না দেবার জন্য, তুমি ভুল না করার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হও!

এরকম অচেতনভাবে একটানা তুমি আমিত্বকে প্রহরা দেবার পরিকল্পনা কর। কিন্তু যে কারণ তুমি দেখাও, তা আলাদা। তুমি মিথ্যা বলছ তা নয়। তুমি আসলে তোমার প্রণালী কত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে তা জান না। কিন্তু যদি তুমি গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর ও দেখ, আমি কি বলছি তা বুঝতে পারবে।

ভুল করায় বেঠিক কিছুই নেই। আসলে কয়েকটা ভুল করে তুমি বুঝতে পারবে যে ভুল করা কিভাবে এড়িয়ে চলা যায়। ভু ল করা থেকে যত শেখ, ততই তুমি জানতে পার ভুল না করে কিভাবে করা যায়।

ভুল কিভাবে না করতে হয় জানা একটা জরুরি ব্যাপার। একমাত্র তাহলেই তুমি তার দুই দিক দেখেছ; একমাত্র তাহলেই তার দুটি দিকের অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা পেয়েছ। নয়ত সংকটপূর্ণ সময়ে এক অজানা জায়গায় পতন ঘটার বি পদ থেকে যায়, তার ঝুঁকি তুমি নিতে পার না।

যাই হোক, একই ভুল পুনরায় কোরো না! তোমার মন সর্বদা নক্শা বা ছক পুনরাবৃত্তি করে। ভুল করেও সেটা কোরো না। নতুন ভুল কর! এবং আরও ভাল উপলব্ধির জন্য এগিয়ে চল!

আমি ইচ্ছাকৃত ভুল করার কথা বলছি না। সেটা আবার বোকামি। আমি কেবল বলছি যে, ভুল হতে পারে বলে উদ্বেগিত না হয়ে প্রবল উৎসাহ ও বুদ্ধি সহকারে কাজ কর। যেই মুহূর্তে ভুল হতে পারে বলে দুশ্চিন্তা কর, আসলে তখন তুমি তোমার আমিত্ব আঘাত পেতে পারে বলে উদ্বেগিত।

যখন তোমার আমিত্ব আঘাত পাবে বলে উদ্বেগিত নয়, তখন তুমি যে কোন প্রকার লাফ দেবার জন্য সাহস পাবে। তোমার সমস্ত তথাকথিত উদ্বেগ হ'ল তোমার আমিত্বে আঘাত লাগার বিষয়। এর থেকে মুক্ত হলে তুমি আরও বেশী স্বাধীনতা ও সাহস অবলম্বনে কাজ করবে। তুমি পরীক্ষা করার জন্য আরও ইচ্ছুক হবে।

একটা ছোট গল্প :

> একজন একটা ক্লাব্হাউসে তাস খেলা শেষ করে চলে যাচ্ছিল। সে তার কোট রাখার জায়গায় গিয়ে কোট পরছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা বিনম্র আওয়াজ পিছন থেকে এল, 'স্যার, আপনি কি মিস্টার ফিলিপ?'

লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'না।'
বিনম্র আওয়াজ বলে চলে, 'ভগবানের অপার করুণা। আমি ফিলিপ এবং ঐ কোটটা আমার।'

আমাদের ভুল হতে পারে বলে ও নিজের আমিত্ব আঘাত পেতে পারে বলে, আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। তাই নিছক নিশ্চিত হবার জন্য আমরা সহৃদয়তার সাথে সাবধানে চলি। এগুলি কিছুই নয় , কেবল অক্রিয় (passive) আমিত্ব। তোমার আমিত্ব আঘাত পাবে বলে এতই ভয় পাও যে তুমি এই প্রকার ব্যবহার কর। আমিত্বের সব প্রহরা সরিয়ে ফেল এবং স্বাধীন হয়ে চল।

গম্ভীরতা থেকে সরে যাও। যে কোন ভাবেই হোক আমরা আধ্যাত্মিকতার সাথে গম্ভীরতা সংশ্লিষ্ট করি। এটা একটা বড় ভ্রান্তধারণা। গম্ভীরতা কখনও ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা হতে পারে না।

তোমাদের কি মনে হয়, আমি তোমাদের সাথে এত রসিকতা কেন করতে থাকি বা এত এত ছোট গল্প কেন বলি? যদি আমি এসব না বলি, তোমরা গম্ভীর হয়ে যাবে এবং তোমরা গম্ভীর হ'লে মৃত ও ভারী হয়ে যাও। তোমরা সতেজ ও হাল্কা থাকবে না। আমি তো এখানে তোমাদেরকে ভারী করার জন্য আসি নি।

আমি এখানে তোমাদেরকে খালি এবং হালকা করার জন্য আছি। আমি এখানে আছি তোমাকে দেখাবার জন্য যে তোমার গম্ভীরতা আসলে কিছুই নয় এবং সেটা তোমার আমিত্বের একটা রূপ।

যারা অতীত ও ভবিষ্যতের দ্বারা ভারাক্রান্ত, তারা সবাই গম্ভীর। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসতে জানে না। অতীত ও ভবিষ্যতকে বহন করা একটা কর্তব্য বলে তারা মনে করে এবং তাতে বিরাট গাম্ভীর্য সহকারে নিমজ্জিত হয়। এটা একটা বিরাট আমিত্ব-পূর্ণ মনোভাব। তারা ভাবে যে তারা এটা না করলে, তা করার অন্য কেউ জন্য নেই।

অতীত ও ভবিষ্যতকে বহন করার কোন দরকার নেই। কেবল বর্তমানে থাক, তাহলেই যথেষ্ট। এই গম্ভীর মানুষগুলি বর্তমানকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলছে। তাদের জীবনে তারা হাসি হারিয়ে ফেলছে।

হাস এবং তোমার আমিত্বকে চলে যেতে দাও

হাসি তোমার সত্তা থেকে এক ঝলক শক্তি শরীরে নিয়ে আসে ও তোমার পুরো সত্তাকে নবতেজোদ্দীপ্ত করে। হাসি অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে বেশী নিরাময় করতে পারে। হাস্য তোমাকে বর্তমানের সুন্দর ঝলক দেখায় যা তুমি নানা ধ্যান-প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাপ্ত করার চেষ্টা কর। হাসি সবচাইতে শক্তিশালী ধ্যান-প্রক্রিয়া।

হাস্য এক খুব বড় বৈশিষ্টপূর্ণ আধ্যাত্মিক গুণ। আন্তরিকতা ও হাস্য সর্বদাই একসাথে চলে। আমি আগে বলেছি , গম্ভীরতা ও হাসি কখনও একসাথে থাকতে পারে না। হয় তুমি গম্ভীর অথবা তুমি হাসছ। আন্তরিক হলে তুমি হাসতে পার এ বং আন্তরিকতার সাথে তোমার কর্তব্য করতে পার।

আমরা ক'জন পুরো হৃদয় দিয়ে হাসতে পারি? এমনকি হাসিতেও আমরা নিয়ন্ত্রণ রাখি! তথাকথিত সামাজিক আদবকায়দা আমাদের মার্জিতভাবে হাসতে শিখিয়েছে। যখন বাচ্চারা হাসে, আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করি। তাদের হাসিতে আমরা ঠাণ্ডা জল স্প্রে করি। আমরা তাদের বলি, 'হয়েছে, এখন অনেক হয়েছে!' এমনকি তাদের হাসিও আমরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি।

আমি মায়েদের মেয়েদের বলতে শুনেছি, 'পুরুষের মত হেসো না; মেয়েদের মত হাসো।' তুমি কিভাবে হাসি অভ্যাস করবে? হাসি তো তোমার সত্তা থেকে আসে। আমি বলছি, বাচ্চাদের নিয়ন্ত্রণ ক'রে তুমি তাদের ঠিক তোমার মত ভোঁতা ও মৃত বানিয়ে ফেল। তাদেরকে তোমার অবিকল প্রতিরূপ না বানিয়ে তুমি ছাড় না।

এই বছর আমেরিকাতে কয়েকটি বাচ্চার সাথে কিছু সময় কাটাই। আমি প্রায় এক ঘন্টা তাদের সঙ্গে ছিলাম ও মিথস্ক্রিয়া করছিলাম। আমি এত অবাক হলাম যে আমি তাদের সাথে যতই রসিকতা করি না কেন তারা হাসেই না। বাচ্চারা আজকাল কৃত্রিম পরিপক্বতা দেখায় এবং নিজেদের জীবন থেকে হাসি বাদ দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলে । যদি ছোটবেলায় হাসতে না পার, বড় হয়ে কি করবে? তাদের দেখে আমি খুব ব্যাথা পেয়েছিলাম।

লোকেরা বলে যে আমার হাসি সাংক্রামিক। সেই বাচ্চাগুলির সাথে প্রথমবার মনে হল আমার হাসি সংক্রামক নয়! তারা মুখে এক প্রকার পরিপক্বতা নিয়ে আমার দিকে কেবল তাকিয়ে ছিল। তারা আমাকে গম্ভীর করে দিতে পারে, এই ভয়ে আমি তাদের ছেড়ে চলে গেলাম!

দ্যাখো, পরিপক্বতার সাথে তুমি কিভাবে হাস তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যে ক রেই হোক আমরা ভাবি যে পরিপক্ব হলে

আমাদের স্বতশ্চলভাবে কম হাসা উচিৎ।

হাস্য একটা এমন তেজ যেটা তোমার অন্তঃকরণ থেকে শক্তিকে তোমার বাহ্যদেশে নিয়ে আসে। তুমি যদি আমার সেশন্ গুলিতে বস, বেশীরভাগ সময়ে হাসিই হবে। কিছু জোক বলা হবে অথবা কিছু গল্প বলা হবে এবং সবাই হাসতে থাকবে। আমি কখনই গম্ভীরতাকে আরম্ভ হতে দিই না। এমনকি যারা আশ্রমে থাকে, তাদের মধ্যেও কখনই গম্ভীরতা আসতে দিই না।

একটা ছোট গল্প :

> একজন খুব রসিক বক্তাকে শহরে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত করা হয়। সে তার প্রোগ্রামে বিরাট দলবল নিয়ে এল। সংগঠকেরা বক্তার সাথে এত লোক দেখে অবাক।
> বক্তা তাদের অবাক মুখগুলি দেখে ব্যাখ্যা করে বলল, 'আজকাল মানুষকে হাসানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি আমার নিজের শ্রোতাদের নিয়ে ঘুরি।'

তথাকথিত অভিজাত সমাজে লোকেরা হাসবে, কিন্তু মার্জিত ও আচারনিষ্ঠভাবে। সেটা আসল হাসি নয়; সেটা মৃত হাসি। হাসিকে কখনও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যদি তা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা হাসি নয়; এটা সেই ধ্যানরত হাসি নয় যার কথা আমরা আলোচনা করছি। এটা নিছক ভিতরের আমিত্বের একটা প্রকাশ, ব্যাস।

রসিকতা করা হলে বা জোক বলা হলে কেন হাস তা বিশ্লেষণ করলে তুমি বুঝবে : প্রথমে কতগুলি যুক্তিদ্বারা সংযুক্ত কথা তোমায় বলা হ'ল। তুমি যখন সেই তৈরি করা যুক্তি আঁকড়ে আছ, তখন পাঞ্চ-লাইন বা আসল শেষ বাক্যটি বলা হ'ল এবং তোমার যুক্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল! যে মুহূর্তে তোমার যুক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়, তোমার মনও চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং তুমি এক মনবিনা অবস্থায় বা 'সাতোরি'-তে চলে যাও। তুমি তখন বুদ্ধ হলে!

যখন তুমি মনবিনা অবস্থায়, তখন তুমি বর্তমানে। হাসলে তুমি বর্তমানে আছ কারণ হাসলে তুমি মনবিনা অবস্থায় চলে যাও। যখন তুমি চিন্তাহীন অবস্থায়, তুমি বর্তমানে আছ। যখন তুমি চিন্তার সাথে আছ, তুমি হয় অতীতে অথবা ভবিষ্যতে।

হাসি হ'ল সম্পূর্ণ এবং তা তোমাকে সহজেই নিরাময় ও রূপান্তরিত করতে পারে। এটা মানুষের জন্য সহজপ্রাপ্য সবচেয়ে ভাল ওষুধ।

জীবন এত মূল্যবান যে তাকে নীরস ও অলস মুহূর্তগুলিতে অপচয় করা ঠিক নয়। হাস এবং তোমার জীবনে শক্তি ও আনন্দ ঢেলে দাও। যে কাজই তুমি কর না কেন, অবিশ্রাম আনন্দ করার সিদ্ধান্ত নাও। আন্তরিক হও, গম্ভীর নয়।

যখন তুমি হাস তুমি চারদিকে এক শক্তি সঞ্চার কর এবং তা সংক্রামক; তুমি চারপাশে এক আনন্দ ছড়িয়ে দাও যা নিরাময় শক্তিতে (healing energy) পূর্ণ। একইভাবে একজন মানুষ খারাপ মেজাজ নিয়ে এলে, সে তার চারপাশে সেই প্রকার মেজাজ বিকিরণ করে এবং তাতে আশেপাশে লোকজনদের প্রভাবিত হবার খুব সম্ভাবনা থাকে। আমি ডাক্তারদের সর্বদাই কিছু বিশোধক ধ্যান করতে বলি, কারণ তারা সারাক্ষণ রোগীদের সাথে আছে যারা নানারকম নকারাত্মক চিন্তা ও রোগ নিয়ে আসে।

প্রশ্ন : কিন্তু হাসার জন্য তো আমাদের একটা কারণ চাই। কৌতুকপূর্ণ কিছু না পেয়ে আমরা কিভাবে হাসার সিদ্ধান্ত নেব?

আমরা সর্বদাই ভাবি যে আমাদের হাসার জন্য একজন কমেডিয়ান অথবা কোন জোক বা রসিকতা চাই। বর্তমান মুহূর্তে বাস করা শুরু করলে তোমার অস্তিত্ব সুন্দর ও হালকা হয়ে উঠবে। তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস, শরীরের ভিতরে খাদ্য রক্তে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া, অস্তিত্বে সমলয়ে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকা; সবই কতই না সুন্দর হবে। তুমি কতই না আনন্দ অনুভব করবে এবং তুমি সর্বদা সহাস্যে থাকবে। তোমার সম্পূর্ণ সত্তা হাস্য এবং আনন্দ ঝরাতে থাকবে।

রসিকতায় হাসা ঠিক আছে, কিন্তু অস্তিত্বের সাথে সুর মেলালে তুমি এই বিরাট মহাজাগতিক নাটক কেবল উপভোগ করবে এবং সবকিছুতেই হাসবে। তখন গম্ভীরতার কোন স্থান নেই, আমিত্বের কোন জায়গা নেই। তুমি আর কঠিন নও। তুমি বহুরন্ধ্র (porous) ও কৌতুকপূর্ণ হয়েছ। তখন তুমি অস্তিত্বের খেলা সম্পর্কে এক গভীর উপলব্ধি তৈরি কর এবং তুমি হাস।

তুমি দেখতে সক্ষম হও যে প্রত্যেকেই কেবল এক অভিনেতা যে তার ভূমিকা সম্পর্কে কত গম্ভীর বা রাশভারী হয়ে পড়েছে এবং তুমি তাতে হাস। এই অভিনয়ের সময় একে অপরকে কিভাবে প্রতারিত করছে দেখে তুমি হাস। তুমিও এক খেলা খেলছ বুঝে তুমি হাস! যখন তুমি হাসতে পারছ, তুমি প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছ এবং যখন প্রত্যক্ষদর্শী হ'লে, তুমি আমিত্ব, মানে 'আমি' ও 'আমার', থেকে আলাদা হয়েছ।

একটা ছোট গল্প :

> আধ্যাত্মিকতার আসল অর্থকে উদ্দেশ্য করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এক সম্মেলন হয়। প্রত্যেক সন্ন্যাসী মঞ্চে গিয়ে লম্বা লম্বা ভাষণ দিলেন।
> সবশেষে এক জেন্-সাধুর পালা। তিনি মঞ্চে গিয়ে কেবল হাসতে থাকলেন! তিনি তাঁর সত্তা থেকে হাসতেই থাকলেন। হাসি তাঁর পেট থেকে উঠছিল। তিনি হাসির সাথে ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকলেন।
> তাঁর হাসি এত সংক্রামক ছিল যে সেখানে সবাই কিছু না জেনেই হাসতে লাগল ! সব সন্ন্যাসীদের হাসি সেই স্থানে সকারাত্মক শক্তির এক বিরাট ঢেউ সৃষ্টি করল। সন্ন্যাসীরা এক অতি উচ্চ অবস্থায় পৌঁছালেন। তাদের চিন্তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের সত্তা আনন্দে ভরে গেল।
> জেন সাধু শেষে বললেন, 'এটাই আসল আধ্যাত্মিকতা।'

হাসি সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক গুণ। তা তোমাকে জীবনমুক্ত করতে পারে ! হাসি এক মহৎ নিরাময়-শক্তি। যদি তুমি তোমার রোগকে দেখে হাস, তুমি নীরোগ হবে। অস্তিত্বের শক্তির সাথে সংযুক্ত হবার জন্য হাসি এক সুন্দর উপায় । হাসি তো এক বিশুদ্ধ নিরাময় শক্তি।

আমাদের ধ্যান অনুষ্ঠানে আমরা সর্বদাই হাস্য ও নৃত্য অন্তর্ভুক্ত করি। বুদ্ধ হবার জন্য তা সবচেয়ে সহজ উপায় ! নাচ তোমাকে সরল ও হালকা করতে পারে। হাস্যের মত নৃত্যও এক সহজ এবং উপভোগ্য ধ্যান। চিন্তামুক্ত হয়ে যখন তুমি নৃত্য কর , তুমি নিজেই নৃত্য হয়ে যাও। তখন তোমার থেকে শক্তি প্রবলভাবে প্রবাহিত হয় ।

চিন্তামুক্ত হয়ে তুমি তখনই নাচতে পার , একমাত্র যদি তুমি তোমার মেকি পরিচয় থেকে মুক্ত হয়েছ। যত ক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভাব যে তুমি একজন কেউ, আনন্দে নাচতে পারবে না। নৃত্য অন্তরের আনন্দের এক বহিঃপ্রকাশ। আর আমি প্রোগ্রাম করা নাচের কথা বলছি না যেখানে কোন পদক্ষেপের পরে কোন পদক্ষেপ আসবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। আমি বলছি তোমার তথাকথিত পরিচয়কে মুছে ফেলে অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে এবং সেই আনন্দে নেচে ওঠা প্রসঙ্গে।

আত্ম-সচেতন মানুষেরা আত্মশ্লাঘী (egoist)। অন্যেরা তাদের নাচ দেখে কি বলবে তাতে তারা বিব্রত। তাই তারা চুপচাপ বসে থাকে। তারা তাদের আমিত্বকে পাহারা দেয় এবং জীবনের আনন্দকে একদম হারিয়ে ফেলে।

কখনোসখনো তোমার ঘরে কোন গান বাজাও ও তার সাথে নৃত্য কর। একদম ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাও । তা একটা গভীর ধ্যান হতে পারে এবং তা তোমাকে তোমার মনের সীমা অতিক্রম করাতে পারে এবং তোমাকে একভাবে রূপান্তরিত করবে যা কথা পারে না। স্বাভাবিক হও। অভিনব হও। যারা তোমার নাচের সমালোচনা করছে তারা তো নাচের আনন্দকে একদমই হারিয়ে ফেলছে। তাদের জন্য বিব্রত হয়ো না। কেবল দ্রবীভূত হও এবং নৃত্য হয়ে যাও। আমিত্ব ঝেড়ে ফেলার জন্য ও অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে যাবার জন্য, হাস্য ও নৃত্য সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন : আমার কখন জানতে পারব যে আমাদের আমিত্ব বা অহংবোধ আর নেই?

উত্তর : সহজভাবে বলতে গেলে, তুমি যখন নিজেকে আর আলাদা সত্তা হিসাবে অনুভব কর না , তোমার আমিত্ব দ্রবীভূত হয়েছে। যখন তুমি জীবনমুক্ত হও, তোমার আমিত্ব পরিপক্ব ও বিদূরিত হয়। তোমার আমিত্ব মুছে গেলে আগের মত আর বিরোধ করবে না এবং অস্তিত্ব তোমার মধ্য দিয়ে সহজেই প্রবাহিত হবে।

তুমি জান কি না জান, মান কি না মান, পছন্দ কর কি না কর, অস্তিত্ব প্রতিটি মিনিটে তোমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তুমি আমিত্বতে এত পূর্ণ যে তুমি তা হতে দিতে পারছ না। তুমি অস্তিত্বের সাথে সংযোগসাধন করতে অসমর্থ এবং তাই তুমি আমিত্ব, অজ্ঞান ও দুর্দশা নিয়ে বাস কর।

তুমি আমিত্বতে এতই পূর্ণ যে তুমি তোমার সত্তা থেকে অনেক দূরে বাস করছ। তোমার ভিতরে অনেক পুঞ্জীভূত জিনিষ হয়ে গেছে। তোমাকে তাদের থেকে মুক্ত হতে হবে। এক জন্ম নয় , এই জিনিষগুলি অনেক জন্ম ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে। এমনকি নিজের জন্য তোমার ভিতরে স্থান নেই! আর সেজন্য তুমি তোমার ভিতরে সত্তা থেকে না করে তোমার চৌহদ্দি বা বাহ্যসীমা থেকেই সর্বদা কাজ করে যাচ্ছ।

আমিত্ব দ্রবীভূত হলে তোমার আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। তুমি অস্তিত্বে নিমজ্জিত হও! জীবনমুক্ত মাস্টারেরা এই অবস্থাতে থাকেন। আমি প্রায়ই লোকেদের বলি, 'যা তুমি নও তা ধ্বংস কর।' লোকেরা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায়। আমার এটা বলা মানে আমি বোঝাতে চাইছি যে তুমি হলে তোমার ভিতরের সত্তা । সেই সত্তা, তুমি যা নও - সেই নানারকম সক্রিয় ও অক্রিয় আমিত্ব

দ্বারা কলুষিত। এগুলিকেই তোমার ধ্বংস করা দরকার এবং সেটাই বোঝাতে চা ইছি যখন আমি বলি, 'যা তুমি নও তা ধ্বংস কর। তোমার তখন হবে!'

তুমি অস্তিত্বের এক অংশ এবং যাই তোমাকে অন্যথা ভাবায় তা আমিত্ব। একটা মাছ , সে পছন্দ করুক কি না করুক, মানুক কি না মানুক, বিশ্বাস করুক কি না করুক, সে তো সাগরেরই অংশ। সে দুটি জিনিষ থেকে একটি বেছে নিতে পারে। সে সাগরে খুশী হয়ে বাস করতে পারে অথবা সাগরের সাথে লড়াই করে নিজের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত করে বাস করতে পারে।

যদি তুমি অস্তিত্বের সাথে প্রবহমান হও, তুমি তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবে। তুমি হবে সংবেদনশীল , সৃজনশীল ও প্রবহমান।

একটা ছোট গল্প :

> একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের চড়ুইভাতির জন্য বাইরে নিয়ে গেলেন। তারা খেলল, খাবার খেল ও আনন্দ করল।
> হঠাৎ শিক্ষক আকাশে এক সুন্দর রামধনুর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। ছোটরা বিস্ময়ে রামধনু দেখল।
> শিক্ষক তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'ঠিক আছে, চলো, এই রামধনু যিনি বানিয়েছেন সেই শিল্পীর জন্য হাততালি দেওয়া যাক।'
> ছোটরা প্রথমে কিছুক্ষণ গুলিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু তারা শীঘ্র বুঝতে পারল ও করতালি দ্বারা অভিনন্দনজ্ঞাপক তুমুল হর্ষধ্বনি করল!

ছোটদেরকে তাদের চারপাশের অস্তিত্বের সৌন্দর্যের মর্ম উপলব্ধি করার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন নতুবা তারা অস্তিত্বের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলবে এবং অহংবাদী হয়ে উঠবে। তাদের যন্ত্রবৎ ও অহংবাদী হতে দেওয়া উচিৎ নয়। তাদের বহুরন্ধ্র ও সংবেদনশীল করে গড়ে তোলা উচিৎ।

তুমি যখন অস্তিত্বের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, তখন তুমি তার নিকটে এসেছ। সম্পূর্ণ অস্তিত্বই সৃজনশীলতা। একজন সৃজনশীল ব্যক্তি তার মনের চেয়ে হৃদয়ের বেশী কাছে থাকে। তুমি যখন সৃষ্টি কর , তুমি ভগবানের নিকটে যাও। ভগবান স্রষ্টা, সৃষ্ট এবং সৃষ্টি। যখন সৃষ্টি কর, তুমি তোমার সত্তাকে প্রকাশ কর যা আস্তিত্বের গুণ। যখন তুমি সৃষ্টি কর , তুমি অস্তিত্বের প্রতি তোমার প্রেম ও আদর দেখাচ্ছ; তুমি অস্তিত্বে আরও একটু সৌন্দর্য যোগ করছ।

যখন তুমি অস্তিত্বের বিস্ময়ে পূর্ণ, তুমি সৃষ্টি করতে পার। অন্যভাবে, তুমি যখন আমিত্বে ভরপুর, তুমি সৃষ্টি করতে পার না এবং যদিও সৃষ্টি কর, তোমার সৃষ্টি হবে এক মৃত উৎপাদন। সেটা হবে এক প্লাস্টিকের গোলাপের মত, যাকে দেখতে হয়ত নিখুঁত, কিন্তু কোন সুগন্ধ ও জীবন নেই। একজন শিল্পী যখন প্রেমময় হয়ে সৃষ্টি করেন , তিনি সৃষ্টিতে এক বিশেষ গুণ প্রদান করতে পারেন। তিনি যদি অহংভাব থেকে সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টি তো মৃতবৎ হয়ে যায়।

তুমি যখন অস্তিত্বের সাথে ঐকতানে নেই , তুমি অস্তিত্বের সুরভি হারিয়ে ফেলবে। যেন সুন্দর সুরভি তোমাকে ঘিরে ফেলেছে, আর তুমি দুর্গন্ধময় আঙ্গুল দিয়ে নাক বন্ধ করছ। এটাই আমিত্ব বা অহংভাব। যখন তুমি অস্তিত্বের সুরভির অভিজ্ঞতা লাভ করেছ , তুমি তার মধ্যে সমলয় অভিজ্ঞতা করা শুরু করবে।

তুমি সমস্ত অস্তিত্বের সাথে অনুরণিত হতে পারবে। তুমি দেখতে পারবে যে প্রতিটি পাতা ও প্রশাখা হ'ল অস্তিত্ব বা ভগবানের রচিত এক অর্কেস্ট্রা। যখন তুমি এই অবস্থায় আছ, তুমি যা খোঁজ তা পেয়ে যাও, কারণ তুমি অস্তিত্বের সাথে একই সুরে বাঁধা আছ। জীবন তখন অলৌকিক হয়ে যায়! তাকে আমরা বলছি অস্তিত্বের সমলয় (synchronicity of existence)।

আর একটা জিনিষ বোঝ : তুমি যখন অস্তিত্বের সাথে অনুরণিত হও, তুমি লোভী হয়ে অন্বেষণ করবে না। সহজভাবেই অস্তিত্ব তোমাকে প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজনীয় জিনিষ দিতে থাকবে - এমনকি তুমি তা খোঁজার আগেই। এটাই আমি বোঝাতে চাই যখন আমি বলি, 'তুমি যাই খোঁজ, তাই পাবে।'

সমস্যা হ'ল আমরা অস্তিত্ব থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছি। অস্তিত্ব আমাদের উৎস এবং তা আমাদেরই গভীরে আছে। তাই এই ব্যাপারে আমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। প্রথমে চারপাশের সৌন্দর্যে গুণমুগ্ধ হয়ে ও তার গুণগান করে তুমি তোমার আমিত্ব মুছে ফেলা শুরু করতে পার । তাতে তোমার ভিতরে রূপান্তরের বীজ বপন শুরু হবে। এটা তোমাকে বোঝাবে যে তোমার আমিত্বের চেয়ে শক্তিশালী এক জীবনীশক্তি আছে যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করছে।

অস্তিত্বের কাছে যতই নিজেকে হারাও, ততই তুমি আমিত্বহীন হয়ে ওঠ। আর যতই আমিত্বহীন হও , আরও বেশী করে তুমি নিজেকে অস্তিত্বের কাছে হারিয়ে ফেল!

প্রশ্ন : বুদ্ধি দ্বারা যদিও আমরা বুঝি যে আমাদের আমিত্বকে সমর্পণ করা উচিৎ, কিন্তু আমরা তা করতে পারি না। কেন?

দ্যাখো, মানুষ কখনই সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে চায় না। সে সর্বদা কোন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চায় এবং সেই 'একটা কিছু' হ'ল তার আমিত্ব। তোমার আমিত্ব তোমার শক্তি। তুমি তাকে বহু বছর ধরে কত ভাল করে পাহারা দিয়েছ। তোমার অস্তিত্বের ভিত্তি হল তোমার আমিত্ব।

তুমি জান না যে তোমার আমিত্ব ছাড়িয়ে এক দুনিয়া আছে যেটা এখন যা অনুভব করছ তার চেয়েও অনেক বেশী আনন্দপূর্ণ। তোমার আমিত্ব তোমার কাছে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সহজ সত্য হ'ল - তোমাকে সেটা মুছে ফেলতে হবে।

এটা অনেকটা এরকম : কল্পনা কর যে একটা বীজ বপন করা হয়েছে। গাছ হবার জন্য বীজকে বিদারিত হতে হবে, তাই নয় কি? বীজ যদি ভাবে সে গাছ হবার পরে বিদীর্ণ হবে, তা কি সম্ভব? না! একই ভাবে প্রস্ফুটিত হবার জন্য, মানুষকে তার আমিত্বকে বিদীর্ণ করতে হবে। যত বেশী সময় সে তার আমিত্বকে প্রহরা দেয়, ততই সে নিজের প্রস্ফুটন স্থগিত রাখছে।

মানুষ তার মাস্টারের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত জানেই না যে সে কোথায় আটকে আছে, তার আমিত্ব তাকে কোথায় বাধা দিচ্ছে। কিন্তু একবার তার মাস্টারের সাথে দেখা হলে সে জানবে! সে রূপান্তরিত হতে পারবে। মাস্টারের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল তাঁর প্রতিটি শিষ্যের আমিত্ব মুছে ফেলা।

যখন তুমি মাস্টারের কথা ও কাজ তোমার যুক্তি দ্বারা বোঝার চেষ্টা কর তোমার কাছে তা আকস্মিক ও অনুপযোগী মনে হবে । কিন্তু তা সত্যে গর্ভবতী; তোমার আমিত্বকে ধ্বংস করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে তা অন্তঃসত্ত্বা। মনুষ্যজাতির ওপরে নিছক করুণা করেই একজন মাস্টার নিজে থেকে অবতরণ করেন। তাঁর নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য কোন কায়েমী স্বার্থ নেই। তিনি কামনার বিশ্বাসঘাতক সমুদ্র থেকে বহু ঊর্ধ্বে। তিনি এখানে এসেছেন কেবল তোমাকে তাঁর অবস্থায় তুলে নেবার জন্য; এক চিরন্তন আনন্দের অবস্থায় - এমন এক অবস্থা যেখানে 'আমি' ছাড়া কেবল চেতনা বিদ্যমান।

দেবী বা স্ত্রীশক্তি-তত্ত্বের ৭০০ সংস্কৃত শ্লোক সম্বলিত চণ্ডীপাঠে আছে যে কিভাবে চণ্ডীদেবী নানা দুষ্ট অসুরকে বধ করেন। এটা এই নয় যে দেবী প্রকৃত মানুষদের বধ করেন। যদি তিনি আসল মানুষদের হত্যা করে থাকতেন, আমরা তাঁকে চণ্ডীপাঠ দ্বারা পূজা করতাম না!

সাংকেতিকভাবে অসুরেরা মানুষের ভিতরের নানা দুর্বৃত্তি ও আমিত্বকে প্রতীকীকরণ করে এবং মানুষকে আমিত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যই দেবী এই আমিত্বকে বধ করেন। আমাদের সেটা বুঝতে হবে। মহিষাসুর নামে এক অসুরের মহিষের মাথা ছিল! এটা আমাদের বোঝানোর জন্য যে আমাদের কেউ কেউ খুবই মোটা মাথার এবং মাস্টার বারবার তাঁর পথে নিয়ে যাবার জন্য জাগাতে চেষ্টা করলেও আমরা নিজেদের রাস্তাতেই দৃঢ়ভাবে টিকে থাকি। আমরা মাস্টারের ডাকে সংবেদনশীল নই। এটা বোঝ যে মাস্টারের সাথে ঝগড়া করা হ'ল নিজেকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া। তোমায় সত্যি কথা বলি, যখন তুমি মাস্টারের সাথে ঝগড়া কর, কেউ তোমার জন্য তার চেয়ে বেশী খারাপ করতে পারবে না। তুমি নিজেই নিজের যথেষ্ট খারাপ করে ফেল।

যাই হোক, মাস্টার জানেন যে কিভাবে কাউকে নিজের মত করে প্রস্ফুটিত করাতে হয়। তাঁর কাছে কেবল বিশ্বাস ও সাহস নিয়ে তোমায় নিজেকে খুলে ধরতে হবে।

প্রশ্ন : যদিও আমি জানি যে আপনি আমার মাস্টার, আপনার উপস্থিতিতে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ও ভীত থাকি।

উত্তর : এই কথাটি বলা মানে তুমি তোমার ভয়কে দমন করতে চাও। তুমি ঝাঁপ দেবে বলে ঠিক করেছ।

আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। তোমার সত্তা পরিষ্কারভাবে আমায় চিনতে পেরেছে; কিন্তু তোমার মন লড়াই করছে। তোমার সত্তা আমায় চিনতে না পারলে তুমি বারবার আমার কাছে আসতে না। আমার কাছে আসার জন্য বাড়ীতে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, ঠিক কিনা? তোমার পক্ষে সবচেয়ে সোজা পথ হ'ল বাড়ীতে থাকা ও নিজের কাজ করা। তা হয়ত তোমার পরিবারকে খুশী রাখত।

কেন এরকম হয় যে তুমি বারবার আশ্রমে আসতে চাও এবং আমায় দেখতে চাও? এখানে আসার জন্য কেন তুমি বাড়ীতে বারবার কলহের সম্মুখীন হও? কেবল বাড়ীতে থাকা ও সবাইকে খুশী রাখা কি অনেক সহজ কাজ নয়? কারণ হ'ল, যে আকর্ষণ তুমি অনুভব করছ তা সত্তা স্তর থেকে আসছে। একবার যখন তোমার সত্তা আমাকে চিনেছে, তা তোমাকে ফিরে যেতে দেবে না। চেষ্টা করে দেখ, তুমি পালাতে পারবে না!

তোমার সত্তা এখন আমাকে চেনে। কিন্তু তোমার মন যেন এক বাধা। সর্বদা হৃদয়কে অনুসরণ করতে স্মরণ রেখ। সেটাই তোমার

এখানে করা দরকার। যখন হৃদয়কে অনুসরণ কর, তুমি আমাতে পৌঁছাবে। যখন তুমি মনকে অনুসরণ কর, তুমি আমাকে হারাতে থাকবে।

তুমি আমার কাছে নিজেকে হারাবার জন্য কত ভয়ে আছ। সেটাই তোমার সমস্যা। তোমার আমিত্ব বিপদে পড়েছে। নিজের পরিচয় হারানোর ভয়ে অসুরক্ষিত বোধ কর। অবাক হতে শুরু কর যে নিজের পরিচয় ছাড়া তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ। আমার সামনে এলে তোমার আমিত্ব এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

আমিত্ব সঙ্গে সঙ্গে তার আহার্য চায় এবং একমাত্র আমার কাছ থেকে পালিয়েই তাকে তা দেওয়া যায়। হাতির শুঁড়ের মত তোমার মন দুলতে থাকে, একদিকে আমার জন্য গভীর ভালবাসা আর অন্যদিকে প্রচণ্ড ভয়।

মনে রেখ প্রেম হৃদয় থেকে আসে, কিন্তু ভয় আসে মনে থেকে। সর্বদা, সর্বদাই তোমার হৃদয়কে অনুসরণ কর। প্রেম স্বাভাবিক; ভয় সামাজিক। ভয় ও সন্দেহ গভীরভাবে সম্বন্ধিত এবং তোমাকে ভিতরে নিছক নিয়ন্ত্রণ করছে।

ভাল করে বুঝে নাও যে সন্দেহ করা খারাপ নয়। সন্দেহ হ'ল জীবনমুক্তির জন্য তোমার টর্চ। মনের পক্ষে সন্দেহ ছাড়া এগিয়ে চলা খুব কঠিন। কিন্তু তোমার সন্দেহগুলিকে সবশেষে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে হবে। একমাত্র তাহলেই তুমি অগ্রসর হয়ে চলেছ। যখন তুমি ভিতরের দিকে চল, এটা হবে।

প্রশ্ন : আমাদের কি করা উচিৎ?

কেবল সম্পূর্ণরূপে প্রেমে পড়, ব্যাস। পুরোপুরি প্রেমে পড়া মানে সমগ্রভাবে আমিত্বহীন অবস্থায় চলে যাওয়া। সেইজন্য একজন মাস্টার যিনি আমিত্বহীন অবস্থায় আছেন, তিনি কেবলমাত্র প্রেম ও করুণা করতে সক্ষম। অন্য সমস্ত আবেগ, যেমন ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি তাঁর অসীম প্রেমেরই কৃত্রিম প্রকাশ। তিনি ক্রোধিত বা বিরক্ত হওয়ার ভান করেন। তিনি তোমার স্তরে নেমে আসেন, তোমার স্তরের আবেগকে ভান করেন এবং তোমাকে উপলব্ধির আরেকটি স্তরে নিয়ে যান, ব্যাস। তিনি তোমার ভাষায় ততক্ষণ কথা বলেন যতক্ষণ না তুমি তাঁর ভাষা - অস্তিত্বের ভাষা, বুঝতে পার।

প্রশ্ন : কিন্তু আমরা কিভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রেমে পড়তে পারি? মনে হয়, বলা সোজা, করা কঠিন!

প্রথম জিনিষ হ'ল যাই কর তাতে তোমার চেতনার বন্যা ঢেলে দাও। প্রত্যক্ষদর্শী হও। তুমি অনুভব করতে থাকবে যে এই পুরো জিনিষটাই একটা নাটক এবং তুমি প্রসঙ্গক্রমে তাতে একটি ভূমিকা নিয়ে সেই নাটককে কেবল প্রত্যক্ষ করছ। দ্বিতীয়ত যা কিছু দেখছ তার সম্বন্ধে বিচার করা বন্ধ কর। যখন বিচার করা বন্ধ কর, তুমি সবাইকে ও সবকিছুকে পুরো সরল হয়ে শুধুমাত্র ভালবাসবে।

যখন বিচার করতে থাক, কি 'আছে', সেটাকে দেখতে পাও না, যা দেখতে চাও কেবল সেটা দেখ। আমরা বেশীর ভাগই আমাদের মতামত আগে তৈরি করে ফেলি। তারপর আমরা শুধুমাত্র তাদের ভিত্তি করে কাজ করি। যা কিছু দেখি, প্রথমেই আমাদের মতামতের মধ্য দিয়ে তাদের দেখি।

এইভাবে কাজ করলে আমরা জিনিষগুলি যেভাবে আছে সেই অবস্থায় তাদের কিভাবে দেখব? আমরা কিভাবে কখনও প্রেমে পড়ব? তুমি প্রেমে পড়তে পার যদি তুমি সমস্ত কিছু সতেজ ও সরলভাবে সাদরে গ্রহণ করতে পার। কিন্তু তুমি কি কর ? তুমি প্রেমের জন্য ভাল মন্দ বিশ্লেষণ করতে থাক। বিশ্লেষণ শুরু করলে তো তুমি প্রেম হারিয়ে ফেলবে। সবশেষে যখন তুমি সেটা করতে সিদ্ধান্ত নেবে, তখন হয়ত অনেক দেরী হয়ে গেছে।

দ্যাখো, একমাত্র তোমার আমিত্ব হারিয়ে ফেলার জন্য গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ রয়েছে। যখন তুমি একা আছ, তুমি তোমার আমিত্ব হারাতে পারবে না। তোমার আমিত্ব মুছে ফেলার জন্য গুরু বা মাস্টার সেই মাধ্যম বা সাহায্য। তুমি তাঁর মধ্যে যত মিলিয়ে যাও , ততই তুমি নিজেকে খুলে ধরতে পারবে এবং তোমার আমিত্বকে হারাবে। কখন তুমি জানবে যে তোমার আমিত্ব মুছে যাচ্ছে ? যখন তুমি এক নির্দিষ্টপ্রকার আনন্দ অনুভব করা আরম্ভ করবে যা আগে কখনও করনি।

তুমি কোন কারণ ছাড়াই আনন্দ অনুভব করতে শুরু করবে। শুধুমাত্র বিদ্যমান থাকাই তোমায় খুশী রাখবে। অবশ্যই, মাস্টারের সাথে তোমার আমিত্বের সার্জারী সর্বদাই চলছে এবং আমিত্বকে চিরে ফেলার জন্য কখনও কখনও কষ্ট হবে। কিন্তু যখন সেই সব মুহূর্তগুলি থেকে বেড়িয়ে এলে, তুমি তোমার এগিয়ে চলার রাস্তায় সামনে দিকে অনেকগুলি পদক্ষেপ এগিয়ে গেলে এবং তুমি বিনা কারণে অসীম আনন্দ অনুভব করবে।

কেবল ছোটদের দ্যাখো। তারা জীবনের জন্য কত অত্যুৎসাহী। তার কত প্রেমময়। কখনও কি অবাক হয়ে ভেবেছ যে তুমি তাদের

মত এত উৎসাহী কেন নও? একসময় তুমি তাদের মতই ছিলে, তাই নয় কি? তাহলে এই উৎসাহ ও সরলতা আমরা কোথায় হারিয়ে ফেললাম?

একজন অংশগ্রহণকারী সাহস করে বলে, 'স্বামীজী, আমরা বড় হয়েছি ও আরও বেশী পরিপক্ব হয়েছি। আমরা তাদের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।'

অভিজ্ঞতা কিসের? একঘেয়েমি জনিত বিরক্তি? পরিষ্কার করে বোঝ : আমরা সবাই ভাবি যে আমরা বাচ্চাদের তুলনায় বেশী পরিপক্ব এবং জীবনের প্রতি আমাদের মনোভাব বাচ্চাদের চেয়ে বেশী সঠিক। আমরা ভাবি যে জীবনে অনেক পথ চলে বাচ্চাদের এই পরিপক্বতা লাভ করতে হবে।

সত্য হ'ল, আমরা এত বুদ্ধিবৃত্তিক (intellectual) হয়ে পড়েছি যে আমরা আমাদের হৃদয়ের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। আমরা পুরোপুরি মন থেকে কাজ করি। এমনকি আমাদের আবেগগুলিও মন দ্বারা নির্দেশিত হয়। আমরা আমা দের সত্তা থেকে আবেগভরে কোন কাজ করি না। আমরা আমাদের অন্তঃস্থল থেকে বিছিন্ন।

আমরা যখন এই পৃথিবীতে আসি, আমারা এক আনন্দ-উদ্‌যাপন ও স্বতঃস্ফূর্ততার অবস্থায় থাকি। তদনন্তর বছর ধরে সমাজ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের জন্য মন সৃষ্টি করে। মন তারপর নিজেকে ঘনীভূত করে এবং নিজের শর্তাবলী আমাদের ওপর চাপাতে থাকে। আমাদের স্বতঃস্ফূর্ততা কোথায় হারিয়ে যায়।

তোমাদের বলি, এই আমিত্ব মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় আমরা আমাদের ভিতরের শিশুটিকে পুনরায় আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছি। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমারা ঈশ্বরের অনেক নিকটে ছিলাম। যতই বড় হই ও তথাকথিতভাবে পরিপক্ব হই, আমাদের ওপরে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ভিতরের শিশুটাকে নষ্ট করে ফেলে।

কত লোকে আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, এত চরম সত্যের কথা বললেও, কিভাবে আপনি এত শিশুসুলভ?' এখন আমাকে বল, আমি বড় হইনি ও পরিপক্ব হইনি বলে কি আমি শিশুসুলভ? না! তুমি নিজের সুবিধা দেখে তোমার দার্শনিক ভঙ্গীতে সহজভাবে জিনিষগুলিকে ব্যাখ্যা করে ফেল।

কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আমাদের কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই সাঁতার কাটা ও ওড়ার সক্ষমতা আছে। তোমাদের এটা উদ্ভট লাগতে পারে, কিন্তু তা সত্যি। আমাদের ভিতরে এইসব সামর্থ্য আছে। যদি আমরা কারো কাছ থেকে শুনে না থাকি যে আমাদের সন্তরণ ও উড্ডয়নের ক্ষমতা নেই, আমরা কিন্তু এই দুটি কাজ নিজে থেকেই করতে পারি। দেখা গেছে যে নবজাত শিশুকে সুইমিংপুলের জলে ছেড়ে দিলে সে তার স্বভাববশত ভেসে থাকতে জানে।

আমিত্ব নিজেকে কতভাবে প্রকাশ করে এবং তার মত করে আমরা প্রতিটি মিনিট জীবনযাপন করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা আসলে মুখোশ পরে থাকি। মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করার একটা মুখোশ, বাবার সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য অন্য একটা মুখোশ, অফিসে বসের জন্য অন্য আরেকটা এবং এরকম কত মুখোশ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্ট মানুষের জন্য সঠিক মুখোশ ব্যবহার করি, ঠিক আছে। যেই মুহূর্তে কারো সামনে ভুল মুখোশ পরি, তখন আমিত্ব একেবারে সামনে এসে পরে। তোমাকে কেবল সুদক্ষ হয়ে মুখোশগুলি পরিবর্তন করতে হবে এবং নাটকটা উপভোগ করতে হবে। তার অর্থ তোমার সত্তা ঘনীভূত হয় নি । তুমি প্রত্যক্ষদর্শী হলে এবং সেই খেলায় জড়িয়ে পড় নি।

তুমি কেবল তখনই উপভোগ করতে পার যখন তুমি জানতে পার যে তুমি মুখোশ ছাড়িয়ে অন্যকিছু। নতুবা তুমি মুখোশে আসক্ত হয়ে উঠবে এবং জীবনের সম্পূর্ণ চারুত্ব হারিয়ে ফেলবে। যখন তুমি জেনে যাও যে তুমি কেবল মুখোশ ব্যবহার করছ , তোমার বাসনাগুলি ঝরে পড়বে।

এটা অনেকটা এরকম : যখন তুমি বড় হও, তুমি তোমার খেলনাগুলি নিজে থেকেই ফেলে দাও। খেলনাগুলি তোমাকে আর আকর্ষণ করে না। একইভাবে, যখন এই মুখোশগুলির দিকে বুদ্ধি সহকারে তাকাবে, সেগুলির জন্য তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তুমি কেবল সেগুলিকে ব্যবহার করবে ও এগিয়ে চলতে থাকবে।

আমিত্ব নানা ধূর্ততা সহ প্রকাশ পায়। তাই তার সম্বন্ধে এত সব ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এইসব তোমাকে দেখতে সাহায্য করবে যে তোমার অন্তর্যাত্রার পথে তুমি নিজে কোথায় কোথায় বাধা হয়ে আছ।

তোমার ভিতরে যত কম বাধা থাকে, তুমি তত তরল ও প্রবহমান হও। ভিতরে বাধা কম থাকলে তুমি আরও বেশী বহুরন্ধ্র ও অরক্ষিত হবে। ভিতরে বেশী বাধা থাকলে তুমি কঠিন হও ও তোমাকে ভেদ করা শক্ত। তোমার আমিত্ব সবকিছুতেই একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ তোমায় কিছু বলে, তোমার তাতে প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হয়? তোমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় একরকম বাধা, একটা 'না।' 'না' বলে আমিত্ব কতই না তৃপ্তি পায়! তুমি নিজেকে ভিতর থেকে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় অনুভব কর। আর 'হ্যাঁ' বলে নিজেকে তরল ও অরক্ষিত অনুভব কর। তোমার আমিত্ব বশবর্তিতা অনুভব করে। তাই তুমি বল, 'না।'

সেইজন্য ঘরে, স্কুলে, কর্মক্ষত্রে বা যে কোন জায়গায় নিয়মভঙ্গ করতে তোমার ভাল লাগে। যেই মুহূর্তে তুমি কোন নিয়ম ভাঙ্গ, তোমার নিজের সম্পর্কে একটা মহান অনুভূতি হবে। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের ভাল লাগে। কেন ? কারণ তারা নিয়ম ভেঙ্গে ভাল বোধ করে। ছোট বাচ্চাদের যেই বলবে যে তাদের কিছু একটা জিনিষ নিতে নেই , তারা সেই জিনিষটাই চাইতে থাকবে। বড়রাও একে অপরকে নানাভাবে অমান্য করে খুশী হয়।

স্বামী-স্ত্রী কোন পরামর্শে কদাচিৎ প্রথমবারেই সহমত হয়! আমাদের ভক্তদের কথাই ধরা যাক। যদি পতি প্রথমে আমার সাথে সংযুক্ত হয়, স্ত্রীর প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে খালি আমাকে বাধা দেওয়া। সে হয়ত আমার বই লুকিয়ে পড়ে এবং তা ভাল লাগে , কিন্তু পতির সামনে সে আমাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে না। একই জিনিষ হয় যদি পত্নীরা আমার দিকে প্রথমে সংযুক্ত হয় । পতিরা সেই পত্নীদের কঠিন অবস্থায় ফেলতে থাকে, যতক্ষণ না পতিরা সবশেষে আমার সুরে সুর মেলায়।

আমিত্বের এরকমই খেলা। 'হ্যাঁ' বললে কোন বাধা ছাড়াই তোমাকে তরল অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে প্রবহমান রাখবে। তার মানে এই নয় যে তুমি অন্ধভাবে 'হ্যাঁ' বলবে। না! তার মানে, তোমার আমিত্বের প্রভাব ছাড়া নিজের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপরে আস্থা রেখে সিদ্ধান্ত নাও, ব্যাস। স্বতশ্চলভাবে তুমি সঠিক পথে চলে যাবে।

এটা বুঝে নাও যে 'না' বলা মানে কোন সতর্ক চাল বা কোন সুরক্ষা শক্তি নয় যা তোমার হিতসাধনকারী দেবদূত হবে। তুমি প্রতিরোধ ও পূর্বকল্পনা ছাড়া উন্মুক্ত হয়ে থাক, ব্যাস।

মন্তব্য : কিন্তু স্বামীজী, আমি এখন পর্যন্ত ভাবছিলাম যে নিজের গুরুত্ব দাবি করাই আমিত্বের একমাত্র প্রকাশ।

না! আমিত্ব নানা রূপে আসে : সক্রিয় ও অক্রিয়, যা আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনা করছিলাম। সেইজন্য এটা বোধগম্য করা বেশ দুরূহ।

সক্রিয় আমিত্ব এবং অক্রিয় আমিত্ব

সক্রিয় আমিত্বকে সহজেই চেনা যায়। সক্রিয় আমিত্বপূর্ণ মানুষেরা উদ্ধতভাবে ব্যবহার করবে ; তারা নিজের গুরুত্ব খোলাখুলিভাবে দাবি করবে; তারা লোকের সামনে নত হবে না; তারা অহংকারী হবে। মাস্টারের পক্ষে এই আমিত্বের সাথে কারবার করা সহজ। তাঁকে কেবল কয়েকবার এই আমিত্বকে জোরে ধাক্কা দিতে হবে এবং তা চূর্ণ হবে!

একটা ছোট গল্প :

> একজন জুয়া খেলে তার সব ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলল ও ভিখারী হয়ে গেল। একদিন সে রাস্তার পাশে এক ছোট হোটেলে গিয়ে টেবিলে ব্রেকফাস্টের জন্য বসল। ওয়েটার অর্ডার নিতে এল।
> লোকটি অবাক হল। ওয়েটার ছিল তার পুরানো বন্ধু ও তার মতই আগে ধনী ছিল। সে ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বলল , 'তুমি এরকম হোটেলে ওয়েটারের কাজ কর !'
> অন্যজন উত্তর দিল, 'আমি এখানে কেবল ওয়েটার। এখানে খাই না।'

সক্রিয় আমিত্বকে চেনা খুব সোজা! টাকাপয়সা, ধনসম্পদ ইত্যাদি প্রতিরক্ষা চলে গেলেও সক্রিয় আমিত্বপূর্ণ মানুষ তার আমিত্বকে ছাড়তে ইচ্ছাপ্রকাশ করবে না। সক্রিয় আমিত্বকে সহজেই ছেঁটে ফেলে যায়।

কিন্তু অক্রিয় আমিত্ব খুবই সূক্ষ্ম ও ধূর্ত। মানুষ অক্রিয় আমিত্ব নিয়ে অনেক অমায়িক হবা র ভান করে; লোকের সম্মুখীন হবার সাহস নেই, কৃতিত্ব নিতে কুণ্ঠিত হয় ইত্যাদি। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল , তারা ভাবে যে তারা এই প্রকার কারণ তারা অহংবাদী নয়! সত্য হল যে তাদের আমিত্ব অন্যদের আমিত্বের চেয়ে বেশী ভারী! তারা এইসব বিনম্র কাজ ক'রে তাদের আমিত্বকে ব্যথা পাওয়া থেকে অতি সতর্কভাবে সুরক্ষিত রাখছে।

যখন তুমি গভীর সজাগতা ও উপলব্ধি সহকারে আছ, তুমি তোমার আমিত্বের এক প্রত্যক্ষদর্শী হবে এবং এই অবস্থায় তুমি বিনয়ী বা অহংবাদী কিছুই হবে না; তুমি কৃতিত্ব নেবে না, আবার কুণ্ঠিতও হবে না। আর তুমি ভাববে না বা দাবি করবে না যে তুমি এগুলির মধ্যে একটিও নও; তুমি শুধুমাত্র 'থাকবে', ব্যাস। যখন কেউ তোমায় প্রশংসা করে বা কৃতিত্ব দেয়, তুমি কেবল অস্তিত্বের সাথে অনুরণিত হবে এবং সেখানে ছেড়ে দেবে, ব্যাস। আর কোন তুলনা বা দাবি করার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

তাই পরিষ্কার করে বোঝ : বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ ভাবে যে সক্রিয় আমিত্বই একমাত্র আমিত্ব। না। অক্রিয় আমিত্বও আছে এবং তাকে ঠিক করা বেশী শক্ত।

মানুষের সক্রিয় আমিত্ব শুকনো শক্ত গাছের ডালের মত। যদি আঘাত কর , তা ভেঙ্গে যায়। অক্রিয় আমিত্ব বিশিষ্ট মানুষেরা সতেজ সবুজ ডালের মত। প্রতিবার তাদের আমিত্ব আঘাত পেলে তারা বেঁকে যায়, কিন্তু ভাঙ্গে না! তাদের আমিত্ব এত সুন্দরভাবে সুরক্ষিত যে তার সাথে কারবার করা বেশ কঠিন। আসলে তারা আমিত্বকে সুরক্ষিত রাখতে কঠিন পরিশ্রম করে , কিন্তু এক মিষ্ট ও অক্রিয় অবস্থায়। অক্রিয়-আমিত্ব সক্রিয়-আমিত্বের চেয়ে বেশী ভয়ংকর।

উদাহরণস্বরূপ, তুমি এখন আমার সাথে এই ক্লাসে আছ। তোমার মনে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন আসছে। কিন্তু তুমি কি তাদের সবকটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিজ্ঞাসা কর? না। তুমি তাদের নিজের ভিতরে নিজের সুবিধা মত পরিচালনা কর এবং সবশেষে তাদের চেপে রাখ। এটা কর কারণ তুমি ভাব যে প্রশ্ন করলে তোমাকে বোকা দেখাতে পারে। তুমি বোকার মত দৃষ্টিগোচর হতে চাও না এবং তুমি প্রশ্ন কর না। তুমি তোমার আমিত্বকে পাহারা দিচ্ছ। তোমার প্রশ্ন যদি আমার উপস্থিতিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় , সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এখানে তুমি তোমার প্রশ্নকে চেপে রাখছ।

তোমার সম্পর্কে অন্যের প্রতিক্রিয়া ও মতামত সম্বন্ধে তুমি কতই না প্রযত্নশীল হও। এই আমিত্বই তোমার নোঙর -বিন্দু (anchor point)। তাকে ঝাঁকুনি দিলে সে নোঙরহীন মনে করে। তাই আজ্ঞানুবর্তী হবার ছল করে তুমি চুপচাপ থাক। তুমি মাস্টারের উপস্থিতিতে নিজের আমিত্বকে অনাবৃত করার আরও একটা সুযোগ হারাও। তুমি প্রস্ফুটিত হবার দিকে পদক্ষেপ নেবার আরও এক সুযোগ হারাও।

তোমাদের একটা জিনিষ বলি : দিনের শেষে সমস্ত প্রশ্নই বোকামিপূর্ণ। কোন মুহূর্তেও ভেবো না যে কিছু প্রশ্ন অন্য প্রশ্ন থেকে বেশী জ্ঞানগর্ভ। যখন গভীর উপলব্ধি হয়, প্রশ্নগুলি নিজে থেকেই দ্রবীভূত হবে। সেটা হল প্রকৃত প্রাজ্ঞতা। যাই হোক , আমাদের আমিত্বকে নিরাপদে রক্ষণ করার জন্য আমরা সবাই কতই না সাবধানে খেলতে থাকি।

সামাজিক আমিত্ব

আমিত্বের আরেকটা খেলা আমরা সবাই খুব ভাল করে প্রতিপালন করি - তাকে বলে সামাজিক আমিত্ব।

সামাজিক আমিত্ব কি?

তুমি ভাব যে তোমার জীবন তোমার কাছে খুবই ব্যক্তিগত এবং কেউ যেন তার আঁচ না পায়। আবার তুমি নিজের একটা সামাজিক প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছ এবং তাকে তুমি সুরক্ষিত রাখ।

উদাহরণস্বরূপ, লোকেরা তাদের সন্তানের খেয়ালী ব্যবহার আলোচনা করতে আসে। কিন্তু আশেপাশে অন্যেরা থাকলে তারা স্বস্তি পায় না। তুমি অন্যদের সেগুলি জানতে দিতে চাও না কারণ তুমি সমাজের চোখে তোমার ও তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য এক ভাবমূর্তি বানিয়ে রেখেছ। যদি তুমি অন্য লোকেদের তোমার পরিবারের ব্যাপারে ঢুকতে দাও, তুমি ভাব যে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাদের কাছে খুলে ধরছ। তুমি ভয় পাও যে তোমার প্রতিচ্ছবি চূর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং সমাজে তোমাকে তুলে ধরার কেউ থাকবে না। এটাই সামাজিক আমিত্ব।

যে প্রতিচ্ছবি তুমি এত কষ্টসহিষ্ণু হয়ে তৈরি করলে, যে প্রতিচ্ছবি তোমার পরিচয় হয়ে গেছে ও যার দ্বারা তুমি নিজেকে সমাজে পরিচিতি দাও, তা এখন সংকটাপন্ন। এটা তোমার কাছে অপরের চেয়ে তোমার নিজেরই একটা পরিচিতি! যদি তুমি নিজেকে ও নিজের পরিবারকে যেরকম আছ সেরকম দেখাও, তুমি অনেক বেশী স্বস্তিতে থাকবে, কারণ তাহলে কিছু লুকানোর জন্য কোনই চাপ থাকবে না।

অবশ্যই তুমি বলতে পার, 'স্বামীজী, এই বিষয়গুলি গোপন রাখার একমাত্র কারণ হল, আমরা চাই না অন্যেরা এই নিয়ে গালগল্প করুক।' তোমাদের বলি : কেউই অন্য কারো ব্যাপারে কথা বলার যোগ্য নয়। যদি বলে, তারা হ'ল বোকা। এটা মনে রেখ, তাহলে যে শক্তি তাদের ও তাদের কথায় দাও তা স্বতশ্চলভাবে মিলিয়ে যাবে। তোমাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তুমিই তাদের দিয়েছ, তাই নয় কি? এখন সেই ক্ষমতা চলে যাবে।

কেবল সিদ্ধান্ত নাও, এক খোলা খাতার মত জীবন ধারণ করবে, ব্যাস। তোমার সাহস ও শরীরের ভাষা দেখে লোকেরা নিজে থেকেই বুঝতে পারবে যে তোমার সম্বন্ধে গল্প করে কোন লাভ হবে না ! তোমার সামাজিক আমিত্ব মুছে ফেল এবং কোনপ্রকার গোপনতা ছাড়াই বাস কর। সেটা একটা বিরাট মুক্তি।

আমাদের সামাজিক আমিত্বের জন্য, আমরা সর্বদাই কত আত্ম-সচেতন। আমরা আত্ম-সচেতন কারণ আমরা ভাবি যে লোকেরা সর্বদা আমাদের দেখছে ও আমাদের সম্বন্ধে গল্প করছে। পরিষ্কার করে বোঝ : তুমি যখন আত্ম-সচেতন, তুমি তখন ভীষণ অহংবাদী। তুমি ভাব যে তুমি বিরাট বড় কেউ এবং সবার চোখ সবসময়ে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। আসলে তাদের অন্য অনেক ভাল কাজ আছে!

তুমি 'কেউ না' ভাবলে কি তুমি কি আত্ম-সচেতন হবে? একমাত্র যেহেতু ভাব যে তুমি 'কেউ', তুমি আত্ম-সচেতন হও। আর তদুপরি তুমি ভাব যে তুমি আত্ম-সচেতন হয়ে বিনম্রতা প্রদর্শন করছ। সেটাই বিপদ!

আমিত্ব সচেতন হলে তুমি বেঁচে থাকলেও জীবন্ত নও। এটা যেন তোমার সৌন্দর্য ও চারুত্বের পথে বাধা। এজন্য তোমার সৌন্দ র্য স্বাভাবিকভাবে সামনে আসে না। প্রাণীজগৎ ও প্রকৃতির দিকে তাকাও। তারা কত সুন্দর ও সহজভাবে প্রবহমান। কেন এমন হয় ? কারণ তারা আত্ম-সচেতন নয়। অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে তারা সহজেই খুশী। যেই মুহূর্তে চিন্তা করতে শুরু কর যে লোকেরা তোমায় লক্ষ্য করছে, আমিত্ব ঢুকে পড়ে এবং তোমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেল।

বাচ্চারা বড়দের মত আত্ম-সচেতন নয়। যদি তুমি তাদের খেলতে দেখ, তুমি দেখবে : পুরো ব্যাপারটায় কত সৌন্দর্য ও সরলতা। এমনকি যখন তুমি নিজের ফটো নাও, লক্ষ্য করে থাকবে যে তোমার অলক্ষ্যে নাওয়া ফটোগুলি তোমাকে ক্যামেরার সামনে জানিয়ে নাওয়া ফটোগুলির চেয়ে অনেক ভাল!

যেই তোমাকে ক্যামেরার সামনে ভঙ্গি করে দাঁড়াতে বলা হয়, তুমি আত্ম-সচেতন হও। তোমার আমিত্ব ভয় পায় যে ফটো কেমন হবে। আত্ম-সচেতন আমিত্ব সর্বদা সব কিছুতেই ভাল মন্দ হিসাব করছে। তা সব সময়ে অন্যের চোখগুলি ও মতামত ওজন করে চলেছে এবং নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছে।

এমনকি আমাদের ধ্যানের ক্লাসে যদি দেখ, ধ্যান-প্রক্রিয়া শুরু হবার আগে একটা কাপড়ের টুকরা দিয়ে আমি তোমাদের চোখ বাঁধতে বলি। কিন্তু প্রথমে তুমি কি কর? তুমি প্রথমে দেখ যে অন্য লোকেরা তাদের চোখ ঠিকভাবে বাঁধছে কিনা! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঠিক করে ধ্যান কর না কারণ তোমরা আত্ম-সচেতন থাক স্বেচ্ছাসেবক ও আমার সম্বন্ধে - যাদের চোখ বাঁধা হয় না! তুমি দমিত অবস্থায় ধ্যান কর এবং ধ্যান শিবিরে আসার আসল উদ্দেশ্যই হারিয়ে ফেল।

যখন হিসাব করা থামাও, তুমি সরল ও উন্মুক্ত হওয়া শুরু কর। তুমি বিস্ময় ও সতেজতায় সর্বদাই পূর্ণ থাক। তোমার জীবন কখনও নীরস ও দমিত হয় না।

আবার একজন সরল ব্যক্তি কারোর ক্ষতি করতে পারে না, কারণ ক্ষতি করতে গেলে হিসাব করতে হবে। তারা না জেনে ক্ষতি করলেও লোকেরা আঘাত পাবে না, কারণ তারা জানে যে তারা আঘাত দিতে চায় নি। তাদের শরীরের ভাষা তাদের সরলতা বলে দেবে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করবে।

জ্ঞানের আমিত্ব

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আমিত্বে যাওয়া যাক - জ্ঞানের সাথে যে আমিত্ব আসে।

বড় হতে থাকলে, বই পড়ে বা লোকের সাথে কথা বলে তুমি নানা বিষয় সম্বন্ধে বিচার ও তথ্য সংগ্রহ কর। এই দু টি মিলিয়ে তৈরি হয় তোমার জ্ঞান, তোমার পুরো মানসিক গঠন। যা কিছু দেখ, তুমি সেই মানসিক গঠন দিয়ে দেখ।

যা কিছু দেখ তা তোমার ইতিমধ্যে তৈরি করা বিচারকে পরিপোষণ করে। ক্রমবিকাশের কোন সম্ভাবনা নেই। তুমি সবসময়ে একটা নির্দিষ্ট রঙীন কাচ দিয়ে দেখতে থাক - একটা রঙ যেটা তুমিই লাগিয়েছ! এই বিস্ময়ে ভরা পৃথিবীতে তাই তুমি বহু কিছু দেখতে পাও না।

একটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষ তার বন্ধুকে বলছিল, 'তুমি জান? আমি সত্যি সত্যি নিজেকে বোকা বানিয়েছি।'
> বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, কি হয়েছে?'
> লোকটি বলে, 'আমি বাড়ীতে দশটা ফাটা জানালা পরিবর্তন করলাম এবং পরে আবিষ্কার করলাম যে আমার চশমাটা ফাটা ছিল!'

যদি আমরা এক মুহূর্তের জন্য ভিতরের দিকে তাকাই , আমরা উপলব্ধি করব যে আমরা যা কিছু দেখি তাতে 'আমি' জিনিষটা

সবকিছুতে আছে। কিন্তু যে করেই হোক আমরা ভিতরে কখনও দেখি না। আমরা ভাবি যে আমরা সব কিছু জানি ; সেখানেই সমস্যার শুরু। আমাদের পার্থিব জ্ঞান আমাদের বিকশিত হবার সুযোগ দেয় না।

এতে সবচেয়ে বিপদের ব্যাপার হল, তুমি অনুভব কর যে কেবল তোমার জ্ঞান সহ তুমি ঘনীভূত হয়ে গেছ। তোমার জ্ঞানের গুণ দ্বারা দৃঢ় চরিত্র হয়েছ বলে তুমি ভাব। তুমি জানই না যে তুমি কেবল তোমার সত্তার বোঝা হয়ে গেছ।

তোমার সত্তা এক স্রোতস্বিনী নদী, আর তুমি তাকে তথাকথিত জ্ঞান দ্বারা স্রোতহীন করেছ। তোমার পথে যে জ্ঞান আসে তাকে ফেলে দেবার জ্ঞানই হল আসল জ্ঞান। স্বতঃস্ফূর্ততা সহকারে প্রবহমান হয়ে শিশুর মত বাস কর। আমিত্ব থেকে স্বতঃস্ফূর্ততার দিকে তোমার যাত্রা করা উচিৎ।

জীবনে যা দেখি সেগুলিকে আমরা শ্রেণীবিভক্ত করতে ও তাতে লেবেল লাগাতে প্রস্তুত। তা করতে গিয়ে আমরা সহজেই জীবনের সৌন্দর্য হরণ করি। মানুষ, জায়গা, পরিস্থিতি, সবকিছু যা আমাদের রাস্তায় পড়ে তাকেই আমরা শ্রেণীবিভক্ত করি।

একটা ছোট গল্প :

> একটা লোক সিনেমা দেখতে একটা সিনেমাহলে গেল।
> মুভি শুরু হল এবং পর্দায় প্রথমেই একটা বিখ্যাত আন্তর্জাতিক স্টুডিওর শিরোনামা দেখানো হল।
> লোকটি নিজের মনে বলল, 'ও! আমি তো এই মুভি আগে দেখেছি!'
> সে উঠে বাইরে বেরিয়ে এল।

সেই প্রোডাক্শনের সমস্ত মুভি তাদের স্টুডিওর শিরোনামা নিয়ে আসে এবং সেই লোকটি মনে করল যে সে আগে সেই মুভি দেখেছে। সে তো ব্যাপারটাই হারিয়ে ফেলল, ব্যাস।

আমরা সবাই এই প্রকার, বিশেষ করে যারা বড় হয়েছে। বাচ্চারা সেরকম নয়। তারা সবকিছু সতেজতা সহকারে দেখে। তারা জীবনীশক্তিতে এতই ভরপুর; তারা আমাদের মত মৃত নয়।

যখন সমুদ্র সৈকতে যাও, কেবল বাচ্চাদের দেখ, তারা কেমন উদ্দীপিত। এদিকে তুমি যখন সেই সৈকতে যাও, তুমি ভাব তুমি সেই জায়গাটিকে ইতিমধ্যে জান। প্রকৃতির অতুলনীয় সতেজতা ও সৌন্দর্য তুমি কালো চশমা দিয়ে দেখ। সমুদ্র সৈকত সহজেই শুধুমাত্র আরেকটি জায়গা হয়ে যায়। বোঝ, যদি অনুভব কর যে জীবনকে উপভোগ করছ না, তার কারণ তোমার মন, তোমার কঠিন আমিত্ব; তার কারণ এই নয় যে জীবন সুন্দর নয়।

> একজন মানুষ সুইজারল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গেল ও এক মাস পর ফিরে এল। এক বন্ধুর সাথে তার দেখা হল এবং তারা একসাথে ভোজন করতে গেল। বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে তুমি কি সুইজারল্যান্ডের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করলে?'
> মানুষটি উত্তর দিল, 'হ্যা, মোটামুটি। কিন্তু পাহাড়গুলি মাঝে এসে যাচ্ছিল।'

আমরা প্রকৃতি সম্বন্ধে এত সংবেদনহীন! আর আমরা নালিশ করি যে উপভোগ করার কিছুই নেই।

উপভোগ করার সামর্থ্য তোমার ভিতরে আছে। ছোটবেলায় তুমি চারপাশে সবকিছু উপভোগ করতে। তারপর কি হল ? তুমি গম্ভীর হয়ে গেলে ও উপভোগ করতে ভুলে গেলে। তুমি তোমার তথাকথিত জ্ঞান দ্বারা ভোঁতা হয়ে গেলে।

তোমাদের আগে বলেছি, লোকেরা প্রায়ই আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনার এত জ্ঞান নিয়ে কিভাবে আপনি শিশুর মত থাকেন? প্রত্যেকবার যখন আপনি কোন রসিকতা করেন, আপনি কত স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসেন এবং আমরা আপনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি! যখন কোন জোক বলেন, আমরা হয়ত সেই জোক আপনার কাছে আগে শুনেছি এবং তাই আমরা হাসি না; কিন্তু আপনি তাকে এত উপভোগ করেন যেন অন্য কেউ আপনাকে জোকটা প্রথমবার বলছে!'

দ্যাখো, আমি এটাই বোঝাচ্ছি যখন আমি বলি যে তুমি তোমার স্বতঃফূর্ততা এবং উপভোগ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ। তোমার জ্ঞান নিয়ে তুমি এক 'সবজান্তা' মনোভাব অর্জন কর।

এখন যেহেতু আমি এটা বললাম, তোমাদের একটা গল্প বলি যেটা আমি আমার ভাষণে বার বার বলি এবং প্রত্যেকবার বলার সময় সেটা আমায় হাসায়!

> আমার জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতে তিরুভান্নামালাইতে মন্দির-উৎসবের সময় খোলা জায়গায় একটা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি

করা হয়। সেখানে বিখ্যাত নাট্যদল যাত্রা মঞ্চস্থ করে, বেশীরভাগই হিন্দু মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণের গল্প থেকে। আমি যেতাম ও নাটকগুলি দেখতাম।

একবার তারা মহাভারতের দৃশ্যপট মঞ্চস্থ করছিল যেখানে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করার চেষ্টা করে এবং তাকে ভগবান কৃষ্ণ রক্ষা করেন।

দ্রৌপদী চরিত্রের অভিনয়ে ছিল একজন শাড়ি পড়া পুরুষ। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার একটার ওপরে একটা ক'রে সাতটা শাড়ি পড়ার কথা এবং দুঃশাসন গুণতি ক'রে তাদের পরপর টানবে। সপ্তম শাড়িতে এলে দ্রৌপদী সাহায্যের জন্য ভগবান কৃষ্ণকে জোরে জোরে ডাকবে ও কৃষ্ণের আবির্ভাব হবে।

যে করেই হোক দ্রৌপদী চরিত্রটি একটি শাড়ি পড়তে ভুলে যায় এবং কেবল ছয়টি শাড়ি পড়ে।

মঞ্চে দুঃশাসন শাড়ি টানা শুরু করে ও হঠাৎ ষষ্ঠ শাড়িতে টান পরলে দ্রৌপদী নিজের ভুল বুঝতে পারে! সে চেঁচাতে থাকল, 'ওহে, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!'

দুঃশাসন ভাবল দ্রৌপদী তার ভূমিকা খুব ভাল ভাবে করছে এবং শাড়ি টানতেই থাকল!

অবশেষে দ্রৌপদী স্টেজে শুধুমাত্র হাফ্‌প্যান্ট ও ব্লাউজ পরে দাঁড়িয়ে, আর তার মেক্‌আপ্‌ মেয়েদের!

কিন্তু তার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল এবং সে চেঁচিয়ে বলল, 'ও কৃষ্ণ! তুমি কত করুণাময়; আমাকে লজ্জা থেকে রক্ষা করার জন্য তুমি আমার লিঙ্গ পরিবর্তন করে দিলে!'

সেই দৃশ্যটির কথা চিন্তা করলে এখনও আমি হাসি থামাতে পারি না!

তাই বোঝ যে জ্ঞান অর্জন করা ঠিক আছে, কিন্তু তার দ্বারা নিজেকে ঘনীভূত বা কঠিন বানিয়ে ফেলার জন্য ব্যবহার কোরো না। উন্মুক্ত হয়ে প্রতিটি মুহূর্তের সম্মুখীন হও। কোন পূর্বনির্ধারিত ধারণা রেখ না। যদি তুমি এই উন্মুক্ততার সাথে বাস কর , তোমার কাছে কিছুই নীরস হবে না। তবে তুমি দেখবে যে এমন কি তোমার নিজের স্ত্রী , যার সাথে তুমি রোজ বাস করছ, তাকেও কত সতেজ ও আনন্দদায়ক লাগে।

তোমার মনোভাব এরূপ হলে, পুরো সম্ভাবনা আছে যে অন্য মানুষেরা তোমার মধ্যে উন্মুক্ততা অনুভব করবে এবং সেও তোমার কাছে আরও বেশী আনন্দে উন্মুক্ত হবে। তখন সেটা এক সকারাত্মক চক্র হয় এবং প্রতি মুহূর্তে তুমি সতেজতা থেকে আরও সতেজতাতে প্রবেশ করবে। তাহলে সর্বত্র কেবল সতেজতা থাকবে; কিছুই বাসি বা নীরস হয়ে থাকবে না!

সাজসরঞ্জাম সহ বাস করা আমিত্ব

যখন আমিত্বের সাথে বাস কর, তোমার চাই কিছু সাজসরঞ্জাম, কিছু সমর্থন, সবসময়ে চারপাশে কিছু মানুষ। এই সমর্থন তোমাকে পরিচিতি দেয়। সেটা ছাড়া তুমি কেউ না। রাজা রাজা হয় যখন তা র রাজ্য আছে। অন্যদিকে একজন পরমহংস এক আমিত্ব-বিহীন সত্তা, একজন নিজেই নিজের রাজা। তাঁর কোন রাজ্যের প্রয়োজন নেই! তিনি ঘুমান যখন তিনি তাঁর পা ছড়িয়ে দেন এবং আহার করেন যখন তাঁর হাত বিস্তারিত করেন। তিনি শুধুমাত্র অস্তিত্বের প্রবাহকে অনুসরণ করেন। তিনি আত্মজ্ঞানী ।

কিন্তু যখন তুমি এক পরমহংস হও, তোমার চারপাশে এক বিরাট রাজ্য তৈরি হবে এবং তা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না অথবা তোমাকে কলুষিতও করতে পারবে না। কেবল দুর্বল ব্যক্তিরা নিজেদের জন্য রাজ্য গঠন করে এবং সেই রাজ্য থেকে তাদের সাহায্য ও বল আহরণ করে। কেবল দুর্বল ব্যক্তি সাহায্যের জন্য 'অবস্থা' চায়, সাহায্যের জন্য তাদের আমিত্ব প্রয়োজন। একজন পরমহংসের জন্য, তাঁর 'সত্তা'-ই (state) তাঁর জন্য সবকিছু করে; তাঁর চারপাশের 'অবস্থা' (status) তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

তুমি সাজসরঞ্জাম খোঁজ কারণ তুমি জীবনকে বড় শূন্য ও নীরস অনুভব কর। আর তুমি ভাব যে জীবন বড় নীরস কারণ তুমি সর্বদাই অলৌকিকতা খুঁজে বেড়াচ্ছ। অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিকতা প্রতিটি মুহূর্তে তোমার চোখের সামনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি তোমার আমিত্বকে নিয়ে এতই আচ্ছন্ন আছ যে সেটা হারিয়ে ফেলছ!

তোমার দেহই এক অলৌকিক ঘটনা। সেটা যে কোন আরও উন্নত সুপার-কম্পুটার, যা হয়ত এখনও আবিষ্কার হয় নি, তার চেয়েও মহান। শরীরের কোটি কোটি কোষ এবং হাজার হাজার তাল মেলানো কাজ, আমাদের পৃথিবী গ্রহে সবচেয়ে বড় অলৌকিকতা। যদি তুমি মনকে মুছে ফেলতে জান এবং অস্তিত্বের সাথে ঐকতানে বাস কর , তুমি উপলব্ধি করবে যে যাকে তুমি অলৌকিকতার নামে অন্বেষণ করছ তা আর কিছুই নয় , তা কেবল অস্তিত্বে সমলয়ে ঘটা স্বাভাবিক কার্যকলাপ। তোমার আমিত্ব তাদের কেবল সাধারণ বানিয়ে ফেলে, ব্যাস। তোমার জ্ঞান তাদের নীরস যুক্তিতে নামিয়ে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন : জেনাও আমরা কেন দুঃখ পাবার সিদ্ধান্ত নিই?

সুন্দর প্রশ্ন! আমাদের যখন খুশী হয়ে বাস করাকে পছন্দ করতে পারি, আমরা দুঃখকষ্ট কেন বেছে নিই?

দ্যাখো, তুমি তোমার সত্তাকে জান না, যেটা তোমার আসল পরিচয়। সময়কালে তুমি বহির্জগতের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে শুরু কর এবং নিজের এক কৃত্রিম পরিচয় সৃষ্টি কর। এই মিথ্যা পরিচয় দ্বারা তুমি বহির্জ গতের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পার। এই মিথ্যা পরিচয় তোমার আমিত্ব। তোমার ওপরে অন্যদের সেঁটে দেওয়া লেবেল দিয়ে নিজের পরিচয় তৈরি হয়েছে। তুমি জান না আসলে তুমি কে।

ধর, যদি জিজ্ঞাসা করি যে তুমি কে, তুমি কি বলবে? তুমি বলবে, 'আমি অমুকের বাবা' অথবা 'আমি অমুকের বোন' অথবা 'আমি ডাক্তার' বা এরকম সব বলতে থাকবে। কিন্তু এই সব পরিচয়গুলি কি? সেগুলি কেবল তোমার সম্বন্ধতা ও পেশা। তুমি তোমার বাবার মেয়ে, পতির পত্নী, বাচ্চাদের মা। কিন্তু তুমি নিজের কি?

তুমি এখন বিদ্যমান আছ কেবল সম্বন্ধে ও পেশায়। তাকে ভিত্তি করে তোমার আমিত্ব তৈরি হয়ে ছে। তোমার পরিচয় কেবল এর মধ্য দিয়েই হয়। তাই সর্বদাই তোমার পরিচয় হারাবার ভয় থাকে। এটা একটা মনুষ্য -নির্মিত ভঙ্গুর জিনিষ এবং তাই এটা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তোমায় এত বেশী পরিশ্রম করতে হয়।

তোমার সহজাত স্বভাব হল 'একাকী থাকা।' যখন তুমি তোমার মায়ের গর্ভে ছিলে, তুমি একা ছিলে। প্রকৃতপক্ষে তুমিই নিজের জন্য যথেষ্ট। এটাই তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা স্বকীয়তা। সময়কালে তাকে ব্যক্তিত্ব ছেয়ে ফেলেছে। স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব স্বাভাবিক; ব্যক্তিত্ব সামাজঘটিত।

এটা এরকম, একটা পার্সেল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় এবং প্রতিটি জায়গায় তাতে নানা বিষয় লিখে সিলমোহর লাগানো হয়। পার্সেলে লেখা ও মোহরগুলি কিন্তু পার্সেল নয়, তা তো ভিতরের জিনিষটা, তাই নয় কি? একই ভাবে তোমার ওপরে লোকেরা যে সিলমোহর লাগায়, সেগুলি তুমি নও; তুমি তো তার ভিতরের জিনিষ।

সময়কালে এই মোহরগুলিকে নিয়ে তোমার আমিত্ব নির্মিত হয়েছে এবং তাকে পরিপোষণের জন্য তোমার বেশী ও আরও বেশী লোকের দরকার। তাই লক্ষ্য করে থাকবে যে তুমি একেবারেই একা থাকতে পার না , নিজের সাথে থাকতে পার না। যখন নিজের সাথে থাক, তুমি অপরের কথা শোন না ও আমিত্বকে পরিপোষণ কর না। তোমার আমিত্ব অভুক্ত থাকে। তাই তুমি কি কর? তুমি কমপক্ষে টেলিভিশন চালিয়ে দেখতে থাক!

একটা ছোট গল্প :

> এক দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক দলের এক নেতা মৃত্যুমুখে পড়েছেন।
> তার বন্ধুরা জানতে পারল সে তার আসন্ন মৃত্যুকালে বিরোধী দলকে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা অবাক হ'ল ও তাকে জিজ্ঞাসা করল সে এমন কেন করল।
> নেতা উত্তর দিল, 'ও! আমি চাইছিলাম বিরোধীদলের কেউ মারা যাক!'

আমাদের কৃত্রিম পরিচয় এতই দৃঢ়! তা আমাদের কাছে এত কঠিন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে যে তা আমাদের অন্ধ করে অন্যকিছু দেখতেই দেয় না। এমনকি মৃত্যুর সময়েও আমরা আমাদের মানসম্ভ্রম বা প্রেস্টিজ ফেলতে পারি না! আমরা অচেতনভাবে বাঁচি ও মরি।

ব্যক্তিত্ব, যা তোমার একমাত্র নোঙর করার স্থান, সেটা হারাবার ভয়ই হল যেভাবে ব্যবহার করছ তার কারণ। তাই আমরা বলি যে তোমার আমিত্ব তোমার সাথে খেলছে। আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটা হল তোমার ব্যক্তিত্বকে মুছে ফেলা , তোমার নকল পরিচয়কে ফেলে দেওয়া।

এটা হতে পারে যখন তুমি প্রত্যক্ষ করা শুরু কর। যখন প্রত্যক্ষ করা শুরু কর, তুমি উপলব্ধি কর যে তুমি সেই পার্সেলের ভিতরের জিনিষ, তাতে লাগানো লেবেলগুলি নও। যখন এই জাগরণ ঘটে, তোমার কোন লেকচার বা উপদেশ বা শিক্ষা বা ধর্মোপদেশের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন : আমাদের মাস্টার, যদি আমরা আপনার কাছে সমর্পণ করি, আমাদের আমিত্বের কি যত্ন নেবেন?

প্রথমত যদি সত্যি সত্যি সমর্পণ কর, তুমি জীবনমুক্ত হবে। সেখানে 'যদি সমর্পণ করি' কথাই উঠবে না। কিন্তু তর্কের খাতিরে,

যদি তুমি আমাকে তোমার ওপরে কাজ করতে দাও, আমি তোমার আমিত্ব ছেঁটে ফেলব এবং তাকে একটা বন্‌সাই গাছের মত রাখব, যতক্ষণ না তুমি আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে হারাও ও জীবনমুক্ত হও।

ব্যবসা চালাবার জন্য, দৈনন্দিন কাজ করার জন্য, অপরকে আঘাত না করার জন্য এবং নিজের জন্য যথেষ্ট আমিত্ব তোমার থাকবে। তোমার আমিত্ব হবে ভাজা বীজের মত যা থেকে আর গাছ হবে না।

যে মানুষ এখনও জীবনমুক্ত হয় নি, তার মধ্যে আমিত্ব কোন না কোন ভাবে আছে, এটা বোঝ। কিন্তু তোমার আমিত্ব সক্রিয় বা অক্রিয় হোক, যত বেশী প্রত্যক্ষ করতে থাক, তত তোমার আমিত্ব দ্রবীভূত হবে। এখনের জন্য এটা বুঝলেই যথেষ্ট।

সাধারণ মানুষের সাথে তুমি সহজেই তোমার আমিত্বকে রক্ষা করে রাখতে পারবে এবং সেই পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসবে। কিন্তু মাস্টারকে কখনও প্রতারিত করা যায় না। মাস্টারের সাথে প্রতারণা করেছ ভেবে তুমি কেবল নিজেকেই প্রতারিত করতে পার। নিজের আমিত্ব ও ধূর্ততাকে যতই ভাল করে ঢেকে রাখ বা লুকিয়ে রাখ , মাস্টারের স্থিরদৃষ্টির সামনে সবই অনাবৃত হয়ে যায়। যখন তুমি তা রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, মাস্টার তা নিরাময় করতে চেষ্টা করেন। কেবল তিনিই জানেন আমিত্বের ক্যান্সার কি জিনিষ।

তোমাদের ভগবৎ গীতা থেকে কিছু বলি। ভগবৎ গীতা হ'ল বিশ্বের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত শিক্ষণ।

ভগবৎ গীতায় শুরুতে অর্জুন বিভ্রান্ত ছিল।

তিনি বলেন, 'হে ভগবান! আমি জানি না জীবনে কি করতে হবে। দয়া করে আমাকে গাইড করুন।'

কৃষ্ণ তাকে সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যা করেন - আত্মায় পৌঁছুবার পথ।

তারপর তিনি কর্মযোগ ব্যাখ্যা করেন, তারপর ভক্তিযোগ, তারপর কর্মসন্ন্যাসযোগ, তারপর জ্ঞানকর্মযোগ, পরে রাজবিদ্যাযোগ এবং আরও অনেক।

১৮ অধ্যায়ে ৭০০ শ্লোকের মাধ্যমে তিনি নানাপ্রকার ধ্যানপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন।

সবশেষে অর্জুন বলেন, 'কৃষ্ণ, তুমি যখন ব্যাখ্যা করা শুরু করলে, তার থেকে এখন আমি আরও বেশী বিভ্রান্ত। এখন আমি কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করব? কোন প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে ভাল ও শীঘ্রতম?'

কৃষ্ণ তার উত্তর দেন সবশেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে।

যে কোন মাস্টারের ক্ষেত্রে যে কথা দিয়ে তিনি শেষ করেন, তাই চূড়ান্ত, অটল ও চরম সত্য।

কৃষ্ণ বলেন, 'সর্ব ধর্মম্ পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ, অহম্ ত্ব সর্বপাপেভ্য মোক্ষ্যয়িষ্যামি মা সুচঃ।'

আমরা যদি সমস্ত ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থকে পাত্রে দুধ বলে ভাবি, তার থেকে নিষ্কাশিত মাখন হ'ল কৃষ্ণের বলা এই শ্লোকটি।

তিনি বলেন, 'আমি সর্বপ্রকার বিচার তোমায় ব্যাখ্যা করেছি। সব কিছু আমাতে শুধুমাত্র সমর্পণ করে দাও । আমাতে সমর্পিত থাক এবং আমি তোমার যত্ন নেব। আমি তোমাকে তোমার সকল পাপ থেকে মুক্ত করব এবং তোমাকে মুক্তিতে উন্নীত করব।

কৃষ্ণ এই শ্লোকে আসলে এক সুন্দর প্রতিজ্ঞা করছেন।

এই পংক্তিতে কৃষ্ণ বিশ্বকে দেখাচ্ছেন যে সমর্পণ হ'ল চূড়ান্ত, দৃঢ় ও চরম প্রক্রিয়া - আমিত্বহীন অবস্থায় যাবার সর্টকাট, মুক্তির পথ।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের আরেকটা সুন্দর গল্প :

> এক সন্ধ্যায় কৃষ্ণ ও অর্জুন একসাথে সময় কাটাচ্ছেন। কৃষ্ণ হঠাৎ একটা কাকের দিকে নির্দেশ করে বললেন , 'অর্জুন, সবুজ কাকটা দেখ!'
> অর্জুন সেই দিকে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ কৃষ্ণ, আমি তা দেখছি!'
> কয়েক মিনিট পরে কৃষ্ণ অকস্মাৎ বলেন, 'অর্জুন, ঐ কালো কাকটা দেখ!'

অর্জুন বলেন, 'হ্যাঁ কৃষ্ণ, আমি দেখছি!'
কৃষ্ণ কেবল অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, 'অর্জুন, তুমি কেমন বোকা! সবুজ কাক তো হয়ই না। প্রথমে কিভাবে তুমি তা দেখলে?'
অর্জুন বললেন, 'কৃষ্ণ, যখন তুমি বললে ওটা সবুজ কাক, আমি সেটাকে সবুজ কাক দেখলাম।'

অর্জুনের বিচারবুদ্ধি কৃষ্ণতে সমর্পিত ছিল। মাস্টারের কাছে নিজের বিচারবুদ্ধি সমর্পণ সবচেয়ে কঠিন কাজ। মাস্টার নিজেই অস্তিত্ব; তিনি আকারের মধ্যে নিরাকার। মাস্টার যা বলেন তা যখন তোমার বিচারবুদ্ধি হৃদয়ঙ্গম করে, তুমি সমর্পণের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছ।

সমর্পণ কি? এই শব্দটির এক গভীর অর্থ আছে। এই অর্থ সঠিকভাবে না বুঝলে আমরা সমর্পণকে ভুল বুঝব! আমরা এক ভীষণ ভুল করব। আমরা গভীর সত্যকে ভুল বুঝব।

একটা ছোট গল্প :

দুই মাতাল রাস্তা দিয়ে একটা হ্যালোজেন লাইটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।
একজন তা দেখে বলে ওঠে, 'দ্যাখ, আমাদের জন্য সূর্য উঠেছে!'
অন্যজন বলে, 'না। এখন তো রাত্রিবেলা; এটা চাঁদ।'
প্রথম জন বলতে থাকে, 'এটা হলুদ রঙের এবং তাই এটা সূর্য।'
তৃতীয় আরেকটি মাতাল তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।
তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মশাই, দয়া করে বলুন, এটা সূর্য না চাঁদ।'
লোকটি উত্তর দিল, 'আমি এই পাড়ায় নতুন; আমি জানি না।'

তাই যে জানে না তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি হয় উত্তর পাবে না অথবা ভুল উত্তর পাবে।

কেবল যারা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তারা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারে। যদি তুমি সমর্পণের মানে এমন একজনকে জিজ্ঞাসা কর যার অভিজ্ঞতা হয় নি, সে বলবে, 'কেবল সবকিছু ঈশ্বরকে দিয়ে দাও, ব্যাস।'

তা তো সমর্পণ নয়।

একজন আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'যদি আমি সবকিছু ভগবানকে সমর্পণ করি, তাহলে কি সব ঠিক হয়ে যাবে?'
আমি উত্তর দিই, 'হ্যাঁ, যদি তুমি ভগবানকে সত্যি সত্যি সমর্পণ কর, সব মঙ্গল হবে।'
সে তিন দিন পরে ফিরে এলো ও বলল, 'স্বামীজী, আমি সবকিছু ভগবানকে সঁপে দিয়েছি।'
আমি খুশী হলাম ও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কোথায় যাচ্ছ?'
সে উত্তর দিল, 'পানশালায়।'
সে বলতে লাগল, 'আমি যা কিছুই করি, এখন থেকে ভগবানই দায়ী।'

এটা আসলে একটা নিজেকে ধোঁকা দেবার প্রক্রিয়া। যদি সে সত্যি সত্যি সমর্পণ করে থাকত, সে তার পান করার অভ্যাসও সমর্পণ করে থাকত। সে আর পান করতে পারতই না।

ভারতের জীবনমুক্ত মাস্টার পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দরভাবে বলেন, 'যখন আসল সমর্পণ হৃদয় থেকে আসবে, ঈশ্বর তোমাকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে গাইড করবেন এবং তুমি কখনও খারাপ কাজ করতে পারবে না। ' যখন সমর্পণ অন্তর থেকে হয় না এবং কেবল কথায় হয়, তখন তুমি নিজেকে ও অন্যদের ধোঁকা দাও।

সমর্পণ সর্বদা তোমায় অস্তিত্বের কথা মনে করাতে থাকবে। ধীরে ধীরে তুমি তোমার পরিচয় হারিয়ে ফেলবে , আমিত্ব মুছে যাবে। পুরাতন হিন্দু মহাকাব্য ভাগবতম্-এ একটি পংক্তিতে এক কৃষ্ণপ্রেমী গোপী বলেন, 'আমি কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। আমি আমার মন তাঁকে সমর্পণ করে ফেলেছি। যদি আমাকে আর কিছু চিন্তা করতে হয় , আমাকে আমার মনকে তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তা আমি কি করে করি?'

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ কয়েকদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তিনি বহু মানুষকে নানা রোগ থেকে নিরাময় করেছিলেন।

কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি আপনার মনকে নিজের রোগের দিকে একটু সময়ের জন্য রেখে তা নিরাময় করুন না কেন ?'

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি আমার মন অসীম শক্তিতে সমর্পণ করেছি। কিভাবে আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আমার রোগের ওপরে রাখি!'

এটাই যথার্থ সমর্পণ।

মহাজাগতিক শক্তি আমাদের যত্ন নেবে। তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার , 'আমি সমর্পণ করলে কি এই মহাজাগতিক শক্তি আমার সমস্যাগুলির সমাধান করবে?' ভগবৎ গীতায় কৃষ্ণ সুন্দরভাবে উত্তর দেন, বরঞ্চ প্রতিশ্রুতি দেন, 'অন্য কোন চিন্তা ছাড়া যখন একজন মানুষ কেবল আমায় ভাবে, তখন আমি তার উপহারগুলির যত্ন নেব এবং সেগুলিকে তার জন্য রেখে দেব বা সে যাতে সেগুলি উপভোগ করতে পারে, তার জন্য প্রযত্নশীল হব। যারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমার কাছে সমর্পণ করে, আমি তাদের অর্থাগম ও সমৃদ্ধির জন্য প্রযত্নশীল হই। তাদের সমস্যাগুলি মিটে যায়।'

যথার্থ সমর্পণ করার জন্য অঙ্গীকার ও মনের পরিপক্বতা প্রয়োজন। তোমাকে ভগবান বা কোন মাস্টারের কাছে সমর্পণ করতে হবে। যে কোন কিছুতে তুমি সমর্পিত হতে পার। সমর্পণ নিজেই এক সদ্ গুণ এবং তাতে অনেক বল থাকে। যখন সমর্পণ কর, তখন তুমি স্বীকার করছ যে তোমার অহং থেকে আরও বড় কোন জীবনী-শক্তি আছে, ব্যাস।

বাস্তবে তোমার সমর্পণের জন্য ভগবান এক অছিলা মাত্র। সমর্পণ কাজটি হল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান লক্ষ্য নয় ; সমর্পণ লক্ষ্য। যখন তুমি সমর্পণ কর অথবা যখন তুমি তোমার আমিত্বকে হারাও , তখন তুমি অস্তিত্ব থেকে আর আলাদা সত্তা নও; তুমি অস্তিত্ব বা ভগবানের সাথে মিশে গেছ। তুমি তখন বুঝতে পার যে কোন ভগবান উপরে বসে নেই। এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র জুড়ে কেবল অস্তিত্ব আছে এবং সেই অস্তিত্বতে তুমিও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ হয়ে আছ !

একটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষ সমর্পণ করার নির্ণয় নিল, কিন্তু কাকে করবে জানে না। সে ঠিক করল যে বনে যাবে ও সেখানে প্রথমে যে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সমর্পণ করবে। সে বনে গেল ও অপেক্ষা করল।
> বনে প্রথম যে লোকটির দেখা পাওয়া গেল, সে ছিল পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে আসা এক সিঁধেল চোর।
> এই চোরের পায়ে ধরে মানুষটি তাকে নিজের গুরু বলে স্বীকার করল ও তার ওপরে সম্পূর্ণ সমর্প ণ করার ঘোষণা করল।
> চোর ঘাবড়ে গেল এবং কি করবে বুঝতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় , 'ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তোমার চোখ বোজ এবং আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাক' এবং সে দৌড়ে পালাল।
> মানুষটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল এবং সে সেখানে লম্বা সময় ধরে কিছু না খেয়ে ও না ঘুমিয়ে বিদ্যমান থাকল।
> গল্পে বলা হয় যে মানুষটির প্রতিজ্ঞা দেখে ভগবান তার কাছে আবির্ভূত হলেন এবং তাকে মুক্তি দিলেন !

কাকে সমর্পণ করছ তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হ'ল পূর্ণ সমর্পণের চিন্তা এবং সেই চিন্তায় এমন শক্তি আছে যা তোমার জীবনকে আনন্দময় রূপে পরিবর্তিত করে দেয়। সমর্পণ করলে তুমি অস্তিত্ব নামক অক্ষয় বা অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হও এবং তোমার পথে যা হবে তাকে পরিচালনা করতে পারবে।

যা কিছু হোক না কেন, তুমি সবল ও অটল হয়ে যাবে। তোমার আশেপাশের লোকেরা তোমাকে তেজের এক স্তম্ভ হিসাবে পাবে। তারা তোমার মাধ্যমে অস্তিত্বের অদৃশ্য হাত অনুভব করতে সমর্থ হবে।

যদি সমর্পণ না করতে পার, তার অর্থ তোমার আমিত্ব তোমাকে পিছনে টানছে এবং তোমায় অসীমের সাথে মিশতে দিচ্ছে না; তুমি স্বতশ্চলভাবে তোমার রসদ ও শক্তিতে সীমিত হয়ে পড়।

তোমাকে সমর্পণে সাহায্যের জন্য মাস্টার হলেন এক পরিকল্পনা। সমর্পণ মানে এই নয় যে তুমি কারও ওপরে নির্ভরশীল। তার সোজা অর্থ হল যে তুমি নিজের আমিত্বকে মুছে ফেলার জন্য সেই মানুষটির সাহায্য নিচ্ছ , ব্যাস।

প্রশ্ন : আপনি কি ধ্যান সম্বন্ধে আরও বলবেন এবং তা কিভাবে আমাদের আমিত্বকে মুছে ফেলতে সাহায্য করতে পারে ?

হ্যাঁ, প্রথমে তোমাদের বলি কিভাবে ও কেন ধ্যান-প্রক্রিয়াগুলি এল।

মানুষ তার সৃষ্টির শুরু থেকে বিস্মিত হয়েছে ও গবেষণা করেছে যে এই সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কি থেকে হয়েছে ; এই সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি কি থেকে হয়েছে এবং তাকে মহাকাশে ঘূর্ণমান কে করেছে; কি থেকে নদীগুলি প্রবহমান ও পর্বতগুলি উচ্চমান হয়। সে সিদ্ধান্তে আসে যে একটা বল বা শক্তি এইসব পরিচালনা করছে। সে সিদ্ধান্তে আসে যে এক বিরাট শক্তিই সবকিছু চালাচ্ছে। সে

তখন অবাক হতে থাকে যে সেই শক্তির সাথে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

প্রথম মানুষেরা যারা অনুসন্ধান বা রিসার্চ করে এইসব সিদ্ধান্তে আসেন এবং এই শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করেন, তাঁরা ছিলেন ঋষি বা জীবনমুক্ত মাস্টার। জীবনমুক্ত হবার পরে তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই শক্তির উপলব্ধির জন্য নানা পথ সৃষ্টি করেন। তাঁদের প্রত্যেকের দেওয়া বিভিন্ন পথগুলিই হ'ল নানাপ্রকার ধ্যান-প্রক্রিয়া এবং ধর্ম।

তাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে বিভিন্ন পথে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাদের খুঁজে পাওয়া পথ স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ বা রেকর্ড করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা তাদের আবিষ্কারের ওপরে যেভাবে রিসার্চ-রিপোর্ট বানান, ঠিক তেমনি। প্রত্যেক ঋষি তাঁর জীবনমুক্তির ওপরে একটা রিপোর্ট দেন এবং সেটা হয়ে যায় একটা ধর্ম বা একটা ধ্যান-প্রক্রিয়া।

এইসব আদি আত্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ড-পরিচালক জীবনীশক্তির এই ধারণাগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন ধর্ম তৈরি করেন। এই জীবনীশক্তিগুলিকে আমরা বলি যীশু, আল্লা, শিব এবং আরও কত কি। তোমাকে কোন ভগবানকে বিশ্বাস করতে হবে না। নাস্তিক কোন ভগবানে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাকে তো নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে হবে, তাই নয় কি? আমরা যদি নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি এবং 'আমি কে?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি, সেটাই ধ্যান-প্রক্রিয়া হয়ে যায় এবং আমরা ভগবান লাভ করি। যাই হোক, এই বিভিন্ন ধ্যান-প্রক্রিয়াগুলি সময়কালে বিভিন্ন ধর্ম হয়ে যায়।

কিন্তু তার পরে কি হল? নানা ধর্মের পিছনে এই মৌলিক ধারণাগুলি ফেলে দিয়ে লোকেরা ধর্মের নামে যুদ্ধ করতে শুরু করল।

একটা ছোট গল্প :

> এক তামিল, এক ইংরেজ, এক উত্তর ভারতীয় এবং এক বাঙালী একসাথে ভ্রমণ করছিল। তারা দূর থেকে একটা হ্রদ দেখতে পেল।
> তামিল তাকে দক্ষিণ দিক থেকে দেখল ও তাকে বলল তান্নির - জলের তামিল শব্দ।
> ইংরেজ তা খেল পশ্চিমদিক থেকে এবং বলল ওয়াটার।
> উত্তর ভারতীয় হ্রদটিকে উত্তর দিক থেকে দেখে বলে পানি।
> বাঙালী তাকে দেখল পূর্বদিক থেকে এবং বলল জল।
> চারজন সবাই একই জিনিষ সম্বন্ধে বলছিল, জল। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে, প্রত্যেকে নিজে ঠিক বলে দাবী করতে থাকে।
> চারজনের কেউই হ্রদে নেমে জলকে নিজে পরীক্ষা করতে উদ্যত হল না। তামিলভাষী বলতে থাকে তার দাদু তাকে কি বলেছিল, ইংরেজ দাবী করে যে তার ঠাকুর্দা তাকে ওয়াটার বলতে শিখিয়েছিল ; উত্তর ভারতীয় এবং বাঙালীও তাদের নিজের নিজের দাদুর কথা আঁকড়ে থাকল।
> তারা হ্রদের একটু জল মুখে না দিয়েই লড়াই শুরু করে দিল।

আমরা হুবহু এটাই করি। যারা ধর্ম নিয়ে লড়াই করে, তারা এই জিনিষই করছে। তাদের বুঝতে হবে আদি আত্মজ্ঞানীরা যে স্থান থেকে দেখেছিল, সেই স্থান থেকে তাঁরা তার নাম দিয়েছিল; কিন্তু সবই এক - অস্তিত্ব বা ঈশ্বর। কৃষ্ণ ও ক্রাইস্ট একই জিনিষ বোঝাচ্ছেন। মানুষেরা তাদের আলাদা আলাদা স্থান থেকে দেখছে, ব্যাস।

সেই চারটে মানুষ হ্রদে না নেমে তাদের পূর্বপুরুষেরা কি বলেছিল তা নিয়ে লড়াই করছে ! কি হবে? তারা কেবল লড়াই করবে কারণ তারা প্রত্যেকে ভাবে যে তাদের ঠাকুর্দা যা বলেছে সেটাই ঠিক। যদি তারা ঠাকুর্দা কি বলেছে তা সরিয়ে রেখে হ্রদে গিয়ে নামত এবং নিজেরা দেখত, তাহলে তারা বুঝত যে সবার ঠাকুর্দা একই জিনিষ বুঝিয়েছিল ! তবে কোন লড়াই হোত না।

আজকে যারা হ্রদে নামে নি ও তার জল মুখে নেয় নি , তারাই লড়াই করে চলেছে। ধর্মের নামে যারা আতঙ্কবাদ ছড়াচ্ছে তারা আধ্যাত্মিকতা নামক সেই হ্রদে নামে নি এবং সত্য আস্বাদন করে নি। যুদ্ধরত চারজন হ্রদের তীরে লড়াই করছে। তাই বুঝে নাও কর যে সত্য বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যাস।

ধ্যানের কথায় ফিরে আসি। সহজে বলতে গেলে ধ্যান হ'ল তোমার মনকে আরাম করতে দেওয়া, ব্যাস। ধ্যান অর্থ একাগ্রতা (concentration) বা পূর্ণ-মনোযোগ নয়। একাগ্র হলে তুমি আসলে তোমার মন থেকে সবকিছু বাদ দেবার চেষ্টা করবে , আর সেটা অসম্ভব কাজ।

দুই মিনিট কেবল বসো এবং মন থেকে সব কিছু বাদ দেবার চেষ্টা কর; তুমি পাগল হয়ে যাবে! যাই তুমি বাদ দেবার চেষ্টা কর, তা ফিরে আসবে ও তোমাকে অত্যাচার করবে। তাই একাগ্রতা ধ্যান নয়। ধ্যান হ'ল সহজেই সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা ও স্বস্তিতে

থাকা।

যখনই সময় পাও, শুধুমাত্র রিল্যাক্স (আরাম) কর এবং চারপাশের সবকিছু সম্বন্ধে সজাগ হও। আশেপাশে হওয়া সমস্ত শব্দ তোমার হৃদয় দিয়ে শ্রবণ কর। পাখীর ডাক, হাওয়ায় ক্যালেন্ডারের পাতা ওড়ার শব্দ, তোমার ওপরে ফ্যানের আওয়াজ, চারপাশে মানুষের কোলাহল অথবা অন্য যা কিছু হতে পারে। উন্মুক্ত হৃদয় দিয়ে শোন। মনে করিয়ে দিই , সেগুলি সব বিরক্তিকর নয়। তুমি তাদের সাথে প্রবহমান হ'লে তাদের বিরক্তিকর লাগবে না। যখন তাদের সাথে প্রবহমান হও, তারা বিরক্ত করা বন্ধ করে।

এটা করতে করতে তুমি উপলব্ধি কর যে তোমার ভিতরে এক প্রকার নির্দিষ্ট নীরবতা , এক যৌগিক অন্তঃসার আছে, যা সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করছে। তুমি বেশী, আরও বেশী করে সেই অন্তরের নীরবতা বা শান্তি সম্বন্ধে সজাগ হতে থাকবে। তুমি তোমার অন্তরের সেই শান্তির আভাস পেতে থাকবে।

ধীরে ধীরে তুমি তোমার শরীরের চেতনা হারিয়ে ফেলবে। তোমার কেবল সজাগতা থাকবে , নিজেকে কেবল তোমার সজাগতা দ্বারা অনুভব করবে, তোমার শরীর বা মন দ্বারা নয়।

ধ্যান তোমাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে জীবনে তুমি কেবল এক দ্রষ্টা। তা তোমাকে তোমার স্বরূপ বা সত্তার গভীরে কেন্দ্রিত করতে সহায়তা করবে ও তোমার বহির্জগতের কাজগুলি আরও অধিক দক্ষতা ও আনন্দের সাথে করে যেতে সাহায্য করবে। কারণ তখন তুমি তোমার অন্তরের শান্তি বহন করবে, যা তোমাকে কোনকিছুতে বিহ্বল ও বিচলিত হতে দেবে না। যদি তুমি এটা করতে থাক, তুমি 'আমি' ও 'আমার'-কে ছাড়তে শুরু কর। তোমার আমিত্ব বা অহংভাব মুছে যায়। তোমার আমিত্ব আর কিছুই নয়, সেটা হল নিজের দেহ ও মন সম্পর্কে তোমার প্রবল অনুভূতি ও পরিচিতি।

আমরা ধ্যানের জন্য বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি, তার সম্পর্কে তুমি কি মনে কর? ধ্যান হ'ল বিশ্বশান্তির একমাত্র চাবিকাঠি। যখন তুমি অন্তরে দেখতে শুরু কর , তুমি বহির্জগতের ধনদৌলত, ক্ষমতা, প্রতিশোধ ইত্যাদি উন্মত্ততা দ্বারা প্রভাবিত হও না। তোমার সকল মূল শক্তিগুলি উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। সমষ্টি গত চেতনায় এক পরিবর্তন আসবে এবং স্বতশ্চলভাবে শান্তির বিজয় হবে।

তাই আমি ব্যক্তিগত রূপান্তরে ফোকাস্ করছি। যখন একদল মানুষ অভিজ্ঞতামূলক উপলব্ধি দ্বারা রূপান্তরিত হয় , তারা পালাক্রমে নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে এবং তা সমাজে এক সকারাত্মক নতুন মানসিক গঠন সৃষ্টি করতে থাকবে।

তোমার উপলব্ধি অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত, রূপান্তর সম্ভব নয়। ধ্যান তোমার উপলব্ধিকে অভিজ্ঞতা বানাতে পারে। ধ্যানই ব্যক্তির রূপান্তরের একমাত্র আশা, সুতরাং মানবজাতির রূপান্তরের আশা।

ধ্যান করলে বুদ্ধি বাড়ে। তুমি সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝতে আরম্ভ কর। বিকল্পের জন্য কাউকে আর জিজ্ঞাসা করার দরকার তোমার নেই। তুমি সহজেই জান , ব্যাস। নিজের অন্তর্বুদ্ধির সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য তুমি জান। তুমি জান যে তা ভুল হতে পারে না।

তুমি তোমার সত্তা থেকে জানবে যে তুমি সঠিক পথে আছ। পথচলা কখনও কঠিন হতে পারে , কারণ তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিপক্ষে, কিন্তু তুমি জান যে পরিণতি সুন্দর ও মুক্তিদায়ক হবে! তোমাকে কেবল অধ্যবসায়ী হতে হবে ও নিজের বুদ্ধিতে গভীর আস্থা রাখতে হবে।

নিজেকে ধ্যান দ্বারা প্রতিপালন করলে, তোমার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তুমি বহির্জগতে অনেক কিছু করতে পা রবে। তুমি কি করবে ও কি প্রকাশ করতে পারবে, তার কোন সীমা নেই। তুমি নানা মাত্রায় নিজেকে বাড়তে দেখবে।

আমিত্ব দ্বারা কাজ না করে অন্তর্বুদ্ধি দ্বারা কাজ করে তুমি দেখবে সবকিছু তোমার কাছে সহজেই আসছে। যখন কোন কিছু তোমার কঠিন লাগে, তার কারণ তোমার আমিত্ব তোমাকে সেই জিনিষ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে হারিয়ে অস্তিত্বের সাথে মিশে যেতে থাকলে কিছুই জটিল হবে না; তুমি সহজেই প্রবহমান হবে। তোমার বুদ্ধি স্বতশ্চলভাবে তোমার ভিতরের সেই অস্তিত্ব - শক্তিকে গুছিয়ে নেবার জন্য কাজ করবে।

তুমি নিজেকে এক অলৌকিক মানুষ হিসাবে দেখতে শুরু করবে ! যা আগে দুরূহ মনে হত, এখন হঠাৎ তা সহজ লাগবে। তুমি অনভিজ্ঞতা থেকে গভীর সজাগতায় চলে যাবে।

প্রশ্ন : যখন আমরা গভীর স্বপ্নবিহীন-নিদ্রায় থাকি এবং আমরা সঠিকভাবে ধ্যানে থাকি, আমরা কি তখন এক 'মন-নেই' অবস্থায় থাকি?

না। গভীর নিদ্রায় তুমি বীজের স্তরে চলে যাও এবং জাগলে নিদ্রার আগে যে অবস্থায় ছিলে সেই অবস্থায় ফিরে আস। এতে কোন উন্নতি হয় না। সঠিক ধ্যানে থাকলে তুমি বীজ অবস্থায় যাও, বীজের বিদারণ ঘটে এবং তুমি পরবর্তী উচ্চতর অবস্থায় চলে যাও। সেটাই পার্থক্য। তারা দুটো চরমসীমা। অবশ্যই তুমি যখন বাইরে থেকে দ্যাখ, চরমসীমাগুলিকে সর্বদা একই লাগে। এক পাগলকে অতীন্দ্রিয়বাদী (mystic) মনে হয় এবং এক অতীন্দ্রিয়বাদীকে পাগল মনে হয়! তাদের দুজনেই তাদের মনদুটি হারিয়েছে, কিন্তু আলাদা আলাদা দিকে।

প্রশ্ন : আপনি সর্বদাই এত সুন্দর কিভাবে থাকেন?

(স্বামীজী হাসেন!)

হ্যাঁ, আকর্ষণীয় প্রশ্ন! কিভাবে সবসময়ে আমাকে সুন্দর মনে হয়?

দ্যাখো : যদি তুমি কেবল আমার এই আকারকে সুন্দর দেখ, যে আকারের দিকে তুমি আকর্ষিত হও, তাহলে সেই আকর্ষণ সময়ের সাথে টলতে থাকবে। তা টলতে থাকবে পরিস্থিতি, বেশভূষা এবং আরও কত কিসে। কেবল ভাব : তুমি রোজ আমায় একই পোশাকে দেখছ, একই গান শুনছ, একই আওয়াজ শুনছ এবং তা সত্ত্বেও তুমি এখানে কত ঔৎসুক্য নিয়ে আছ। তুমি কি মনে কর এমনটি তুমি জীবনে আর কারও সাথে করতে পারবে? বোঝ যে, এটা ব্যক্তিটি নয়, এটা উপস্থিতি - যা সুন্দরতা বিকিরণ করে এবং তুমি তা অনুভব কর।

তোমার সম্বন্ধে বলতে গেলে, তুমি হলে এক 'ব্যক্তি।' আমার সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি কেবল এক 'উপস্থিতি', ব্যাস। আমিত্বহীন উপস্থিতি এতই শক্তিশালী যে তা সহজেই তোমায় আকৃষ্ট করে। আমার চেয়ে কত সুন্দর ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ মডেল ও অভিনেতা আছে, ঠিক? তাদের সবার দিকে তুমি হয়ত আকর্ষিত হবে; কিন্তু এখানকার মত তোমার গভীরের আকুল আ কাঙ্ক্ষা থেকে নয়, ঠিক কিনা?

এই আকুল আকাঙ্ক্ষা তোমার সত্তা থেকে আসে, কারণ তোমার সত্তা আকারের পিছনে দেবত্ব দেখে। সেটাই তোমার সত্তার একমাত্র আকুলতা। তোমার সত্তার জন্য আমিত্বহীন এক উপস্থিতি পরমানন্দদায়ক। তাই তুমি এখানে বারংবার আস !

দ্যাখ : প্রতিটি মানুষের গভীরে ঈশ্বরকে অনুভব করার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তা অধিগম্য (tangible) নয়! যখন তুমি আমায় দেখ, তুমি একটি টান অনুভব কর এবং অবাক হও যে সেই আকর্ষণটি কি? সে টান হ'ল তোমার সত্তার ডাক। তুমি সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু কর এটা কি হতে পারে; তুমি কেবল তোমার মনকে প্রয়োগ করতে জান ও সবকিছুকে যুক্তিতে নামিয়ে আন। ঈশ্বর যুক্তির বাইরে। তাই তুমি তোমার যুক্তি দিয়ে বুঝতে পার না যে এখানে আসার জন্য কেন তুমি একটা টান অনুভব কর।

সবাই এখানে সহজেই বসে থাক আর অবাক হও যে কোন জিনিষটার জন্য তুমি ঘন্টার পর ঘন্টা চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাক। যখন অন্তরের আকাঙ্ক্ষা গভীর হয়, এটা হবে। অনেক জন্ম ধরে তুমি এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছ, কিন্তু অসমর্থ হয়েছ এবং তাই তুমি আবার ফিরে আস; তুমি আরেকটা জন্ম নাও।

এই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলে তোমরা কেউ তাকে অন্বেষণ কর ও অন্তর্দেশে যাত্রা আরম্ভ কর ; আর কেউ ভয় পাও ও পালিয়ে যাও! অথবা তুমি বাইরের বৃত্তে ঘোরাফেরা কর এবং লক্ষ্য করতে থাক যাতে কিছু হলেই তুমি সহজে পালিয়ে যেতে পার ! তাই আমাকে ছল করে শিক্ষা দিতে হয় এবং তোমাকে দেখাতে হয় যে তোমার হয়ে গেছে এবং আর বেশী কিছু করার নেই , কেবল একটা জিনিষকে যেতে দিতে হবে - তোমার আমিত্বকে!

তুমি সর্বদাই ভয় থেকে কাজ কর কারণ তোমাকে সেভাবেই শেখানো হয়েছে। ভয় হ'ল আমিত্বের অক্রিয় আকার। সমর্পণ করে ফেলতে পার বলে তোমার এত ভয় এবং তাই তুমি ভয়ের নাম করে একটা দুরত্ব বজায় রাখ। ভেবো না যে ভয় একধরণের বিনম্রতা। ভয় আমিত্বের এক ভ্রান্তিজনক রূপ। সমর্পণ করতে তোমার কত ভয়। তোমার ভয় যে তুমি গলে যেতে পার, অস্তিত্বে দ্রবীভূত হয়ে যেতে পার।

বোঝ যে অস্তিত্ব হ'ল প্রেম। তা একমাত্র প্রেম এবং অন্য কিছুই নয়। আবার অস্তিত্ব তোমাকে জানে কারণ তুমি তার অংশ। যদি অস্তিত্ব তোমায় না জানে তবে কে তোমায় জানে? তাই ভয় পাবার কিছুই নেই।

অস্তিত্বের সাথে কোন মিথ্যাভিমান করার প্রয়োজন তোমার নেই। তুমি কেবল নিজের সত্তার সহজতা সহকারে থাক এবং অস্তিত্ব

তোমার ওপরে বর্ষণ করতে থাকবে। অস্তিত্ব কেবল প্রেম ও ক্ষমা করতে জানে। সে অন্য কোন গুণ জানে না। তুমি অস্তিত্বকে তোমার আমিত্বপূর্ণ ভাবনা ও তথাকথিত নৈতিক মানদণ্ড দ্বারা বিচার কর; সেটাই সমস্যা।

যখন তুমি জান যে তুমি অস্তিত্বের অংশ, তুমি মুক্ত বোধ কর। যখন তুমি ভাববে যে তুমি অস্তিত্ব থেকে পৃথক, তুমি দুঃখযাতনায় পড়বে। তুমি জান, অস্তিত্বের অংশ হওয়া একটা কত মহান অনুভূতি! তোমার আমিত্বের জন্যই তো তুমি নিজেকে অস্তিত্ব থেকে আলাদা হয়ে আছ বলে ভাব।

যখন তুমি তোমার অন্তর্দেশ যাত্রা শুরু কর, তুমি বেশী করে বুঝতে থাকবে যে তুমি অস্তিত্বেরই অংশ। সজাগতা ধীরে ধীরে আমিত্বকে স্থলাভিষিক্ত করবে। সজাগতা এসে গেলে, আমিত্বকে চলে যেতেই হবে। আর কোন রাস্তা নেই। সজাগতা না আসা পর্যন্ত তুমি নিজেকে এক ভারী স্বতন্ত্র সত্তা মনে কর এবং নিজেকে অস্তিত্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছেদ করে রাখ।

আসলে তোমার কাছে সম্পূর্ণ আকাশ দেখার জন্য আছে। কিন্তু তুমি তাকে তোমার জানালা দিয়ে দেখ, যতটা তোমার আমিত্ব তোমাকে অনুমতি দেয় ততটাই দেখ এবং তুমি মনে কর যে জানালার কাঠামোর মধ্যে দিয়ে দেখা আকাশটাই বাস্তব আকাশ। এই সমস্ত খেলাই হ'ল আমিত্বের খেলা। আমিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হওয়াই আমিত্ব থেকে বেড়িয়ে পড়ার জন্য প্রথম পদক্ষেপ। সজাগতা হ'ল এক সর্বখোল চাবি যা দিয়ে তোমার ভিতরের যে কোন তালা তুমি খুলে ফেলতে পার। তাই বারংবার আমি বলি, সজাগতা নিয়ে এস।

প্রশ্ন : স্বামীজী, আমাদের জন্য আপনার চিন্তা কিভাবে বর্ণনা করবেন?

তোমাদের ব্যাপারে আমার একমাত্র চিন্তা হ'ল তোমাদের প্রস্ফুটনে সাহায্য করা। সেটাই মহত্তম কাজ যা আমি তোমাদের জন্য করতে পারি এবং তোমরা আমার জন্য করতে পার! আমি চাই মানুষেরা তাদের সহজাত আনন্দকে হৃদয়ঙ্গম করুক, তাদের অসীম সম্ভাবনার শক্তি উপলব্ধি করুক। ঠিক এখন, মানুষ মনে করে সে এক মনুষ্য সত্তা হয়ে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করছে। তাকে পরিষ্কার করে বুঝতে হবে সে এক আধ্যাত্মিক সত্তা হয়ে মানবিক অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করছে। আমি তাদের সেটা শেখাবার জন্য কাজ করছি।

আর তার সেটা শেখার একমাত্র পথ হ'ল তাকে আমিত্বের নানা আকার সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। আমিত্বের এই নানা আকারগুলি তাকে আধ্যাত্মিক সত্তা না হয়ে মনুষ্য সত্তা হিসাবে অনুভব করায়। মানুষ যখন 'প্রার্থনা করা' থেকে 'হওয়া'-র দিকে চলে, সে চাবিটা পেয়েছে।

প্রশ্ন : ধ্যান করলে রূপান্তর কিভাবে ঘটে? আর আপনি মাস্টারের ভূমিকা সম্বন্ধে আরও কিছু বলবেন?

যখন কেউ ধ্যান করে, তার সমস্ত আবেগগুলি যেমন ক্রোধ, কাম, ঈর্ষা, অতিরিক্ত আসক্তি ইত্যাদি উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ধ্যান তাকে চৈতন্যের ও সজাগতার উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রচালিত করে। তাহলে সে আগের মত অস্থির ও চঞ্চল মত হবে না। শক্তির রূপান্তর কেবল ধ্যান দ্বারা সম্ভব।

যখন এই রূপান্তর প্রত্যেকের মধ্যে হয়, সম্পূর্ণ সমাজ রূপান্তরিত হয়ে যায়। হিংসা কম হবে এবং আরও বেশী বিশ্বব্যাপী ঐকতান হবে। বিশ্বশান্তির সবচেয়ে কার্যকর উপায় হ'ল মানুষের রূপান্তর।

ধ্যান ও মাস্টারের পথপ্রদর্শন দ্বারা রূপান্তর এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে গেলে তুমি যা নও তা ধ্বংস হয়। মাস্টারের সাথে এই যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাও, কারণ তোমাকে হৃদয়ের নিকটের সকল জিনিষগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে; সমস্ত বিষয় যাদের তুমি 'তুমি' বলে ভেবেছিলে।

মাস্টার তোমায় অবিশ্রাম দেখাবেন তুমি কি নও এবং সব কিছু মুছে যেতে থাকবে। তোমার চাপা ভাবনাগুলিকে সামনে আনার জন্য তিনি ঘটনাবলীর সৃষ্টি করবেন। তোমাকে তাঁকে তোমার ওপরে কেবল কাজ করতে দিতে হবে যাতে তিনি তোমার বহুজন্মের সঞ্চিত জিনিষগুলি দূর করতে পারেন।

আমি লোকেদের বলতে থাকি : যদি পালিয়ে যেতে চেষ্টা কর, তুমি মাস্টারকে আরেকবার হারাচ্ছ। পালাতে চেষ্টা করবে না। আমি ঠিক সেই জায়গায় হাত রাখব যেখানে টিউমারগুলি ভিতরে লুকিয়ে আছে, যে টিউমার তোমার অহংবোধ। কেবল আমার ওপরে তোমার বিশ্বাস রাখ এবং উন্মুক্ত হবার সাহস রাখ। আমি তাহলে তোমার সব টিউমার নিরাময় করতে পারব। কেবল মাস্টারের কাছে উন্মুক্ত হলেই অর্ধেক অহংবোধ তোমায় ছেড়ে যায়। বাকীটা তিনি দেখবেন। তোমাকে কেবল হাত বাড়াতে হবে; তিনি তোমায় উঠিয়ে নেবেন, ব্যাস।

যখন তুমি এক আন্তরিক অন্বেষণকারী হও, যখন তুমি রূপান্তরিত হতে তৈরি, তুমি মাস্টারের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং সবকিছু স্বতশ্চলভাবে ঘটবে। যদি তুমি কেবল উইন্ডো-শপার (দোকানে রাখা দ্রব্যগুলিকে যে কেবল ঘুরঘুর করে দেখে, কিন্তু কেনে না) হও, তবে বেশী কিছুই হবে না; তুমি এক মাস্টার থেকে আরেক মাস্টারের কাছে যাবে এবং তাদের কারো থেকে কিছুই শিখবে না।

ধ্যান প্রগাঢ় ভাবে কর। যখন ধ্যানের সাথে প্রগাঢ়তা থাকে, রূপান্তর ঘটতে বাধ্য; অতি-চেতনা ঘটতে বাধ্য। সাধারণত, হয় আমরা কেবলমাত্র প্রগাঢ় এবং ধ্যানকে হারিয়ে ফেলি অথবা প্রগাঢ় না হয়ে ধ্যান করি। আমরা একটাকে ধরি ও অন্যটাকে হারাই। প্রস্ফুটিত হবার জন্য আমাদের দুটোকেই ধরা উচিৎ।

কতক্ষণ ধ্যান করছ তা বড় কথা নয়; কত প্রগাঢ় ও ঐকান্তিক হয়ে ধ্যান করছ তা গুরুত্বপূর্ণ। তোমার চেতনার গুণমান গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্যাত্রার জন্য তোমার সচেতন সিদ্ধান্তই তোমাকে ধ্যান করার জন্য ঐকান্তিকতা দেবে ।

প্রশ্ন : আমরা সর্বদাই জীবনে কিছু অর্জন করে সফল হতে চাই। সেটাও কি আমিত্বের খেলা?

হ্যাঁ, অবশ্যই! তুমি আসল কথায় এসেছ। যখন তুমি ভাব যে জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং তুমি সেই উদ্দেশ্যের পিছনে দৌড়াচ্ছ, তুমি অহংবাদী হচ্ছ। যখন তুমি অস্তিত্বের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম কর এবং তার সাথে প্রবহমান হও , তুমি বুঝবে যে জীবন নিজেই একটা উদ্দেশ্য এবং অন্য যাবতীয় লক্ষ্যগুলি হ'ল ভ্রম বা মায়া। তাহলে তুমি সজাগতা অর্জন করেছ, তাহলে তুমি আর অহংবাদী নও।

মাস্টার তাঁকেই বলা যায় যিনি তোমায় জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা উপলব্ধি করিয়ে দেন। যখন তুমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে খোঁজ , তুমি বাস্তবতাকে হারাও, কারণ যখন উদ্দেশ্যের পিছনে দৌড়াও তুমি বর্তমানকে হারিয়ে ফেল। তুমি অস্তিত্বকে সহজেই হারিয়ে ফেল।

জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা উপলব্ধি করলে তোমার অন্তরে এক নতুন চৈতন্যের উদয় হয়। তুমি তখন বুঝবে, যে হীরাগুলিকে তুমি এতদিন রক্ষা করছিলে, সেগুলি নিছক পাথর। যে জিনিষগুলিকে তুমি গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে, তারা শুধুমাত্র খেলনা। তুমি বুঝতে পারবে প্রকৃত আনন্দ হিসাবে তুমি ধনদৌলতে খুঁজছ না। তুমি ধনদৌলতকে ছাড়িয়ে অন্বেষণ করছ।

তুমি জীবনকে অস্তিত্বের এক ঐশ্বরিক খেলা হিসাবে দেখতে শুরু করবে। তুমি নাটকটি উপভোগ করবে এবং তুমি তোমার ভূমিকা চরম উল্লাস ও উৎকর্ষতার সাথে করবে। তুমি কোন লক্ষ্যের জন্য বাঁচবে না, তুমি কেবল বাঁচার জন্য বাঁচবে এবং বাঁচা উপভোগ করবে।

এটা বোঝ, আমি বলছি না যে তোমার টাকা রোজগার করা বন্ধ করা প্রয়োজন। টাকা ছাড়া তুমি জীবনে কিছুই করতে পারবে না । আমি কেবল বলছি প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচতে উপভোগ কর ও তোমা র লক্ষ্যগুলিকে আনুষঙ্গিক কর। তোমাকে বুঝতেই হবে যে পুরো জিনিষটা একটা নাটক মাত্র এবং তুমি এক অভিনেতা। লক্ষ্যগুলিতে আসক্ত হলে তুমি পুরো ধারণাটাই হারিয়ে ফেল।

নাটকে তোমার ভূমিকা বা অন্য কোন চরিত্র বা কোনকিছুর সাথে আসক্ত হওয়ার কোন মানে আছে কি ? না! সেটা তো একদম হাস্যকর হবে, তাই নয় কি? একইভাবে জীবনও এক বিরাট নাটক; তাই কোনভাবে তাতে আসক্ত হয়ো না। কেবল তোমার ভূমিকা অভিনয় কর এবং সম্পূর্ণ শো উপভোগ কর।

বোঝ যে জীবন এক লক্ষ্য নয়, কিন্তু জীবন নিজেই একটা পথ। লক্ষ্য থাকলে তুমি দৌড়াবে। দৌড়ালে তোমার পা মাটিতে ঠেকবে না। আর পা মাটিতে না ঠেকলে তুমি অস্তিত্বের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলবে। দৌড়ালে তোমার তলায় অস্তিত্বের অনুভব তুমি আক্ষরিকভাবে হারাচ্ছ। যখন তুমি লক্ষ্য সরিয়ে ফেল, স্বতশ্চলভাবে পথকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। পথকে বানানো হয়েছে উপভোগ করার জন্য; লক্ষ্যের যত্ন স্বতশ্চলভাবে নাওয়া হবে।

যখন জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা উপলব্ধি কর, তুমি বেঁচে থাকার অর্থ বুঝতে পার। এটা না বোঝা পর্যন্ত তুমি একপ্রকার অচেতন অবস্থায় জীবন কাটাও। তুমি সঠিক চৈতন্য ছাড়া বাস কর। তুমি এক কঠিন আমিত্ব সহ বাস কর , যা কেবল লক্ষ্য দেখে এবং জীবনের সৌন্দর্যকে দেখে না।

লক্ষ্যের জন্য তোমার সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করা - বাঁচার পদ্ধতি নয়। তুমি যদি এইভাবে বাস কর, প্রত্যেক লক্ষ্যে একবার পৌঁছালে, তুচ্ছ জিনিষের প্রতি সমস্ত জীবন অপচয় করার জন্য তুমি কেবল অনুশোচনাই করবে। লক্ষ্য ফেলে দাও এবং পথটা উপভোগ কর। এই শিক্ষার ওপরে বারবার ধ্যান কর। সত্য নিজেই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে।

আরেকটা জিনিষ : তোমার জীবন থেকে কোন কিছুই বাদ দিও না এবং কখনও ভেবো না যে জীবনে বিশেষ কিছু জিনিষ পেলে

না। আধ্যাত্মিকতা কখনও বাদ দেওয়া নয়; তা সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত করে। জীবন থেকে কোন কিছু বাদ দিলে, তুমি কিছু হারাবে। বরঞ্চ একীভূত কর এবং সবকিছু অন্তর্ভুক্ত কর। তবেই তুমি সম্পূর্ণ হবে। পূর্ণাত্মা হলে, পুণ্যাত্মা হবে!

অবশ্যই যদি কিছু জিনিষ তোমার ভাল না লাগে, তবে সেটা অন্য ব্যাপার। তাদের তোমার জীবনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিব্রত হয়ো না। কেবল সজাগতার সাথে কাজ কর ও প্রবহমান থাক।

এটা বোঝ যে একজন বিজ্ঞানী তার বহির্জগতের আবিষ্কার সম্বন্ধে অন্যকে অভিজ্ঞতা দেবার জন্য এক ফর্মুলা সৃষ্টি করে।

একজন মাস্টার তাঁর অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অপরকে অভিজ্ঞতা দেবার জন্য এক ফর্মুলা সৃষ্টি করেন। যে আনন্দকে তিনি নিজের চৈতন্যে অভিজ্ঞতা করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা অন্যদের দেবার জন্য তিনি এক ফর্মুলা সৃষ্টি করেন।

এখন আমি তোমাদের পরম আনন্দ বা নিত্যানন্দ হৃদয়ঙ্গম করার এক ফর্মুলা দিচ্ছি।

প্রশ্ন : আমাদের আমিত্ব ধ্বংস করার জন্য কি করব?

প্রথমে ভাল করে বোঝ যে তোমার কোন না কোন আকারে আমিত্ব আছে - সক্রিয় বা অক্রিয়। তারপরে অহংবোধ যে সব পথে প্রকাশ পায়, সেই পথগুলি বোঝ। তোমার সমস্ত অপরাধবোধ, বাসনা, ভয়, বিনম্রতা, নিজের গুরুত্ব ইত্যাদি সবই তোমার আমিত্বের নানা প্রকাশ। এগুলি তোমার ভিতরে হয়, কারণ তোমার 'আমি' ও 'আমার' সম্পর্কে ভারী অনুভূতি আছে। একবার এটা বুঝলে দ্রষ্টা হবে এবং বুঝবে যে পুরো জীবনটাই এক নাটক। এমন করলে তুমি তোমার কঠিন 'আমি'-কে দ্রবীভূত করতে সক্ষম হবে, তোমার আমিত্ব মুছে যাবে।

যখন এটা ঘটা শুরু হয়, তুমি স্বতশ্চলভাবে অস্তিত্বের সাথে অনুরণন কর এবং দ্যাখো যে কিভাবে জিনিষগুলি নিজে থেকেই পুনর্বিন্যস্ত হয় এবং জীবনকে তোমার জন্য সুন্দর বানায়। তখন তুমি তোমার আমিত্বকে হনন করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে বাঁচ। আমিত্বকে কোনভাবে রক্ষা করতে যেও না। আমিত্বকে হনন করার জন্য সদা প্রস্তুত থাক। আমিত্বকে হনন করার জন্য প্রস্তুত হ'লে তুমি মুক্তি পাবার জন্য তৈরি হও, ব্যাস।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে আজ্ঞা-চক্র সরলতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সংযুক্ত। সরলতা ও বুদ্ধিমত্তাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

যখন তুমি মনের অনমনীয় গঠন ভেঙ্গে মুক্ত হও, তুমি নদীর মত তরল, প্রবহমান হয়ে যাও, তাহলে তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি কোন সমস্যার প্রতি একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সমর্থ হও, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি স্বতঃস্ফূর্ত, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তোমাকে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন, তুমি বুদ্ধিমান।

যখন তুমি বোঝ যে জীবন একটি নাটক, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি বোঝ যে অস্তিত্বই চরম জীবনীশক্তি, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি তোমার অন্তরের নীরবতা সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন, তুমি বুদ্ধিমান।

যখন তুমি মন প্রয়োগ না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাস, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি তোমার নিছক উপস্থিতি দ্বারা শক্তি বিকিরণ কর, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি কোথাও বেশী সময়ের জন্য আটকে থাক না, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি তোমার আমিত্বকে সচেতন হয়ে অনুভব করতে পার, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি জান যে তুমি ধনী তোমার ধনসম্পদের জন্য নয়, তুমি ধনী তোমার সত্তার জন্য, তুমি বুদ্ধিমান!

যখন তুমি একজন মাস্টারকে চিনতে পার, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি তোমার আমিত্বকে মাস্টারের কাছে ছেড়ে দিতে তৈরি, তুমি বুদ্ধিমান। যখন তুমি জীবনের খেলা প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করে খেল, তুমি বুদ্ধিমান!

একটা ছোট গল্প :

> তিনজন মানুষকে একই প্রশ্ন করা হয়, 'যদি বলা হয় যে তুমি আর কেবল দশ দিন বাঁচবে, তুমি কি করবে?'
> প্রথমজন বলে, 'আমি সমস্ত কাজগুলি গুছিয়ে ফেলব এবং সব সমস্যার জায়গাগুলি সমাধান করব যাতে আমি চলে যাবার পর আমার পরিবারের কোন কষ্ট না হয়।'
> পরের জন বলে, 'আমি জীবন পুরো উপভোগ করব ও যে সব জিনিষ আগে কখনও করি নি তা করব।'
> তৃতীয়জন বলে, 'আমি আরেকজন ডাক্তারের পরামর্শ নেব!'

এটাই বুদ্ধিমত্তা। যখন তুমি স্বতঃস্ফূর্ত এবং জীবনের পরিচিত রাস্তায় আটকে যাও না, তুমি বুদ্ধিমান।

আরেকটা ছোট গল্প :

এক হাসপাতালে টেলিফোন বাজল ও নার্স তা ওঠালো।
আওয়াজ এল, 'দয়া করে বলবেন কি দশ নম্বর রুমে চন্দন বসু কেমন আছেন?'
নার্স উত্তর দিল, 'উনি ভাল আছেন এবং আমরা আশা করছি কাল সন্ধ্যায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আপনি কে বলছেন?'
আওয়াজটি উত্তর দিল, 'আমি চন্দন বসু। এখানে তো আপনারা রোগীদের কখন কিছুই বলেন না!'

এটাই বুদ্ধিমত্তা। যখন তুমি একই জায়গায় বহুক্ষণ আটকে থাক না, তুমি বুদ্ধিমান।

এখন এটা শোন :

একটি লোক তার বন্ধুকে নিজের খামারে (ফার্ম) নিয়ে গেল।
সে তাকে পুরো খামার দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এতগুলি ভেড়া দেখে তুমি নিশ্চয় অবাক হয়েছ! তুমি কি তাদের গুনতে চেষ্টা করেছ?'
বন্ধুটি বলে, 'ও হ্যাঁ। ৩০০টি ভেড়া আছে।'
লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কি করে তা গুনলে?'
বন্ধুটি উত্তর দেয়, 'ও! সেটা খুব সোজা ব্যাপার। আমি পায়ের সংখ্যা গুনলাম এবং তাকে চার দিয়ে ভাগ করলাম। '

এটা বুদ্ধিমত্তা নয়! এইভাবে আমরা জীবনের সোজা জিনিষ জটিল করে ফেলি।

এবার সরলতায় আসা যাক : বাচ্চাদের দেখে সরলতা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারবে। তারা কোন রকম কাটছাট না করে কথা বলে। তারা হিসাব করে না; তারা তাদের ব্যবহারে একদম সম্পূর্ণ, তাদের ব্যবহার কখনও ধূর্ত ও ভণ্ডামিপূর্ণ নয়। এটা সরলতা।

কিন্তু আমরা তাদের কি করি? আমরা তাদের যথাসাধ্য শেখাই কিভাবে কথাকে কাটছাট করতে হয়, কিভাবে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করতে হয়। আমরা তাদের হৃদয় থেকে মনে সরে যেতে শেখাই এবং তাতে তাদের পবিত্র সরলতা মন দ্বারা কলুষিত হয়।

একটা ছোট গল্প :

একটা বালককে বলা হল যে তার এক ধনী পিসী তাদের বাড়ীতে আসছে এবং সে যেন ভাল করে ব্যবহার করে।
পিসী এল ও তার জন্য বিরাট নৈশভোজের আয়োজন করা হ'ল। বালকটি পিসীকে ভোজনের সময় একটানা লক্ষ্য করে চলেছে এবং সবশেষে জিজ্ঞাসা করে বসে, 'পিসী, তুমি তোমার মজাটা কখন করবে?'
মহিলাটি জিজ্ঞাসা করে, 'কোন মজা, সোনা?'
বালকটি উত্তর দেয়, 'বাবা বলে তুমি মাছের মত পান কর!' *(অতিরিক্ত মদ্যপান করাকে ইংরাজীতে বলে drink like a fish)*

বাচ্চারা সহজেই যা ভাবে তাই বলে! তারা কত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে। তাই তাদের লক্ষ্য করতে খুবই আনন্দ হয়। তাদের সরলতা আমাদের আকর্ষণ করে। কিন্তু আমরা তা বুঝি না এবং আমরা তাদের ধূর্ত হতে এবং নিজের উদ্দেশ্যসাধন করতে শেখাই।

ছোট গল্প :

একটি ছোট ছেলে তার দাদুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, দাদু, তুমি কি সত্যি ব্যাঙ নকল করতে পার?'
দাদু অবাক হয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বলত?'
বাচ্চাটা উত্তর দিল, 'মা বাবাকে বলতে শুনেছি যে তুমি ব্যাঙের ডাক ডাকলে, আমাদের জন্য একটু ধনসম্পদ রাখা থাকবে।' *(ব্যাঙের ডাক ডাকা মানে মারা যাওয়া বোঝানো হয়েছে)*

আমরা বেশীর ভাগ সময়েই ভণ্ড। আমরা কখনই নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করি না। আমরা এক কথা চিন্তা করছি এবং অন্য কথা বলছি। এরই জন্য আমরা কত কদর্য হয়ে গেছি। আমরা সরলতা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি।

আরেকটা ছোট গল্প :

একদিন মা তার বন্ধুর কাছে বাচ্চাকে রেখে যাচ্ছিল আর সন্ধ্যাবেলে চলে আসার সময় মাসীকে ধন্যবাদ দিতে না

ভোলার জন্য মা বাচ্চাকে শিখিয়ে দিল।
সেই সন্ধ্যায় বাচ্চাটি ঘরে ফিরল এবং মা তাকে জিজ্ঞাসা করল সে ধন্যবাদ দিয়েছে কিনা।
বাচ্চাটি উত্তর দিল, 'দিই নি, কারণ অন্য মেয়েটা ধন্যবাদ দেবার পর মাসী বলল, 'বলতে হবে না।''

বাচ্চারা এরকম! অবশ্যই, তাদের কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি প্রাথমিক জিনিষ শেখানো আমাদের কর্তব্য, কিন্তু আমি তোমাদের বোঝাতে চাইছি যে বাচ্চাদের ভণ্ডামি শিখিয়ো না। তাকে খেলাটা বুঝতে দাও, তাকে সজাগতার সাথে খেলতে দাও, কোন আমিত্বের সাথে নয়, কেবল সজাগতার সাথে। বাচ্চারা যাতে নিজে বিচার করতে পারে তার জন্য তাদের প্রাথমিক বিধি সমূহ ও বুদ্ধি দাও ।

একটা জিনিষ বোঝা দরকার : বাচ্চার সরলতা তার অজ্ঞতার জন্য। এই সরলতা শিশুর মধ্যে থাকতেই হবে কারণ তাদের তখনও সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া শুরু হয় নি। কিন্তু একবার যখন সেই নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয় এবং জ্ঞান অর্জন হয়, শিশু তার সরলতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু গভীর সচেতনতার দ্বারা মানুষ তার বহু বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সরল তাকে আবার ফিরে পেতে পারে। এই ফিরে পাওয়া সরলতাই আসল সরলতা, কারণ এই সরলতা অজ্ঞতা থেকে আসে না, এটা গভীর উপলব্ধি থেকে আসে।

শিশুর সরলতা ও মাস্টারের সরলতায় সেটাই পার্থক্য। ইহলৌকিক জ্ঞান সরলতাকে পিষ্ট করে এবং আমিত্বকে পরিপুষ্ট করে। কিন্তু বুদ্ধি ও সচেতনতা জ্ঞানকে সরিয়ে রাখতে পারে এবং সরলতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে। যখন এই প্রকার হয়, তুমি পথ পেয়ে গেছ।

প্রশ্ন : ঈশ্বরের সাথে আমাদের কিভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিৎ?

সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য ভগবান কোন আলাদা অস্তিত্ব নয়। সেটা প্রথমে বোঝ। তিনি তোমার মাথার ওপরে স্বর্গ নামক কোন জায়গায় বসে নেই এবং তুমি তাঁর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করবে বলে তিনি অপেক্ষা করছেন না। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জিনিষে আছেন। তিনিই তো সব সৃষ্টি করেছেন।

তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং সৃষ্ট (creator, creation, created)। তিনিই অভিজ্ঞতাকারী, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞ (experiencer, experience, experienced)। ভগবান নামটা আমরা অস্তিত্বকে দিয়েছি, ব্যাস। এটা বুঝলে, তুমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা শুরু করেছ; তাহলে ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে যে আমি ভগবানের নৈকট্য অনুভব করি কিনা। আমি তাদের বলি আমিই ভগবান! আমি তাদের বলি যে তারাও ভগবান! কিন্তু অবশ্যই তারা তা গ্রহণ করতে রাজী নয়। তারা জানতে চায় ভগবানের সমীপ কিভাবে হওয়া যায়। সমীপ হওয়ার অর্থ তো তোমার ও ভগবানের মধ্যে একটু তফাৎ থাকবেই। আমি তোমাদের বলি তুমিই ভগবান ! তাহলে সমীপে যাওয়ার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো? ঈশ্বর আর কিছুই নয়, অস্তিত্বকে তোমার দেওয়া একটা নাম এবং তুমি সেই অস্তিত্বের অংশ।

যখন অস্তিত্বের সাথে ঐকতানে বাস কর, যখন তুমি অস্তিত্বের সাথে তোমার সংযোগ জানতে পেরেছ, তুমি ভগবান হয়েছ, ব্যাস। যখন তোমার নিকটে আসা যে কোন কিছু বা যে কোন মানুষের সাথে আনন্দোচ্ছলতার অনুভূতি নিয়ে বাস কর, তুমি বিশুদ্ধ চৈতন্য হয়েছ। যখন তোমার চতুঃপার্শ্বে চেনা অচেনা সকলের দিকে একই প্রেম অনুভব কর, তুমি তোমার অন্তরে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত করছ। এই সহজ মাপদন্ড দ্বারা বুঝতে পার যে তুমি ঈশ্বর -চৈতন্য থেকে অত দূরে আছ।

তুমি যখন অস্তিত্বের সাথে ঐকতান শুরু কর, তখন তোমার অন্তরের আওয়াজ শুনতে শুরু করবে। তখন কোন গাইড লাগবে না। অন্য কাউকে তোমাকে বলার প্রয়োজন নেই তোমাকে কি করতে হবে আর কি না করতে হবে। তুমি সহজেই জানবে ; তোমার বুদ্ধিমত্তা তোমায় গাইড করতে থাকেবে। একজন মাস্টার তোমার অন্তরের আওয়াজকে জাগরিত করতে পারেন। তিনি তোমার বুদ্ধি জাগরণের জন্য তোমার ওপরে কাজ করেন।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রেম করার একটা কারণ থাকে। আমাদের আমিত্ব এতই কঠিন। যখন তুমি এমনটি কর , পরিষ্কার করে বুঝে নাও যে তুমি ভগবান থেকে অনেক দূরে আছ ! আমরা দাবী করি আমরা আমাদের পরিবার ও বন্ধুজনের ওপরে প্রেমবর্ষণ করি। পৃথ্বীগ্রহে এখন পর্যন্ত সম্ভব হওয়া মাস্টারদের দিকে তাকাও। কোন সাধারণ গুণমান তাঁদের মিশনের দিকে আকর্ষিত করেছে? পবিত্র প্রেম, ব্যাস। তাঁরা যদি তোমাদের মত গতানুগতিক প্রেম নিয়ে থাকতেন, তাহলে কি তাঁরা তাঁদের মিশন প্রতিষ্ঠা করতে সফল হতেন?

বিশ্বব্যাপী মিশন প্রতিষ্ঠা কি কেবল গতানুগতিক প্রেম দ্বারা করা সম্ভব? গতানুগতিক প্রেম কতটা বল যোগাবে? তা তোমাকে শীঘ্র পরিশ্রান্ত করে ফেলবে! প্রতিটি মানুষের সাথে দিব্যপ্রেম ও একত্ব অনুভব করার জন্যই মাস্টারেরা বারবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে

বহু মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের রূপান্তরিত করতে পেরেছেন।

আসলে তুমি যদি তাঁদের জীবনী পড়, দেখবে যে তাঁদের প্রায় সবাই নিজের পরিবার থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন, পরিবারের ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন। পরিবার সর্বদা এইসব ক্ষেত্রে বাধা দেয়। অবশ্য পরে পরিপক্বতা ও সজাগতা এলে পরিবারের লোকেরাও বিশ্বের বাকীদের মত তাঁকে গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে।

যা কিছু তোমাকে ভগবান থেকে আলাদা করে অনুভব করায়, তা হ'ল অহংভাব। অহংভাব থাকলে তুমি উপযুক্তভাবে ও সর্বদা একই গভীরতা সহকারে প্রেম করতে পার না; তোমার প্রেম খুবই বিষয়ীকেন্দ্রিক হবে এবং তা চরমসীমার মধ্যে দুলতে থাকেবে।

মাস্টারদের শরীরের ভাষা লক্ষ্য কর এবং তুমি জানবে যে দিব্যপ্রেমের সাথে অনুরণন মানে কি। অস্তিত্বের সাথে ঐকতানের সবচেয়ে সহজ পথ হল মাস্টারের শরীরের ভাষা লক্ষ্য করা। একজন মাস্টার সর্বদাই অস্তিত্বের সাথে সুরে বাঁধা থাকেন। তিনি সর্বদাই প্রেম ছড়িয়ে দিতে থাকেন, সামনে কেউ বা থাকুক। তাঁর শরীরের ভাষা লক্ষ্য করলে তুমি সেই ভাষার গুণমান আত্মভূত করতে পারবে।

যদি মাস্টারকে সময়কাল ধরে লক্ষ্য কর, তুমি উপলব্ধি করবে যে তিনি কিভাবে এক নদীর মত প্রবাহিত হন, এত সুন্দরভাবে, এত ছন্দোময় হয়ে, এত সমলয়ে, অস্তিত্বের সুরে সুর মিলিয়ে। তাঁর সব কাজই অস্তিত্বের সাথে নিখুঁত সমলয়ে ঘটে। তাই তাঁকে দেখতে এত ভাল লাগে! শুধুমাত্র মাস্টারকে লক্ষ্য করে তুমি অস্তিত্বের সৌন্দর্য ও প্রবাহকে উপলব্ধি ও অনুভব করতে পার।

যেহেতু মাস্টার আমিত্ব-হীন, তাই তিনি কোন বাধা ছাড়াই প্রবাহিত হন। তাঁর 'আমি' ও 'আমার' সম্বন্ধে চেতনা নেই বলে তিনি প্রবাহমান হন। যেহেতু তিনি কেবল প্রেম বিকিরণ করেন, তিনি নিরাময় করেন। নিরাময় হল ঘনীভূত প্রেম। সেইজন্য সময়কালে বারবার আমরা মাস্টারদের অলৌকিক নিরাময়ের শক্তির কথা শুনি। তাই মাস্টারদের ভগবান হিসাবে দেখা হয়। পরিষ্কার করে বোঝ : মাস্টারেরা হলেন জীবন্ত ভগবান। তাঁরা পরম শক্তির সর্বোচ্চ সুপ্রকাশ।

তাই ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না। অস্তিত্বের সুরের সাথে সুর মেলানো শুরু কর এবং ভগবান হও।

মনে রেখ : তুমি অস্তিত্বকে জয় করতে পার না। তুমি অস্তিত্ব দ্বারা বিজিত হতে পার। যখন তোমার আমিত্ব সম্পূর্ণ মুছে যায়, তুমি বিজিত হলে, ব্যাস! যখন তুমি এক ঈশ্বর সহায়ক গর্ভ হয়ে যাও, তিনি তোমার ভিতরে অধিষ্ঠান করবেন। প্রথম দিকে তুমি অতিথি এবং তিনি নিমন্ত্রণকর্তা। সবশেষে তোমাকে নিমন্ত্রণকর্তা হতে হবে; তাঁকে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করার জন্য তোমাকে জরায়ু হতে হবে। জরায়ু হওয়া মানে গলে যাওয়া এবং নমনীয় হওয়া। নমনীয় হওয়া মানে তোমার সম্পূর্ণ আমিত্বকে মুছে ফেলা এবং ঈশ্বরে বা অস্তিত্বে দ্রবীভূত হয়ে যাওয়া। তখন জীবন হয় সঙ্গীত এবং চিরন্তন উৎসবের উদ্‌যাপন!

আমরা এখন এক সুন্দর ও খুব কার্যকর ধ্যান-প্রক্রিয়া করব। আজ্ঞাচক্রের জন্য এই ধ্যানের নাম দিব্যনেত্র-ধ্যান।

আবেগ : আমিত্ব
চক্র : আজ্ঞা-চক্র
অবস্থান : ভ্রূদ্বয়ের মাঝে

সংস্কৃতে আজ্ঞা মানে 'ইচ্ছা' বা 'আদেশ।' আজ্ঞা-চক্রকে চক্ররাজ হিসাবে জানা যায়।

এই চক্র গম্ভীরতা ও আমিত্ব দ্বারা তালাবদ্ধ থাকে। এটি সরলতা, সহজতা, বুদ্ধিমত্তা সহকারে এবং আমিত্বকে মুছে ফেলে প্রস্ফুটিত করা যায়।

সরল ও আমিত্বহীন সত্তা হবার জন্য ধ্যান-প্রক্রিয়া :
দিব্যনেত্র-ধ্যান - জরাথ্রুস্টের ধ্যান-প্রক্রিয়া

দিব্যনেত্র ধ্যান

(সময় : ৩০ মিনিট)

তোমার উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা জাগরণের জন্য দিব্যনেত্র ধ্যান করা হয়। এটা আজ্ঞা-চক্রের জন্য কাজ করে। এই শক্তিকেন্দ্র ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে আছে - তাকে ত্রিনয়ন বলা হয় এবং এটা তোমাকে মহাজাগতিক বুদ্ধির সাথে সংযুক্ত করে। আজ্ঞা চক্রকে চক্ররাজ বলা হয় - সমস্ত চক্রের রাজা।

এটা এত গুরুত্বপূর্ণ চক্র যে এমন কোন ধর্ম নেই যা এই চক্রকে সক্রিয় করার জন্য কাজ করে নি। যখন আজ্ঞা খোলে সম্পূর্ণ সত্তা এক পৃথক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শক্তি বা ক্ষমতার অনেকগুলি স্তর প্রকাশিত হয়। সেইজন্য প্রাচ্যের দেবদেবীদের মূর্তিতে তৃতীয় চোখ বা ত্রিনয়ন দেখা যায়। ত্রিনয়ন জাগরিত আজ্ঞার প্রতীক।

পুরানো কথায় আছে কেউ পবিত্র শহর বারাণসীতে মারা গেলে স্বতশ্চলভাবে সে মুক্তি পাবে। বারাণসী কেবল শহর নয়। এখানে 'বারণ' মানে ভ্রূদ্বয় 'নাসি' মানে নাসিকার সাথে মেলে, সেটাই আজ্ঞা চক্রের সঠিক অবস্থান। এটা জীবনমুক্ত অবস্থায় আমিত্বের মৃত্যু প্রতীকীকরণ করে!

এই ধ্যান-প্রক্রিয়া জরাথ্রুস্টের ধর্ম থেকে নাওয়া হয়েছে ও এতে দুটি ভাগ আছে। একটা হ'ল আজ্ঞাচক্রকে শুদ্ধ করা এবং অন্যটি তাতে শক্তি সঞ্চার করা। আজ্ঞা চক্র বা ত্রিনয়ন মায়া এবং কামকে ধ্বংস করে। এটা তোমার ভিতরের অতি-চেতনাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে।

তোমার সামনে একটা প্রার্থনার প্রদীপ আছে। এতে তিল তেল বা শুদ্ধ মাখন ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি মোমবাতিও ব্যবহার করতে পার, কিন্তু নিশ্চিত থেকো যে তা যেন উদ্ভিজ্জ তেল হয়। এটা একটা পরিচালিত ধ্যান-প্রক্রিয়া। কেবল আমার নির্দেশ অনুসরণ কর।

চোখ বন্ধ করে পাদুটি আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করে মেঝেতে বসো। যারা মেঝেতে বসতে অসক্ষম তারা চেয়ারে বসতে পার।

তোমার আজ্ঞাচক্রে ফোকাস কর, যেন তাকে ভেদ করছ। (৫ মিনিট)

চোখ খোল এবং প্রদীপের দীপশিখার দিকে তোমার ভ্রূদ্বয়ের মাঝে ত্রিনয়ন দিয়ে তাকাও। তোমার চোখ পিট পিট করতে পারে অথবা জ্বলতে পারে বা জল গড়িয়ে পড়তে পারে; এসব হতে দাও। (৫ মিনিট)

চোখ বন্ধ কর এবং আবার আজ্ঞাচক্রে ফোকাস কর। তাকে গভীরভাবে ভেদ কর। (৫ মিনিট)

চোখ খোল এবং দীপশিখার দিকে ভ্রূদ্বয়ের মাঝে ত্রিনয়ন দিয়ে তাকিয়ে থাক। (৫ মিনিট)

চোখ বন্ধ কর; আজ্ঞাচক্রে ফোকাস কোরো না; কেবল আরাম কর। (৫ মিনিট)

খুব ধীরে ধীরে চোখদুটি খোল।

আমাদের পরের সেশনে দেখা হবে। ধন্যবাদ।



নবম অধ্যায়

কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রস্ফুটিত হও

কৃতজ্ঞতা থেকে প্রার্থনা কর, ভয় থেকে নয়

একজন মানুষ ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করে, 'হে ভগবান, আমার যথেষ্ট টাকা নেই। দয়া করে আমায় একটা লটারীতে দশ কোটি টাকা জিততে সহায়তা কর! যদি আমি জিতি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি ২০ শতাংশ টাকা তোমার মন্দিরে দেব। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, দয়া করে দু কোটি কেটে রেখে বাকী আট কোটি আমায় দিও।'

আমাদের সমস্ত আচরণ এরকমই - নিছক ব্যবসা! আমাদের জীবনে তা হয়ত সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু তুমি যদি তোমার প্রার্থনার মনোভাব গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর, তুমি বুঝবে যে তুমি সবার সাথে ব্যবসা করছ, ভগবান সমেত।

একটা ছোট গল্প :

> একদিন এক গরীব মানুষ বাদ্‌শা আকবরের প্রাসাদে গেল। সে তার ছেলের পড়াশুনার জন্য কিছু অর্থ চাইবে বলে ঠিক করেছিল।
> সবাই জানত কেউ কিছু চাইলে আকবর কখনও তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না।
> প্রাসাদে পৌঁছে লোকটি দেখল আকবর প্রার্থনা করছে। সে কিছু না বলে চলে গেল। কিন্তু আকবর তাকে দেখেছিল ও ফিরে ডাকল।
> আকবর জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি যে কিছু না চেয়েই চলে যাচ্ছ?'
> গরীব মানুষটি উত্তর দিল, 'জাঁহাপনা, আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখলাম আপনি নিজেই ভিক্ষা করছেন!'

যদি আমাদের প্রার্থনাসকল লক্ষ্য কর, তুমি বুঝতে পারবে যে আমরা আসলে কেবল ভিক্ষা চাইছি। আমরা কেবল চাই, চাই আর চাই। আমাদের প্রার্থনা ভিক্ষাপাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুগত জিনিষ , ভাল সম্পর্ক, ক্ষমতা, উদ্দেশ্যসিদ্ধি, শারীরিক সৌন্দর্য এবং কত কিছুর জন্য আমরা ভিক্ষা করি।

আমাদের মনে আমরা সর্বদাই কিছু না কিছু চেয়ে চলেছি। আসলে আমরা চাইতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে সেটা আমাদের মধ্যে এক অচেতন প্রক্রিয়া হয়ে গেছে, এমনকি আমরা চাইছি বলে স্বীকার নাও করতে পারি। আমরা সেগুলিকে চাওয়া বলে গণ্যই করি না। এটা আমাদের এক স্বাভাবিক জীবনধারা হয়ে গেছে! আমরা এতে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছি এবং তাই তা থেকে সরে এসে তাকে সতেজ মন দ্বারা অবলোকন করতে পারছি না।

বোঝ যে বিশ্বে কেবল দুই প্রকার ধর্ম আছে; প্রার্থনা ভিত্তিক ধর্ম এবং কৃতজ্ঞতা ভিত্তিক ধর্ম।

প্রার্থনা ভিত্তিক ধর্ম হ'ল ভগবানের কাছে কোন না কোন কিছু চাওয়া। তা জনগণ অনুসরণ করতে পারে, কারণ তার সাথে আমাদের চাওয়ার মনোভাবের মিল আছে। ছোটবেলা থেকে আমাদের যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে তার সাথে এই মনোভাবের সামঞ্জস্য আছে। ছোটবেলা থেকে আমাদের চাওয়ার প্রার্থনা শেখানো হয়েছে। এটাকে ভগবান বা অস্তিত্বের নিকটবর্তী হবার জন্য সবচেয়ে স্বাভাবিক পথ বলে মনে হয়।

অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা-ধর্ম ভগবান বা অস্তিত্বের জন্য ভিতরের এক অভিভূতকারী কৃতজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করা। ছেলেবেলা থেকে যা শেখানো হয়েছে, এটা তার একদম বিপরীত। যদি কিছু পাই তার জন্য আমাদের ধন্যবাদ দিতে শেখানো হয়েছে, ব্যাস। কৃতজ্ঞতাকে এক সামাজিক ভদ্রতা হিসাবে আমাদের শেখানো হয়েছে , তার চেয়ে বেশী কিছু নয়!

তাহলে আমরা কিভাবে সর্বদাই ধন্যবাদপূর্ণ থাকব? এটা হজম করা খুব কঠিন! সেজন্য বাছাই করা খুব কম মানুষ এই কৃতজ্ঞতা ভিত্তিক ধর্মকে অনুসরণ করে।

শুধুমাত্র কয়েকটি ধ্যানশীল ধর্মসমূহ, যেমন বৌদ্ধ, সুফি, হিন্দু এবং জৈন, কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলে। খুব কম লোকেই এই ধর্মগুলিকে অনুসরণ করে, কিন্তু অনুসরণকারীদের গুণমান উচ্চ।

প্রার্থনায় কোন ভুল নেই, কিন্তু চাইতে চাইতে প্রার্থনায় আটকে যাওয়া থেকে সমস্যার শুরু হয়। ধ্যানে প্রবেশ করার জন্য প্রবেশ-দ্বার হিসাবে প্রার্থনাকে ব্যবহার করা উচিৎ; ধ্যানে কৃতজ্ঞতা হয়ে যায় প্রার্থনা এবং তোমার সত্তা হয়ে যায় আনন্দ !

তুমি ভাবতে পার, 'কৃতজ্ঞতা জানানো একটা সামাজিক অভ্যাস হতে পারে, কিন্তু তা ধ্যান কিভাবে হয়?' আমি কি বলছি তা বুঝতে পারবে যখন তুমি আসল কৃতজ্ঞতা দেওয়া আরম্ভ করবে। কৃতজ্ঞতা জানানো শুরু করলে তুমি জীবনের মূল্য বুঝতে পারবে।

আমি তোমাদের বলি : তুমি শুধু তাদের জান যারা সরাসরি তোমায় দেয় ও যত্ন নেয়। কিন্তু অস্তিত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা মহাজাগতিক শক্তি যে সবসময়েই তোমাকে সহায়তা করছে, রক্ষা করছে ও যত্ন নিচ্ছে, তা অনুভব করার জন্য কোন সজাগতাই তোমার নেই।

তুমি বিশ্বাস কর যে তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তুমি তার যোগ্য বা তা একটা আকস্মিকতা। যখন তুমি দেখতে ও অনুভব করতে শুরু করবে যে অস্তিত্বের অদৃশ্য হাত তোমার যত্ন নিচ্ছে, তখন তুমি জানবে যে অস্তিত্ব তোমাকে এখানে চায়। কেবল তখনই তুমি বুঝবে যে তোমার ওপরে অস্তিত্ব অনবরত মঙ্গল-বর্ষণ করে চলেছে।

তুমি যে বেঁচে আছ, এই সত্যতাই প্রমাণ করে যে অস্তিত্ব তোমায় এখানে চায় এবং সে তোমার যত্ন করে। এটা না বুঝলে তুমি নিষ্প্রভ ও বিষণ্ন হবে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বঞ্চিত ব্যক্তির মত চাইতে থাকবে।

তুমি যদি তোমার সত্তা থেকে এখানে যা বলা হ'ল তা ভাল করে শোন, তাহলে তুমি নিজেকে সুরে বাঁধতে পারবে এবং অস্তিত্বের দেওয়ার এই সুন্দর ধরণকে বোঝার জন্য সংবেদনশীল হবে!

ঈশ্বর প্রেমময়, ভয়ংকর নয়

বেশীরভাগ মানুষই ভগবানকে ভয় সহকারে প্রার্থনা করে। মায়েরা সন্তানদের বলে যে কথা না শুনলে ভগবান তাদের ওপরে রাগ করবে। এই কথাগুলি একদম ছোটবেলাতেই বাচ্চাদের ভিতরে গেঁথে যায় এবং তাদের ভগবান সম্বন্ধে এক ভুল ধারণা দেয়। ছোটদের ছেলেবেলায় এইভাবে তোমরা নিয়ন্ত্রণ কর। তারা বড় হয়ে এর জন্য উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। প্রেম ও কৃতজ্ঞতা সহকারে অস্তিত্বকে আলিঙ্গন না করে তারা ভগবানকে সম্মান ও ভয় করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ধর্মকে যদি ভয়ের জন্য অনুসরণ কর, তা তোমায় কোথাও নিয়ে যাবে না; তা তোমার রূপান্তর ঘটার জন্য পথ তৈরি করে দেবে না। বিশ্বাস সহকারে চাওয়ার জন্য তুমি হয়ত বস্তুগত দিক থেকে লাভবান হবে, কিন্তু তুমি সত্তাস্তরে যেখানে ছিলে সেখানেই থেকে যাবে। জীবনের উদ্দেশ্য ও আসল পরিপূর্ণতা বস্তুগত পথে কখনও হয় না; তা কেবল সত্তার স্তরেই ঘটতে পারে। যেসব মানুষেরা 'সাফল্যের বিষণ্নতা'-র মধ্য দিয়ে গেছে, তারা বেশী ভাল করে বুঝতে পারবে আমি কি বলছি। আমরা আগের সেশন্গুলিতে সাফল্যের বিষণ্নতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

ঈশ্বর বা অস্তিত্বের জন্য গভীর প্রেম ও কৃতজ্ঞতা থেকে ধর্ম অনুসরণ করা উচিৎ। যদিও সমাজ তোমাকে ভয়ের নামে ভগবানকে পূজা করতে শেখায়, আমি তোমাদের বলি, কখনও তা কোরো না। ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা প্রেম ও কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রার্থনা কর।

একটা ছোট গল্প :

> এক সুফি মাস্টার, জুনেদ ভগবানকে দিনে পাঁচবার কৃতজ্ঞতা জানাতেন।
>
> একবার তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে কতগুলি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গ্রামগুলি ধর্ম হিসাবে সুফি -বাদ তখনও গ্রহণ করে নি।
>
> প্রথম গ্রামে লোকেরা তাদের ভিক্ষা করার জন্য অভিযুক্ত করল ও যৎসামান্য ভিক্ষা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল।
>
> পরদিন দ্বিতীয় গ্রামে লোকেরা তাদের কোন ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করল।
>
> তৃতীয় দিন তারা আরেকটা গ্রামে গেল, কিন্তু সেখানে লোকেরা এত ক্ষেপে গেল যে লাঠি ও পাথর মেরে তাদের গ্রাম থেকে বার করে দিল।
>
> সেই রাতে নিয়মিতভাবে জুনেদ নতজানু হয়ে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাল।
>
> তাঁর শিষ্যরা তাঁকে লক্ষ্য করছিল। তারা সেটা সহ্য করতে পারল না। তারা বুঝতে পারল না জুনেদ কেন ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। তারা ভীষণ ক্ষেপে গেল। তারা চিৎকার করে বলল, 'মাস্টার! তিনদিন ধরে আমরা কিছু খাই নি! আজকে আমাদের সেই গ্রাম থেকে কুকুর তাড়াবার মত তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল! আপনি কি সেজন্য ধন্যবাদ দিচ্ছেন?'
>
> জুনেদ তাদের দিকে তাকালেন ও বললেন, 'তোমরা তিন দিনের ক্ষুধার কথা বলছ! গত ত্রিশ বছর ধরে তোমরা যে খাবার পেয়েছ তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছ? আর একটা জিনিষ জান : আমার কৃতজ্ঞতা কোন কিছু পাওয়া বা না পাওয়ার জন্য নয়। এটা আমার সত্তায় গভীর আনন্দ ও প্রেমের একটা সহজাত প্রকাশ। এই প্রকাশে কোন বাছাবাছি নেই, এটা এক প্রার্থনাপূর্ণ অভিব্যক্তি।

যখন তুমি ভিতরে এক অভিভূতকারী কৃতজ্ঞতা সহকারে বাস কর, তুমি এমন এক স্থান পেয়ে গেছ যেখানে আর কিছুই চাই না। তার মানে তুমি ধ্যানে প্রবেশ করেছ। তাহলে তুমি আর কিছুর জন্য উদ্বেগিত হবে না। তুমি সঠিক পথে আছ। তোমার মন তোমার

এগিয়ে চলার পথে আর বাধা নয়; তোমার মন অদৃশ্য হয়েছে। যখন তুমি হৃদয়ে কানায় কানায় পূর্ণ, মন সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। মনের জন্য কোন স্থান না থাকলে, কোথা থেকে অসন্তোষ আসবে? অসন্তোষ বা অতৃপ্তি হৃদয় থেকে আসতে পারে না। তা কেবল মনেরই সৃষ্টি।

অস্তিত্বের সৌন্দর্যে জাগো

তোমার মন সর্বদাই 'তুমি' ও অস্তিত্বের মাঝে এসে যায়। তা তোমাকে অস্তিত্বের সাথে শুনতে, দেখতে, অনুভব করতে ও আবেগভরে কাজ করতে বাধা প্রদান করে। একবার মনের ঊর্ধ্বে যেতে পারলে এবং অস্তিত্বের সৌন্দর্য দর্শন করতে পারলে, কৃতজ্ঞতা তোমার সত্তার প্রার্থনা ও আনন্দ হয়ে যাবে। তুমি তখন মুক্তি ও চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করবে !

যখন তুমি মনের নীরস যুক্তি ফেলে দাও, তুমি এক নদীর মত প্রবাহিত হবে - কোন বাছবিচার ছাড়া, বিনা প্রচেষ্টায়, আনন্দে নদীর স্রোতের সাথে বয়ে চলবে। তুমি তখন তোমার ভূমিকা নেবে এবং তার প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করবে। তুমি তখন বুঝবে যে তুমি এক সুন্দর নাটকের অংশ, যেখানে তুমি ডাইরেক্টরের প্রতি যত সংবেদনশীল হবে ততই ভাল অভিনয় করবে ও তা উপভোগ করবে!

স্রোতের বিপরীতে গেলে, তোমাকে নানা চেষ্টা ও বাছবিচার করতে হবে। স্রোতের সাথে গেলে তোমাকে কোন প্রচেষ্টা করতে হবে না; তুমি ক্লান্ত হবে না; তুমি হতাশ হবে না; তুমি কেবল এক প্রবহমান লঘিমা (হালকা ভাব) অনুভব করবে। তখন সবকিছুই সুন্দর মনে হবে।

একটা ছোট গল্প :

> একটা লোক ট্রেনে যাচ্ছিল। সে সব সময় জানালার পাশে বসে বাইরে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছিল।
> তার পাশে একজন বয়স্ক মহিলা বসেছিল। তাকে লোকটি বলে যে এই ভ্রমণে সবচেয়ে ভাল জিনিষ হল বাইরের শ্বাসরোধ করা সুন্দর দৃশ্যাবলী।
> মহিলাটি মাথা নাড়াল এবং জানালার পাশে বসে কিছুক্ষণ ধরে বাইরে দেখতে থাকল ও পরে চলে গেল।
> মহিলাটি ফিরে এল এবং কিছু সময় ধরে আবার জানালার পাশে বসে কিছুক্ষণ ধরে বাইরে দেখতে থাকল ও চলে গেল।
> সে আবার এলো ও জানালার কাছে লোকটির সামনে বসল। কয়েক মিনিট পরে মহিলাটি তাকে টোকা মেরে বলল, 'মাফ কর, কিন্তু তুমি কি এমন জিনিষ দেখ যা আমি দেখি না?'

আমরা অস্তিত্বের সৌন্দর্য সহজেই হারিয়ে ফেলি! কি উপভোগ করি বা কোনটা উপভোগ করি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে আমরা সর্বদাই উপভোগ করার জন্য কারণ খুঁজি, আনন্দ উদ্‌যাপন করার জন্য কারণ খুঁজি! সেইজন্য আমরা অস্তিত্বের সাথে সম্পূর্ণত সংযোগ হারিয়ে ফেলেছি।

আমাদের চারপাশে সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব না করে আমরা সবসময়ে চেয়ে যাচ্ছি ও প্রশ্ন করে চলেছি। আমাদের অস্তিত্বের সাথে এই সংযোগ আবার ফিরে পেতে হবে। কৃতজ্ঞতা এই সংযোগ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারে। তা তোমাকে তোমার মুল আবার পাইয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। তা তোমাকে প্রকৃতির সাথে, অস্তিত্বের সাথে একাত্ম হতে সাহায্য করতে পারে।

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক একদিন মন্দিরে গিয়ে খুব প্রার্থনা করে, 'হে প্রভু! আমায় আগামী ১৫ দিন ধরে রোজ ১০০০ টাকা দাও। আমার সেটা খুব দরকার। আমি আমার বেতন পেলে, এই টাকা আজ থেকে ১৬তম দিনে ফিরিয়ে দেব।'
>
> মন্দিরের পুরোহিত তার এই প্রার্থনা শুনছিল। সে লোকটিকে এই অবস্থায় দেখে খুব দুঃখিত হ'ল। তার কাছে ৫০০ টাকা ছিল। সে একটা খামে সেই ৫০০ টাকা রেখে তাকে দিয়ে বলে যে ভগবান তাকে এই টাকা দিতে বলেছেন।
>
> লোকটি খুব খুশী হ'ল। সে খামটি নিল ও ঘরে গিয়ে খামটি খুলল। সে টাকাগুলি গুনে দেখে যে তাতে ৫০০ টাকা আছে, ১০০০ নয়।
>
> পরের দিন সে মন্দিরে গিয়ে আবার প্রার্থনা করে, 'হে ভগবান! দয়া করে পরেরবার আমাকে পুরোহিতের হাত দিয়ে টাকা পাঠিও না। সে তার অর্ধেক নিয়ে নেয়।'

আমরা সবকিছুকে নিশ্চিত ধরে নিই ও অতৃপ্ত হয়ে থাকি !

কোন কিছু অবধারিত বলে মেনে নিও না

মনে রেখ, জীবন নিজেই তোমার পাওয়া একটা উপহার! তুমি কি তাকে পেতে খুব কষ্ট করেছ? তোমাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পার যে এই জীবন পাবার জন্য তোমাকে পরিশ্রমের কাজ করতে হয়েছে? না! তাই আমরা এর মূল্য বুঝি না! আমরা সবকিছু নিশ্চিতভাবে ধরে নিই - আমাদের শরীর, আমাদের রোজের খাবার, প্রকৃতির সৌন্দর্য - সবকিছু আমরা অবধারিত বলে গণ্য করি। আমরা ভগবানের কাছে হীরার আংটি চাই - কিন্তু আমরা তাঁকে আংটি পরার জন্য আঙ্গুলগুলি পাবার জন্য কি ধন্যবাদ দিই? এমন কি হীরার আংটিও সময়কালে আমাদের কাছে মূল্য হারিয়ে ফেলে !

> একদিন ভূগোলের টিচার বাচ্চাদের পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য জিনিষ লিখতে বলল।
> সব বাচ্চারা আশ্চর্য জিনিষের লিস্টে লিখল, চীনের প্রাচীর, মিশরের পিরামিড, আইফেল টাওয়ার ইত্যাদি।
> একটি মেয়ে লিখছিল এবং লিখেই যাচ্ছিল - খুব আগ্রহ সহকারে এবং মাথা ঝাঁকিয়ে।
> টিচার তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? তুমি কি শিখেছ তা কি ভুলে গেছ?'
> ছোট মেয়েটি বলে, 'না। আমি একটু বিভ্রান্ত। সাতটার চেয়েও অনেক বেশী আছে।'
> টিচার অবাক হ'ল ও তার খাতা নিয়ে পড়তে লাগল। সে তখন পুরো ক্লাসের জন্য জোরে জোরে পড়ল, 'পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য হ'ল, আমি দেখতে পারি; আমি স্পর্শ করতে পারি; আমি গন্ধ শুঁকতে পারি; আমি শুনতে পারি; আমি স্বাদ গ্রহণ করতে পারি; আমি হাসতে পারি; আমি ভালবাসতে পারি...'
> ক্লাস হঠাৎ অদ্ভুতভাবে নীরব হয়ে গেল।

এই ছোট জিনিষগুলি ভুলে থাকা হয় কারণ আমরা তাদের ছোট বলে ভাবি। সহজেই উপলব্ধ হলে সবকিছুই আমাদের কাছে ছোট হয়ে যায়।

এই পৃথিবীতে কত লাখ মানুষ আছে যারা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না, স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। আমরা কখনও এসব সম্বন্ধে ভাবি না। আমরা সর্বদাই ভেবে চলি 'আরও কি', 'আরও ভাল', 'এরপর কি।'

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক তার গ্রামে যাবার জন্য বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এক ঘন্টা যাবার পর তার গাড়িতে একটা ঝাঁকুনি হ'ল ও থেমে গেল। সে ঘাবড়ে গেল ও দেখল যে গাড়িতে ইন্ধন নেই।
> প্রার্থনা করতে করতে, ঘামতে ঘামতে ও হাঁফাতে হাঁফাতে সে কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে এক শহরে পৌঁছাল। সে একটা পেট্রল পাম্প দেখতে পেল ও সেখানে গেল। সে ব্যাখ্যা করল যে তার এক পয়সাও নেই, কিন্তু গ্রামে যাবার জন্য গাড়িতে ইন্ধন চাই। তারা লোকটিকে ভাগিয়ে দিল।
> কিছু দূরে সে আরেকটি পেট্রল পাম্প দেখতে পেল এবং একই অনুরোধ করল।
> পাম্প স্টেশনের ম্যানেজার সহৃদয় ব্যক্তি ছিল ও তাকে কয়েক লিটার তেল বিনামূল্যে দিতে রাজী হ'ল।
> লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি তার বদলে আমাকে টাকা দেবেন? ওই পেট্রল পাম্পের তেল এখানের চেয়ে সস্তা।'

যতক্ষণ আমাদের কাছে কিছু না আসে ততক্ষণ তাকে মূল্যবান মনে হয় এবং আমরা এক প্রার্থনাপূর্ণ মেজাজে থাকি ; যেই মুহূর্তে তা এসে যায়, সেটা মূল্য হারিয়ে ফেলে এবং আমরা এগিয়ে চলি...আরেকটা প্রার্থনায়!

আমরা সর্বদাই 'এরপর কি' মনোভাব নিয়ে থাকি। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা দোকানে গিয়ে কোন নতুন বৈশিষ্ট্যের একটি অভিনব আলার্ম ঘড়ি দেখি , সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাবি যে এই নতুন বৈশিষ্ট্য দ্বারা আমাদের জীবন অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে। আমরা ভাবি যে এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধ করলে আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ গুণমান পরিবর্তিত হবে। আমরা মনে করি যে এই ঘড়িটি পেলে আমরা আমাদের জীবনে অনেক বেশী দক্ষ হয়ে উঠব। তাই আমরা সেটা কিনি ও তাকে ঘরে নিয়ে আসি।

কিছু দিন পরে কি হয়? সেই মূল্যবান ঘড়িটা মোছারও সময় হয় না! বেচারা ঘড়িটা কোথাও একটা ধূলো মেখে পড়ে থাকে এবং আরেকটা নতুন জিনিষ কিনে ঘরে গাদাগাদি করার জন্য তোমাকে কথাও শুনতে হয়েছে ! আর তুমিও তখন নতুন অন্য এক গ্যাজেটের দিকে আকর্ষিত হয়েছ, অন্য একটা বাসনা!

আমরা সর্বদাই ভাবি যা আমাদের কাছে নেই তা একটা পর্বতের মত বিশাল এবং তাকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। কিন্তু যখন

তা আসলে পেয়ে যাই, তা আমাদের কাছে খুব ছোট জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে আমরা আমাদের জীবনে কৃতজ্ঞতার অপূর্ব মনোভাব হারিয়ে ফেলি। আমরা সর্বদাই 'এরপর কি?' তার পিছনে দৌড়ে বেড়াই।

ভারতের জীবনমুক্ত মাস্টার ভগবান রামানা মহর্ষি ঈশ্বরকে বলেন, 'আমি কত বুদ্ধিমান। আমি তোমাকে আমার যা কিছু আছে তা সব দিয়ে দিয়েছি, আমার দুঃখকষ্ট ভরা সমস্ত জীবন। তুমি তার বদলে করুণা করে আমায় দিলে তোমার আনন্দের উপস্থিতি !'

এই বিচক্ষণ বিনিময়ের জন্য ভগবান রামানা বলছেন যে তিনি ঈশ্বরের চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান। অস্তিত্বের জন্য তাঁর এই অসীম কৃতজ্ঞতার ভাব কত বন্দনীয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের একটা গল্প বলি :

> বলা হয় যে যখনই রামকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থান থেকে কেউ এসেছে দেখতেন , তিনি তাঁর পায়ে পড়তেন। চৈতন্য মহাপ্রভু ভারতের এক মহান জীবনমুক্ত মাস্টার ছিলেন।
> একবার রামকৃষ্ণ যখন এরকমভাবে কারো পায়ে পড়লেন , আশেপাশের মানুষেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কেন এভাবে সাধারণ মানুষের পায়ে পড়েন।
> তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'তারা সাধারণ বা অসাধারণ হোক, যায় আসে না, তারা বানিগাতি (পাণীহাটি) থেকে আসছে - যেখানে শ্রীচৈতন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ সংকীর্তন করেছিলেন। যেই মুহূর্তে আমি শুনি যে তারা সেখান থেকে আসছে , সেই নামই (পাণীহাটি) আমার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি জাগ্রত করে; সেটাই যথেষ্ট। শ্রীচৈতন্যকে আমার স্মরণে নিয়ে আসার জন্য আমি তাদের পায়ে পড়ে কৃতজ্ঞতা জানাই। যদি আমার তাদের সাথে সেই সময় দেখা না হত আমি হয়ত কোন মূল্যহীন জিনিষ চিন্তা করতাম। তারা হ'ল সেই যন্ত্র, যারা আমার মধ্যে ঐশ্বরিক স্মৃতি ও ধারণা জাগিয়ে দেয়।'

সেটা ছিল রামকৃষ্ণের উত্তর!

শ্রীচৈতন্যের চিন্তা মনে আনার জন্য, রামকৃষ্ণ তাদের পায়ে পড়তেন! আজকের দিনে কি তা কল্পনা করতে পার? সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি যে সবকিছুকে ও সবাইকে কৃতজ্ঞতা সহকারে দেখা উচিৎ , তারা যাই করুক না কেন। তারা সবাই অস্তিত্বের অংশ এবং তারা সবাই অস্তিত্ব দ্বারা সৃষ্ট সমলয়ে সুবিন্যস্তভাবে এগিয়ে চলেছে। আমরা যখন এই ঘটনায় সংবেদনশীল , যেভাবে জিনিষগুলি ঘটছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে সমর্থ হব।

মহান মাস্টারদের থেকে আমাদের এই কৃতজ্ঞতা বোধ আত্মভূত করতে হবে। একমাত্র এই জিনিষটাই তাঁদের থেকে আমাদের শিখতে হবে; স্বতশ্চলভাবে অন্যগুলিকে যত্ন নাওয়া হবে, কারণ তুমি যখন এটা আত্মভূত কর, সমকালীনতার (coincidence) শক্তি তোমার যত্ন নেবে এবং অস্তিত্ব তোমার ওপরে সহজেই কৃপা বর্ষণ করবে। কিন্তু আজকে ব্যাপারটা কত আলাদা।

এই ছোট গল্পটা শোন :

> একটি ভিখারী রাস্তায় একটি লোককে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'দুই বছর আগে আপনি আমাকে ২০ টাকা দিতেন। গত বছর মাত্র ১০ টাকা দিলেন। আর এই বছর শেষ হতে চলল এবং এখন পর্যন্ত কেবল ২ টাকা দিয়েছে। কেন?'
>
> লোকটি উত্তর দিল, 'প্রথমে আমি অবিবাহিত ছিলাম, তারপর বিয়ে করলাম আর এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে। তাই।'
>
> ভিখারীটি চেঁচিয়ে উঠল, 'কি? তুমি আমার টাকা দিয়ে পরিবার চালাচ্ছ?'

ভিখারীর কথা শোন, 'তুমি আমার টাকা দিয়ে তোমার সংসার চালাছ!' আসলে আমরা অনেকেই ভাবি যে আরেকটা মানুষ আমাদের ও আমাদের প্রয়োজনে সাহায্য করবে বলে আশা করাটা আমাদের জন্মগত অধিকার। আর আমরা তাদের অবধারিত বলে ধরে নিই।

এটা বোঝ : এমনকি আমাদের নিজের বাবা বা মা বা পতি বা পত্নীকেও অবধারিত বলে মেনে নাওয়া উচিৎ নয়।

তাই বোঝ : অতৃপ্তি, উদ্বেগ ও বিষাদ অন্বেষণ করার মনোভাব থেকে পরিবর্তিত হয়ে যখন তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে বর্তমানকে অন্বেষণ করার মনোভাব নিয়ে আস, তখন তুমি স্বতশ্চলভাবে অস্তিত্বের শক্তিকে আরও ভাল করে আহরণ করতে পারবে। তখন তুমি অস্তিত্বকে আরও ভাল করে কদর করতে পারবে ও কৃতজ্ঞতা তোমার জীবনশৈলী হবে।

> একদিন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর জন্য দোকান থেকে সবজি আনতে গেল। সে কিছু চ্যাঁড়স কিনল ও বাড়ি ফিরে সেগুলি

স্ত্রীকে দেখাল।
তার বউ সেগুলি দেখে বলে, 'ও! এগুলি তো বুড়ো হয়ে গেছে। আমি এগুলো রান্না করতে পারব না।'
লোকটি পরদিন বাজারে গিয়ে অনেক সতর্কতার সাথে আরও ঢ্যাঁড়স কিনে ঘরে ফিরল এবং তা স্ত্রীকে দেখাল।
বউ বলে, 'কি নিয়ে এসেছ? এগুলো তো এতই কোমল যে আমি যা বানাতে চাইছি তা এগুলি দিয়ে হবে না।'
পরের দিন লোকটি বাজারে গেল ও দোকানদারকে মিনতি করে বলল, 'দয়া করে আমায় এমন কিছু ঢ্যাঁড়স দিন, যেগুলো বুড়োও নয় আবার কোমলও নয়।'
দোকানদার সবচেয়ে ভাল ঢ্যাঁড়স নিজে বেছে দিল ও লোকটি তা নিয়ে ঘরে এসে তার স্ত্রীকে দেখাল।
স্ত্রী তা দেখল ও বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি আজকেও ঢ্যাঁড়স নিয়ে এসেছ?'

আমরা যখন জিনিষগুলিকে অবধারিত বলে ধরে নিই, সেগুলিকে আমরা কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কদর করতে পারি না। আমাদের বিভিন্ন সম্পর্ক সহকারে কোন কিছুই কদর করতে পারি না।

আরেকটা ছোট গল্প :

একটা মানুষ কাজ থেকে ঘরে ফিরে দেখে যে তার স্ত্রী প্রচণ্ড খারাপ মেজাজে আছে।
সে লোকটির দিকে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি কাজের মহিলাটিকে এতদিন ধরে ঘরের সমস্ত কাজ শেখালাম আর এখন সে ছেড়ে চলে গেল।'
লোকটি সহানুভূতি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রিয়ে, কারণটা কি?'
পত্নী উত্তর দিল, 'তুমিই তার কারণ! সে বলে যে তুমি তার সাথে টেলিফোনে খুব বাজে করে কথা বলেছিলে। তা শুনে সে ঠিক করে যে তাকে তার আত্মসম্মান বাঁচাতে হবে এবং তাই সে ছেড়ে চলে গেছে।'
লোকটি হতভম্ভ হয়ে গেল ও বোকার মত বলল, 'কিন্তু আমি ভাবলাম আমি তোমার সাথে কথা বলছি!'

আমরা সম্পর্ক সর্বদা অবধারিত বলে ধরে নিই। প্রতিটি মানুষকে পূর্ণের এক অংশ ভেবে তার সাথে আচরণ কর এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব কর; তাহলে তুমি কাউকেও অবধারিত বলে গণ্য করবে না। তুমি সবাইকে অস্তিত্বে র অংশ বলে পূজা ও শ্রদ্ধা করবে।

জিনিষগুলিকে অবধারিত বলে গণ্য না করলে তুমি যা পেয়েছ তাতে কৃতজ্ঞ থাকবে। যদি তুমি বসে বিশ্লেষণ কর, তবে দেখবে যে আমরা যা পাই নি সর্বদা সেগুলিকে ব্যগ্র হয়ে গুণতে থাকি - তা সে আমাদের ওপরে যতই কৃপা বর্ষণ হয়ে থাকুক না কেন। আমরা সুখী নই কারণ আমরা সেগুলি সম্বন্ধে ভাবছি যেগুলি এখনও আমাদের কাছে আসে নি!

কল্পনা কর, তোমাকে বলা হয়েছে যে বসো এবং যা যা জিনিষ তোমার ওপরে বর্ষিত হয়েছে বলে মনে কর তার একটা তালিকা বা লিস্ট বানাও। তুমি তোমার চোখ থেকে শুরু করতে পার। আগেই বলছিলাম , তুমি কি জান যে কতজন মানুষ দৃষ্টিশক্তির আশীর্বাদ পায় নি? তুমি কি কল্পনা করতে পার যে একদিন সকালে উঠে যদি বোঝ তুমি অন্ধ হয়ে গেছ , তো কি হবে? তুমি বিছানা থেকে উঠে বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারবে না! যে সমস্ত কাজগুলি তুমি এতদিন কৃতজ্ঞ না হয়ে করেছ , সেগুলি করার জন্য তখন অনেক প্রয়াস লাগবে।

যাই হোক, যদি তুমি একটা লিস্ট লেখা শুরু কর যে তোমাকে জীবনে কি কি দেওয়া হয়েছে , তা একটা লম্বা লিস্ট হবে। সেই লিস্ট শেষ করার পর, আরেকটা লিস্টে লেখ যে তুমি কি ভাব যে তোমাকে কি কি দেওয়া হয় নি। সেটাও একটা লম্বা লিস্ট হবে...আসলে বিরাট লম্বা লিস্ট! সেই লিস্ট হয়ত একটা মার্সেডিস বেঞ্জ গাড়ি দিয়ে শুরু হবে এবং বেঞ্জ গাড়ির চেয়ে লম্বা হয়ে শেষ হবে! দুটো লিস্টেরই শেষ নেই, আসলে দুটিই অসীম হবে, যদি তুমি একটা জিনিষও না ভুলে আন্তরিকভাবে লিখতে পার।

ঠিক আছে, এখন আমাদের সামনে দুটো লিস্ট আছে। এখন এটা আমাদের ওপরে নির্ভর করে যে আমরা কোন লিস্টের ওপরে ফোকাস করব। আমরা কি আমাদের ওপরে যে যে জিনিষ কৃপা বর্ষণ করা হয়েছে তা দেখে আমাদের জীবন সুন্দর বানাব অথবা আমাদের যা পাইনি তা দেখব এবং আমাদের জীবন নীরস ও মৃতবৎ বানিয়ে ফেলব। এটা তো আমাদের পছন্দ!

যে মানুষ সব কিছু অবধারিত বলে মনে করে সে দ্বিতীয় লি স্টটি লোভ ও অসন্তোষের সাথে দেখবে। যখন তুমি লোভী , তুমি স্বতশ্চলভাবে কেবল অসন্তুষ্ট অনুভব করবে, কারণ তোমার লোভের কোন শেষ নেই এবং তাই তোমার সন্তুষ্টি কখনও ঘটতে পারে না! যাই হোক, এই মানুষটি জীবনের আনন্দ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে যা প্রথম লিস্টে আছে।

সে জীবনে যাই পেয়ে থাকুক না কেন, তা ছোটই হোক আর বড়ই হোক, তার কাছে তা সাধারণ মনে হবে এবং সে কেবল পরের জিনিষটির জন্য অপেক্ষা করবে। আর পরের জিনিষটা পেলে, সেটাও তার কাছে সাধারণ লাগবে কারণ সে ইতিমধ্যে পরের

জিনিষটার জন্য চিন্তা করছে!

অন্যদিকে যে মানুষটি কৃতজ্ঞতা নিয়ে বাস করে সে দ্বিতীয় লিস্ট আছে বলে জানবেই না! সে শুধুমাত্র প্রতিটি মুহূর্তে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। কৃতজ্ঞতাই যেন তার শ্বাসপ্রশ্বাস। জীবন তার জন্য এক চিরন্তন আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপন। সে কত হালকা ও আনন্দপূর্ণ। তাকে দেখতে থাকলে কত আনন্দ হতে থাকে। সে নিজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনন্য সৌন্দর্য ছড়াতে থাকে।

শুধুমাত্র সবসময়ে কৃতজ্ঞ থাকলে, জীবনের তথাকথিত সমস্ত নীরস জিনিষগুলি পবিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে ! আমি তোমাদের বলি, কেবল তোমার জিনিষগুলিকে অবধারিত বলে ধরে নেবার মনোভাবের জন্য তুমি ভাব যে তোমার জীবন নীরস হয়ে গেছে। তোমার ভাবনা অনুযায়ী জীবন নীরস নয়। প্রতিটি ছোট জিনিষই সুন্দর। তোমার মন হ'ল নীরস; তোমার মনই তোমাকে গভীরে যেতে দেয় না, তাই দেখতে পাও না যে অস্তিত্ব কত সুন্দরভাবে প্রবহমান হচ্ছে।

তোমার মন একটা মৃত নক্‌শা বা প্যাটার্ন হয়ে গেছে যা কেবল বারবার বলে 'এরপর কি?'

যখন সব জিনিষকে এক বিস্ময়-ভরা মনোভাব নিয়ে দেখতে সমর্থ হও, তুমি কৃতজ্ঞতা ও পরিপূর্ণতায় ভরে যাও কারণ তুমি সে সময় প্রশ্ন করছ না। তুমি তোমার মনকে একদম খেলতে দিচ্ছ না। তুমি সহজেই তোমার হৃদয়ের সাথে অনুরণিত হচ্ছ। এই সময়ে তুমি শিশু হও এবং শিশু হলে কিছুই নীরস নয়; সবকিছুই বিস্ময়কর!

সবকিছুর দিকে কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময় সহকারে তাকাতে শেখ। তোমার শরীরকে উদাহরণস্বরূপ নাও । এই ছোট অনুশীলনটি এখন কর। বসো ও চোখ বোজ। প্রত্যক্ষবৎ স্মরণ কর যে তোমার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি কোন ছোট দুর্ঘটনায় কেটে গেছে। কল্পনা কর যে তোমার কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি এখন আসল সাইজের কেবল তিন চতুর্থাংশ হয়ে গেছে। তোমার শরীরে আর কোন অঙ্গবৈকল্য তোমার জানা নেই। তোমার শরীর একদম নিখুঁত। হঠাৎ শুধুমাত্র তোমার কনিষ্ঠ আঙ্গুল কেটে গেছে।

তোমার প্রতিক্রিয়া কি হবে? তোমার পক্ষে সেটা হজম করা বেশ শক্ত হবে। প্রতিটি সাধারণ কাজের জন্য, যেখানে তোমার হাত ব্যবহার করা হয়, সেখানে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ভূমিকা থাকে। তোমার কি অবস্থা হবে? তুমি হয়ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে যাবে।

এখন খালি ভাব, এই পৃথিবীতে কত মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে আছে। কত মানুষের পাঁচটা আঙ্গুলই নেই ! মাথা থেকে পা পর্যন্ত, কেবল একটি অঙ্গে বিকৃতি থাকলেও তুমি জীবনের কোন না কোন একটি দিক উপভোগ করতে পারবে না।

রোজ কয়েক মিনিট ঘরে একা বসে দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রেমের সাথে স্পর্শ কর এবং তোমাকে জীবনে কত কিছু উপভোগ করাবার জন্য প্রত্যেকটিকে ধন্যবাদ দাও।

তুমি কি কখনও তোমার শরীর সম্পর্কে এইভাবে ভেবেছ? তুমি তোমার শরীরকে কত অবধারিত বলে গণ্য কর! তোমার শরীরকে তুমি কত অনাদর কর। আমরা অনেকে আমাদের শরীরকে ঘৃণা করি, কারণ আমরা ভাবি যে এটা যথেষ্ট সুন্দর নয়। আমি বলি, তুমি যদি এই অভ্যাস রোজ কর এবং দেহের প্রতিটি অংশের জন্য প্রেম ও কৃতজ্ঞতা অনুভব কর , তুমি দেখবে যে তোমার সমস্ত শরীর ও মুখ এক নতুন উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হবে।

তোমার শরীর তোমার মনকে সাড়া দেয়। কখনও তাকে অবহেলা কোরো না অথবা তাকে অবধারিত বলে ধরে নিও না। সব সত্ত্বেও, শুধুমাত্র তোমার শরীরের জন্যই তুমি কত কিছু উপভোগ করতে পারছ। এমনকি আজ এখানে আসার জন্য এবং এই কথা সহজভাবে শোনার জন্য তোমার দেহের সমস্ত অংশগুলিকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা দরকার।

তুমি আরও কি চাও?

একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের বুঝতে হবে যে বাসনা ও কৃতজ্ঞতা একসাথে থাকতে পারে না । তোমার একটার পর একটা বাসনার উদয় হওয়া মানে তুমি কৃতজ্ঞতা সহকারে বাস করছ না। যখন তুমি কৃতজ্ঞ হয়ে বাস কর ; তোমার কখনও কোন বাসনা থাকতে পারে না। কৃতজ্ঞতা সহকারে থাকলে , তোমাকে যা দেওয়া হয় তাতেই তোমার সেই মুহূর্তে যা দরকার তা সহজেই পূর্ণ হবে, ব্যাস। এমনকি চাওয়ার আগেই, তুমি পেয়ে যাবে, তাই চাইবার কোন প্রশ্নই থাকবে না!

কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করলে জিনিষগুলি সর্বদাই নিখুঁত হবে। নয়ত , জিনিষগুলিতে সবসময়ে কিছু খুঁত থাকবে ও সেগুলি অসুন্দর হবে। মানুষের লোভ এমনই যে তাকে পৃথিবীর রাজা বানিয়ে দিলেও সে ভাববে , 'সাগরগুলি আমাকে মানে না; সুর্য ও তারাগুলি আমার আদেশ পালন করে না!'

শিবপুরাণে শিব ও ব্রহ্মকপালের গল্প আছে। ব্রহ্মকপাল হ'ল একটা মাথার খুলির ওপরের অংশ যা শিব ভিক্ষুক সেজে ঘুরে

বেড়াবার সময় ভিক্ষাপাত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। ব্রহ্মকপাল সম্বন্ধে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, যা কিছু ভিক্ষা মানুষ তাতে দেয়, ব্রহ্মকপাল তা সাথে সাথে গিলে ফেলে! শিব সেই পাত্রটিকে ভরার অনেক চেষ্টা করলেও পাত্রটি সবসময় খালি থেকে যায়।

আসলে এই ব্রহ্মকপাল আমাদের ভিতরে আছে। সেটাই আমাদের অহংভাব; আমিত্ব সবকিছুকে গিলে ফেলে এবং আরও চায়! এই আমিত্ব, আমরা যা পেয়েছি, তা আমাদের উপভোগ করতে বাধা দেয়।

তুমি তোমার জীবন 'চাওয়া' নাকি 'কৃতজ্ঞতা'-র ওপরে ভিত্তি করতে চাও তা কেবল সম্পূর্ণরূপে তোমারই পছন্দ। কৃতজ্ঞতা কো ন নৈতিকতা নয় যা তোমার ওপরে বাইরে থেকে চাপানো যায়। এটা এমন এক মনোভাব যাকে অস্তিত্ব ও তার পথের গভীর উপলব্ধি থেকে অন্তর থেকে প্রস্ফুটিত হতে হবে। যখন আসল কৃতজ্ঞতা ঘটে , তা তোমার জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পরিবর্তন করে দিতে পারে এবং তোমার জন্য চিরন্তন শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আসতে পারে।

> একবার একটি লোক রামানা মহর্ষির কাছে যায় ও বলে, 'ভগবান, আমি শান্তি চাই!'
> রামানা উত্তর দেন, 'তোমার নিজের কথা থেকে 'আমি' শব্দটা সরিয়ে দাও আর 'চাই' শব্দটা দূর করে দাও - যা পরে থাকল তাই 'শান্তি'!'

বাস্তবতার সাথে, অস্তিত্বের সাথে জীবন্ত সংযোগ রাখার একমাত্র পথ হ'ল তোমার নিয়ন্ত্রণ ও তোমার আমিত্বকে ছেড়ে দেওয়া এবং তোমার চারপাশে যে দেওয়াল বানিয়েছ তাকে ভেঙ্গে ফেলা; তাহলে দেখতে সমর্থ হবে যে সেই সংযোগ সর্বদাই ছিল! তোমাকে বিশেষভাবে কিছু করতে হবে না; যেটা নয় তাকে সহজেই ফেলে দিতে হবে, ব্যাস!

যখন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে প্রেম করছ ও তাতে প্রবাহিত হচ্ছ , তুমি সর্বদাই অনুভব করবে যে অস্তিত্বের অঢেল শক্তি তোমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তুমি সবসময়ে একটা পরিপূর্ণতার ভাব নিয়ে আছ , কোন লাভের জন্য নয়, কিন্তু তোমার সত্তায় মিশে যাবার জন্য! এই পরিপূর্ণতাই চরম পরিপূর্ণতা যা সকল মানুষ অন্বেষণ করছে, যদিও সে সেটার সম্বন্ধে সজাগ নয়। সে বারবার সেটা সমস্ত বস্তুগত জিনিষে খুঁজতে থাকে ও তা হারাতে থাকে।

অস্তিত্বে আস্থা রেখ

তুমি মান কি না মান, অস্তিত্ব তোমার যত্ন নিচ্ছে এবং তোমাকে কেবল তার ওপরে আস্থা রাখতে হবে এবং তোমার কর্তব্য কৃতজ্ঞতা সহকারে করতে হবে। তখন তোমার ওপরে অস্তিত্ব মঙ্গল বর্ষণ করবে।

কিন্তু আমাদের আস্থা নেই।

একটা ছোট গল্প :

> একজন মানুষ কোন বিশ্বাস ছাড়াই বাস করত। একদিন অকস্মাৎ সে পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ে গেল এবং দেখল যে সে একটা গাছের শিকড়ে আটকে ঝুলছে। সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গে ল।
> তার হঠাৎ মনে পড়ল যে লোকেরা সবসময়ে ঈশ্বরের কথা বলে। সে মনে মনে ভাবল, 'সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে ডেকে চেষ্টা করা যাক' এবং চ্যাঁচাল, 'হে ঈশ্বর! তোমার ওপরে আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না; তুমি কি সত্যিই আছ? তুমি কি আমায় বাঁচাতে পার?'
> ঈশ্বরের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল, 'সে পুত্র! নিঃসংশয়ে। ঐ গাছের শিকড়টা ছেড়ে দাও এবং আমি তোমাকে নীচে থেকে ধরে ফেলব।'
> লোকটি আবার চ্যাঁচাল, 'আর কেউ আছে কি যে আমাকে বাঁচাতে পারে?'

আমরা অস্তিত্বের ওপরে বিশ্বাস রাখার জন্য একদম প্রস্তুত নই! তোমার সত্তার অস্তিত্বে আস্থা রাখার গুণমানই তোমাকে পৃথ্বীলোকে দেবতার মত বাস করাবে! এই সুন্দর সুযোগ তুমি তোমার অজ্ঞানতা ও আমিত্বের জন্য হারাচ্ছ।

আমরা যদি মহাজাগতিক শক্তির দিকে এক অবিরাম কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে থাকি , তবে আমরা অনুভব করতে সমর্থ হব যে সেই মহাশক্তিই তার কোলে আমাদের যত্ন নিচ্ছে। মা যেভাবে শিশুকে লালনপালন করে, এই মহাশক্তিও সেইভাবে আমাদের লালনপালন করছে বলে আমরা অনুভব করব; তুমি মান কি না মান এটাই সত্য।

> একজন মানুষ স্বপ্ন দেখল যে ঈশ্বর ও সে জীবনের যাত্রায় সমুদ্রতীরে বেলাভুমিতে হেঁটে চলেছে।
> সে ঈশ্বরকে বলল, 'হে প্রভু! আমি স্বপ্ন দেখলাম যে তুমি ও আমি সমুদ্রতীরে এই বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। যখন বালির ওপরে ছাপগুলি দেখলাম, আমি বুঝলাম, যখন জীবন খুব কষ্টের ছিল, যখন আমার বড় বড় সমস্যাগুলি ছিল,

> তখন কেবল একজনের পায়ের ছাপ ছিল; অন্যজনেরটা ছিল না। ঐ সময়গুলিতে তুমি কিভাবে আমায় ছেড়ে ছিলে?' ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'পুত্র! ঐ সময়গুলিতে আমি তোমায় বহন করছিলাম!'

আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলতে দাও : আমার পরিব্রজ্যার সময়, আমি হাজার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। আমি কেবল দুটি কাপড় ও এক ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভ্রমণ করেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম টাকা ছোঁব না এবং পরবর্তী ভোজনের জন্য খাবার বাঁচিয়ে রাখব না।

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে সেটা কিভাবে সম্ভব। আমি তোমাদের বলি : আমি সহজভাবে অস্তিত্বের ওপরে আস্থা রেখেছিলাম এবং আমার জীবনমুক্তির লক্ষ্যের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং অস্তিত্ব আমার যত্ন নিয়েছিল ; এইভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল।

যখন তোমরা আমাকে বলতে শুনবে, 'অস্তিত্বের ওপরে বিশ্বাস রাখ,' তোমরা ভাবতে পার যে এটা হয়ত আগেকার ন্যায়পরায়ণ ও সাধুদের সময়ের ধারণা। একদম নয়। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি; তোমার চোখের সামনে যে এখন বসে আছে তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি! আর আমার মনে হয় আমি এই সমাবেশে বয়সে সবচেয়ে ছোট! তাই আমি তো অনেক আগের দিনের কথা বলছি না। বুঝতে পারছ আশা করি।

শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা সহকারে বাস করার চেষ্টা কর এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটা প্রত্যক্ষ কর। অস্তিত্ব প্রদান করে , যদি তুমি কোন সন্দেহ বিনা উচ্ছলিত হৃদয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাক।

যা তোমার কাছে ইতিমধ্যে আছে তার জন্য ধন্যবাদ দাও

> একটি লোক স্বপ্ন দেখল যে সে স্বর্গে গেছে এবং এক দেবদূত তাকে স্বর্গ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। সে দেবদূতের পাশে পাশে চলছিল।
> প্রথমে তারা একটা বড় কাজের ঘরে প্রবেশ করল, সেখানে অনেক দেবদূত ছিল। সেই ঘরে ব্যস্তভাবে অনেক কাজ হচ্ছিল।
> দেবদূত-গাইড থেমে লোকটিকে বুঝিয়ে দিল, 'এটা হ'ল গ্রহণ বিভাগ (রিসিভিং সেক্শন)। এখানে ভগবানের কাছে মানুষের প্রার্থনার মাধ্যমে সমস্ত আবেদনগুলি গ্রহণ করা হয় ও তাদের গুছিয়ে ফেলা হয় ।'
> লোকটি চারিদিকে তাকাল। সে দেখতে পেল যে পুরো জায়গাটা ভীষণ ব্যস্ত এবং অনেক দেবদূত বিভিন্ন রকম কাগজে লেখা বহু আবেদন বাছাই করে চলেছে - লম্বা কাগজ, টুকরা কাগজ ও কত কি। বিভিন্ন ভাষায় পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে আসা ঐ আবেদনপত্রগুলি।
> তারপর তারা দ্বিতীয় বিভাগের দিকে গেল ও সেখানে প্রবেশ করল।
> এই বিভাগও অনেক ব্যস্ত, দেবদূতে ভর্তি এবং সেখানে অসংখ্য পার্সেল ও কাগজ। গাইড দেবদূত বুঝিয়ে দিল , 'এটা পার্সেল ও বিতরণ বিভাগ। এখানে মানুষেরা যেসব অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ চেয়ে পাঠিয়েছে , সেগুলিকে গুছিয়ে নীচে পৃথিবীতে বিতরণ করা হয়।'
> তারা হেঁটে চলে ও লম্বা বারান্দার শেষে একটা ছোট ঘরের দরজায় থামল। লোকটি অবাক হয়ে দেখে যে, সেখানে শুধুমাত্র একটি দেবদূত তার ডেস্কে অলসভাবে বসে আছে।
> লোকটি গাইড দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই বিভাগটি এত চুপচাপ কেন? এটা কোন বিভাগ?'
> দেবদূত বন্ধু শান্তভাবে উত্তর দিল, 'এটা আশীর্বাদ-স্বীকৃতি বিভাগ। যারা আশীর্বাদ পেয়ে স্বীকারোক্তি পাঠায় , সেগুলিকে এখানে গুছিয়ে রাখার কথা।'

আমরা সবাই চাই আর চাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন আমরা যা পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ দিই? আমরা কয়জন কৃতজ্ঞতাকে প্রার্থনায় আমাদের চাওয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত করি?

একা একা থাকলে এই ছোট অনুশীলনটি কর :

দুই ঘন্টা ধরে, তোমার উদ্বেগ ও চাহিদাগুলিকে সরিয়ে রাখ এবং যে অস্তিত্ব তোমাকে সব দিয়েছে তার দিকে নিবদ্ধ হও। তুমি সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, 'যদি আমি আমার চাহিদা সম্বন্ধে চিন্তা না করি, তাহলে আমি তা কিভাবে পূরণ করব? আমার পরিবারকে কে দেখবে? আমার ব্যবসার কি হবে?' মানলাম, তোমাকে এসব জিনিষ সম্বন্ধে ভাবতে হবে। কিন্তু মাত্র দুই ঘন্টার জন্য, এই সমস্ত ভার তোমার মাথা থেকে সরিয়ে রাখ ও আমি যা বলছি তা কর।

যে করেই হোক, তুমি কি ভাব যে তোমার পরিবার অথবা তোমার ব্যবসা তোমার জন্য চলছে ? আমি তোমাদের বলি, জিনিষগুলি

আমাদের জন্য ঠিকঠাক চলছে তা নয়, কিন্তু আমরা থাকা সত্ত্বেও সেগুলি ঠিকঠাক চলছে! যদি অস্তিত্বকে আমাদের পরিবার ও ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের বুদ্ধির ওপরে নির্ভর করতে হ'ত, আমরা সবাই এতদিনে নিঃস্ব হয়ে যেতাম! আর পরিষ্কার করে বোঝ : কেবল দুশ্চিন্তা করে কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা তো দুশ্চিন্তা সম্পর্কে আগে যথেষ্ট আলোচনা করেছি।

তাই কিছু মিনিটের জন্য তোমার চোখ বন্ধ কর এবং তোমার ওপরে যা কৃপা বর্ষণ করা হয়েছে, তোমার ইতিমধ্যে যা আছে, তাতে নিবদ্ধ হও। মানসিকভাবে সব কিছুর মধ্য দিয়ে চল - তোমার দেহ, তোমার সম্পদ, যে সব লোকেরা তোমায় সহায়তা ও সাহায্য করে, তোমার বাড়ী, তোমার বিলাস-সামগ্রীগুলি, তোমার অবকাশ যাপনগুলি, সবকিছু। এই সবগুলিকে আরাম করে ও কৃতজ্ঞ হয়ে উপভোগ কর। যতক্ষণ সময় লাগে লাগুক।

তাড়াহুড়ো কোরো না এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে সেগুলির মধ্য দিয়ে যেও না। সেগুলির পুরোটাই তোমার মনের মধ্যে অতিবাহিত কর। সেই ভাব নিয়ে থাক। সেই পরিপূর্ণতার সুন্দর ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ থাক। ভাব যে তুমি কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে যাচ্ছ এবং তাতে উথলে পড়ছ। এখন তুমি চোখ খোলার পর দেখবে যে তোমার কাছে যা আছে তা তোমার জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী! - এবং তুমি অবাক হবে যে তোমার আরও কত চাই!

কৃতজ্ঞতা হয়ে যাও ও উপভোগ কর!

তোমাকে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা হয়ে যেতে হবে! কৃতজ্ঞতা হবার জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল কোন কারণ ছাড়াই উপভোগ করা। অস্তিত্বই যত্ন নিচ্ছে বলে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যা কিছু দেখ, যা কিছু শোন এবং যা কিছু কর, তা উপভোগ কর। জীবন তখন সহজেই তোমার চোখের সামনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং তুমি সর্বদা উচ্ছ্বসিত থাকবে কারণ তুমি সর্বদাই জীবনকে উপভোগ করছ।

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক আমবাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই আমবাগান নানা প্রকার আমে ভর্তি। সে বাগানে প্রবেশ করল, চারিদিকে দেখল, পর্যবেক্ষণ করল, কিছু পরিসংখ্যান নিল ও আধা ঘন্টা পরে নানা তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে চলে গেল।
> কিছুক্ষণ পরে আরও একজন লোক একই বাগানে এল। সে কিছু আম পাড়ল, তাদের আনন্দ সহকারে খেল এবং চলে গেল!

এখন আবার তোমরা অন্য আমবাগানের আম খেতে যেয়ো না। তোমাকে হয়ত কেউ পাথর মারতে পারে! আমি কি বলতে চাইছি তা বোঝার চেষ্টা কর। প্রশ্ন না করে জীবনকে কেবল উপভোগ করতে শেখ, যদিও আমি বলছি না যে তোমার সব কাজ ফেলে দিয়ে তুমি সবসময়ে কেবল উপভোগ কর।

কোন সন্দেহ নেই যে তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি শুধু উপভোগ করতে থাকলে কেউ তোমাকে সবকিছু দিতে থাকবে না। আমি কেবল বলছি, উপভোগ করার জন্য কারণ খুঁজতে যেও না, ব্যাস। বিনাপ্রশ্নে সবকিছু কেবল উপভোগ কর। উপভোগ করা তোমার স্বভাব হোক, তখন কৃতজ্ঞতা তোমার সত্তা হয়ে যাবে।

তোমার পেশা, তোমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও তোমার আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, এসব নির্বিশেষে যে কোন মানুষের উপভোগ করার সামর্থ্য আছে।

সমস্যা হল তুমি সর্বদা ভাব যে সবকিছুর জন্য একটা নিমিত্ত বা হেতু থাকা প্রয়োজন, এমনকি আনন্দের জন্যও। তুমি তোমার মনকে এই প্রকার চিন্তার নক্শা দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়েছ। এই কারণে তুমি পায়ই ভাব যে অন্যরা যোগ্যতার চেয়ে বেশী জিনিষ আশীর্বাদে পেয়ে গেছে, আর তোমাকে তোমার উদ্যমের জন্য যথেষ্ট প্রাপ্য দেওয়া হয় নি।

তুমি সর্বদাই ভাব যে উপভোগ করার জন্য তোমায় খুব পরিশ্রম করতে হবে। না! পরিশ্রম করা ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে উপভোগ করার সামর্থ্যের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধারণাটা মুছে ফেল। একমাত্র এই পথেই তুমি অভিযোগ করা অথবা অসন্তুষ্ট হওয়া বন্ধ করবে।

অস্তিত্ব কৃপা বর্ষণ করে। যদি তা উপভোগ করতে পছন্দ কর, তুমি তা করবে। এটা একদম তোমারই পছন্দ। তুমি ভুল পছন্দ কর এবং তারপর অভিযোগ কর ও অন্য কাউকে দোষ দাও। মনে রেখ, তোমার সাথে ঘটা ঘটনার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়। সবকিছুই এক সজ্ঞান পছন্দ যা তুমি অচেতনভাবে কর। তোমার সজাগতার অভাবের জন্য তুমি অচেতন ও বৈচিত্রহীন নির্ণয় নাও এবং জীবন সম্পর্কে অভিযোগ কর।

সবসময়ে মনে রেখ যে স্বর্গ ও নরক বহির্জগতে ভৌগলিক অবস্থান নয়। তুমিই তাদের নিজের ভিতরে সৃষ্টি কর। যেই মুহূর্তে অস্তিত্বের ওপরে আস্থা হারাও, তুমি নিজেকে তার বিরোধী করিয়ে দাও এবং যেখানেই যাও নিজের সাথে নরক বহন কর।

> একবার এক শিক্ষক তার ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে, 'কেউ আমায় বলতে পার কি নরক কোথায়?'
> এক লম্বা নীরবতার পরে একটি ছাত্রী উঠে দাঁড়ায় ও উত্তর দেয়, 'আমার বাবার পড়ার ঘরে।'
> শিক্ষক বিস্মিত হ'ল ও তাকে প্রশ্ন করল যে সে এরকম কেন বলল।
> শিশুটি উত্তর দিল, 'প্রতিবার বাবার পড়ার ঘরে গেলে, বাবা চিৎকার করে বলে যে এখান থেকে নরক বার করে দাও (get the hell out of here)!'

কৃতজ্ঞতা সহকারে থাক, তাহলেই যথেষ্ট

বাচ্চাদের ছেলেবেলা থেকেই স্বর্গ ও নরককে তাদের বাইরের সত্তা বলে ভাবতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের শেখানো হয় যে ভগবান ওপরে কোথাও বসে আছেন - একটা মস্তবড় সিংহাসনে এবং তিনি আমাদের প্রতিটি চলাফেরা লক্ষ্য করছেন এবং আমাদের পাপ ও পূণ্য লিখে রাখছেন।

এইরকম ভেবে আমরা আমাদের সমস্ত কাজেই কার্যকারণ চক্র আরম্ভ করে ফেলি। আমরা ভাল কাজের সাথে স্বর্গের ও খারাপ কাজের সাথে নরককে সংযুক্ত করি। আমরা মনে করতে শুরু করি যে ভগবান বা সম্পূর্ণ অস্তিত্ব যেন এক লেনদেন-কেন্দ্র। আমাদের প্রকৃত পেশা নির্বিশেষে আমরা সবাই নিজের মত করে একেকজন ব্যবসায়ী হয়ে যাই !

মন্দিরে গেলে তুমি কি কর? তুমি ফুল, নারকেল ও ফল ক্রয় কর এবং পরিবারের নামে ঠাকুরকে অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য দাও। তুমি তোমার ও পরিবারের সবার নাম, জন্ম নক্ষত্র, রাশি ইত্যাদি বল এবং আচারানুষ্ঠান সম্পন্ন কর।

বেচারা পূজারী একটা পাত্র তার হাতে ধরবে এবং তুমি তাকে তোমার পরিবারের প্রত্যেকের নাম ও অন্যান্য তথ্যের লম্বা লিস্ট বলতে থাকবে। ভগবান ভুল মানুষকে বা ভুল বাড়ীতে আশীর্বাদ পাঠাবে ভেবে তুমি এত ভীত ! তুমি তাঁকে সঠিক ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বল এবং তাঁকে জোর দিয়ে বল যে পূজা দিতে তুমিই তাঁর কাছে এসেছ, অন্য কেউ নয়। এসব করার পর তুমি মন্দির থেকে চলে যাও। আমি ঠিক বলছি কি?

এসব না বললে ভগবান যেন তোমায় চিনতে পারে না! যেন তোমার বিদ্যমানতা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হবে, আর তারপর ভগবান যেন তোমার ওপরে কৃপা বর্ষণ করে।

তোমাকে শুধুমাত্র তাঁর জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে হবে, ব্যাস। তিনি তো সর্বদাই তোমার ওপরে কৃপা বর্ষণ করছেন।

এমন নয় যে ভগবান তোমাকে সমস্যায় দেখে তা থেকে তোমাকে বের করে করে নিয়ে আসার নির্ণয় নেন। অথবা এরকমও নয় যে তিনি তোমাকে ঠিকঠাক দেখলে তোমায় উপেক্ষা করেন। এগুলি সবই ভগবান সম্বন্ধে আমাদের অভিক্ষিপ্ত ধারণা। এগুলি সবই সমাজ আমাদের ছেলেবেলা থেকে শিখিয়েছে।

মন্দিরে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতার ভাবনা নিয়ে প্রবেশ কর; প্রতিটি ঠাকুরের সামনে কয়েক মিনিট গভীর ধন্যবাদপূর্ণতা সহকারে দাঁড়াও এবং সেই একই খেয়ালে মন্দির ছেড়ে যাও। তাহলেই যথেষ্ট। বাকীটার যত্ন আপনা আপনি হবে। এটাই পরম প্রার্থনা। কৃতজ্ঞতাই পরম অর্ঘ্য।

আমি যা বলছি তা কার্যকরভাবে অভিজ্ঞতা করার জন্য এখানে থাকার কয়দিনকে ঠিকভাবে প্রয়োগ কর। বহির্জগত থেকে বাইরে থাকার এই কয়দিন কৃতজ্ঞতাকে শিকড় গাড়তে দাও। উন্মুক্ত হও ও নিজেকে প্রস্ফুটিত হতে দাও। এটা তোমার জন্য এক দুর্লভ সুযোগ। এটা তোমার রূপান্তরিত হবার এক সুযোগ। এটা মিস্ কোরো না। তোমার ভিতরে সেই নতুন অন্তর্জগৎ সৃষ্টি কর, এখান থেকে চলে যাবার পর যেটাকে তুমি সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে।

কৃতজ্ঞতা হৃদয় থেকে হয়

সমস্যা হল, আমরা সর্বদাই আমাদের মস্তিষ্ক দ্বারা ঈশ্বরকে পাবার জন্য চেষ্টা করছি। ঈশ্বরকে মস্তিষ্ক দিয়ে কখনও পাওয়া যায় না। যদি তুমি সহজেই মাথাকে সরিয়ে রাখ, তুমি স্বতশ্চলভাবে হৃদয় থেকে কাজ করবে এবং তুমি আবিষ্কার করবে যে তোমাকে ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে না, ঈশ্বর তো তোমার ভিতরেই আছে!

তোমার মস্তিষ্ক দ্বারা তুমি সর্বদাই বাইরে অন্বেষণ করবে এবং তুমি কখনও ভগবানকে বাইরে পাবে না। আবার, তুমি কৃতজ্ঞ হবার

জন্যও কারণ খুঁজবে। মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে চলে এলে তোমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন স্থান খুলে যায় এবং তুমি উপলব্ধি কর যে তুমি তো আগেই জানতে। কেবল তোমার মন ভিতরে গণ্ডগোল পাকাচ্ছিল ও তোমাকে উপলব্ধি করতে দিচ্ছিল না।

যখন তুমি হৃদয় থেকে ক্রিয়াশীল হও, তুমি সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকেবে। আমরা কি কখনও 'মস্তিষ্ক-অনুভূত কৃতজ্ঞতা' বলি? না! আমরা সর্বদা বলি 'হৃদয়-অনুভূত কৃতজ্ঞতা।' তাই নয় কি?

এরপর তোমরা জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে কিভাবে যাই, স্বামীজী!' কেবল তোমার মস্তিষ্ক সম্পর্কে সজাগ হও, সেটাই যথেষ্ট! যেহেতু তুমি তোমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সজাগ নও, তুমি তাকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দাও, যন্ত্রের মত কাজ করতে দাও। একবার নিজের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সজাগ হলে তুমি তাকে সরিয়ে রাখতে সম র্থ্য হবে।

কৃতজ্ঞতা কোন গুণ নয়। তাকে তোমার মনোভাব হতে হবে। যখন কেবল কৃতজ্ঞতা অনুভব কর , সুন্দরভাবে অস্তিত্বের সুরের সাথে সুর মেলাতে পার, তখন অস্তিত্ব তার ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্য তোমার কাছে প্রকাশ করবে। তখন তোমার কাজ কেবল বসে থাকা ও উপভোগ করা!

সুর মেলানো বলতে কি বোঝাচ্ছি তা ব্যাখ্যা করি। আমরা সবাই জানি রেডিও কিভাবে কাজ করে। একই রেডিওকে তার ভৌতিক আকার পরিবর্তন না করে বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের নানা প্রোগ্রামের সাথে সংযোগ করা যায়, তাই নয় কি? যখন তুমি একটি স্টেশনের কোন অনুষ্ঠান শুনছ, যদি তখন কোন গোলযোগ হয় বা অন্য স্টেশনের কথা শোনা যায়, তুমি কি কর? তুমি তাকে ফাইন টিউন (fine tune) কর। এখন ঠিক একই ধারণা অস্তিত্বের সাথে সুর মেলানোর জন্য প্রয়োগ কর।

আমাদের চারপাশে হাজার হাজার অনুষ্ঠান হচ্ছে। নিজেদের যেদিকে টিউন করব, তাই আমরা উপলব্ধি করব। এখন কোন অনুষ্ঠানের সাথে টিউন করব, তা একদমই নিজের পছন্দ। ইচ্ছামত যে কোন অনুষ্ঠান বাছাই করার স্বাধীনতা তোমার আছে, ঠিক? একইভাবে তুমি যদি অসন্তোষের সাথে বা একই প্রকার নকারত্মক জিনিষের সাথে টিউন করা পছন্দ কর , তাহলে তুমি দুশ্চিন্তা, অসন্তুষ্টি, উভয়-সঙ্কট ইত্যাদির শেষ না হওয়া ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়বে। অন্যদিকে তুমি যদি যিনি ব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছে তাঁর কেন্দ্রের সাথে নিজেকে টিউন করা পছন্দ কর, তাহলে তুমি চারপাশের বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ঠিক রশিটি ধরতে পারবে এবং তুমি এই সকল আবেগ থেকে মুক্ত হবে। তুমি এক সুন্দর সুগন্ধিত ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

নিজেকে অস্তিত্বের সাথে যত বেশী ফাইন-টিউন করবে, জীবন ততই পরমানন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

অসন্তোষ তোমাকে নীচে নামিয়ে আনবে, তোমাকে ভারী ও দুর্দশাগ্রস্ত করবে। অন্যদিকে কৃতজ্ঞতা তোমাকে লঘু ও আনন্দময় করবে।

কারণবিনা কৃতজ্ঞতা অনুভব কর

একটা ছোট গল্প :

> এক খ্রীস্টান বাড়ীতে একটি মেয়ে তার মায়ের সাথে নৈশভোজনে বসেছিল।
> টেবিলে খাবার দেওয়া হল এবং সে ধন্যবাদের কথা না বলেই খেতে শুরু করল।
> তার মা অবাক হয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল যে সে এরকম কেন করল।
> মেয়েটি চট্‌পট্ উত্তর দিল, 'এই প্লেটে এমন কিছু নেই যেটাকে আমি আগে অন্তত একবার ধন্যবাদ জানাই নি।

আমরা শুধুমাত্র একটা সুদৃঢ় কারণের জন্য কৃতজ্ঞ অনুভব করতে জানি।

আরেকটা গল্প :

> একটি ছোট মেয়ে তার মাকে প্রশ্ন করল, 'মা, ক্রিস্‌মাসের আর কদিন বাকী?'
> মা জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা কেন জানতে চাও?'
> মেয়েটি উত্তর দিল, 'আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে যে এখন আমায় ভাল মেয়ে হতে হবে কিনা।'

এভাবে আমরা বাচ্চাদের চিন্তা করতে ও ব্যবহার করতে শিক্ষা দিই। আমরা তাদের কিভাবে লেনদেন করতে হয় তা শেখাই। আমরা তাদের শেখাই যে সবকিছু লেনদেন ছাড়া কিছুই নয়। আমরা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রবহমান হতে শেখাই না। আমরা তাদের উদ্দেশ্য বিনা জীবনযাপন করতে শিক্ষা দিই না। আমরা তাদের জন্য সবকিছুই লক্ষ্য-ভিত্তিক করে ফেলি।

ছোটদের ওপরে এভাবে নানা কিছু করা হয়েছে বলে, প্রথমে তোমাদের পরিশ্রম করে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

পরিষ্কার করে বোঝ যে আমি তোমাদের সাথে যা কিছু করছি তা কেবল তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য। আমি অবিশ্রাম তোমাদের আলগা করছি বা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসছি। কল্পনা কর , তোমাদের ওপরে কত কিছু করা হয়েছে ! প্রজন্ম ধরে লোকেরা তোমার ওপরে তাদের ধারণা চাপিয়ে এসেছে। আমাকে প্রথমে সেগুলিকে আলগা করে তোমাদের বন্ধন মুক্ত করতে হবে এবং তারপর তোমার ভিতরে তোমার প্রস্ফুটনের জন্য এক স্থান সৃষ্টি করতে হবে।

যখন আমি লোকেদের তাদের ভিতরে অবিশ্রাম কৃতজ্ঞতাবোধ অনুভব করতে বলি , তারা পরে এসে আমায় বলে, 'স্বামীজী, আজকাল আমি গাড়ির ড্রাইভারদের ও বাড়ির চাকরদের ধন্যবাদ বলি।' স্পষ্ট করে বোঝ : কৃতজ্ঞতা তোমার সত্তা হলে এইসব কথা কখনও রিপোর্ট করবে না।

যখন তুমি কোন নিকটজনের মৃত্যুর জন্য শোক কর, তুমি কি তোমার শোক ব্যক্ত কর? তুমি কি তোমার শোক ব্যক্ত করতে পারবে? না! সেটা তোমার এক গভীর আবেগ এবং তা তোমার এক অবস্থা হয়ে যায়। তুমি তাকে অনুভব করতে পার ; তুমি তা কখনও রিপোর্ট করতে পার না।

একইভাবে কৃতজ্ঞতা যখন তোমার সত্তা বা অবস্থা হয়ে যায়, তুমি তাকে রিপোর্ট করবে না। তুমি তাকে কখনো রিপোর্ট করতেও পারবে না। অবশ্যই ধন্যবাদ বলা সামাজিক কারণে ঠিক আছে কারণ তুমি তা প্রকাশ না করলে , তা অন্য লোকের কানে ঢোকে না।

কিন্তু আমি এখানে তোমাদের বলার চেষ্টা করছি যে তোমাকে মনের কৃতজ্ঞতা থেকে সত্তার কৃতজ্ঞতায় চলে যেতে হবে। আমরা যে কৃতজ্ঞতার কথা আলোচনা করছি, তুমি তাকে কখনও প্রকাশ করতে পারবে না কারণ তা অনেক গভীরে আছে।

আসল কৃতজ্ঞতা অনেক গভীরে থাকে

লোকেরা প্রায় আমায় বলে, 'স্বামীজী, আমরা আপনার ওপরে কত কৃতজ্ঞ যে আপনার সাহচর্যে আসার পরে আমাদের জীবনে কত কিছু ঘটেছে।'

সামাজিক শিষ্টাচারের খাতিরে তুমি হয়ত কোন মানুষকে কোন জিনিষের জন্য ধন্যবাদ দিতে পার , কিন্তু কৃতজ্ঞতা একটা এমন জিনিষ নয় যা তুমি কাউকে দিতে পার। যখন তুমি কোন মানুষের কাছ থেকে কিছু পেয়েছ বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব কর , সেটা শুধুমাত্র মনের কৃতজ্ঞতা। সেটা কৃতজ্ঞতার একদম শিশুপাঠের পর্যায়।

প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হল তোমার ভিতরে এক গভীর উচ্ছ্বলিত অনুভূতি, যা কোন লাভের ফলে নয়, কিন্তু বিদ্যমান থাকার ভাবের জন্য, অস্তিত্ব নামক করুণাময় জীবনীশক্তি সম্বন্ধে তোমার ভাবের জন্য। ব্যাস। এই কৃতজ্ঞতার কোন সম্বন্ধের প্রয়োজন হয় না; এটা কোন মানুষ বা জিনিষের ওপরে নির্ভর করে না; এটা কোন আবেগ যেমন, কাম, ক্রোধ, হিংসা বা ভালবাসা, এদের বশবর্তী নয়। এটা শুধু 'আছে', ব্যাস।

তোমার আমিত্বের জন্য শব্দ দ্বারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তুমি চাও না যে লোকেরা তোমাকে অভদ্র ভাবুক। কিন্তু যেই মুহূর্তে তুমি তা প্রকাশ কর, তুমি কৃতজ্ঞতাকে ছোট করে ফেল অথবা মিথ্যা বর্ণনা কর।

আসলে তোমার শরীরের ভাষাই তোমার কৃতজ্ঞতার অবস্থা জানাতে পারে। তোমার চোখ তা জানাতে পারে; তোমার হাসি তা জানাতে পারে; তোমার উষ্ণতা তোমার কথার চেয়ে তা ভাল জানাতে পারে। কৃতজ্ঞতার অশ্রু সবকিছুর চেয়ে ভাল করে বোঝাতে পারে। যখন তুমি অভিভূত, যখন তুমি পরিপূর্ণ, অশ্রু প্লাবিত হবে।

আমি তোমাদের কাঁদতে বলছি না! আমি কেবল বলছি যে যখন তুমি অভিভূত হও, তোমার শরীর সেটা দেখাবে, তুমি তা লুকাতে পারবে না এবং সেটাই তোমার কৃতজ্ঞ অবস্থার আসল লক্ষণ।

আর মনে রেখ, এই অশ্রুর কোন জাত, মত বা ধর্মবিশ্বাস নেই। তাদের বলা যায় না যে এটা হিন্দু অশ্রু বা ওটা মুসলমান অশ্রু ; এই অশ্রুর কোন ধর্ম নেই। এই অশ্রু সত্তায় থাকে এবং সত্তা এগুলির অনেক ঊর্ধ্বে। কৃতজ্ঞতা মনুষ্যসৃষ্ট সমস্ত বাধা ও নিয়ন্ত্রণ মুছে ফেলতে পারে; সেইজন্য কৃতজ্ঞতা পরম প্রার্থনা।

কোন গভীর জিনিষই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। কবিরা তাকে প্রকাশ করতে পদ্য লিখতে পারে, চিত্রকর তাকে প্রকাশ করতে চিত্র বানাতে পারে, লেখক তাকে প্রকাশ করার জন্য লিখতে পারে, কিন্তু একটা ভাগ থেকে যাবে যাকে তারা কখনও এসবের দ্বারা প্রকাশ করতে পারবে না। অস্তিত্বকে কখনও সাধারণ জিনিষ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তাই এটা এত নিগূঢ় ও আকর্ষণীয়। তাই তা শব্দাতীত, কিন্তু রোমাঞ্চকর! তাই তা অনুভূত, কিন্তু অপ্রকাশিত। তাই তোমরা এখানে বারবার আস!

এখানে এলে তোমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে না , কারণ তুমি তা প্রকাশ না করলেও আমি তা জানব। যখন প্রকৃত কৃতজ্ঞতায় তুমি অভিভূত, তোমার আগেই আমি তা জেনে যাব! আমি তোমার হৃৎস্পন্দন জানি! আমি তা তোমার চোখের দৃষ্টি থেকে জানি! আসলে তুমি যখন আমার কাছে প্রকাশ কর, তুমি হয়ত নিজেকে প্রতারিত করছ কারণ বেশীরভাগ সময়ে তুমি পরস্পরবিরোধী চিন্তা কর ও কথা বল। তুমি হয়ত ভিতরে কিছু চিন্তা করছ, কিন্তু বাইরে অন্যকিছু প্রকাশ করছ।

অস্তিত্ব জানে কখন একটি মানুষ ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। শুধু অস্তিত্বের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ কর , সেটাই যথেষ্ট। তোমাকে তা প্রকাশ করতে হবে না, শুধু তা হয়ে যাও, ব্যাস।

ভারতবর্ষে মাস্টারের পা ছোঁয়ার এক ঐতিহ্য আছে। যখন তুমি মাস্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছাসিত , তখন তা প্রকাশ করার কোন উপায় নেই। তুমি তখন কেবল তাঁর পদযুগল স্পর্শ কর, একত্বভাব অনুভব কর এবং নিজের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

অনেক মানুষ নানা জায়গা থেকে আমায় দেখতে আসে। তাদের মধ্যে কেউ আসে ও আমার সামনে দাঁড়ায় ও কিছু বলে না। শুধুমাত্র আনন্দের অশ্রু তাদের চোখ থেকে ঝরে। তারা কিছু বলার জন্য বাধ্য হয় না , কারণ তাদের চোখের জল যা জ্ঞাপন করে তার চেয়ে বেশী কিছু মুখে বলতে পারে না। তারা শুধুমাত্র তাদের সত্তা থেকে আবেগভরে আছে।

তুমি যখন কোন মাস্টারের উপস্থিতিতে আছ, সেখানে কেবল গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের ভাব নিয়ে থাক। তাঁর কাছে উপস্থিত থাকার জন্য একটা কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সহকারে থাক। তুমি দেখবে যে তোমার সমস্ত প্রশ্নগুলি দ্রবীভূত হয়ে গেছে এবং তুমি খুব শীঘ্রই এক প্রকার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেছ। যখন তুমি সহজে পরিপূর্ণ হও, তার মানে তুমি সঠিক সূত্রটি ধরে ফেলেছ।

সর্বদা মাস্টারের সাথে গভীর সজাগতার সাথে থাক; তাহলে তুমি সেটা মিস্ করবে না। যখন তুমি মাস্টারের সাথে কৃতজ্ঞতা সহকারে আছ, মাস্টারের শক্তি তোমার সত্তায় সঞ্চারিত হবে এবং তাঁর অভিজ্ঞতা সহজেই তোমাকে উচ্ছ্বসিত করবে।

আর যখন মাস্টারের প্রতি শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা অনুভব কর, শারীরিকভাবে তাঁর কাছে থাকার প্রয়োজন ধীরে ধীরে মিটে যাবে। কৃতজ্ঞতা তোমায় স্থানকালের বেড়া ভেঙ্গে বেড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। তা সীমারেখা মিটিয়ে ফেলে এবং তোমাকে প্রসারিত করে। প্রসারিত হয়ে তুমি সবকিছুর সাথে একাত্ম বোধ কর। কিছু সময় পরে , এমনকি কৃতজ্ঞতাকেও এক বাধা লাগবে; শুধুমাত্র নীরবতা পড়ে থাকবে!

এমনকি সম্বন্ধ বিষয়েও যদি দেখ যে কোন সম্বন্ধ ভালবাসা না হারিয়ে শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি তার প্রতি কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করবে, ব্যাস। সেই চলে যাওয়া বা প্রয়াত মানুষটির সাথে কিছু সময়ের জন্য সংযুক্ত থাকার জন্য যা কিছু শিখেছ ও উপভোগ করেছ, তার জন্য তুমি ভিতরে শুধু কৃতজ্ঞতা বোধ কর। তাহলে , সেটা সুন্দর হয়ে যায়।

তোমার শত্রুদের জন্যও কৃতজ্ঞতা অনুভব কর!

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, ‘স্বামীজী, আমরা আমাদের শত্রুদের প্রতি কিভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারি?’

আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন নয়? তোমার তথাকথিত শত্রুরা তোমাকে আরও বলবান বানাবার জন্য দায়ী। তারা তোমার জন্য এক চ্যালেঞ্জ; তাদের জন্য তুমি বৃদ্ধি পাও। তোমাকে আঘাত দিয়ে তারা তোমাকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখতে শেখায়। তাদের জন্য কৃতজ্ঞ কেন হবে না?

তৎসত্ত্বেও তুমি তো বৃদ্ধি পেতে চাও, চাও না কি? প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আরও বেশী বুদ্ধিমান হতে চাও, তাই না? যদি এই মানুষগুলি তোমায় সুযোগ না দিয়ে থাকে, তুমি কেবল চারিদিকের বন্ধুদের নিয়ে কেবল ভ্রান্তিতে থাকবে। সেটা তোমাকে বেশী সাহায্য করবে না। তোমাকে রুক্ষতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে; তবেই তুমি বিদারিত হবে এবং বুদ্ধি বিকশিত হবে।

গাছ হতে গেলে বীজকে বিদারিত হতে হবে। বীজ যদি বীজ অবস্থাতেই খুশী থাকে , তা সময়ের সাথে খণ্ডিত হয়ে যাবে এবং মরে যাবে, ব্যাস। তার কোন রূপান্তর ঘটবে না।

যখন তথাকথিত শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয়, একজন সাধারণ মানুষ তাকে অপ্রীতিকর করে ফেলবে। সে তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে যেখানে সবকিছু এক দুষ্টচক্রে পরিণত হয় - ঘৃণা থেকে আরও ঘৃণাতে যাওয়া। কত পরিবারে ঝগড়া আছে। তা এত বিশ্রী হয় যে সেখানে আচরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেন? তোমার জন্যই সেটা এইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তুমি গভীর সজাগতা ও বুদ্ধি দ্বারা কাজ কর নি। তুমি পরিতৃপ্তির সাথে কাজ করছিলে না এবং তাই তুমি তাকে বিশ্রীভাবে বাড়তে দিয়েছ।

যদি তুমি পরিতৃপ্তির সাথে কাজ করে থাক, তাহলে তো শত্রুতা বাড়ার কোন স্থানই তুমি দেখতে পাও নি। সেটা তোমার জন্য একটা অজানা ভাষা হবে। এমনকি অন্য মানুষটি শত্রুতা চালিয়ে যেতে চাইলেও, তুমি তার প্রতি ঘৃণা অনুভব করবে না। যদি সে সম্বন্ধতা শেষ করে দিতে চায়, তুমি তা কৃতজ্ঞ হয়েই শেষ করবে!

কত পরিবারে লোকেদের চোখাচোখি হয় না অথবা তারা একে অপরকে প্রকাশ্য জায়গায় এড়িয়ে যাবার জন্য অনেক কষ্ট করে। এইসব অনর্থক ব্যাপার কেন? কেন তুমি এইসব ব্যাপারে শক্তি অপচয় করছ? কখনও ঘৃণাকে তোমায় গ্রাস করতে দিও না। তার দিকে গভীর সজাগতা ও বুদ্ধি সহ তাকাও। ঘৃণা অদৃশ্য হবে, শুধুমাত্র প্রেম ও কৃতজ্ঞতা পড়ে থাকবে।

প্রশ্ন : আজকাল আমি আপনার প্রতি কেবল কৃতজ্ঞতা অনুভব করি, আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাই না। কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমি চাই আপনি আমার নাম মনে রাখবেন এবং আমাকে সেই নামে মাঝে মাঝে ডাকবেন! স্বামীজী, এটা কি আমার একপ্রকার অসন্তুষ্টি বা বাসনা?

তুমি একটা সুন্দর জিনিষ বলেছ। এটা বোঝাচ্ছে যে তুমি নিজেকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছ। দ্যাখ : তুমি যখন ঈর্ষা ও অসন্তুষ্টি সহকারে মন থেকে যত্ন চাও, তা এক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। কিন্তু যখন তুমি প্রেম ও কৃতজ্ঞতা সহকারে চাও , তা বাসনা নয়; সেটা আমার জন্য তোমার গভীর প্রেম, ব্যাস।

যখন তুমি বাসনা সহকারে প্রার্থনা কর, সেটা পুরোপুরি অকৃতজ্ঞতা ও আমিত্বের খেলা। কিন্তু যখন তুমি গভীর প্রেম থেকে চাও, তা এক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা হয়ে যায়। তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

তুমি সজাগ আছ, তাই এটাকে অসন্তুষ্টি বা বাসনা বলা যায় না। সময়ের সাথে তোমার থেকে এটাও মুছে যাবে। আর একটা জিনিষ : এই প্রশ্ন করার সাহস তোমার হয়েছে! আমি জানি আরও অনেকেরই এই ভাবনা গোপনভাবে আছে, কিন্তু তারা তা মুখে প্রকাশ করে নি! তারা হয়ত নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে, 'নামে কি আছে,' অথবা তারা হয়ত বলতে লজ্জা পায়! অবশ্যই নামে কিছু নেই। কিন্তু তোমাকে তার ঊর্ধ্বে যেতে হবে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান দ্বারা, এর দ্বারা নিজেকে বিভ্রান্ত করে নয়। তুমি এই প্রশ্ন করেছ মানে তুমি সাহসের সাথে এর মধ্য দিয়ে যেতে চাও।

কৃতজ্ঞতা ও মাস্টার

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্য আমরা কি করতে পারি?'

আমি তাদের বলি, 'আমার জন্য সবচেয়ে ভাল যেটা তুমি করতে পার তা হ'ল, প্রস্ফুটিত হও!' আমার জন্য সেটাই সবচেয়ে ভাল কাজ তুমি করতে পার এবং সেটাই সবচেয়ে ভাল যা আমি তোমার জন্য করতে পারি। এটা বোঝ। যখন তুমি এই কথাগুলি আত্মভূত কর ও কৃতজ্ঞতাকে তোমার সত্তা বানাও, তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করে ফেলেছ।

কিন্তু যদি ভাব যে তোমাকে পরিবর্তে কিছু করতে হবে, সমাজসেবা কর; অন্যদের সাহায্য কর। তুমি যে আনন্দ আবিষ্কার করেছ তা অন্যদের মধ্যে জাগ্রত করার জন্য তাদের সহায়তা কর। সেটা তোমার অহংভাব বা শ্রেষ্ঠমন্যতা থেকে কোরো না। তা শেয়ার করার প্রেম থেকে কর, শেয়ার করার আনন্দ থেকে কর। তাতে তোমার সম্পূর্ণ শক্তি প্রদান কর এবং তা আনন্দে কর। সেটা তোমার জন্য হবে এক আনন্দপূর্ণ ধ্যান ও তাদের জন্য হবে এক জাগরণ।

প্রতিবার যখন তুমি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব কর, তুমি আসলে ধ্যানে আছ। তাই কল্পনা কর, যদি তুমি নিত্য কৃতজ্ঞতা সহকারে থাক, তবে তুমি সর্বদাই ধ্যানে থাকবে।

কৃতজ্ঞতা কখনও শেখানো যায় না। অবশ্যই ছোটদের জানাবার জন্য তাদের ছেলেবেলাতে কৃতজ্ঞতা বিষয়ে বলা যায়। কিন্তু তা এক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হয়ে দাঁড়ায়; যেভাবে তোমাকে বড়দের সম্মান জানাতে অথবা স্কুলে শিক্ষকদের সুপ্রভাত বলে শিষ্টাচার করতে শেখানো হয়। এটা মনের কেবল এক যান্ত্রিক প্রয়োগ, তোমার অন্তরের আসল ভাবনা নয়।

এমনকি পরিষ্কার করে বোঝ : আমি তোমাদের কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষা দিচ্ছি না। আমি কেবল তোমার ভিতরে এক অন্তর্দেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি যেখানে আমি যা বলছি তুমি তা অনুভব করবে, যেখানে সেটা তোমার নিজের অভিজ্ঞতা হবে। আমার কথার শক্তি সেই অন্তর্দেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

তোমাকে যখন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তুমি আরও ভাল ব্যক্তি হও এবং তুমি উন্মুক্ত হতে প্রস্তুত হও। যখন তুমি মানসিক গোলামির প্রভাবে আছ, তোমার পক্ষে অন্বেষণ করা এবং অন্তর্দেশ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

আমি সবসময়ে লোকেদের বলি যে আমি এক মুক্তিপ্রদানকারী গুরু! মানুষের সাথে কাজ করার সময় আমি তাদের সুপ্রচুর স্বাধীনতা দিই। কেবল তখন তাদের পক্ষে অন্বেষণ করা ও বিকশিত হওয়া সহজ হয়।

অবশ্যই আমি বলছি না যে বাবামায়েরা বাচ্চাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে ও হস্তক্ষেপ না করে তাদের দেখতে থাকবে। আমি শুধু বলতে চাইছি যে মানসিক গোলামি পরিহার করতে হবে। বাচ্চাদের বিকশিত হবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি কর। দরকারি সাবধানতা নাও, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তাদের জোর করে না ভক্ষণ করিয়ে, তাদের নিজে থেকে সত্যকে অভিজ্ঞতা করতে দাও। তাদের বিকশিত হবার জন্য ও অন্তরের আনন্দকে অভিজ্ঞতা করার জন্য যথেষ্ট জায়গা দাও।

কখন কখন লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনি সবসময়ে এত আনন্দে কিভাবে আছেন?'

কৃতজ্ঞতার গভীর অবস্থার জন্য মাস্টারেরা সর্বদাই এক পরমানন্দ অবস্থায় থাকেন এবং কৃতজ্ঞতা তাদের মধ্যে সর্বদাই টগ্ বগ্ করছে; কারণ তাঁরা সর্বদা অস্তিত্বের সাথে যোগাযোগে থাকেন!

যখন তুমি আমার প্রতি বা অন্য কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব কর, তুমি পুরো ব্যাপারটা হারিয়ে ফেল। কৃতজ্ঞতা কোন রশ্মিছটা নয় যেটা কোন সঠিক মানুষের দিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে নির্দেশিত হয়। সেটা তো এক সৌরভ বা সৌগন্ধ। তুমি যখন সেটাকে সাথে নাও, তা সহজেই তোমার থেকে ছড়াতে থাকবে। সেইজন্য মাস্টারকে সর্বদা এত আনন্দময় বলে বোধ হয়। মাস্টার এক সৌগন্ধের মত যা তুমি অভিজ্ঞতা ও উপভোগ করতে পার ! তাই তুমি এখানে বারবার আকর্ষিত হয়ে আস !

বোঝ যে প্রতিটি মুহূর্তই সুন্দর যদি তুমি তাকে গ্রহণ করার জন্য ও দেখার জন্য তৈ রি থাক। আমরা যখন কোন ফাংশন বা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি অথবা কোন সফলতা প্রাপ্ত করি অথবা আমরা কোন কিছু অর্জন করি ; এমন নয় যে কেবল সেই মুহূর্তগুলিই সুন্দর।

প্রত্যেকটি মুহূর্তই সুন্দর কারণ অস্তিত্ব সহজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও আনন্দপূর্ণ হয়ে বয়ে চলেছে এবং সমস্ত ঘটনা সকল সময়ে সামঞ্জস্যের সাথে হয়ে চলেছে। যখন এটা বুঝবে, কিছুই তোমার কাছে 'ভুল' লাগবে না। তুমি তখন অবাক হবে যে লোকেরা সবসময়ে কিসব অভিযোগ করে চলেছে!

যখন তুমি অস্তিত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব কর, সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তোমার কাছে এক মন্দির হয়ে যায়। তখন তুমি যেখানেই যাও প্রার্থনা ও ধ্যানের খেয়ালে থাক। তোমাকে আর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে না। তুমি সহজেই সম্পূর্ণের সাথে মিশে যাও এবং সর্বদা আনন্দ অনুভব কর।

সম্পূর্ণ অস্তিত্ব মন্দির হয়ে গেলে, বৃক্ষগুলি, আকাশ, পৃথ্বী সবকিছুই এক হয়ে যায়। যখন তার কাছে নত হও , তুমি আর কি চাইতে পার? এই নিগূঢ় অস্তিত্বের এক অংশ হবার জন্য তুমি কেবল কৃতজ্ঞতা সহকারে নত হবে , ব্যাস।

এটা হলে, তুমি নিজেকে বৃক্ষ, আকাশ, পৃথ্বী ও সবকিছুর সাথে সম্পর্কিত করতে পারবে। তুমি তখন মনের ভাষা (communication) থেকে হৃদয়ের ভাষায় (communion) চলে আসবে। তখন তুমি তোমার কেন্দ্রকে মন থেকে হৃদয়ে সরিয়ে নিয়ে আসবে।

ঈশ্বর কিভাবে কাজ করেন

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস কর যে ভগবান তোমার প্রার্থনার উত্তর দেন, আমি তাদের বলি শোন : ঈশ্বর এত করুণাময় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তোমার প্রার্থনাগুলিকে কোন উত্তর না দিয়ে ছেড়ে দেন!

এটা এরকম : সর্দিকাশিতে আক্রান্ত কোন বাচ্চা আইস্‌ক্রীম চাইলে, তুমি কি তাকে তা দেবে? না, তুমি তাকে তা দাও না।

এখন বাচ্চাটি হয়ত তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারে , কিন্তু তুমি জান যে তুমি বাচ্চাটির জন্য যথাসাধ্য করছ কারণ সে জানে না যে সে যেটা চাইছে সেটা তার জন্য সেইসময়ে ঠিক বস্তু নয়।

একইভাবে গভীর অজ্ঞতার জন্য তুমি জান না যে তোমার জন্য কোন জিনিষটা সবচেয়ে ভাল ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নানা জিনিষ চাইতে থাক। কিন্তু অবিমিশ্র করুণার জন্য, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনাগুলি সরিয়ে রাখেন এবং যে জিনিষগুলি তোমার প্রকৃতপক্ষে দরকার কেবল সেগুলি প্রদান করেন এবং তোমাকে উন্নততর বুদ্ধির দিকে চালিত করেন এবং সেটাই তোমার জন্য ঈশ্বরের একমাত্র চিন্তা। মনে রেখ, তোমার বুদ্ধি যত বাড়বে, তুমি তত কম প্রার্থনা করে চাইবে।

তুমি ভগবানের কাছে কি চাইতে পার? যেই মুহূর্তে তুমি চাও, তার মানে তুমি ভাবছ যে ভগবান কিছু জিনিষ জানেন না! তার

মানে তুমি ভাবছ যে তুমি না চাইলে ভগবান সেটা জানবেন না। এটা হাস্যকর শোনাচ্ছে, তাই না? ভগবান জানেন না এমন জিনিষ কি হতে পারে?

বোঝ যে ভগবান তোমায় সেটাই দেন যেটা তোমার প্রয়োজন, যেটা তুমি চাইছ সেটা নয়। যদি তুমি যা চাইছ তাই তিনি দিতে থাকেন, তুমি তো দুর্দশা থেকে আরও দুর্দশাগ্রস্ত হবে! যে সময়ে যেটা তোমার প্রকৃতপক্ষে দরকার, ভগবান সেটাই দেন এবং তাতে তুমি বুদ্ধিমান থেকে আরও বুদ্ধিমান হও এবং একসময়ে তোমার চাওয়া শেষ হয় ও তুমি কৃতজ্ঞতায় ডুবে যাও ।

অসুবিধাকে পরাভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় বল ও সাহস ঈশ্বর তোমায় দেন।
তথাকথিত সমস্যাগুলি মিটাবার জন্য তিনি তোমাকে জ্ঞান প্রদান করেন।
তিনি তোমার সমৃদ্ধির জন্য তোমায় এক অতি মূল্যবান সম্পদ দেন, যা হ'ল আধুনিকীকৃত (updated) বুদ্ধি।
তোমার নিজের প্রেম ও যত্নকে অনুসন্ধান করার জন্য তিনি সুযোগ দেন।
তিনি তোমায় এটা বোঝার জন্য বুদ্ধি দেন যে তোমার কাছে যা কিছু আছে, কেবলমাত্র তাই তোমার প্রয়োজন।
তিনি তোমাকে সৌগন্ধ সহকারে প্রস্ফুটনের জন্য পরিপক্বতা প্রদান করেন।

আমাদের সবার মৌলিক সমস্যা হল, আমরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যে আমরা যা চাই তা দেবার শক্তি ঈশ্বরের আছে, কিন্তু বুঝতে পারি না যে আমরা যেটা চাইছি সেটা আমাদের জন্য ভাল কিনা তা বোঝার বুদ্ধিও ঈশ্বরের আছে! যেহেতু সহজেই আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের শুধুমাত্র শক্তি আছে, আমরা চাইতেই থাকি।

আমরা সর্বদা ভাবি যে আমাদের জন্য কি সবচেয়ে ভাল তা আমরা জানি এবং ভগবানের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করি। যা চাই তা পাবার জন্য আমরা আমাদের বুদ্ধি ও ভগবানের শক্তি ব্যবহার করতে চাই! আমরা পরিষ্কারভাবে তাঁকে বলি, 'এই জিনিষটা আমি চাই, এইভাবেই জিনিষগুলির হওয়া উচিৎ, তাই দয়া করে তোমার শক্তি দিয়ে আমার জন্য এটা কর!' আমরা আমাদের সব চাহিদাগুলিকে, ব্র্যাকেটে পছন্দের অগ্রাধিকার সহ, ভগবানকে প্রার্থনা হিসাবে অর্পণ করি!

এই মনোভাব আমাদের জটিলতায় নিয়ে যায়। আমাদের বুঝতে হবে যে ভগবানের শুধুমাত্র শক্তি আছে তা নয় , কিন্তু তোমার জন্য কি ভাল তা বিচার করার বুদ্ধিও তাঁর আছে।

আমরা ভাবি যে সমস্ত দুনিয়া আমাদের বুদ্ধির জন্য চলছে। পরিষ্কার করে বোঝ : দুনিয়া আমাদের বুদ্ধি সত্ত্বেও চলছে!

একটা ছোট গল্প :

> ঈশ্বর ও বিশ্বের সব বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
> ঈশ্বর যা বানিয়েছেন, বিজ্ঞানীরা তার হুবহু নকল অন্য কোন উপাদান দ্বারা তৈরি করছিল। বিজ্ঞানীরা সেগুলি কোন সমস্যা ছাড়াই বানিয়ে ফেলছিল।
> সবশেষে ঈশ্বর ধূলা থেকে মানুষ বানালেন ও বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ করলেন।
> বিজ্ঞানীরা ধূলা ওঠাতে গেল...
> ঈশ্বর বললেন, 'দাঁড়াও! আমার ধূলা থেকে না বানিয়ে তোমার ধূলা থেকে মানুষ বানিয়ে দেখাও!'

মানুষকে বুঝতে হবে যে অস্তিত্বই স্রষ্টা, সৃষ্ট ও সৃষ্টি। কেবল তখন সে সহজেই জিনিষগুলিকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। কেবল তখন সে তার অধিকার করার প্রবণতা ও কর্তাভাব পরিত্যাগ করতে পারবে।

লেনদেনের ধারণাতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় যে আমাদের রক্তের সম্পর্কে না হয়েও কেউ বিনিময়ে কিছু আশা না করে বিনাশর্তে আমাদের যত্ন নিতে পারে। এটা বিশ্বাস করা এক বিরাট ব্যাপার!

আমি বলি, অস্তিত্ব যে কোন মানুষের চেয়ে অনেক ভালভাবে তোমার যত্ন নেয়। এই সত্যটি আমি বলতে পারি , কিন্তু এটা প্রত্যেককে নিজে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, নিজে অভিজ্ঞতা করতে হবে। শুধুমাত্র তখন সেটা তাজা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান হবে।

আমি সবসময়ে লোকেদের বলি, 'আমি তোমাদের আধ্যাত্মিকতা শেখাতে পারি না, কিন্তু তুমি শিখতে পার!' আমি তোমাদের মহান সত্যগুলি বলতে পারি যাতে অন্ততপক্ষে তুমি জানবে যে তুমি কি জান না। কিন্তু সেই সত্যটিকে তোমার নিজের উপলব্ধি বানানোর কাজ তোমার। তুমি যতবার সে সত্য শুনতে চাও, ততবার তোমায় তা বলার জন্য আমি তৈরি।

একটা ছোট গল্প :

প্রাচীন ভারতের মহান সন্ত আদি শংকরাচার্য একবার তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রায় ছিলেন। এক জায়গায় এসে তিনি খুব তৃষ্ণার্তবোধ করলেন।

শিষ্যেরা চারদিকে দেখল, কিন্তু তাঁর তৃষ্ণা মিটাবার জন্য কিছুই পেল না। সেখানে কেবল তালজাতীয় গাছ ছিল এবং লোকেরা সেখানে তাড়ি (একপ্রকার দেশী মদ) বানাচ্ছিল।

শঙ্করাচার্য সেই তালবাগানে গিয়ে কর্মীদের জিজ্ঞাসা করল যে তৃষ্ণা মিটাবার জন্য কিছু আছে কিনা। তারা বলে যে তাড়ি ছাড়া তাদের কাছে অন্য কিছু নেই। শঙ্করাচার্য তাড়ি চাইলেন ও তা পান করলেন। শঙ্করকে পান করতে দেখে শিষ্যেরাও তাড়ি পান করল!

তাড়ি শঙ্করকে প্রভাবিত করতে পারে নি, কারণ তিনি তো জীবনমুক্ত, সীমাহীন চৈতন্যের অধিকারী! তিনি সোজাই হাঁটতে লাগলেন, কিন্তু শিষ্যরা তাঁর পিছনে মাতালের মত টলতে টলতে চলতে লাগল!

কয়েকদিন পরে তাঁরা চলতে চলতে মরুভুমি অঞ্চলে পৌঁছালেন। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাঁরা সবাই একটা কামারশালা দেখতে পেলেন। তৃষ্ণা মিটাবার জন্য সেখানে কিছুই উপলব্ধ ছিল না।

শঙ্কর শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করলেন যে পান করার জন্য কিছু আছে কিনা। শ্রমিকেরা কিছুই নেই বলে জানাল।

কিন্তু শঙ্কর গলা তরল লোহা দেখতে পেলেন ও তাদের কাছ থেকে তাই চাইলেন ও পান করে ফেললেন।

গলা লোহা পান করার পরে তিনি শিষ্যদের দিকে ফিরলেন এবং তা তাদের দিতে গেলেন!

শিষ্যরা ভীষণ অবাক হ'ল।

শঙ্করাচার্য শিষ্যদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে তাদের সেটা করা উচিৎ যেটা তিনি বলেন, যা তিনি করেন তা নয়। তাড়ি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি কারণ তিনি সীমাহীন চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত। নিজে অভিজ্ঞতা না করলে তুমি তা জানবে না। তাই বাইরে থেকে তুমি সেটাকে শুধু অনুকরণ করতে পারবে না। এটাকে তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে ঘটতে হবে এবং তাহলেই তুমি জানবে।

তুমি সত্যকে কতটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও সংযুক্ত হয়ে অনুভব করতে চাও, সেটা তোমাকেই নির্ণয় করতে হবে। আমি কেবল তাদের সাহায্য করতে পারি যারা নিজেদের সাহায্য করে। শুধুমাত্র নীচে থেকে তুমি এক হাত আমার দিকে বাড়াতে ইচ্ছা করলেই আমি তোমাকে ওঠানোর জন্য হাত বাড়াতে পারি। যদি তুমি সত্যিই উত্থিত হতে চাও , তুমি অন্তত আমার দিকে হাত তো বাড়াবে। নয়ত, যেখানে আছ, সেখানেই থাকার তোমার স্বাধীনতা আমি মেনে নেব, ব্যাস। সেইজন্য বলা হয়, 'ঈশ্বর তোমাকে বন্ধনে থাকার স্বাধীনতা দেন!'

আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ভাবি যে ভগবানের যেভাবে করা উচিৎ, সেভাবে উনি আমাদের সাহায্য করছেন না। আমি বলি, তুমি নিজেকে যতটা জান, ভগবান তোমায় তার চেয়ে বেশি জানেন। এটাই সত্য। তোমাকে সেটা বুঝতে হবে , ব্যাস। শুধু সন্দেহ মুছে ফেল এবং বিশ্বাস নিয়ে আস; তবেই যথেষ্ট। বাকীটা স্বতশ্চলভাবে হয়ে যাবে।

একটা ছোট গল্প :

মাছের জলাধারে দুটি গোল্ডফিশ ছিল।
একটি অন্যটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সত্যি সত্যি ভগবান আছে বলে বিশ্বাস কর?'
অন্যটি উত্তর দিল, 'তোমার কি মনে হয়, কে আমাদের জল রোজ পরিবর্তন করে?'

যদি তুমি বিশ্বাস কর যে অস্তিত্ব তোমার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যত্ন নেয় , তুমি তাহলে যে কোন রকম দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু মনে রেখ, যা আমি আগেও বলেছি : তোমার প্রয়োজন ও তোমার চাহিদা, দুটি ভিন্ন জিনিষ। তোমার প্রয়োজন খুবই কম, কিন্তু তোমার চাহিদা প্রচুর। তোমার প্রয়োজনগুলি স্বতশ্চলভাবে অস্তিত্ব দ্বারা পূরণ হয়। যখন তোমার চাহিদা বেড়ে যায় , তুমি অস্তিত্বের ওপরে বিশ্বাস হারাও কারণ তুমি তাদের পূরণ হতে দেখতে পাও না।

তোমরা দ্যাখো, সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে শুধু বিশ্বাস করা, ব্যাস। কিন্তু অন্যদিকে নিষ্ঠা হল বিশ্বাসকে কার্যকর করার জন্য তাতে শক্তির সঞ্চার করা। তুমি বিশ্বাস নিয়ে শুরু করতে পার, কিন্তু তোমাকে নিষ্ঠা নিয়ে আসতেই হবে। বিশ্বাস করলে কোথাও একটু সংশয় থাকবে; কিন্তু নিষ্ঠা হ'লে কোন সন্দেহ থাকবে না, কারণ তুমি নিজে তার অভিজ্ঞতা পেয়েছ। যখন তুমি নিজে কৃতজ্ঞতার অলৌকিক ব্যাপার অভিজ্ঞতা করেছ, তুমি নিজের দিকে বেশী ও আরও বেশী সমৃদ্ধি আকর্ষণ করবে। আমি এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে ঘোষণা করছি।

কৃতজ্ঞতা তোমাকে আরও দেয়

একটা ছোট গল্প :

> একবার একটি ছেলে রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করতে গেল। সেখানে একরাত থাকার জন্য সে রাজাকে অনুরোধ করল। রাজা রাজী হল ও বালকটি সেখানে থাকল।
>
> পরদিন সকালে ছেলেটি রাজার কাছে গেল ও তাকে দেওয়া নিবাসনের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অফুরন্ত অভিযোগ করতে লাগল।
>
> রাজা বালকটিকে বার করে দেওয়ার জন্য আদেশ দিল এবং বলল যে তার মত কাউকে একদিনের জন্যও সেখানে থাকতে দেওয়া একটা বিরাট ভুল।
>
> বালকটি খুব দুঃখ পেল ও এক সুফি সন্তের কাছে গেল এবং তাঁকে রাজার কথা সব খুলে বলল। সুফি সন্ত কিছুই বললেন না। তিনি কেবল বালকটিকে তাঁর শিষ্য হয়ে যেতে বললেন।
>
> কয়েক মাস পরে, সন্ত বললেন যে তিনি রাজাকে দেখতে যাচ্ছেন এবং বালকটিকে তাঁর সাথে আসতে বললেন।
>
> তাঁরা রাজপ্রাসাদে গেলেন ও সেখানে কয়েকদিন থাকার জন্য রাজাকে অনুরোধ করলেন। রাজা রাজী হল।
>
> পরদিন সকালে রাজা সন্তকে জিজ্ঞাসা করল যে তাঁর জন্য করা সমস্ত আয়োজনে তিনি আরামে আছেন কিনা। সমস্ত আয়োজনের জন্য সন্ত রাজাকে তাঁর হৃদয় অনুভূত কৃতজ্ঞতা জানালেন।
>
> রাজা খুব খুশী হল এবং তার লোকেদের সন্তের জন্য আরও ভাল করে যত্ন নেবার জন্য আদেশ দিল।
>
> সুফি সন্ত ছেলেটিকে বললেন, 'এখন দেখলে? এটাই জীবনের গোপনকথা। কৃতজ্ঞ বোধ কর এবং তোমার ওপরে কৃপা বর্ষণ হবে।'

তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ছিদ্রান্বেষণ না করে তুমি যখন অস্তিত্বকে ধন্যবাদ দাও , তখন এমনটি ঘটে। কৃতজ্ঞ বোধ করে তুমি সকারাত্মক স্পন্দন ছড়িয়ে দাও এবং সেটা তুমি যা কল্পনা করেছ, অস্তিত্ব স্বতশ্চলভাবে তার চেয়ে অনেক বেশী তোমায় দেবে।

তার মানে এই নয় যে তোমাকে লোকেদের কথা বলে প্রশংসা করতে হবে এবং আরও পাবার জন্য চতুরভাবে তাদের ধোঁকা দেবে। না! তুমি যখন সর্বদা এক ধন্যবাদপূর্ণ অবস্থায় আছ, বহির্জগতে তোমার অবস্থা নির্বিশেষে, কৃতজ্ঞতা তোমার থেকে বিকিরণ হতে থাকবে। তখন তোমার আশেপাশে সহজেই ঘটনাগুলি ঘটতে আরম্ভ করবে।

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আমাদের চারিদিকে কত দুঃখকষ্ট। এরকম কেন?' আমি তোমাদের বলি, এর কোন অর্থই নেই। প্রথমত তুমি যতটা দাবী কর মোটেই ততটা দুঃখকষ্ট নেই। দুঃখকষ্ট আছে, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার নিজের মন তাকে বিবর্ধিত করে। যদি তুমি সঠিক পরিসংখ্যান নাও এবং দেখ , বুঝবে যে তোমার মন এতে কতই না খেলা করে। এসব কথা বলা একটা নৈমিত্তিক সামাজিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পুরো পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করা হয় । দ্বিতীয়ত, আমাদের নিষ্ঠা মুছে গেছে, তাই দুঃখকষ্ট আছে, ব্যাস। অচেতনতার দ্বারা চালিত হয়ে আমরা লালসাপূর্ণ হয়ে গেছি।

বোঝ যে অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব ঘটনাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। সমস্ত ঘটনাগুলি এত সমলয়ের সাথে পরিচালনা করা হয় যে তুমি যত সজাগ হবে, ততই আগের বিশৃঙ্খল মনে হওয়া ঘটনাগুলিকে সুশৃঙ্খল বলে অবহিত হতে পারবে। এর সম্বন্ধে আমাদের শুধুমাত্র সজাগ হতে হবে এবং তদনুসারে আমাদের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে যেতে হবে; জীবন তখন সঙ্গীতের মত বয়ে চলবে।

তুমি যখন এই বিষয়ে সংবেদনশীল হও, সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, তুমি উপলব্ধি করতে শুরু করবে যে কিভাবে জিনিষগুলিকে পুনর্বিন্যাস করা হয় ও তোমার সাথে ঘটানো হয়। তুমি তো এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় এক উপকরণমাত্র । সমকালীনতার (coincidence) শক্তি তার সমস্ত আড়ম্বর নিয়ে তোমার কাছে নিজেকে প্রকাশিত হতে থাকবে। তুমি সচেতন হবে যে তুমি নিখিল বিশ্বের এই অর্কেস্ট্রার এক অংশ এবং এখানে তোমাকে সেই সঙ্গীতের সাথে প্রবহমান হয়ে তাকে উপভোগ করতে হবে! কেবল যখন তুমি এই প্রবাহের সাথে লড়াই কর, তার বিপরীতে যেতে চাও, সমস্যার সূত্রপাত হয়।

প্রবাহের সাথে বয়ে চল

একটা ছোট গল্প :

> একদিন জনতা একটি লোকের কাছে তাড়াহুড়া করে এল এবং তাকে বলল যে তার বউ নদীতে পড়ে গেছে ও তাতে বয়ে চলে গেছে।

লোকটি সাথে সাথে নদীর দিকে দৌড়াল, তার কাপড়চোপড় খুলে ফেলে তাতে ঝাঁপ দিল ও নদীর স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতে লাগল।
জনতা চীৎকার করল, 'উজানস্রোতে কেন যাচ্ছ? তোমার বউ নিশ্চয়ই স্রোতে ভেসে গেছে।'
লোকটি চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'আমি আমার বউকে জানি। নদীতেও সে স্রোতের বিরুদ্ধেই যাবে, স্রোত বরাবর যাবে না!'

আমরা স্রোতের বিরুদ্ধে গেলেই সমস্যা শুরু হয়, কারণ তখন অস্তিত্ব ও আমাদের মাঝখানে আমরা আমিত্বকে আসতে দিয়েছি। অপরদিকে আমরা যদি অস্তিত্বের প্রবাহ বুঝি এবং তার সাথে চলি, আমরা স্বতঃস্ফূর্ত হব; আমাদের পথে যা কিছু আসে আমরা তার মুখোমুখী হতে পারব এবং আমরা কৃতজ্ঞতায় প্রসারিত হব।

স্বতঃস্ফূর্ত হলে তুমি যে কোন দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। আমি সর্বদাই লোকেদের বলি যে দায়িত্ব হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা। মাস্টারেরা সমস্ত বিশ্বের দায়িত্ব নেন! কিভাবে? কারণ তাঁরা তো স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বদাই অস্তিত্বের সাথে প্রবহমান! তাঁরা জানেন যে তাঁরা অস্তিত্বের সাথে প্রবহমান হ'লে অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে জিনিষগুলি ঘটাবে!

তুমি যদি আমাদের আশ্রমবাসীদের সাথে কথা বল, তারা তাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তোমাদের বলবে। তাদের পক্ষে আগে থেকে জিনিষগুলিকে জানা খুবই কঠিন কারণ এখানকার ঘটনাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়! সময়কালে, তারা কোন কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময় আগে সঙ্কেতের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে মুছে ফেলে এবং তারপর ধীরে ধীরে তারা যে কোন সময়ে যে কোন কিছু করার জন্য প্রস্তুত হতে শেখে!

একজন বাইরের মানুষ আশ্রমে ঘটা সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলতা দেখে অবাক হবে। সে পূজাই হোক বা কোন অনুষ্ঠানই হোক, আমি তাদের কয়েক ঘন্টা আগে বলি এবং জিনিষগুলি ঠিক হয়ে যায়।

অস্তিত্বের সাথে প্রবহমান হতে শিখলে আমরা কোন দুশ্চিন্তা ছাড়াই বাস করতে পারি। কিন্তু যে করেই হোক, আমরা সবাই অস্তিত্বের সাথে লড়াই করার কলাতে পারদর্শী হয়ে গেছি। তাই আমরা ভুগি। যদি তুমি নিজেকে অস্তিত্বের প্রবাহের সাথে মিলিয়ে দাও, প্রতিটি মুহূর্তে তুমি দেখবে যে তোমার যত্ন নাওয়া হচ্ছে এবং সেই মুহূর্তে তোমার যা প্রয়োজন তা তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে।

নিজেকে সুরে বাঁধলে করলে তুমি তোমার সাথে অস্তিত্বের দীপ্তি ও শক্তি বহন কর। তুমি দেখবে যে জিনিষগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হচ্ছে, জিনিষগুলির জিগ্‌স ধাঁধাগুলি (jigsaw puzzle) তোমার জন্য অনায়াসে সমাধান হয়ে যাচ্ছে; যেখানেই যাও তুমি অনুভব করতে পারবে যে মানুষেরা তোমাকে এক অদৃষ্টপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রবল উৎসাহের সাথে গ্রহণ করছে। লোকেরা তোমার দিকে অন্যভাবে তাকাবে। তারা তোমার দিকে এক অব্যাখ্যেয় আকর্ষণ অনুভব করবে। তোমার জীবন এক সঙ্গীত হয়ে উঠবে যা এক অদৃশ্য সুরকার সুর করে চলেছেন, যাতে তুমি কেবল নেচে চলেছ। জীবন কেবল সঙ্গীত ও নৃত্য হয়ে ওঠে। তা এক আনন্দ উদ্‌যাপন হয়ে যায়!

প্রকৃত অলৌকিক ঘটনা দেখতে শুরু কর!

আনন্দ উদ্‌যাপন না করে আমরা সর্বদা আরও খুঁজে চলেছি, অলৌকিক ঘটনা অন্বেষণ করে চলেছি। আমরা সর্বদাই অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি এবং ভাবছি যে সেরকম ঘটনা ঘটছে না।

অলৌকিক ঘটনা কখনও করা হয় না; সেগুলি অবিশ্রাম তোমার চারিদিকে হয়ে চলেছে! তোমার স্বীকৃতিই সেই ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বানিয়ে দেয়! অস্তিত্বের সাথে টিউন করার জন্য কৃতজ্ঞতাকে ব্যবহার কর এবং তুমি অলৌকিক ঘটনাগুলি ঘটছে বলে প্রত্যক্ষ করতে পারবে! কৃতজ্ঞতা তোমায় অলৌকিকতার সাথে টিউন করবে। হয় তুমি তাদের উপভোগ কর অথবা তুমি তাদের মিস্ কর। সেটা তোমার পছন্দ!

যখন তুমি তাদের মিস্ কর, তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, এটা এরকম : দরজা খোলা আছে, কিন্তু তুমি তাতে একটানা খট্‌খটিয়ে যাচ্ছ! আমি তোমাদেরকে বলছি যে তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা ইতিমধ্যে আছে এবং তোমাকে কেবল তা গ্রহণ করতে হবে , কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করতে তৈরি নও। তোমার চারিদিকে ঘটা অলৌকিক ঘটনাগুলি তুমি দেখ না এবং পরিবর্তে তুমি তা অন্বেষণ করে যাচ্ছ।

জলকে সুরায় পরিবর্তিত করা অলৌকিকতা নয়। মানুষকে ভগবান বানিয়ে ফেলাই প্রকৃত অলৌকিক ঘটনা। বিখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার প্রথমটি করে। পরেরটা করতে গভীর উপলব্ধি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রায়ই বলা একটা ছোট গল্প :

> দুই ভাই একসাথে থাকত। বড় ভাই ব্যাবসা চালিয়ে যাওয়া ঠিক করল এবং ছোট ভাই সন্ন্যাসী হতে চাইল।
> বহু বছর পর তাদের পরস্পরের সাথে দেখা হ'ল। তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করল যে বিগত বছরগুলিতে তারা কি কি অর্জন করেছে।
> বড় ভাই বহির্জগতে যা যা বস্তুগত জিনিষ অর্জন করেছে তার লিস্ট বলে গেল। সে তার ব্যবসা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করল এবং কত সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছে তা বলল। তারপর সে ছোট ভাই কি অর্জন করেছে জিজ্ঞাসা করল।
> ছোট ভাই তাকে এক নদীতে নিয়ে গেল এবং জলের ওপরে পায়ে হেঁটে নদী পার করে দেখাল এবং গর্বের সাথে ঘোষণা করল, 'আমি এটা অর্জন করেছি।'
> বড় ভাই একটা নৌকা ভাড়া করে নদীর অপর পাড়ে গেল এবং বলল, 'কি? যেটা করতে দু টাকা লাগে, সেটা তুমি এত বছর পর অর্জন করলে?'

লোকেরা ভাবে যে তারা যদি অলৌকিক জিনিষ করতে পারে তারা আধ্যাত্মিক ও শক্তিশালী হয়েছে। না! বোঝ : আধ্যাত্মিকতা বহির্জগতে অলৌকিকতার খেলা নয়। তোমার ব্যক্তিত্বকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে পরিবর্তিত করার জন্য এটা অন্তর্জগতের এক খেলা, এবং সর্বোত্তম অলৌকিকতা! ব্যক্তিত্বকে (personality) স্বতন্ত্র অস্তিত্বে (individuality) রূপান্তরিত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা।

লোকেরা প্রায়ই আমায় অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে বলে। আমি তাদের বলি যে এই তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাগুলি আমাকে মাপার জন্য মানদণ্ড নয়। কিন্তু তারা শুনতে চায় না। যদি আমি সাধারণ কিছু বস্তুর মূর্তকরণ প্রক্রিয়া করি , তবে লোকেরা শুধুমাত্র এইসব বিস্ময়কর জিনিষ দেখতে এখানে আসবে, যেন জাদুর প্রদর্শনী হচ্ছে, তারা আমার কাছে নিজের রূপান্তরের জন্য আসবে না! সেটাই আমার চিন্তা।

একদিন, কয়েকজন নাছোড়বান্দা ভক্তের মিনতির জন্য, আমি একটা লক্ষ্মীমূর্তি মূর্তকরণ (teleportation) করে তাদের দিলাম। আমি তাদের ব্যাখ্যা করে বললাম যে এটা কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। যেহেতু তোমরা যা দেখছ তার কার্যকারণ (cause and effect) চক্র সম্বন্ধে জান না, তাই তোমরা এটাকে অলৌকিক ঘটনা ভাবছ।

টেলিবহনে আসলে কি হয়? যেভাবে টেলিফোনে তোমার গলার আওয়াজের শব্দতরঙ্গ বিদ্যুতে পরিবর্তিত হয় এবং কোন মাধ্যম দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য দিকে আবার শব্দতরঙ্গে পরিবর্তিত হয়, আমিও বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করি, তাকে বাতাসের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাই এবং আবার সেটাকে বস্তুতে রূপান্তরিত করি, ব্যাস। এতে কোন অলৌকিকতা নেই।

তাই অলৌকিকতা খোঁজা বন্ধ কর। অস্তিত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের ভাব নিয়ে বাস কর এবং স্বতশ্চলভাবে তুমি আসল অলৌকিকতা তোমার মধ্যে ঘটতে দেখবে। তোমার রূপান্তর হল সবচেয়ে বড় অলৌকিকতা যা মাস্টারের জন্য হতে পারে! আর মনে রেখ, মাস্টারের কাছ থেকে অলৌকিকতা তোমার চাই না; তোমার কেবল বুদ্ধি চাই।

যখন তোমার বুদ্ধি বিকশিত হয়, তুমি তোমার দৈনন্দিন জীবন অনায়াসে যাপন কর এবং তুমি শান্তিতে থাক। উদাহরণস্বরূপ , তুমি কোন ম্যানেজার হ'লে অনেক কর্তব্য থাকে : তুমি লোক নাও, তাদের কার্য সম্পাদন পর্যবেক্ষণ কর, তাদের মাইনে ঠিক কর ইত্যাদি। তুমি কি এসব জিনিষ চাপে না পড়ে করতে সমর্থ হও? বুদ্ধির সাথে তুমি তাদের চাপে না পড়ে পরিচালনা করতে পারবে। তুমি শান্তিতে থাকবে। তোমার কেবল বুদ্ধি চাই, বল নয়। মনে রেখ।

যখন তুমি বোঝ, যখন তুমি অভিজ্ঞতা কর যে অস্তিত্ব যত্ন নিচ্ছে, তুমি রূপান্তরিত হবে এবং সমস্ত মায়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবার দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা সর্বদা আমাদের নিষ্ঠা রাখি জ্যোতিষী, ভাগ্যগণক, গ্রহ, নক্ষত্র এবং আরো কতকিছুর ওপরে; কিন্তু অস্তিত্ব, যা নাকি ব্রহ্মাণ্ডের জীবনের উৎস, তাতে কখনও আস্থা রাখি না।

ভারতবর্ষের লোকেদের তোতাপাখিকে ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করার একটা রোমাঞ্চকর প্রথা আছে। রাস্তার ফুটপাথে একটা খাঁচায় তোতা আর পাশে তার মালিক বসে থাকবে। পথচারীরা সেখানে থামবে এবং মালিককে কিছু টাকা দেবে ও বিশ্বাস সহকারে নিজেদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে। মালিক খাঁচাটা খুলে দেবে ও তোতাকে বেড়িয়ে এসে স্তুপীকৃত কিছু কাগজ থেকে একটা কাগজ নিতে আদেশ দেবে।

তোতা খাঁচা থেকে বেড়িয়ে এসে একটা কাগজ ঠোঁটে করে নিয়ে তার মালিককে দেবে। তোতার মালিক তাতে কি লেখা আছে পড়ে শোনাবে। সেটাই সেই মানুষটির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী!

ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশিষ্ট একজন মানুষ চারটি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তোতাকে নিজের ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করছে ! সেটা কিভাবে সম্ভব? এসব বোকামি বিলকুল ছাড় এবং নিজেকে সঠিক সুরে বাঁধ; তোমার কেন্দ্রের তন্ত্রীটিকে ধর যেটা হ'ল কৃতজ্ঞতা এবং অস্তিত্বের সাথে ঐকতানে এগিয়ে চল।

মাস্টারেরা কৃতজ্ঞতার মূর্ত প্রকাশ

মাস্টারদের লক্ষ্য করলে তাঁদের কত মাধুর্যময় মনে হয়, কত অলৌকিক এবং কত দিব্য মনে হয়। তার কারণ তাঁরা অস্তিত্বের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন। কিন্তু তুমি তাঁদের অবস্থা (state) বোঝ না; তুমি কেবল তাঁদের প্রতিষ্ঠা (status) দেখ। যখন তুমি তাঁদের অবস্থা বোঝ, তুমি বুঝবে যে তাঁরা অস্তিত্বের সাথে একদম মিশে আছেন, দ্রবীভূত হয়ে আছেন এবং তাই তাঁদের সবসময় এত আনন্দপূর্ণ লাগে। তোমাকে তো এই অবস্থা পাবার জন্যই চেষ্টা করতে হবে।

তার পরিবর্তে তুমি কি বল? 'ও! দ্যাখো, উনি এক মাস্টার; উনি সর্বদাই আনন্দে আছেন। উনি আমাদের সমস্যা কিভাবে বুঝবেন? আমি এখানে আমার পেট চালানোর জন্য কষ্ট করে যাচ্ছি, আর উনি আমায় সবসময়ে কৃতজ্ঞ থাকতে বলছেন।'

তুমি মাস্টারের পদযুগলে কেবল গোলাপের পাপড়িগুলি দেখ; তুমি কেবল তাঁর প্রতিষ্ঠা দেখ এবং ভাব যে তিনি তোমার দৈনন্দিন ব্যাপারে কিছুই জানেন না। মনে রেখ, তিনি মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তাঁর অবস্থার জন্য, তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। এই অবস্থা অর্জন করার জন্য সংগ্রাম সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই।

তুমি পেট চালাবার জন্য সংগ্রামের কথা বল। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলি যে আমার পরিব্রজ্যার সময়ে বহু দিন আমি খাবার ছাড়াই থাকতাম। সেই সময় আমি এই পরিস্থিতিকে অস্তিত্বের ঘাটতি বলে কখনও ভাবি নি। তখন আমি এত ঐকান্তিকভাবে সত্যকে অন্বেষণ করছিলাম যে সবকিছুই ধ্যান হয়ে গিয়েছিল, এমনকি খাবার না খেয়ে থাকাও।

শোন, আমি দেখেছি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি দানশীল ঘর ও উত্তর ভারত *(স্বামীজী এখানে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতকেও উত্তর ভারতের মধ্যে ধরেছেন)* ছাড়া সন্ন্যাসীদের এড়িয়ে চলা হয়। সন্ন্যাসীদের সবসময়ে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। লোকেরা ভাবে সন্ন্যাসীরা তাদের ধনসম্পদ চুরি করতে এসেছেন। আমি তোমাদের বলি, কখনও তাঁদের তাড়িয়ে দিও না। তাঁদের এক পাত্র চাউল দাও না কেন? সেটাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। দান করার সময় কখনও কৃপণতা কোরো না। মনে রেখ : যদি তুমি দানী হতে ইচ্ছুক না হও, তুমি তো মহাদানী হয়ে যাবে। দানী মানে যে তার সম্পদের ছোট অংশ দিয়ে দেয়, আর মহাদানী তো সমস্ত ধনসম্পদ রেখে মারা যায়!

যাই হোক, এটা বোঝ যে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এমনকি সবচেয়ে সঙ্গিন সমস্যা ও সংগ্রামে, যদি তুমি অটল আস্থা ও কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাও এবং তোমার অন্তর্বুদ্ধি ব্যবহার করে সেই সমস্যাগুলির মধ্য দিয়ে যাও, তুমি দেখবে যে তুমি সেগুলিকে সমাধান ক'রে এবং আরও কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হয়ে উত্থিত হচ্ছ!

যদিও তুমি বহুমূল্য কিছু হারাও, সেটাকে কিছুদিন উপভোগ করার জন্য তুমি শুধু কৃতজ্ঞ হয়েই থাক, ব্যাস। যখন তুমি বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা হয়ে যাও, তুমি কোন কিছু হারালে কাঁদবে না। যতক্ষণ তা থাকবে তুমি কেবল তাকে উপভোগ করবে এবং তা চলে গেলে তার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে থাকবে।

একটা ছোট গল্প :

> এক রাজা তার রাজ্যে রাত্রে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াত। প্রত্যেক রাতে যখন পুরো শহর ঘুমিয়ে থাকে রাজা দেখত যে একটা গাছের নীচে একজন মাস্টার আনন্দ-অবস্থায় বসে থাকেন।
>
> এক রাতে রাজা মাস্টারের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করল এবং তাঁকে প্রাসাদে গিয়ে থাকতে অনুরোধ করল।
>
> মাস্টার বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আজকেই যাব, কাল কি হবে কে জানে।'
>
> মাস্টার নিমন্ত্রণে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজী হওয়ায় রাজা অবাক হল, কিন্তু তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে গেল।
>
> রাজপ্রাসাদে রাজা তাঁকে সবচেয়ে ভাল ঘরটা দিল এবং খুব ভাল ভাল খেতে দিল। মাস্টার সবকিছু সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করলেন।
>
> রাজা তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন যে তিনি কিভাবে সমস্ত বস্তুগত জিনিষ উপভোগ করছেন। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে একজন প্রকৃত মাস্টার জিনিষগুলি এভাবে উপভোগ করবেন, তাই দিনের পর দিন মাস্টারের ওপরে তার শ্রদ্ধা কমতে লাগল। রাজা নিজেকে প্রতারিত মনে করলেন।
>
> সবশেষে মাস্টার একদিন রাজাকে বললেন, 'মনে হচ্ছে, তুমি কোন সমস্যায় আছ। আমাকে সেটা বলছ না কেন?'
>
> রাজা বলল, 'হ্যাঁ, যখন আমি আপনাকে এইসব উপভোগ করতে দেখি, আমি বুঝতে পারি না যে আমার ও আপনার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'
>
> মাস্টার হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, চলো, আমরা একটু হেঁটে আসি।'
>
> রাজা রাজী হ'ল এবং দুজনে হাঁটতে চললেন। অনেক সময় ধরে তাঁরা নিঃশব্দে চললেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি

নদীর সামনে এলেন, সেই নদীটা রাজার রাজ্যের সীমারেখা।

মাস্টার বললেন, 'ঠিক আছে, আমার এখানে থাকা শেষ। তোমার রাজ্য ছেড়ে আমি যাচ্ছি, তুমি আসছ কি?'

রাজা বলল, 'আমি কি করে তা করি? আমার তো আমার রাজ্য আছে, আমার প্রজা আছে এবং কত কিছু আমাকে সমাধান করতে হবে!'

মাস্টার হাসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে এখন কি তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ?'

মাস্টারের কথায় রাজা বিরাট ঝাঁকুনি খেলেন।

মাস্টারেরা জানেন যে সব কিছুর মালিক হ'ল অস্তিত্ব। সেইজন্য তাঁরা সম্পূর্ণভাবে প্রতিটি মুহূর্তে বাস করেন, তাকে পুরোপুরি উপভোগ করন। প্রতিটি নিমেষ পূর্ণতার সাথে বাস করা হয়। তাঁরা কোনকিছু হারাবার জন্য ভয় পান না , কারণ কোন জিনিষটা তোমার যে তুমি হারাবে?

সর্বদা মনে রেখ, সবকিছুই অস্তিত্বের। তুমি কেবল তার অস্থায়ী অধিকারী , ব্যাস। যত জিনিষেরই অধিকারী হও না কেন, সর্বদা কৃতজ্ঞ বোধ কর। সেটাই মুক্তজীবনের পথ। এই একটা বিষয় বুঝলে সুপ্রচুর স্বাধীনতা ও সন্তুষ্টি উপভোগ করতে পারবে ।

সন্তুষ্টির সৌন্দর্য

অসন্তুষ্ট হওয়া যেন মনকে চিবানোর জন্য কিছু খাদ্য দেওয়া। মন তাকে খেতে থাকবে ও নিজেকে ব্য স্ত রাখবে। আমরা খুব সন্তুষ্ট অনুভব করলে কি হয়? মন খাবার পায় না। সে তখন বুঝতে পারে না যে কি করবে। মন তখন খাদ্য খুঁজতে আরম্ভ করে !

একজন মহিলা জুতার দোকানে গেল। সে তার পায়ের মাপের জুতা চাইল এবং সেলস্ ম্যান ধৈর্য ধরে অনেক জুতা দেখাল। মহিলাটি একটার পর একটা জুতা চেষ্টা করে গেল এবং ভাবল যে তার পায়ে একটাও নিখুঁতভাবে মানানসই হচ্ছে না।

সবশেষে, সেলস্ম্যান একজোড়া জুতা দেখিয়ে তাকে সেটা পরে দেখতে বলল।

মহিলাটি সেটা পরল ও বলল, 'এটা তো পরতে একদম ঠিক লাগছে। কিন্তু এটা সঠিক মাপের কিনা কে জানে।'

যখন তুমি সন্তুষ্ট হবে না বলে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছ, তখন কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারে না। এটা তোমার মনের এক অবস্থা, যাকে কেবল তুমিই সাহায্য করতে পার। আমরা অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়ে কথা বলা ও অসন্তুষ্ট অনুভব করার সময় নিজেরা একটা আরামপ্রদ অঞ্চলে আছি বলে মনে করি। কারণ তখন কিছু কথা বলার থাকে; মন সর্বদাই কিছু জিনিষে ব্যস্ত থাকে।

সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা যেন মনকে হারিয়ে ফেলা। তাই আমরা যদিও বলি যে আমরা সন্তুষ্ট হতে চাই, আসলে আমরা তার জন্য প্রস্তুত নই। আমাদের মন সর্বদাই চতুরভাবে খেলা করে, কারণ চিবাবার জন্য তার কিছু চাই।

দিগন্তরেখার দিকে দৌড়ালে আমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করি। দিগন্তরেখা কেবল একটি কাল্পনিক রেখা, কিন্তু আমরা তার দিকে দৌড়াতে নিরাপদ মনে করি কারণ দৌড়াবার জন্য কিছু একটা আছে! মন তো সর্বদা দৌড়াবার জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে!

এইপ্রকার হ'লে আসলে তুমি নিজেকে বোকা বানাচ্ছ, ব্যাস। তুমি নিজের জন্য পরস্পরবিরোধী ফলগুলি সৃষ্টি করছ। উদাহরণস্বরূপ, তুমি তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে পরিতৃপ্ত হতে চাও; কিন্তু তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, অবিরত তা না দেখার জন্য ও তার জন্য অভিযোগ করার জন্য নিজেকে পরিতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখ! তুমি কিছু একটা চাও, কিন্তু নিজের ওপরে অন্য কিছু নিয়ে আস। আর পরিতৃপ্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা করাকে সারা জীবনের এক বিশেষ প্রক্রিয়া ভেবে আরামে থাক !

বোঝ, যেই মুহূর্তে তুমি নিজের জন্য পরস্পরবিরোধী ফল সৃষ্টি কর , তোমার দুর্দশা শুরু হয়। তোমার জীবন কিরকম চাও, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার হও এবং তাকে সফল করার জন্য তোমার সমস্ত শক্তিকে সেই দিকে চালিত কর। যখন তুমি এই স্পষ্টতা সহকারে কাজ কর, তুমি কখনও নিজেকে বিভ্রান্ত করবে না এবং শীঘ্রই দেখবে যা হতে চেয়েছিলে , হয়ে গেছ!

যখন এমন এক জায়গায় প্রবেশ কর যেখানে কৃতজ্ঞতা তোমার ধ্যান হয়ে যায় , পরিতৃপ্তি স্বতশ্চলভাবে ঘটে। সাধারণ সন্তুষ্টি , যা আমরা সবাই জানি, তা সর্বদা একটা কারণ থেকে আসে। এটা বহির্জগতে ঘটা কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যে ঘটনা সাময়িকভাবে তোমার ব্যস্ত মনকে একটু বিশ্রাম দিয়েছে , ব্যাস। মন শান্ত হলে বল যে তুমি পরিতৃপ্ত। এটা আসল পরিতৃপ্তি নয়।

আসল পরিতৃপ্তি হয় যখন তুমি অস্তিত্বের দয়াশীলতার প্রতি চি রস্থায়ী কৃতজ্ঞতা অনুভব কর। আসল পরিতৃপ্তি আর কিছুই চায় না। তা কেবল সবকিছুই কোন কারণবিনা উপভোগ করে; তার কোন কারণের প্রয়োজন হয়ে না। এই অবস্থায় পৌঁছালে, তুমি জানবে না যে অতৃপ্তি কি ব্যাপার।

একটা ছোট গল্প :

> একটি লোক অনিদ্রার জন্য ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে আপনি সারারাত ঘুমাতে পারেন না?'
> লোকটি উত্তর দেয়, 'আমি রাত্রে ভালই ঘুমাই, ডাক্তারবাবু।'
> ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে সমস্যা কি?'
> লোকটি বলে, 'দুপুরে আর সন্ধ্যায় আমি ঘুমাতে পারি না।'

কোনরকম মাপদণ্ড ছাড়া আমরা কেবল চেয়েই চলেছি। যদিও বা আমাদের কোন মাপদণ্ড থাকে, সেটা হবে অসীম; সেটাই সমস্যা। আমরা বেশী বেশী চাইবার মনোভাবের জন্য পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছি। সেজন্য আমরা জানিও না যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমরা বহুকাল অন্তরে তাকিয়ে দেখি নি।

কখনও কোন কিছু বিব্রত করলে এই জোকটি মনে রাখার চেষ্টা কোরো। সঙ্গে সঙ্গে জোকটির সাথে সংযুক্ত হবার চেষ্টা কর এবং সজাগ হয়ে দেখ যে কি তোমাকে বিব্রত করছে। গভীরে যাও এবং দেখ যে সত্যিই তোমার সমস্যা আছে কিনা অথবা তুমি কেবল তোমার মনকে খেলতে দিচ্ছ। তুমি শেষে কেবল হাসতে পার।

> একটি মহিলা দূরপাল্লা উড়ানে ভ্রমণ করছিল। বিমানসেবিকা সবাইকে ভোজন বিতরণ করছিল। সে মহিলাটিকে গভীর নিদ্রায় দেখতে পেল এবং তাই সে অন্যদের যত্ন নিতে চলে গেল।
> মহিলাটি কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ল ও তার খাবার চাইল। বিমানসেবিকা তখন তার জন্য খাবার নিয়ে এল।
> মহিলাটি খাবার ছুঁয়ে দেখল ও রেগে গেল , 'কি ধরণের বিমান তোমরা চালাচ্ছ? খাবার গরম নয়। আমি অনেক কষ্ট করে দাম দিয়ে এই বিমানের ভাড়া দিয়েছি, আর এখন গরম খাবার পর্যন্ত পাব না!'
> বিমানসেবিকা ক্ষমা চেয়ে বলে, 'ম্যাডাম, দয়া করে ক্ষমা করবেন। গরম করার মেশিন কাজ করছে না। অন্যেরা এই খাবারই খেয়েছে।'
> মহিলাটি বলল, 'তাই নাকি? তাহলে ঠিক আছে।'

দ্যাখ, খাবার তো ঠাণ্ডাই থেকে গেল, কিন্তু অন্যেরা একই রকম খাবার খেয়েছে জেনে মহিলাটি আর অসন্তুষ্ট থাকল না! আমি সেটাকে বোঝাচ্ছি যখন আমি বলি যে সবকিছুই মনের খেলা ; সবকিছুই মনের দ্বারা খাপ খাইয়ে করা। মন তার ভঙ্গিমা পরিবর্তন করতে থাকে এবং তোমার সাথে খেলতে থাকে, কারণ তুমি মনকে পরিচালনা করতে অনুমতি দিয়েছ। তুমি নিজেকে সন্তুষ্টিতে কেন্দ্রিত কর নি, তাই তুমি মনের পরিচালনায় আন্দোলিত হতে থাক।

তাই আমি বলছিলাম, যদি তুমি দিনের শেষে হাসতে না পার, তার মানে তুমি পুরো ব্যাপারে এখনও গম্ভীর আছ; তুমি এখনও ভাবছ যে তুমি সমস্ত পৃথিবীকে কাঁধে নিয়ে আছ এবং কেবল তোমার জন্যই সমস্ত পৃথিবী চলছে।

অস্তিত্বের সৌন্দর্য

দ্যাখো, একদম গভীরে গেলে যে সত্য পাওয়া যায়, সেটা হল, আমরা অস্তিত্বেরই অংশস্বরূপ, অস্তিত্বই পরম বা চূড়ান্ত এবং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত শক্তি যে সম্পূর্ণ শো নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'ল সেই সংযোগকে আবার খুঁজে বার করা যাতে আমরা কোন সমস্যা ছাড়া প্রবহমান হতে পারি। কিন্তু কোথাও আমরা সেই বোধ হারিয়ে ফেলি এবং বস্তুগত জিনিষগুলির পিছনে ছুটতে শুরু করি এই ভেবে যেন সেগুলিকে আমরা খুঁজছি।

জীবনে যদি একবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে থাক, তুমি লক্ষ্য করে থাকবে যে সবচেয়ে লম্বা লাইন বাঘ সিংহের খাঁচার সামনে হয়। সর্বদাই লোকেরা অনেক সময় ধরে বাঘ সিংহের সামনে থাকে এবং তাদের দিকে বিস্ময় ও সম্মান সহকারে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

না বুঝেই আমরা এরকম করি কারণ, আমাদের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী কিছু দেখলে অদ্ভুতভাবে আমরা নিজেদের ভিতরে আশ্বস্ত হই। এটা আমাদের আরাম বোধ দেয় যে আমরা চরম শক্তি নই। আমরা জানি যে আমরা পরম শক্তি নই। আমাদের সত্তা প্রকৃতপক্ষে অন্বেষণ করছে যে কিভাবে এই প্রকার এক বিশালতা বা মহিমার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং যে মহিমা এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের আসল ভূমিকা মনে করিয়ে দেবে।

লোকেরা মন্দিরে শুধুমাত্র এই আশ্বাস পাবার জন্য যায় এবং তা তারা বিগ্রহগুলি দেখলে পেয়ে যায়। যারা এই প্রকার আশ্বাসন মন্দিরে পায় না, তা তারা অন্যস্থানে পায়। কিন্তু যে করেই হোক, আমাদের গভীরে আমরা জানি যে আমরা চরম শক্তি নই। এই

ভাবনা আমাদের জন্য এক অভিজ্ঞতামূলক বাস্তবতা হওয়া উচিৎ। তাহলে অবশ্যই আমরা জানব।

যদি হিমালয়ে যাও, তুমি অস্তিত্বের প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে এক স্থায়ী ও শক্তিশালী স্মারক পাবে। শিখর থেকে শিখরে পর্বতগুলি উন্নত হয়, পর্বত হয়ে যায় উপত্যকা এবং উপত্যকা পর্বত হয়ে উঠে যায়, কোথায় তা শুরু হচ্ছে আর কোথায় তা শেষ হচ্ছে বোঝা যায় না। গঙ্গানদী উপত্যকাতে বয়ে চলেছেন বিভিন্ন মেজাজে, নানা রঙে, নানা চিহ্ন সহকারে, অস্তিত্বের ভাষায় কলকল করতে করতে ও হাসতে হাসতে। যদি কোন দুনিয়া থাকে যা মানুষ বানায় নি, তা হ'ল হিমালয়। হিমালয় প্রমাণ করে যে মানুষ পরম রাজা নয়।

যখন হিমালয় দেখ, তুমি দেখবে, শত শত কিলোমিটার ধরে, বরফের পর্বতমালা প্রথমে শুধুমাত্র বরফের পর্বত রূপে দৃশ্যমান হয়, তারপর পর্বত ও জল, শেষে শুধুমাত্র জল। এ তো প্রকৃতির সবচেয়ে বড় বিস্ময়।

বই যা তোমাকে শব্দ দ্বারা শেখাতে পারে না, শুধু দেখার অভিজ্ঞতা দ্বারা হিমালয় তোমায় শিক্ষদান করতে পারে। তোমাকে কেবল তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এক সূক্ষ্ম নীরবতা সহকারে হিমালয় এক জীবন্ত শক্তিক্ষেত্র। তোমাকে কেবল সেই সূক্ষ্ম নীরবতাকে তোমার গভীরে প্রবেশ করতে দিতে হবে। যদি তুমি বোঝ যে তুমি অস্তিত্বের ঐশ্বর্যের একটি কণামাত্র, তুমি কোন প্রশ্ন না করে তাকে অনুগ্রহ ও বিনম্রতার সাথে গ্রহণ করবে।

যখন তুমি অস্তিত্বের কাছে উন্মুক্ত হও, অস্তিত্ব তোমায় পরিপূর্ণ করে। তুমি যতটা খুলে ধর, ততটাই সে ভরে দেয়। তোমরা সবাই ভাব যে ভগবানকে পাবার জন্য তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। একদম নয়। একটা বানরশিশু কিভাবে তার মাকে আঁকড়ে থাকে দেখেছ? যেন যে কোন সময়ে সে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু বিড়ালের ক্ষেত্রে তার মা বিড়ালকে মুখে ধরে রাখে ; তাতে বিড়ালছানা একদম সুরক্ষিত থাকে।

তোমাকে ভগবানকে আঁকড়ে থাকতে হবে না। যদি তুমি নিজেকে নিজের কর্তব্য করে যেতে দাও ও বাকীটা ভগবানের ওপরে ছেড়ে দাও, ভগবান তোমায় আঁকড়ে ধরবে। ভগবানকে ধরা বড় ব্যাপার নয়। ভগবান তোমায় ধরবে, সেটা বড় ঘটনা! এটা হবে যখন তোমার অকুতোভয় নিষ্ঠা থাকে এবং তুমি প্রেম ও সেবার জীবন যাপন কর।

একটা সুন্দর ছোট গল্প :

> একজন ঈশ্বর সচেতন প্রেমময় মানুষ তার জীবনে অনেক ভাল কাজ করেছিল। সে জানতে পারল যে একটি লোকের কাছে একটি বিশেষ খাতা আছে, যেখানে যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের নাম লেখা আছে। নিজের নাম সেই খাতায় আছে কিনা দেখার জন্য সে খুব উৎসুক হ'ল এবং সেই লোকটির বাড়ী গিয়ে সেই খাতায় নিজের নাম দেখতে চাইল।
> সে পুরো খাতা বহুবার খুঁজেও নিজের নাম দেখতে পেল না। ঈশ্বর সচেতন মানুষটি খুব হতাশ হল ও সেখান থেকে চলে গেল।
> এক বছর পরে সে আবার এসে সেই খাতায় নিজের নাম দেখতে এল। আবার সে তার নাম সেখানে পেল না। যখন সে চলে যাচ্ছিল, লোকটি বলল, 'দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। এই খাতাটায় যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের নাম আছে। আমার আরেকটা ছোট্ট খাতা আছে যাতে কয়েকটা নাম লেখা আছে। ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন, সেই খাতার লিস্টে তাদের নাম আছে।'
> এই বলে সে তাকে খাতাটি দেখাল।
> ঈশ্বর সচেতন মানুষটি সেখানে নিজের নাম দেখতে পেল।

ভগবানকে প্রেম করা খুব সোজা। আর যাই হোক, তিনি তো কত প্রেমময়, কত দানশীল, কত বলবান এবং আরও কত কিছু। তুমি বলে যেতে পার যে তুমি তাকে ভালবাসো; এদিকে হয়ত, যেখানে আছ সেখানেই থাকবে। কিন্তু যখন তুমি ঈশ্বরকে সত্তাস্তরে অনুভব করতে শুরু কর, তোমার পরিবর্তন ঘটবে এবং ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসবেন! তুমি দেখবে তুমি কত ভাবে ভালবাসা পাচ্ছ যা আগে জানতে না। ভগবানের সকরুণ প্রেম এরকম।

আমাদের সর্বদা প্রকৃতি, ঈশ্বর ও অস্তিত্ব থেকে সতর্ক থাকতে শেখানো হয়েছে। পৃথিবী যাতে আমাদের ব্যাথা না দেয় তার জন্য আমাদের চপ্পল পরতে শেখানো হয়েছে। আমাদের গায়ে বৃষ্টি না লাগাতে শেখানো হয়েছে। হাওয়া চললে ঘরের ভিতরে থাকতে আমাদের শেখানো হয়েছে। জন্তু জানোয়ার থেকে আমাদের দূরে থাকতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই রকম বহু শিক্ষা আমরা পেয়েছি।

আমি বলি, পৃথ্বীগ্রহে অস্তিত্বই তোমার একমাত্র বন্ধু। তুমি কি জান পৃথিবীকে অনুভব করে হাঁটা কত চমৎকার? আমি ছোটবেলায় কখনও চটি পরতাম না, কেবল কলেজের নিয়মের জন্য কলেজে যাবার সময় পরতাম। আমি খালি পায়ে হাঁটতাম। সে ঘর হোক, কি স্কুল হোক অথবা আমার পরিব্রজ্যার দিনগুলিই হোক।

এমনকি এখনও আশ্রমে, আমি বেশীরভাগ সময়ে খালি পায়ে হাঁটি। অবশ্য আমার আশেপাশে লোকেরা আমায় চটি পরতে বলে যাতে আমি পায়ে ব্যথা না পাই। আমি তাদের প্রশ্ন করি কিভাবে পাদুটি এখন ব্যথা পেতে পারে; এই পাদুটি তো পুরো ভারত জুড়ে খালি পায়ে ভ্রমণ করেছে!

তুমি এগুলি করে প্রকৃতির সাথে সংযোগ পুরোপুরি ছিন্ন কর। কত লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে , 'স্বামীজী, এত বছর ধরে রুক্ষ জায়গা দিয়ে চলার পরেও আপনার পাদুটি এত মসৃণ ও নিখুঁত কি করে রয়েছে?' আমি তোমাদের এখন বলি : আমি কখনও অস্তিত্বের বিরোধী হই নি; তাই। সেটাই আসল কারণ। আমি সবসময়ে ভাবতাম যে আমি অস্তিত্বের এক অংশ।

সর্বদা আমি নিজেকে প্রকৃতির অংশস্বরূপ ভাবতাম। সেজন্য আমি কোনরকম সতর্কতা অবলম্বন না করে , কোন কিছুকে ভয় না পেয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

কেবল কল্পনা কর যদি তোমাকে অন্ধকার জঙ্গলে বন্য জন্তুদের সাথে কোন খাবার ছাড়া এবং পরে কোথায় খাবার পাবে তার ভাবনা ছাড়া, শোবার জন্য আকাশের নীচে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় ছাড়া, একা থাকতে হ'ত। তোমার কেমন লাগবে? পুরাদস্তুর আতঙ্কিত হবে, হবে না কি?

তার কারণ তোমাকে কখনও শেখানো হয় নি যে অস্তিত্ব তোমার নির্ভরযোগ্য বন্ধু। তুমি সবসময় মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে এসেছ কারণ তুমি বিশ্বাস করতে যে কেবল মানুষেরাই সাহায্য করতে পারে। তুমি বুঝতে পার নি যে অস্তিত্বই মানুষের দ্বারা সাহায্য করে। সর্বদা তোমার বিশ্বাস ছিল মানুষের ওপরে , অস্তিত্বের ওপরে কখনও নয়।

অস্তিত্বের ওপরে নিষ্ঠা রাখলে তুমি পৃথিবীতে প্রভু হয়ে বাস করতে পার। আমি আমার পরিব্রজ্যার দিনগুলি উপভোগ করেছি। যেখানে আমার পা আমাকে নিয়ে গেছে, পরের গন্তব্যস্থলের কোন ধারণা ছাড়াই আমি সেখানে হেঁটেছি। আমি যে কোন ট্রেনে চড়ে পরতাম এবং যে স্টেশনের দৃশ্যাবলী আমায় আকৃষ্ট করত সেখানে নেমে পরতাম। তখন হিন্দীভাষা জানতাম না এবং আমার পরিব্রজ্যার বেশী সময়ে উত্তর ভারতে ও হিমালয়ে কেটেছিল। আর কাজ চালানোর জন্য কিছু হিন্দী শব্দ শিখেছিলাম।

আসলে কোন ভাষা শেখার জন্য প্রথম প্রতিবন্ধক হ'ল তোমার চিন্তা যে তুমি সেই ভাষাটা জান না। তুমি প্রথমে ভাষাটির বিরূপ হও এবং পরে সেটাকে কঠিন মনে হয়। এখানাও তুমি তোমার সবজান্তা প্রকৃতি নিয়ে নিজের সাথে বিরোধ করছ।

যাই হোক, বেশীর ভাগ সময়ে আমি একাই চলে বেড়িয়েছি, কোন পরিব্রাজক ভিক্ষুকদলের সাথে নয়। আমি কখনও নিজেকে একা ভাবিনি। অস্তিত্বের অংশ হয়ে আমি উপভোগ করেছিলাম। যখন প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পার , তুমি অস্তিত্বের আনন্দ অনুভব করতে পারবে। আমাকে কখনও খাবারের জন্য ভিক্ষা করতে হয় নি। যখন আমি ক্ষুধার্ত হতাম বা অন্য সময়েও, খাবার কারো হাত দিয়ে বা অন্য কোনভাবে এসে যেত। আমি এটাই বোঝাতে চাই যখন আমি বলি যে কেবল বিশ্বাস কর ও হালকা থাক এবং অস্তিত্ব তোমার যত্ন নেবে।

লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনি জীবনে এত কষ্ট করেছেন এবং তারপর আপনার লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য কি আমাদেরও সংগ্রাম করা উচিৎ নয়?' আমি তাদের বলি, 'আমি কষ্ট করেছিলাম কারণ আমি একটা তালা খোলার জন্য ১০,০০০ চাবি ব্যবহার করছিলাম। আমি বহু বছর ধরে পরীক্ষা করছিলাম ও শেষে সঠিক চাবি পাই। এখন আমার কাছে সেই সঠিক চাবিটা আছে। কেউ চাইলে সেটা আমি তাকে দিতে প্রস্তুত। এটা দিয়ে খুলতে তোমার কেবল এক মুহূর্ত লাগবে! অবশ্যই, যদি তুমি মনে কর কর যে তোমাকে কষ্ট করতে হবে, তাহলে সেটা তোমার স্বাধীনতা; আমি তাতে হস্তক্ষেপ করব না!'

প্রশ্ন : ধ্যান কিভাবে পরিতৃপ্ত অনুভব করতে সাহায্য করে?

যখন তুমি একটানা ধ্যান কর, তুমি কোমল ও ভেদনীয় হও। তুমি বহুরন্ধ্র, সংবেদনশীল ও সজাগ হও। তুমি দেখবে যে তোমার চেতনা প্রতিটি নিমেষে প্রসারিত হচ্ছে। তোমার চেতনা তোমার ভাবনা ও কাজ নির্ণয় করে। তাই বারংবার আমি তোমাদের ধ্যান করতে বলি। সেটা তোমাদের চেতনাকে বিশুদ্ধ করবে। জিনিষগুলি তোমার কাছে আরও স্পষ্ট হবে।

তুমি অনুভব করতে সমর্থ হবে যে মন থেকে তোমার কেন্দ্র হৃদয়ে সরে যাচ্ছে। যখ ন তোমার মন ও তোমার মধ্যে দূরত্ব বাড়ে, তোমার সমগ্র সত্তা এক ভিন্ন অনুভবে স্পন্দিত হয় এবং এই অনুভবই পরিতৃপ্তি , এক গভীর পরিপূর্ণতা, কোন কারণবিনা পূর্ণতার প্রতি এক গভীর প্রেম, এক অবিরাম হর্ষ ও আনন্দের উপলব্ধি।

নকারাত্মক চিন্তা ও অতৃপ্তির জন্য যত শক্তি আগে খরচা করেছ, তা বিমুক্ত হবে এবং তুমি আনন্দময়, সংহত ও শক্তিতে ভরপুর অনুভব কর। তখন কৃতজ্ঞতা তোমার প্রার্থনা হয়ে যায় এবং 'তোমাকে ধন্যবাদ' হয়ে যায় তোমার মন্ত্র!

ঘুমাতে যাবার সময়, অস্তিত্বের সাথে আরও একদিন কাটানোর জন্য এক গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে ঘুমাতে যাও। যখন ঘুম থেকে ওঠ, অস্তিত্বের সাথে আরও একদিন কাটাতে পারবে বলে এক গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে উঠে পড় ! কৃতজ্ঞতাকে একদম তোমার সত্তা বানিয়ে ফেলার জন্য এটাই সবচেয়ে সহজ ও সর্বোত্তম কার্যকর ধ্যান।

আমি তোমাদের বলি, কেবল কৃতজ্ঞতাকে অনুভব করে ও তা তোমার সত্তা থেকে কিরণবর্ষণ করে , তুমি পৃথ্বীগ্রহের চেহারা পালটে ফেলতে পার। সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, ধর্মান্ধতা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র ইত্যাদি সবই সমূলে উৎপাটন করা যায় যদি কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সজাগতা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি প্রতিটি মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতা নিয়ে আসা যায়।

যখন প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে ও তা বিকিরণ করে, তখন কোন ভালবাসা থাকবে না, কোন ঘৃণা থাকবে না, কোন ঈর্ষা থাকবে না। কেবল এই একটা ভাবনা দ্বারা বিশ্বের সমস্ত নকারাত্মকতার সম্ভাব্য ভিত্তিগুলিকে বিনাশ করা যায়, কারণ নকারাত্মকতার সমস্ত ভিত্তি এর দ্বারা লুপ্ত হয়ে যাবে। এটাই কৃতজ্ঞতার মাধুর্য !

ঠিক আছে; এখন আমাদের কিছু সময় ধরে একটা সুন্দর ধ্যান করা যাক , যার নাম সহস্রার ধ্যান - কৃতজ্ঞতার ধ্যান।

আবেগ : কৃতজ্ঞতা
চক্র : সহস্রার চক্র
অবস্থান : মাথাও ওপরে

সংস্কৃতে সহস্রার অর্থ ‘হাজার পাপড়ি সহকারে প্রস্ফুটিত।’ এই চক্র সক্রিয় হলে মাথার তালুতে হাজার পাপড়ি সহকারে প্রস্ফুটিত পদ্মের এক নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় (mystical) অভিজ্ঞতা হয়।

অসন্তুষ্টি এবং জীবনের সবকিছুকে অবধারিত বলে ধরে নেবার মনোভাব থাকলে এই চক্র তালাবদ্ধ থাকে। উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তি দ্বারা এই চক্রকে প্রস্ফুটিত করা যায়!

গভীর কৃতজ্ঞতায় প্রস্ফুটিত হওয়ার ধ্যান প্রক্রিয়া : সহস্রার ধ্যান, এটি সুফি সম্প্রদায়ের একটি ধ্যান প্রক্রিয়া।

সহস্রার ধ্যান
(পুরো সময় : ৬০ মিনিট)

নিত্য-ধ্যান এই ধ্যানের অংশ

নিত্যধ্যান কেন?

আবেগ ও চিন্তা আমাদের মানসিক গঠন ও মনোভাবের জন্ম দেয়। আবেগ ও ভাবনাগুলির খেলা বুঝতে পারাই সেগুলিকে অতিক্রম করার প্রথম ও শেষ ধাপ। মন থেকে আন্‌ক্লাচ্‌ (unclutch) করার জন্য ও মনকে অতিক্রম করার জন্য, নিত্যধ্যান নিত্যানন্দ দ্বারা পরিকল্পিত একটি ৩৫ মিনিটের ধ্যান প্রক্রিয়া।

মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী এক আন্‌ক্লাচ্‌ড্‌ ও আনন্দপূর্ণ সত্তা। আমরা আন্‌ক্লাচ্‌ড্‌ বলতে কি বোঝাই?

((আন্‌ক্লাচ্‌, unclutch, একটি নতুন শব্দ এবং এটি আধ্যাত্মিক জগতকে ও ইংরাজী ভাষাকে পরমহংস নিত্যানন্দের দেওয়া এক উপহার। শব্দটি খুবই শক্তিশালী। আমরা এখানে এই শব্দটির কোন বাংলা অনুবাদ করতে চাই না। আন্‌ক্লাচ্‌ করলে আন্‌ক্লাচ্‌ড্‌ অবস্থায় চলে যাওয়া হয়। ইংরাজীতে ক্লাচ্‌ মানে আঁকড়ে ধরা। তাই আন্‌ক্লাচ-এর অর্থে আঁকড়ে ধরার বিপরীত তাৎপর্য আছে এবং আন্‌ক্লাচ্‌ মানে 'ছেড়ে দেওয়া' বা 'বন্ধন খোলা' বা 'মুক্ত করা' বলা যেতে পারে। যাই হোক, আমরা বিশ্বব্যপী প্রচলিত আন্‌ক্লাচ্‌ শব্দটি বাংলায় প্রয়োগ করব, কারণ স্বামীজী শব্দটিতে বিশেষভাবে শক্তির সঞ্চার করেছেন।))

আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হওয়া প্রতিটি চিন্তা বুদ্বুদের মত , তা তৈরি হয়, ওঠে ও মিলিয়ে যায়। প্রতিটি চিন্তা পরবর্তী চিন্তা আসার আগে স্বতন্ত্রভাবে আবির্ভূত হয় ও মিলিয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি তুমি একটি চেয়ারে বসে থাক ও হঠাৎ উঠে পর, তাহলে লক্ষ্য কর যে যেই মুহূর্তে তুমি উঠে পরার নির্ণয় নিয়েছ সেই মুহূর্তে বসে থাকার চিন্তা তোমাকে ছেড়ে গেছে। যদি তুমি কম্পিয়ুটারে কাজ করছ ও তাকে শাট ডাউন বা বন্ধ করা ঠিক কর, সেই মুহূর্তে তোমার কাজ করার ইচ্ছার চিন্তা মিলিয়ে গেছে। তাই প্রতিটি চিন্তাই অন্য চিন্তার সাথে অসংযুক্ত এবং চিন্তাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর আরেকটা হয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী চিন্তা আসার আগে পূর্ববর্তী চিন্তাটিকে মিলিয়ে যেতে হবে। এটাই আমাদের আসল প্রকৃতি।

আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'ল প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তাগুলিকে পরিত্যাগ করতে থাকা; প্রতিটি চিন্তাকে বুদ্বুদের মত উঠতে দিয়ে তাকে ফাটিয়ে ফেলা এবং পরের চিন্তাকে উঠে আসতে দেওয়া। আমাদের চিন্তার কেবল এক উল্লম্ব (vertical) অস্তিত্ব আছে, বুদ্বুদ ওঠার মত।

চিন্তাগুলির সাথে সংযুক্ত না হয়ে তাদের উঠতে দেওয়া ও মিলিয়ে যেতে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আমরা আন্‌ ক্লাচ্‌ড্‌ হওয়া বলি। যতক্ষণ এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ঘটতে দেওয়া যায়, ততক্ষণ সব ঠিক আছে।

কিন্তু আমরা কি করি? আমরা এই চিন্তাগুলিকে এলোমেলোভাবে যথেচ্ছভাবে সংযুক্ত করতে আরম্ভ করি এবং একটি দণ্ড বা শাফ্‌ট্‌ (shaft) বানিয়ে ফেলি। এটা করে আমরা রৈখিক সংযোগ দ্বারা উল্লম্ব (vertical) ও আন্‌ক্লাচ্‌ড্‌ প্রক্রিয়াকে অনুভূমিক (horizontal) বানিয়ে ফেলি। এখানেই সমস্ত সমস্যার সূত্রপাত। যতক্ষণ একটা চিন্তাকে উঠতে দেওয়া ও মিলিয়ে যেতে দেওয়া হয়, আমরা আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্তরে যে কোন পরিমাণ ভার বহন করতে পারি এবং আমাদের চেতনা লঘু ও আনন্দপূর্ণ থাকে। একবার চিন্তাগুলি সংযুক্ত করতে থাকলে, আমাদের চেতনা কষ্ট পায় এবং আমরা ভারগ্রস্ত অনুভব করতে শুরু করি। তাতে আমাদের সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমস্ত আবেগ যেমন দুশ্চিন্তা, কাম, অসন্তুষ্টি, ঈর্ষা, ভয়, আমিত্ব এবং দৃষ্টি আকর্ষণের চাহিদা, এগুলির একমাত্র কারণ হ'ল, স্বাধীন ঘটনাবলীর মধ্যে ও স্বাধীন চিন্তা সমূহের মধ্যে আমরা সংযোগ খুঁজে বার করি এবং আমাদের নিজেদের জন্য এক ধারণার সৃষ্টি করি এবং সেই ধারণার সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করা শুরু করি। আমাদের চিন্তাগুলি দ্বারা আমরা একটা কাল্পনিক শাফ্‌ট্‌ বানিয়ে ফেলি ও সেইজন্য কষ্ট পাই।

এই আবেগগুলিই পৃথিবীতে ধর্মীয় যুদ্ধ, সামাজিক সংঘাত অথবা রাজনৈতিক উত্তেজনা - সমস্ত প্রকার হিংস্রতার সৃষ্টি করে। আমাদের আবেগই সমস্ত হিংসার ভিত্তি এবং আমাদের আবেগগুলির ভিত্তি হ'ল আমাদের চিন্তাগুলি দ্বারা কাল্পনিক নানা শাফ্‌ট্‌ তৈরির স্বভাব এবং সেই শাফ্‌ট্‌গুলিকে আমাদের ওপরে কাজ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা।

এই দণ্ড বা শাফ্‌ট্‌ তৈরির সময়ে প্রধান জিনিষ যেটা আমরা করি তা হ'ল, আমরা সুখ চাই না দুঃখ চাই তার ওপরে নির্ভর ক'রে আমরা চিন্তাগুলি পছন্দ করি। আমরা যথেচ্ছভাবে সুখের চিন্তাগুলিকে উঠিয়ে নিই এবং তাদের সংযুক্ত করে সুখের শাফ্‌ ট্‌ বানাই অথবা নকারত্মক চিন্তাগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে সেগুলি দ্বারা দুঃখের শাফ্‌ট্‌ বানাই। আমরা আমাদের জন্য সুখ ও দুঃখের শাফ্‌ট্‌গুলি

পর্যায়ক্রমিকভাবে সৃষ্টি করতে থাকি এবং এই দুই আবেগের মধ্যে আন্দোলিত হতে থাকি। এই শাফ্ট্ থেকে আন্‌ক্লাচ্ করাই আনন্দময় জীবনের জন্য প্রধান সূত্র।

যদি তুমি গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর যে আমরা কিভাবে চিন্তাগুলিকে মিলিয়ে যেতে না দিয়ে তাদের সংযুক্ত করি , তাহলে তুমি বুঝবে আমরা কিভাবে আমাদের জন্য দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করি। মনই এই সংযুক্ত করার কাজ করে। আসলে তো চিন্তাগুলির মধ্যে কোন রকম সংযোগ নেই।

আমাদেরকে সর্বদাই শব্দ (কথা) ও চিন্তা ভক্ষণ করে থাকতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা এই শাফ্ট্গুলি তৈরি করি। আমরা শব্দ ভক্ষণ করি কারণ আমরা সবসময়ে ভয় ও লোভ থেকে কাজ করি। ভয় ও লোভ থেকে আমরা আমাদের চিন্তাগুলিতে সংযোগ সাধন করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটাকে ছেড়ে দিতে পারি না, কারণ যদি আমরা তাকে ছেড়ে দিই, আমাদের ধরে থাকার জন্য কিছুই থাকবে না। আমরা কখনও মনের এক আন্ ক্লাচ্ড্ অবস্থা অভিজ্ঞতা করি নি যেখানে কোন শাফ্ট্ নেই, যেখানে আছে শুধুমাত্র বুদ্বুদের মত চিন্তা।

আন্‌ক্লাচ্ড্ অবস্থায় ভয় ও লোভের কোন সুযোগ নেই। তুমি কেবল 'থাকবে', ব্যাস্। এই মাত্রা আমরা কদাচিৎ অভিজ্ঞতা করি কারণ আমরা চিন্তাগুলির দ্বারা তৈরি সুপরিচিত শাফ্টে ক্লাচ্ করতে (আঁকড়ে ধরতে) অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

একটা ছোট গল্প :

> একজন চোখের ডাক্তার এক জন্মান্ধ মানুষকে পরীক্ষা করল। ডাক্তার তাকে আশ্বস্ত করল, 'একবার আপনার চোখ অপারেশন করি, আপনি দৃষ্টিশক্তি পেয়ে যাবেন এবং আপনার লাঠিটা ফেলে দিতে পারবেন।'
> অন্ধ মানুষ তা শুনে ভয় পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি বুঝলাম আমার দৃষ্টিশক্তি পেয়ে যাব, কিন্তু লাঠি ছাড়া আমি চলব কি করে?'

লোকটি লাঠি নিয়ে চলতে এতই অভ্যস্ত যে সে বুঝতেই পারছে না যে দৃষ্টিশক্তি পেয়ে গেলে তার চলার লাঠি আর লাগবে না ! একইভাবে যখন সত্য হ'ল এই যে আমরা আন্‌ক্লাচ্ড্ অবস্থায় আনন্দে থাকতে পারি, আমরা বিস্মিত হই যে চিন্তার শাফ্টে ক্লাচ্ না করে আমরা কিভাবে থাকব। আমরা এটাকে অপরিহার্য মনে করি।

আমরা দেখতে অসফল হই যে পুরো ব্যাপারটা কত অবাস্তব। আমাদের মন একটা ভ্রম। আমরা তাকে ক্ষমতা দিয়েছি এবং তার গোলাম হয়ে গেছি। এটা তো একেবারে মনের জন্য গোলামী।

শুধু তোমার মধ্যে চিন্তাগুলিকে উঠতে লক্ষ্য কর। স্পষ্টভাবে দেখ কিভাবে প্রতিটি চিন্তার উদয় হয় ও মিলিয়ে যায় এবং পরবর্তী চিন্তা এসে পরে। প্রত্যক্ষ কর তুমি কিভাবে এই চিন্তাগুলিকে অনায়াসে সংযুক্ত কর এবং ভাবনা ও ধারণা সৃষ্টি কর। প্রত্যক্ষ কর কিভাবে এই ধারণাগুলি তোমার সাথে খেলা করে; তুমি বুঝতে পারবে কিভাবে তুমি এই অলীক কল্পনাগুলির সৃষ্টি কর। চিন্তাগুলিকে সংযুক্ত করাই আদি পাপ (original sin)।

আন্‌ক্লাচ্ড্ অবস্থায় বাস করাই আনন্দময় জীবনযাপনের একমাত্র উপায়। শুধু ফয়সালা কর যে তুমি কখনও দুটি চিন্তাকে সংযুক্ত করবে না, যে তুমি কোন চিন্তা বা ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রকা র রায় দেবে না। যেই মুহূর্তে তুমি দেখবে যে তুমি সংযোগ করছ , তখন তার থেকে একদম আন্‌ক্লাচ্ করে ফেল। যখনই এই প্রক্রিয়া মনে পরে, আন্‌ক্লাচ্ করতে থাক; তোমার মানসিক গঠন স্বতশ্চলভাবে রূপান্তরিত হবে।

যখন আন্‌ক্লাচ্ড্ অবস্থায় কাজ কর, দেখবে যে তোমার ধারণক্ষমতা বাড়ছে; তুমি কোন চাপে না পরেই অনেক বেশী দায়িত্ব নেবে; সুখ ও দুঃখের মধ্যে তোমার মেজাজ আন্দোলিত হতে দেখবে না; তুমি সর্বদা আনন্দপূর্ণ থাকবে। আমরা কারণ সহকারে আসা সুখের সাথে একদম অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই কারণও একটি শাফ্ ট্ যেটা আমরা আমাদের চিন্তাগুলি দ্বারা সৃষ্টি করি। একবার এই শাফ্ট্গুলি বানানো বন্ধ করলে তুমি সর্বদাই আনন্দময় হয়ে থাকবে।

আন্‌ক্লাচ্ড্ মানে এই নয় যে তুমি তোমার চারিদিকের লোক ও পরিস্থিতি থেকে নির্লিপ্ত , নিরুত্তাপ ও আগ্রহহীন হয়ে থাকবে। শুধুমাত্র তোমার চিন্তাগুলিকে সংযুক্ত কোরো না এবং শাফ্ ট্ বানাবার প্রক্রিয়া শুরু কোরো না, ব্যাস।

মনে রেখ যে তুমি স্বাভাবিকভাবে একজন সুন্দর ও আন্‌ক্লাচ্ড্ সত্তা, সেটাই যথেষ্ট। তুমি নিজের জন্য ও অপরের জন্য কষ্ট সৃষ্টি করা বন্ধ করবে।

নিত্যধ্যান তোমার শরীরের ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকেন্দ্রগুলিকে শুদ্ধ করে ও তাতে শক্তির সঞ্চা র করে। এই শক্তিকেন্দ্রগুলি

আন্দোলিত আবেগ ও সঞ্চিত নকারাত্মক স্মৃতির জন্য দায়ী। নিত্যধ্যান তোমার সিস্টেমে প্রগাঢ় সজাগতা আনে ও অন্তর্বুদ্ধি জাগরিত করে। নিত্যধ্যান তোমার চেতনার বর্ধমান বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতার কারণ হয় এবং এই চেতনা তোমাকে পরিপূর্ণ জীবনের দিকে চালনা করতে পারে। নিত্যধ্যান গভীরে খোদিত ও অবাঞ্ছিত নকারাত্মক স্মৃতি ও নিগ্রহগুলিকে দূর করে।

তোমার দেহ, মন ও আত্মার আসল প্রকৃতি অভিজ্ঞতা করার জন্য ধ্যান তোমায় পবিত্র করে ও ভিত স্থাপন করে। যে দেশে মন কিছুই আঁকড়ে ধরা বা ক্লাচ্ করে না, নিত্য আনন্দের সেই দেশের সাথে সংযোগ সাধন করার জন্য ধ্যান একটি সরাসরি প্রক্রিয়া।

নিত্যধ্যান প্রক্রিয়া তোমাকে ভারসাম্য প্রদান করে এবং তোমাকে দেহ, মন ও আত্মার সাথে সম্পূর্ণ ঐকতানে থাকতে দেয়। নিত্যধ্যান দ্বারা অন্তর্বুদ্ধিকে জাগিয়ে তাকে প্রচালিত শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে শ্রেষ্ঠতর হওয়া যায়।

এটি একটি পাঁচ ধাপের পরিচালিত ধ্যান প্রক্রিয়া। দয়া করে মনোযোগ সহকারে নির্দেশগুলি শোন।

নির্দেশাবলী :

ধাপ ১



কোমরে হাত রেখে বজ্রাসনে বস। মেঝেতে মাদুর বা শতরঞ্চি পেতে পা বিস্তৃত করে বস। এবারে পা দুটি একটার পর আরেকটা হাঁটু থেকে ভাঁজ কর এবং পাছা গোড়ালির ওপরে রাখ, তোমার পায়ের আঙ্গুলগুলি বাইরের দিকে করে থাকবে। তোমার হাত কোমরে। অসুবিধা হলে ছোট বালিশ বা তোয়ালে রোল করে গোড়ালির নীচে রাখতে পার। মাথা, গলা ও মেরুদণ্ড সোজা করে একই সরলরেখায় রেখে আরাম করে বস। এখন চোখ বন্ধ করে এবং এলোমেলো বা অব্যবস্থিতভাবে ৭ মিনিট ধরে শ্বাসপ্রশ্বাস নাও। শ্বাসপ্রশ্বাসে কোন তাল বা লয় থাকবে না। শুধু তোমার সমস্ত শরীর দিয়ে জোরে জোরে, যত জোরে পার গভীরভাবে ও অব্যবস্থিতভাবে তোমার পেটের নীচের থেকে শ্বাসপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাও।

ধাপ ২



বজ্রাসনে বহাল থাক। আঙ্গুলদ্বারা চিন্‌মুদ্রা রচনা কর। চিন্‌মুদ্রা এইভাবে করা হয় : হাত দুটি হাঁটুতে রাখ। হাতের খোলা তালু ওপরদিকে করে থাকবে। তর্জনীর ডগা বুড়া আঙ্গুলের ডগাকে ছোঁবে ; তাতে একটা বৃত্ত তৈরি হবে। অন্য তিনটি আঙ্গুল, বাহু ও হাত আরাম করে রাখা থাকবে। তুমি এখন ৭ মিনিট ধরে এই ভঙ্গীতে যত জোরে পার, যত তীব্র পার ও যত লম্বা পার, ঠোঁটদুটো মিলিত রেখে নাভি অঞ্চল থেকে গুঞ্জনধ্বনি (মমমমমমম... ধ্বনি) কর। তোমার সম্পূর্ণ চেতনা গুঞ্জনে লাগাও। গুঞ্জন হয়ে যাও। এটা আসলে মহামন্ত্র গুঞ্জন। *(তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে মহামন্ত্র ধ্যান করা হয়েছিল)*

ধাপ ৩



এখন তুমি চাইলে পা আড়াআড়ি করে মাটিতে বসতে পার বা বজ্রাসনে বহাল থাকতে পার। এবার ৭ মিনিট ধরে তুমি তোমার সজাগতাকে মূলাধার চক্র থেকে সহস্রার চক্রে নিয়ে যাবে।

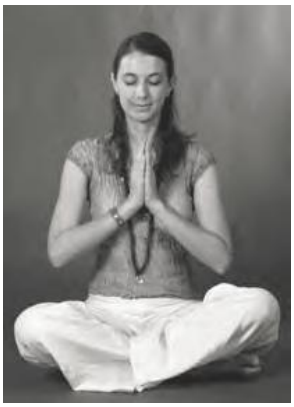
মূলাধার চক্র - মেরুদণ্ডের গোড়াতে
স্বাধিষ্ঠান চক্র - মূলাধারের ২ ইঞ্চি ওপরে
মণিপুরক চক্র - নাভি কেন্দ্রে
অনাহত চক্র - হৃদয় কেন্দ্রে
বিশুদ্ধি চক্র - কণ্ঠ কেন্দ্রে
আজ্ঞা চক্র - ভ্রুদ্বয়ের মাঝে
সহস্রার চক্র - মাথার ওপরে

প্রতিটি চক্রে এক মিনিট ধরে এই প্রকার সজাগতা সহকারে থাক : চক্রটি পবিত্র; চক্রটি শক্তিতে পূর্ণ এবং চক্রটি বিকিরণ

করছে চিরন্তন আনন্দ, নিত্য আনন্দ, নিত্যানন্দ।

ধাপ ৪
নীরবতা পালন করে ৭ মিনিট ধরে আন্‌ক্লাচ্‌ কর।

কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য পরিচালিত ধ্যান



এই পরিচালিত ধ্যান সুফিদের থেকে নাওয়া।

সোজা হয়ে বস। হাতে কিছু ফুল নাও ও চোখ বন্ধ কর।
তোমার সহস্রার চক্রে কেন্দ্রীভূত হও।
শরীরের অন্য সমস্ত অংশ ভুলে যাও।
শুধুমাত্র তোমার মাথার তালুর কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হও এবং সেখানে আরাম কর।
মুখে যেন একটা হাসি থাকে এবং স্বস্তিতে থাক।

তোমাকে এই শরীর প্রদান করার জন্য, তোমার সম্পূর্ণ সত্তার সাথে তোমার মাতাকে কৃতজ্ঞতা জানাও। মাকে মনে কর এবং তোমার সমগ্র সত্তার সাথে মাকে কৃ তজ্ঞতা অর্পণ কর।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার পিতাকে, তোমাকে এই জীবন প্রদান করার জন্য এবং তোমার সকল প্রয়োজনের যত্ন নেবার জন্য।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর সব ডাক্তার ও নার্সদের, যারা তোমাকে এই পৃথিবীতে প্রথম অভ্যর্থনা করে।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তাদের, যারা সেই হাসপাতাল বা বাড়ি নির্মাণ করেছিল, যেখানে তোমার জন্ম হয়।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তাদের, সবাইকে যারা তোমাকে শৈশবে যত্ন নেয়।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তাদের, যারা ছোটবেলায় তোমার খাবার, কাপড় ও বেঁচে থাকার জন্য কাজ করেছে।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, যারা তোমায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার ছোটবেলার সমস্ত বন্ধুদের যারা তোমার জীবনকে খুশী ও আনন্দপূর্ণ করেছিল , যারা তোমার সাথে তাদের সরলতা ও খুশী শেয়ার করেছিল।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার ভাইবোনদের ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের , যারা তোমাকে প্রতিপালন করেছিল ও যত্ন নিয়েছিল। জেনে বা না জেনে, সচেতন বা অচেতনভাবে, যদি তাদের কোনভাবে আঘাত দিয়ে থাক তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর সকল মানুষদের, যারা তোমাকে পেশাগত শিক্ষা প্রদান করে, যারা তোমাকে তোমার পেশায় দাঁড়াতে সাহায্য করে, যারা তোমাকে তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহস দেয়।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তাদের, যারা দরকার মত তোমাকে আর্থিক দিক থেকে সহায়তা করে।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর সমস্ত ডাক্তারদের ও নার্সদের যারা তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়েছে , যারা তোমাকে যখন দরকার তখন চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা করেছে।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার পত্নী বা পতিকে, যে তোমাকে জীবনে ভালবাসা ও সুরক্ষা দিয়েছে। তাদেরকে ক্ষমা কর যদিও তাদের কোন কাজ হয়ত তোমায় আঘাত দিয়েছিল। তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কর, যদি জেনে বা না জেনে কোন কাজ করে তাদের কোনভাবে আঘাত দিয়ে থাক।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর সমস্ত মানুষদের, যারা তোমাকে উৎসাহিত করেছে এবং তোমাকে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তাদের সবাইকে যারা কোন না কোনভাবে তোমাকে সারা জীবন ধরে সেবা করেছে : গোয়ালা যে দুধ দিয়ে যায়, মুদী, ধোপা, জঞ্জাল সংগ্রহকারী, তোমার ভৃত্যসকল, তোমার ড্রাইভার, যাদেরকে তুমি ধরেই নিয়েছিলে যে তাদের তো এসব কাজ করতেই হবে। তাদের যদি ইচ্ছা করে বা ইচ্ছা না করে, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে, কোনভাবে আঘাত দিয়ে থাক, তবে তার জন্য তাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার শত্রুদের এবং তাদের যারা তোমাকে আঘাত করে ছে, যারা তোমায় বলবান ও ক্ষমাশীল তৈরি করেছে। যদি তাদের কোন আঘাত দিয়ে থাক, তার জন্য তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কর।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তাদের সবাইকে যারা তোমাকে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে, সামাজিকভাবে, আর্থিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সাহায্য করেছে।

তাদের সবাইকে এক এক করে মনে কর এবং নিজের সময় নিয়ে কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার শরীরকে এবং তার সমস্ত অংশদের - এক এক করে।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর তোমার মনকে তার অলৌকিক কাজকর্মের জন্য।

কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর ঐশ্বরিকতাকে, পূর্ণতাকে, ভগবানকে - এই সকল জিনিষ তোমার জীবনে সম্ভব করার জন্য।

ধাপ ৫

শেষের সাত মিনিট ধরে তুমি বসে থেকে 'গুরু পূজা মন্ত্র'-এর স্তব করতে পার অথবা ক্যাসেট বা সিডি প্লেয়ারে হওয়া স্তবের সাথে বয়ে চলতে পার এবং অস্তিত্ব ও জীবনমুক্ত মাস্টারদের মহান পরম্পরাকে তোমার কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর। তোমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর।

এবারে তুমি তোমার পুষ্প অর্পণ কর।



পরিশিষ্ট

পরবর্তী ধাপ - ইনার অ্যাওয়েকেনিং (অন্তর্জাগরণ)

সবচেয়ে স্বাভাবিক পরবর্তী ধাপ হল
“ইনার অ্যাওয়েকেনিং প্রোগ্রাম”

জীবনের সকল অভিমুখে মানুষের পুরো সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এটি একটি ২১ দিনের অনন্য, অদ্বিতীয় এবং প্রগাঢ় ধ্যান প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের প্রধান বৈশিষ্টগুলি হ’ল :

- যোগীর শরীর তৈরির জন্য নিত্যযোগ ও নিত্যক্রিয়া
- মানুষের মন ও আত্মাকে শুদ্ধিকরণ ও তাতে শক্তিসঞ্চার করার জন্য বিভিন্ন ধ্যান প্রক্রিয়ার মিশ্র ণ [অতীত-জীবন প্রত্যাবর্তন (past-life regression) সহ]
- চিন্তার সীমিত ছকের বিশ্লেষণ
- কিছু আলোকসম্পাতকারী ক্যাম্প-ফায়ার সেশন
- ইন্টার অ্যাক্তিভ সেশন
- শক্তি-দর্শন (energy-darshan) এবং ২১টি শক্তিশালী দীক্ষা ও ঐকান্তিক কুণ্ডলিনী জাগরণ

এই প্রোগ্রামটিকে আপনার রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে আরও গভীর করার জন্য এবং আপনার পূর্ণ সম্ভাবনাকে নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য রচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীর মাইটোকণ্ড্রিয়াল কোষের শক্তি ১৩০০% বৃদ্ধি পায়। ইনার আওয়েকেনিং নানা প্রকার স্বাস্থ্যগত উপকার প্রদান করে, যেমন মধুমেহ বা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ, রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ, ওজন-ভারসাম্য ও অনিদ্রা থেকে ত্রাণ ইত্যাদি।

এখান থেকে ইনার অ্যাওয়েকেনিং প্রোগ্রাম সম্পর্কে আরও জানুন :
www.innerawakening.org

এছাড়া আপনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় ই-মাইল করে আপনার প্রশ্ন পাঠাতে পারেন :
ia@nithyananda.org

বিনামূল্যে বক্তৃতা, বই, ধ্যান ও যোগব্যায়াম কৌশল, বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আরও নানা তথ্য ইন্টারনেটে পাবেন :
http://nithyananda.org/
https://lifeblissprograms.org/books
https://www.facebook.com/ParamahamsaNithyananda

এছাড়াও অনেক বিনামূল্যে বক্তৃতা ও টিউটোরিয়াল ইউটিউবে হয় :
http://www.youtube.com/lifeblissfoundation/



পরমহংস নিত্যানন্দ সম্বন্ধে

ভারতবর্ষের অসাধারণ অবতার মহাপুরুষ পরমহংস নিত্যানন্দ আমাদের সহস্রাব্দে এক ওজস্বল আধ্যাত্মিক শক্তি হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। সমগ্র পৃথিবীতে কয়েক কোটি মানুষের সাথে কাজ ও শেয়ার করতে করতে , নিত্যানন্দ মানবজাতির পরবর্তী বিরাট সাফল্য, 'অতিচেতনা'-তে, আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।

তিনি এক আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং ম্যানেজমেন্ট থেকে মেডিটেশন বা ধ্যান, রিলেশনশিপ্ থেকে রিলিজিয়ন ও সাক্সেস থেকে সন্ন্যাসে তাঁর প্রবুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি আছে। নিত্যানন্দ আমাদের জন্য সম্পদ হিসাবে নিয়ে এসেছেন ব্যবহারিক প্রাজ্ঞতা, ধ্যান-প্রক্রিয়া এবং অন্তরের স্থায়ী রূপান্তরের জন্য পদ্ধতি সমূহ। হাজার হাজার মানুষের বিষণ্ণতা থেকে ক্যান্সারের মত রোগের নিরাময় বা হীলিংয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে - প্রায়ই কেবল তাঁর একটি ছোঁয়াতে। আজ আধ্যাত্মিক মাস্টারদের মধ্যে ইন্টারনেটে ইউ-টিউবে নিত্যানন্দকে সবচেয়ে বেশী দেখা হয় এবং তিনি একজন বেস্টসেলিং লেখক। তাঁর লেখা প্রায় ২০০টি বই আছে ও বইগুলি ২৫টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

অধুনা নিজের দেশে ধার্মিক নির্যাতনের ও আইনবিরুদ্ধ কারাবাসের উত্তরজীবী হয়ে , নিত্যানন্দ নিগ্রহের পরে আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এবং প্রাচ্যের পুরাতন নিগূঢ় শৃঙ্খলা থেকে যোগ ও ধ্যানের গভী র মাত্রাগুলি প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

নিত্যানন্দের প্রামাণিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আমাদের সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে তাঁর গভীর অন্তর্জ্ঞানের জন্য তাঁর শিক্ষাগুলি হল স্থান, কাল ও মনের গণ্ডী পেরিয়ে প্রাসঙ্গিক।

নিত্যানন্দ মিশন সম্বন্ধে

পৃথিবী এক নতুন চেতনায় জাগছে এবং বস্তুগত জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন, অন্তরের বিকাশ ও বাইরের বিকাশ, এদের মধ্যে পৃথকীকরণ শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ছে। নতুন যুগের মানুষ এক সমন্বয়পূর্ণ বিশ্ব গড়ার চেষ্টা করছে যেখানে বস্তুজগতে সাফল্য আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিপূরক হবে , যেখানে পুরাতন প্রাজ্ঞতা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সুন্দরভাবে মিশ্রিত হয়ে সবার জন্য এক সমৃদ্ধতর ও আরও পরিতৃপ্তিকর জীবন সৃষ্টি করবে।

এই বৈপ্লবিক সত্যগুলি সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই নিত্যানন্দ মিশনের প্রচেষ্টা। নিত্যানন্দ মিশন এক বিশ্বজোড়া আন্দোলন এবং তা জাতি, লিঙ্গ ও দেশ নির্বিশেষে আমাদের গ্রহের সমস্ত মানুষের যথার্থ জাগরণ ঘটানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আধুনিক জীবনের আলোকে প্রাচীন বৈদিক প্রাজ্ঞতা পুনরায় ব্যাখ্যা ক'রে এই মিশন ব্যক্তির ও সমষ্টির শক্তিশালী রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে।

প্রোগ্রাম ও ওয়ার্কশপ সমূহ

নিত্যানন্দ ধ্যানপীঠম্ কোটি কোটি মানুষের দেহ, মন ও আত্মা স্তরের মঙ্গলসাধনের জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে সবিশেষ ধ্যান প্রোগ্রাম প্রদান করে। তাদের কয়েকটির তালিকা দেওয়া হ'ল।

ইনার আওয়েকেনিং (Inner Awakening) :

জীবনের সকল অভিমুখে মানুষের পুরো সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এটি একটি ২১ দিনের অনন্য, অদ্বিতীয় এবং প্রগাঢ় ধ্যান প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের প্রধান বৈশিষ্টগুলি হ'ল :

- যোগীর শরীর তৈরির জন্য নিত্যযোগ ও নিত্যক্রিয়া
- মানুষের মন ও আত্মাকে শুদ্ধিকরণ ও তাতে শক্তিসঞ্চার করার জন্য বিভিন্ন ধ্যান প্রক্রিয়ার মিশ্রণ [অতীত-জীবন প্রত্যাবর্তন (past-life regression) সহ]
- শক্তি-দর্শন (energy-darshan)
- কিছু আলোকসম্পাতকারী ক্যাম্প-ফায়ার সেশন
- ঐকান্তিক কুণ্ডলিনী জাগরণ সেশন যেখানে যোগদানকারীরা শারীরিক উত্থানের (levitation) অভিজ্ঞতা লাভ করে

বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীর মাইটোকণ্ড্রিয়াল কোষের শক্তি ১৩০০% বৃদ্ধি পায়। ইনার আওয়েকেনিং নানা প্রকার স্বাস্থ্যগত উপকার প্রদান করে, যেমন মধুমেহ বা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ, রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ, ওজন-ভারসাম্য ও অনিদ্রা থেকে ত্রাণ ইত্যাদি।

নি-ধনাঢ্যতা বা এন্ওয়েল্থ্ (eNWealth) :

সপ্তাহের শেষে পরমহংস নিত্যানন্দের সাথে এক অসাধারণ ওয়ার্কশপ যেখানে তিনি ধনসম্পদ সৃষ্টির বিষয়ে গুহ্য বৈদিক রহস্য প্রদান করেন - যেমন সম্পদ আকর্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সঠিক অন্তর্দেশ গঠন, নিখুঁত ও দায়িত্বপূর্ণভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, অনায়াস-সাফল্যের জন্য বন্দোবস্ত করার প্রক্রিয়া।

নিত্যানন্দ মিশনের প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ :

- বিশ্বজুড়ে ধ্যান ও নেশা-ছাড়ানোর ক্যাম্প : অদ্যাবধি ৫০ লাখের বেশী মানুষ প্রভাবিত
- নিত্য আধ্যাত্মিক নিরাময় (Nithya Spiritual Healing) : বিনামূল্যে ৫০০০ প্রশিক্ষক হীলার বা আরোগ্যকর্তা মহাজাগতিক শক্তি দ্বারা দেহ ও মন নিরাময় করেন।
- অন্নদান : সব আশ্রমের অন্নমন্দির থেকে দর্শনার্থী, ভক্তমণ্ডলী ও শিষ্যদের প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার পুষ্টিকর ভোজন বিতরণ করা হয় ও স্বাস্থ্য-মানদণ্ডের উন্নতিসাধন করা হয়।
- নিত্যানন্দ প্রথা ও প্রশিক্ষণ (The Nithyananda-Order and its training) : আধ্যাত্মিক অন্বেষণকারীরা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হবার জন্য আসে। তারা কয়েক বছর ধরে যোগ, ধ্যান, গভীর আধ্যাত্মিক অভ্যাস, সংস্কৃত, বৈদিক স্তব, জীবন কুশলতার প্রগাঢ় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। তারা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নিত্যানন্দ ধ্যানপীঠমের বিশ্বব্যাপী সমস্ত আশ্রমগুলির সব কাজ করে ও মিশনগুলিকে চালায়। নিত্যানন্দ ধ্যানপীঠম ১০০% স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে নির্ভরশীল।
- নিত্যযোগ : ঋষি পতঞ্জলির আসল শিক্ষাকে অনুসরণ করে বৈপ্লবিক যোগ পদ্ধতি, তা পনেরটি দেশে শেখানো হয়।

- নিত্যানন্দ বৈদিক মন্দির : বিশ্বব্যাপী ৩৩-টির বেশী বৈদিক মন্দির এবং আধ্যাত্মিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
- কারাগারে ধ্যান প্রোগ্রাম : জেল ও জুভেনাইল-ক্যাম্পে চরমপন্থী মনোভাব সংশোধন করার জন্য। নিবাসীদের অদ্ভুত রূপান্তর হয়।
- চিকিৎসা শিবির : বিনামূল্যে চিকিৎসা; আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, আকুপাংচার, চোখ পরীক্ষা ও সার্জারি, স্ত্রীরোগ, নকল অঙ্গ প্রদান এবং আরও অনেক।
- গ্রামাঞ্চলে শিশুদের সাহায্য : স্কুল-বাড়ী, স্কুল-পোশাক এবং শিক্ষার উপাদান সরঞ্জাম বিনামূল্যে গ্রামের স্কুলগুলিতে দেওয়া হয়।
- নিত্যানন্দ বিদ্যালয় : এখানে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি সংযুক্ত ক'রে জীবনমুক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিশুদের অবদমন, ভয় ও বড়দের চাপ ছাড়া প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করা হয়।
- কর্পোরেট ধ্যান প্রোগ্রাম : বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট ফার্মদের জন্য বিশেষভাবে সংকল্পিত ও পরিচালিত প্রোগ্রাম। এতে মাইক্রোসফ্ট্, এটি অ্যান্ড টি, কোয়াল কম, জেপি মর্গান, পেট্রোব্রাস, পেপ্সি, অরাক্যাল্, আমেরিকান এসোসিয়েসন অফ ফিসিশিয়ান অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন (AAPI) লাভ পেয়েছে। এই প্রোগ্রামে ফোকাস করা হয় স্বজ্ঞামূলক পরিচালন (intuitive management), অধিনায়কত্বের দক্ষতা (Leadership Skill) এবং টীমওয়ার্ক।
- নিত্যানন্দ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান : ৩০০ জনেরও বেশী শিক্ষককে এই সব বিষয়ে শিক্ষা দেবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে : রূপান্তরমূলক ধ্যান প্রোগ্রাম, কোয়ান্টাম স্মৃতি প্রোগ্রাম, নিত্যযোগ, স্বাস্থ্য ও নিরাময় প্রোগ্রাম, আধ্যাত্মিক অভ্যাস প্রোগ্রাম এবং আরও অনেক।
- গণমাধ্যম (Media) : নিত্যানন্দ-কথিত রূপান্তরিত হবার জন্য সন্দেশ ও রচনা দেশে ও বিদেশের সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়।
- নিত্যানন্দ পাব্লিশার্স : ৫০০০ ঘন্টার বেশী সময়ের পরমহংস নিত্যানন্দের বক্তৃতাগুলি আভ্যন্তরীণভাবে প্রতিলিপি করে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করা হয়েছে এবং দোকানে বই, ডিভিডি ও সিডি বানিয়ে উপলব্ধ করা হয়েছে।
- লাইফব্লিস্ গ্যালেরিয়াস্ : বিশ্বব্যাপী স্টোর ও চলমান দোকান থেকে ২৩টি ভাষায় নিত্যানন্দের বক্তৃতার বই ও নিত্য কীর্তনের রেকর্ডিং বিক্রি করা হয়।
- নিত্যানন্দ ধ্যান ও নিরাময় কেন্দ্র (Nithyananda Meditation end Healing Centers) : বিশ্বব্যাপী ধ্যান-সেবা ও নিরাময়-সেবা করা হয়।
- নিত্যানন্দ সঙ্গীত অ্যাকাডেমি : সঙ্গীত, নৃত্য এবং অন্যান্য কলার শিক্ষাদান করা হয় এবং যুবা ও যুবা-মনের প্রৌঢ়দের উৎসাহিত করা হয় - লাইভ এবং ইন্টারনেট দ্বারা।
- বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সহায়তা : আধ্যাত্মিক শক্তি ও হীলিংয়ের ওপর রিসার্চ দ্বারা ক্রমাগত বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বিভেদ দূর করা হচ্ছে।
- নিত্যানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ ফাউণ্ডেশন (NIYF) : অনুপ্রাণিত যুবাদের এক সমষ্টি শান্তি ও জীবনমুক্তির সর্বজনীন ভাবাদর্শ দ্বারা দিব্য ও প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণে লিপ্ত।
- উইমেন্স্ এম্পাওয়ারমেন্ট (WE) : জীবনমুক্তির সর্বজনীন ভাবাদর্শ সহকারে এক প্রগতিশীল মহিলাদের শাখা সমাজকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে সেবা করছে।
- নিত্য ধীরা সেবা সেনা : নিজের রূপান্তরের মাধ্যমে এই 'আনন্দ-সেবক' স্বেচ্ছাকর্মীরা মানবসেবার কাজ করে ও তার প্রশিক্ষণ দেয়। তারা কোন বিপর্যয়ের সময় পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রাণকর্মী বা রিলিফ উইং হিসাবে সেবা করে।

আমাদের যোগাযোগ করুন :

USA

Los Angeles
NITHYANANDA VEDIC TEMPLE
9720 Central Avenue,
Montclair, CA 91763
Ph.: +1 909 625 1400
E mail:
programs@lifeblissfoundation.org,
shop@lifebliss.org
Web: www.NithyanandaVedicTemple.org

Seattle
NITHYANANDA VEDIC TEMPLE,
2877, 152nd Ave NE, Bldg #13,
Redmond, WA
Ph.: +1 425-749-7073
Web: http://www.vedictempleseattle.org/

Columbus, Ohio
NITHYANANDA VEDIC TEMPLE,
820 Pollock Rd,
Delaware, OH - 43015
Web: http://www.vedictempleohio.org/

San Jose
NITHYANANDA VEDIC TEMPLE,
513, Los Coches Street,
Milpitas, CA - 95035
Ph.: +1 408-263-6375
Email: info.vedictemple@gmail.com
Web: http://
www.vedictemplebayarea.org/

Phoenix
NITHYANANDA VEDIC TEMPLE,
6605 S 39th Ave
Phoenix, AZ 85041
Ph.: +1 602-268-0233
Email: VedicTemplePhx@gmail.com
Web: http://vedictemplephoenix.org/

INDIA

Bengaluru, Karnataka
Nithyananda Dhyanapeetam
Nithyanandapuri, Kallugopahalli,
Off Mysore Road, Bidadi - 562109
Ramnagara District, Karnataka, INDIA
Ph.: +91 80 2720 2084 / +91 97422 03311
Email: wc@nithyananda.org
Web: http://nithyananda.org/ashram

Hyderabad, Andhra Pradesh
Nithyananda Dhyanapeetam
Nithyananda Giri, Pashambanda
Sathamarai Village,
Shamshabad Mandal,
Rangareddy District - 501218
Ph.: +91-9866500350, +91-9396482358
Email: dhyanapeetamhyd@gmail.com
Web: http://www.dhyanapeetam.org/web/ap/

Tiruvannamalai, Tamil Nadu
Nithyananda Dhyanapeetam,
Nithyanandapuri, Girivala path,
Adiannamalai
Tiruvannamalai - 606 604
Tamilnadu, INDIA
Ph.: +91-4175-237666, 094449 91089
E-mail: tvmalai@nithyananda.org
URL: http://arunachala.nithyananda.org/

MALAYSIA
Nithyananda Dhyanapeetam Malaysia ,
14, Jalan Desa Gombak 5,
Taman Desa Gombak,
53000 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Ph.: +601 78861644 / +601 22350567
Email: nithya.nirantarananda@gmail.com

ইনার অ্যাওয়েকেনিং প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানুন :
www.innerawakening.org

ইনার অ্যাওয়েকেনিং সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ই-মাইল করে আপনার প্রশ্ন পাঠাতে পারেন :
ia@nithyananda.org

বিনামূল্যে বক্তৃতা, বই, ধ্যান ও যোগব্যায়াম কৌশল, বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আরও নানা তথ্য ইন্টারনেটে পাবেন :
http://nithyananda.org/
https://lifeblissprograms.org/books
https://www.facebook.com/ParamahamsaNithyananda

এছাড়াও অনেক বিনামূল্যে বক্তৃতা ও টিউটোরিয়াল ইউটিউবে হয় :
http://www.youtube.com/lifeblissfoundation/

Paramahamsa
NITHYANANDA

নিশ্চিত সমাধান
পরমহংস নিত্যানন্দ

এই বইটি আপনার আবেগসমূহকে নতুনভাবে বুঝিয়ে দেবার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। এটি আপনাকে শরীরের ভিতরে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকা শক্তি-চক্রগুলির সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়। চক্রগুলির ক্রিয়াকলাপ আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশলতার জন্য দায়ী। বইটি নির্দিষ্ট আবেগের সাথে সম্পর্কিত চক্রের সম্বন্ধতা ব্যাখ্যা করে।

আপনি অনুধাবন করবেন কোন আবেগ কিভাবে সূক্ষ্মরূপে আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে। আপনি উপলব্ধি করবেন যে দৌর্বল্যকর আবেগ নিছক এক বস্তু বিনা প্রচ্ছায়া। এই আবেগসমূহকে বশে আনার জন্য অনেকগুলি শক্তিশালী ধ্যান প্রক্রিয়াও দেওয়া হয়েছে। আপনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যে আবেগসমূহের বশে না এসে তাদের থেকে মুক্ত হয়ে জীবনযাপন করা যায়।

আপনি মনের উভয়সঙ্কট অবস্থা ও সত্তার বিষাদগ্রস্ততা থেকে মুক্ত হবার জন্য এই বইটি থেকে সাহায্য পাবেন। যে মানসিক গোলামী আপনার আত্মাকে বন্ধনে রেখেছে, তার থেকে মুক্ত হবার জন্যও সমাধান পাবেন। সমৃদ্ধিলাভের জন্য ও অন্তর্দেশের কেন্দ্রের সাথে পুনরায় সংযোগসাধনের জন্য, আপনি আপনার ভিতরে এক স্থান সৃষ্টি করবেন। এইভাবে আপনি সম্বন্ধস্থাপন করতে পারবেন আপনার প্রকৃত সত্তার সাথে - যা শরীর ও মনের অতীতে, যা বিশুদ্ধ এবং চিরন্তন আনন্দ - নিত্য আনন্দ- নিত্যানন্দ!